ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম

ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম

মুহাম্মাদ কুতুব

ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম

মুসলিম জাহানের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ

মুহাম্মাদ কুতুব

বাংলা অনুবাদ

অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ আবদুর রাজ্জাক

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৩৯

১৫শ প্রকাশ

জমাদিউল আউয়াল ১৪৩৪

চৈত্র ১৪১৯

এপ্রিল ২০১৩

বিনিময় ঃ ১৬০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

شبهات حول الاسلام -এর বাংলা অনুবাদ

BHRANTIR BERAZALE ISLAM. by Mohammad Qutub. Published by Adhunik Prokashani, 25, Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25, Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 160.00 Only

মুহাম্মাদ কুতুব মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামী আন্দোলন ইখওয়ানুল মুসলেমুনের বিশিষ্ট নেতা সাইয়েদ কুতুব শহীদের ভাই। এক সময়ে তিনি মিসরের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। বিভিন্ন সময় তিনি ইসলাম সম্পর্কে যেসব প্রশ্নের সম্মুখীন হন এবং আধুনিক শিক্ষিত যুব মানসে যেসব জিজ্ঞাসা তিনি লক্ষ্য করেন, 'ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম' তারই জবাব। প্রাঞ্জল ভাষায়, যুক্তি ও তথ্য সহকারে তিনি ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনামূলক পর্যালোচনা করে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করেন। এক দিকে ইসলামী আদর্শ ও ইতিহাস সম্পর্কে শতাব্দীকালের অজ্ঞতা, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার অনুপস্থিতি, অন্যদিকে সমকালীন পাশ্চাত্য সভ্যতার সর্বগ্রাসী সয়লাব ইসলাম সম্পর্কিত বিভ্রান্তির মূল কারণ।

বর্তমান বইটি আরবী ভাষায় ১৯৬৪ সালে কায়রো হতে প্রকাশিত হয়। ১৯৬৭ সালে কুয়েত সরকার এর ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশ করেন। ১৯৭৮ সাল থেকে আমরা এই বইটির যে অনুবাদ প্রকাশ করে আসছিলাম তা ছিল কুয়েত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ইংরেজী সংস্করণের অনুবাদ। এতে সম্পাদক মূল কপি হতে কিছু কিছু অংশ বাদ দিয়েছেন।

বর্তমানে বইটির মূল আরবী কপি হতে সরাসরি অনুবাদ ও কোন রকম কাটছাট না করা উত্তম বিবেচিত হওয়ায় এবং অনেক বিজ্ঞ পাঠকের পরামর্শ পাওয়ায় আমরা বইটির মূল আরবী থেকে বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করলাম।

বিশিষ্ট ইসলামী শিক্ষাবিদ সুসাহিত্যিক এবং গবেষক অধ্যক্ষ আবদুর রাজ্জাক বর্তমান সংস্করণের অনুবাদ করেছেন। আশা করি বইটি পাঠক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করবে।

মহান আল্লাহ পুস্তকটির সাথে সম্পৃক্ত সকলের খেদমতকে কবুল করুন।

—প্রকাশক

বিষয় | পৃষ্ঠা

ভূমিকা

আধুনিক শিক্ষিত লোকদের অধিকাংশই একটা কঠিন ধর্মীয় সংকটে আবর্তিত হচ্ছেন। তাদের বক্তব্য হলো : "ধর্ম কি মানব জীবনের জন্যে সত্যিই অপরিহার্য ? অতীতে হয়ত তা-ই ছিল। কিন্তু বর্তমানে যখন বিজ্ঞান মানব জীবনের সমগ্র ধারাকেই পরিবর্তিত করে দিয়েছে এবং বাস্তব জীবনে বৈজ্ঞানিক সত্য ছাড়া অন্য কিছুর আদৌ কোন স্থান নেই তখন উক্ত দাবী সংগত হতে পারে কি ? ধর্ম কি মানুষের জন্যে স্বাভাবিকভাবেই প্রয়োজন ?—না এটা তাদের ব্যক্তিগত রুচি বা ইচ্ছা-অনিচ্ছার ব্যাপার যে, কেউ এটা গ্রহণ করছে, আবার কেউ এটাকে প্রত্যাখ্যান করছে ? এতে করে কি প্রমাণিত হয় না যে, ধর্মকে মানা অথবা না মানার কারণে মানুষের কার্যকলাপে তেমন কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না ? আর আমরা মানুষের যে আচরণ ও কর্মতৎপরতাকে 'কুফর (আল্লাহদ্রোহিতা)' বা 'ঈমান' নামে অভিহিত করি বাস্তবতার নিরিখে তাতে কোন তফাৎ নেই ?

তারা যখন ইসলাম সম্বন্ধে কথা বলেন তখন তাদের এই মানসিক দ্বন্দ্ব ও সংশয়ের স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। যখন তাদেরকে বলা হয় : ইসলাম শুধু কিছু প্রত্যয় ও আকীদার নাম নয়। শুধু আধ্যাত্মিক পবিত্রতা অথবা মানুষের কল্যাণমূলক শিষ্টাচার বা নিয়ম-শৃংখলার মধ্যেও সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটা হচ্ছে এমন একটি সর্বাত্মক ও সুসম্বিত পূর্ণাংগ জীবনব্যবস্থা যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে একটি সুবিচার ভিত্তিক অর্থনৈতিক জীবনাদর্শ, ভারসাম্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থা, দেওয়ানী-ফৌজদারী ও আন্তর্জাতিক আইন-কানুন, একটি বিশেষ জীবনদর্শন এবং দৈহিক প্রশিক্ষণ ও প্রতিপালনের সুষ্ঠু বিধান। আর এর সবকিছুই উহার মৌল বিশ্বাস এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবধারা থেকেই উৎসারিত তখন এরা খুব বিব্রত ও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। কেননা তাদের একমাত্র বক্তব্যই হলো : ইসলাম বহু পূর্বেই উহার শৌর্য ও কল্যাণকর ভূমিকা থেকে চিরতরে বঞ্চিত হয়ে সম্পূর্ণরূপেই অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে। এ কারণে যখনই তাদেরকে বলা হয় : ইসলাম কোন মৃত ধর্মের নাম নয়। বরং উহা এক অপরাজেয় দুর্বার শক্তি, পাতায়-পল্লবে, ফলে-ফুলে সুশোভিত এক জীবন পদ্ধতি যাতে কার্যকর রয়েছে এমন এমন শক্তিশালী উপাদান যার দৃষ্টান্ত না সমাজতন্ত্র পেশ করতে পেরেছে, না সাম্যবাদ উহার কল্পনা করতে সক্ষম হয়েছে, না অন্য কোন মতবাদ উহার বিকল্প তুলে ধরতে পেরেছে তখন তারা অধৈর্য হয়ে পড়েন এবং আমাদেরকে প্রশ্ন করতে থাকেন : "আপনারা কি সেই ধর্ম সম্বন্ধে এই কথাগুলো বলছেন যা দাস প্রথা, সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদকে সমর্থন করে ?—যা

নারীকে পুরুষের অর্ধেক বলে মনে করে এবং তাকে ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী করে রেখে দেয় ?—যা পাথর মেরে মেরে মানুষ হত্যা, হাত-পা কেটে ফেলা এবং কোরা লাগাবার ন্যায় পাশবিক শাস্তির বিধান দেয় ?—যা উহার অনুসারীদেরকে দান-খয়রাতের পয়সা দিয়ে জীবনযাপন করতে শেখায় ?—যা তাদেরকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করে দেয় যাতে করে কিছু লোক অন্যদের ধন-সম্পদ শোষণ করতে সক্ষম হয় ?—যা শ্রমিকদেরকে সুখী ও সমৃদ্ধ জীবনের কোন নিশ্চয়তা বিধান করতে পারে না ? আর যে ইসলাম সম্পর্কে আপনারা এটা-ওটা বলছেন তা কি আপনারা নিজেরা পালন করে থাকেন ? এর উন্নতি বিধান ও ভবিষ্যত সাফল্যের নতুন নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ তো দূরে থাক, আমাদের দৃষ্টিতে এর অস্তিত্বই এখন চারদিক থেকে বিপন্ন হয়ে পড়েছে —আজকের বিশ্বে যখন বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক মতবাদের আদর্শিক সংঘাত তুঙ্গে উঠেছে তখন ইসলামের ন্যায় একটি বস্তাপচা ধর্মের ক্ষীণকণ্ঠ ও সাফল্যের কথা কোন আলোচ্য বিষয় বলেও পরিগণিত হতে পারে না।"

আরো সামনে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে, আসুন এই সন্দেহবাদী আধুনিক শিক্ষিতদের প্রকৃত পরিচয় আমরা জেনে নেই।—পর্যালোচনা করে দেখি, তাদের এই সন্দেহ ও সংশয়ের মূল সূত্র ও উৎস কোথায় ? তাদের এই চিন্তাধারা কি তাদের নিজস্ব ও স্বাধীন বিচার-বিশ্লেষণের ফল, না অন্যদের অন্ধ অনুসরণের ফসল ?

প্রকৃত অবস্থা এই যে, এরা ইসলামের বিপক্ষে যে সন্দেহ ও সংশয় প্রকাশ করে থাকেন তা তাদের স্বাধীন চিন্তা ও নিরপেক্ষ বিচার বিবেচনার ফসল নয়। বরং এরা তা অন্যদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছেন। এর মূল উৎস জানতে হলে আধুনিক যুগের ইতিহাসের প্রতি দৃকপাত করতে হবে।

মধ্য যুগে ইউরোপ এবং ইসলামী বিশ্বের মধ্যে ক্রুসেড নামে কয়েকবারই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অতপর উভয় পক্ষের মধ্যে বাহ্যিকভাবে সন্ধি স্থাপিত হলেও আন্তরিকভাবে কোন মৈত্রী স্থাপিত হয়নি। ফলে পারস্পরিক বৈরিতারও কোন অবসান হয়নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ইংরেজরা যখন যেরুজালেম দখল করে নেয় লর্ড এলেন বি (Allcn By) প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেন ঃ আজই ক্রুসেডের অবসান হল।"

এই সংগে আমাদের একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, বিগত দু'শ' বছর ধরে ইউরোপ সাম্রাজ্য ও ইসলামী বিশ্বের মধ্যে একটি বিরতিহীন সংঘর্ষ চলছে। তওফীক পাশার ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ইংরেজরা মিসরে প্রবেশ করার সুযোগ লাভ করে। মিসরে আরাবী পাশার নেতৃত্বে সংগঠিত ১৮৮২

খৃস্টাব্দের গণবিপ্লবকে ইংরেজরা এই তওফীক পাশার সাহায্যে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করে দিয়ে ক্ষমতা দখল করে নেয়। অতপর তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় যে কোন পন্থায়ই হোক না কেন নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী থাবা বিস্তার করে ইসলামের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণকে দৃঢ় হতে দৃঢ়তর করে তুলতে হবে এবং সম্ভাব্য যাবতীয় উপায়-উপাদান ব্যবহার করে, নিজেদের ক্ষমতাকে অপ্রতিরোধ্য করে তোলার উদ্দেশ্যে ইসলামী আন্দোলন ও উহার দুর্বার চেতনাকে পর্যুদস্তু করে দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে স্মরণীয় যে, ভিক্টোরিয়া যুগের বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ গ্লাডস্টোন একবার এক জিলদ কুরআন পাক হাতে নিয়ে বৃটিশ কমন্‌স্‌ সভায় (House of Commons) সদস্যগণকে বলেছিলেন ঃ "মিসরীয়দের নিকট যতদিন এই গ্রন্থ বর্তমান থাকবে ততদিন মিসরের বুকে আমরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে অবস্থান করতে পারবো না।

এ কারণেই ইংরেজরা মুসলমানদেরকে ইসলাম সম্পর্কে বিমুখ ও উদাসীন করে তোলার উদ্দেশ্যে ইসলামী আচার-অনুষ্ঠানকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠে এবং ইসলামের এক জঘন্য ও কদর্য রূপ উপস্থাপিত করতে শুরু করে—যাতে করে মিসরের উপর তাদের সাম্রাজ্যবাদী বন্ধন দৃঢ় হতে দৃঢ়তর হতে থাকে এবং তাদের পৈশাচিক উদ্দেশ্যসমূহ সফল হতে থাকে।

মিসরে তারা যে শিক্ষানীতি প্রবর্তন করে তাতে প্রকৃত অর্থে মুসলমান শিক্ষার্থীদেরকে তাদের দ্বীন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভের কোন সুযোগই দেয়া হয়নি ; এমনকি তাদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষায়তন থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রী হাসিল করার পরেও কেউ ইসলামের প্রকৃত মর্ম সম্পর্কে অবহিত হতে পারেনি। সে সকল শিক্ষায়তনে তাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে যে জ্ঞান দান করা হতো তার সারকথা ছিল এই যে, কুরআন পাক আল্লাহর কিতাব। কেবলমাত্র বরকত ও সওয়াব লাভের জন্যেই উহা পাঠ করা হয়। আর ইসলাম অন্যান্য ধর্মের ন্যায় মানুষকে ভালো মানুষ রূপে গড়ে তোলার জন্যে নৈতিক চরিত্রকে উন্নত করার প্রেরণা দেয় এবং ঐ সকল ধর্মের ন্যায় ইহাও ইবাদাত-বন্দেগী, অযীফা-যিকর, কাশফ -কারামাত এবং দরবেশী ও তাসাউফের একটি সমষ্টি মাত্র। ইসলামের পরিধি এতটুকুই। এছাড়াও ইসলামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন-কানুন এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতি মানুষের নিকট যে অনন্য সঞ্জীবনী শক্তির সন্ধান দেয় সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদেরকে শুধু যে অন্ধকারে ফেলে রাখা হয় তাই নয়, বরং তথাকথিত প্রাচ্যবীদদের প্রচারিত ভ্রান্ত চিন্তাধারা এবং ধ্বংসাত্মক সংশয়ের অনুসারী করে তোলা হয়। আর এর একমাত্র লক্ষ্য থাকে তাদের মেধা ও চিন্তাধারাকে বিকৃত করে তাদের সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা।

এই সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদেরকে শুধু শেখানো হয়েছে যে, সমগ্র বিশ্বে ইউরোপের জীবন ব্যবস্থাই সবচেয়ে উপযুক্ত ও সর্বশ্রেষ্ঠ ; সর্বোৎকৃষ্ট অর্থনীতি ইউরোপীয় চিন্তাবীদদের সর্বাত্মক গবেষণার সুফল। আধুনিক যুগের সবচেয়ে উপযুক্ত ও নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রনীতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণই শত শত বছরের পরীক্ষা-নিরিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচনা করেছেন। শিক্ষার্থীদেরকে আরো বুঝানো হয়েছে ঃ মৌলিক অধিকার সর্বপ্রথম ফরাসী বিপ্লবই মানুষকে দিয়েছে। গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক জীবনধারার বিস্তার ও জনপ্রিয়তার সবটুকুই ইংল্যান্ডের গণতান্ত্রিক বিকাশের সুফল। আর সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রকৃত বুনিয়াদ রোমান সভ্যতা ও সাম্রাজ্যের সর্বোকৃষ্ট উপহার। মোটকথা এই শিক্ষাব্যবস্থা ইউরোপ ও ইউরোপীয়দের এক আকর্ষণীয় ও মনোমুগ্ধকর চিত্র তুলে ধরেছে। উহা দেখা মাত্রই এরূপ বিশ্বাস জন্মে যে, ইউরোপ একটি গর্বিত অথচ মহান শক্তি ; বিশ্বের কোন শক্তিই উহার মোকাবিলা করতে সক্ষম নয় ; উহার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার পথে কোন শক্তিই কোন বাধার সৃষ্টি করতে পারে না। আর এর বিপক্ষে শিক্ষার্থীদের সম্মুখে প্রাচ্যকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও অবমাননাকর বলে উপস্থাপিত করা হয়েছে, ইউরোপের সম্মুখে প্রাচ্যের যেন কোন মূল্যই নেই, বরং প্রাচ্যের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব সম্পূর্ণরূপেই ইউরোপীয় লোকদের উপর নির্ভরশীল ; সভ্যতা ও সংস্কৃতি বলতে প্রাচ্যের নিকট কিছুই নেই, যতটুকু যা আছে তা এতদূর নিম্ন মানের যে, উহা পাশ্চাত্যের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পুঁজির মূল্যবোধের ছিটে-ফোটা নিয়েই কোন রূপে বেঁচে আছে।

সাম্রাজ্যবাদীদের এই রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র একদিন সফল হলো। মিসরীয় মুসলমানদের নতুন প্রজন্ম জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ, স্বকীয় সাংস্কৃতিক ও ব্যক্তিত্ববোধ থেকে বঞ্চিত হলো। ইউরোপ ও উহার সভ্যতা তাদের মন-মানসিকতা ও ধীশক্তিকে একেবারেই আচ্ছন্ন করে ফেলল। না তারা নিজেদের চোখ দিয়ে দেখতে পারত, না তাদের প্রজ্ঞা ও ধীশক্তিকে কাজে লাগিয়ে কোন কিছু ভাবতে পারত। তাদের পর্যবেক্ষণ ও চিন্তাশক্তি রহিত হয়ে গেল ; ইউরোপীয় প্রভুদের সন্তুষ্টি বিধানই তাদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়াল।

এই ঐতিহাসিক পটভূমিতে বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আধুনিক শিক্ষিত মুসলমানদের অস্তিত্ব সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের রাজনৈতিক সংগ্রামের এক বিরাট অবদান, তাদের গোপনীয় ষড়যন্ত্র সফল হওয়ার সবচাইতে বড় দলীল। মুসলিম সমাজে এই শিক্ষিত শ্রেণীর চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ড সাম্রাজ্য-বাদীদের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সুস্পষ্ট দর্পণ।

ইসলাম সম্পর্কে এই বেচারাদের জ্ঞান খুবই সীমিত ও অসম্পূর্ণ এবং তাদের পাশ্চাত্যের শিক্ষকদের নিকট থেকে গৃহীত। অনুরূপভাবে সাধারণ ধর্ম

সম্বন্ধে তাদের ধ্যান-ধারণাও ইউরোপীয়দের আপত্তি ও সন্দেহের প্রতিধ্বনি মাত্র। বলা বাহুল্য প্রভুদের দেখাদেখিই তারা ইসলাম সম্পর্কে নানারূপ ভিত্তিহীন প্রশ্নের অবতারণা করে। কখনো বলে ঃ রাষ্ট্রীয় ও সরকারী কার্যকলাপে ইসলামের কোন স্থান থাকতে পারে না ; আবার কখনো তারা এই বলে ঢাক-ঢোল পিটাতে থাকে যে, ইসলাম ও বিজ্ঞান পরস্পর বিরোধী, একটির সাথে আরেকটির কোন মিল নেই।

কিন্তু মূর্খতা আর কাকে বলে ? হয়ত তারা অবগতই নয় যে, গোটা ইউরোপ যে ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিল তার নাম ইসলাম ছিল না, বরং তা ছিল ইসলাম থেকে ভিন্নতর অন্য একটি ধর্ম। একথাও তারা ভুলে যায় যে, যে অবস্থা ও ঘটনাবলী ইউরোপীয়দেরকে নিজেদের ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তুলেছিল তা শুধু ইউরোপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিশ্বের অন্য কোন এলাকায় এর কোন নযীর খুঁজে পাওয়া যায় না। ন্যূনকল্পে ইসলামী ইতিহাসের এমন কোন অবস্থা ও ঘটনাবলীর কোন সন্ধান মিলে না। এমনকি ভবিষ্যতেও এরূপ অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু ইউরোপের এই অন্ধ অনুসারীরা কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা না করেই নিজেদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। তাদের মতে ইসলামকে বর্জন করার একমাত্র কারণ হল এই যে, ইউরোপীয়রা ধর্মের প্রতি রুষ্ট এবং রুষ্ট বলেই উহাকে দেশ থেকে চিরতরে বিদায় দিয়েছে।

ইউরোপে ধর্ম ও বিজ্ঞানের পারস্পরিক সংঘর্ষের মূলে ছিল ধর্মযাজকদের নির্বুদ্ধিতা। তারা কোনরূপ বিচার-বিশ্লেষণ না করেই গ্রীসদের পরিত্যক্ত কিছু বৈজ্ঞানিক ধারণাকে ধর্মের অংগীভূত করে উহাকে পবিত্রতার লেবাস পরিয়ে দেয়। ফলে উক্ত ধারণার অস্বীকৃতিও নিরংকুশ সত্য বা ধর্মের অস্বীকৃতি বলে বিবেচিত হয়। অতপর সুষ্ঠু চিন্তা ও সঠিক গবেষণার মাধ্যমে যখন উক্ত ধারণার ভুল-ভ্রান্তি ধরিয়ে দেয়া হয় তখনও তাদের চৈতন্য উদয় হল না। বরং জ্বলজ্যান্ত ভুলকেও নির্ভুল ও অকাট্য সত্যরূপে গ্রহণ করার বিধান চালু রাখা হয়। এই পরিবেশ গোটা ইউরোপে গীর্জা ও ধর্মযাজকদের মর্যাদাকে মারাত্মকভাবে ম্লান করে দেয়। ধর্ম ও বিজ্ঞানের এই দ্বন্দ্ব ক্রমেই এক ধ্বংসাত্মক রূপ গ্রহণ করে এবং জনসাধারণের মধ্যে ধর্মীয় জুলুম ও নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে প্রচন্ড প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। এরপর যখন ধর্মযাজকগণ তাদের 'খোদায়ী শক্তি'কে অভাবনীয় নিষ্ঠুর পন্থায় ব্যবহার করতে শুরু করে তখন আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকল মানুষই ধর্মের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠে। ধর্মযাজকগণ নিজেদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ইউরোপবাসীদের সম্মুখে

ধর্মের যে চিত্র ফুটিয়ে তুলেছে তা ছিল অতিশয় জঘন্য ও বর্বরোচতি। তাদের ধর্ম হয়ে উঠলো এক শক্তিশালী দানব। এই দানবের ভয়ে দিবাভাগে যেমন মানুষ এক মুহূর্তও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারত না। তেমনি রাতের অন্ধকারেও তারা তার খপ্পর থেকে রেহাই পেত না। ধর্মযাজকরা ধর্মের নামে যে অর্থ জনসাধারণের কাছ থেকে আদায় করে নিত তার ফলে তারা কার্যতই তাদের দাসে পরিণত হল। ধর্মযাজকরা নিজেদেরকে এই জমিনের বুকে আল্লাহর প্রতিনিধি বলে মনে করত এবং তাদের দাবী ছিল ঃ তাদের যে কোন কথা বা উদ্ভট বক্তব্যকে চিরন্তন সত্য বলে অবনত মস্তকে স্বীকার করতে হবে। এ কারণে যে সকল বৈজ্ঞানিক তাদের কোন রায়ের সাথে একমত হতে পারেননি তাদের জন্যে তারা নিষ্ঠুরতম দৈহিক শাস্তির ব্যবস্থা করেছে এবং নামমাত্র খুঁটিনাটি কথার জন্যেও তাদেরকে জীবন্ত অবস্থায় পুড়িয়ে মেরেছে। যে বৈজ্ঞানিক পৃথিবীকে গোলাকার বলে রায় দিয়েছিলেন তার করুণ কাহিনীই এর একটি স্পষ্ট উদাহরণ।

মোটকথা ধর্মযাজকদের এই নিস্পেষণ ও অন্যায় আচরণ ইউরোপের সকল বিবেকবান ও চিন্তাশীল মানুষকে অস্থির করে তুলল। তখন তারা এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে, ধর্মনামধারী এই বিরাট দৈত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে ; হয় তাকে চিরতরে নির্মূল করে দিতে হবে, নইলে অন্তত পক্ষে এতখানি দুর্বল করে দিতে হবে যাতে করে ভবিষ্যতে কাউকে কোনদিন নির্যাতিন করতে না পারে এবং নিজের ভ্রান্ত কর্মকাণ্ড দিয়ে একথা প্রমাণ করতে না পারে যে, মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার নামই হচ্ছে ধর্ম।

কিন্তু প্রশ্ন এই যে, ইউরোপবাসী ও ধর্মের মধ্যে যে সম্পর্ক মুসলমান ও ইসলামের মধ্যেও কি সেইরূপ সম্পর্ক বর্তমান ? যদি না হয়ে থাকে, তাহলে ইসলাম ও বিজ্ঞানের বৈরিতা সম্পর্কে এত হৃড়-হাঙ্গামা কেন ? বাস্তব সত্য তো এই যে, ইসলাম ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। না আজ পর্যন্ত এমন কোন বৈজ্ঞানিক সত্যের কথা বলা হয়েছে-যা মেনে নিলে ইসলামের কোন সত্য ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়। ইসলামের সুদীর্ঘ শাসনামলে এমন কোন সময় আসেনি যখন বৈজ্ঞানিকগণকে পাশবিক অত্যাচারের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করা হয়েছে। ইসলামের সমগ্র ইতিহাসই আজ আমাদের সামনে বর্তমান। এর বিভিন্ন অধ্যায়ে চিকিৎসা বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রের বড় বড় পণ্ডিত অতীত হয়েছেন, কিন্তু তাদের এমন একটি ঘটনার কথাও কেউ বলতে পারবে না যে, অমুককে তার বৈজ্ঞানিক রায় বা চিন্তাধারার জন্যে নিগৃহীত করা হয়েছে। এই মুসলিম বিজ্ঞানীদের কেউই ইসলাম এবং বিজ্ঞানের মধ্যে কোন দূরত্ব বা বৈপরীত্য খুঁজে পাননি। এরূপে

মুসলিম শাসকমণ্ডলীও তথাকথিত ধর্মযাজকদের ন্যায় বিজ্ঞানীদেরকে কখনো শত্রু বলে মনে করেননি। এবং করেননি বলেই ইসলামের ইতিহাসে না কোন বিজ্ঞানীকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে, না কাউকে বন্দী করে রাখা হয়েছে, না কাউকে অন্যরূপ শাস্তি দেয়া হয়েছে।

কিন্তু এ সত্ত্বেও কিছু লোক ইসলাম ও বিজ্ঞানকে পরস্পর বিরোধী প্রমাণ করার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে। এরা ইসলামের কোন জ্ঞান হাসিল না করেই ইসলামের দোষ-ত্রুটি আবিষ্কার করতে শুরু করেছে। বস্তুত সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের শিরা-উপশিরায় যে তীব্র হলাহল ঢুকিয়ে দিয়েছে তারই অনিবার্য ফল স্বরূপ এরা এই সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপন করে থাকে। অথচ এরা কখনো এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারছে না।

এদের প্রতি লক্ষ্য করে আমি এই বই লিখিনি। কেননা আমার মতে তাদেরকে কিছু বলার সময় এখনো আসেনি। তাদের সঠিক পথে ফিরে আসার জন্যে আমাদের সেই শুভ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে যখন তাদের পশ্চিমা প্রভুরা নাস্তিক্যবাদী সভ্যতা সম্পর্কে হতাশ হয়ে এমন এক জীবন পদ্ধতির জন্যে পাগলপারা হয়ে উঠবে যাতে থাকবে জীবনের সকল দিক ও বিভাগের সুষ্ঠু সমাধান—যাতে থাকবে দেহ ও মন এবং ঈমান ও আমল সংক্রান্ত যাবতীয় দিকনির্দেশনা। ঠিক তখনই আশা করা যায়, তাদের দেখা-দেখি এই শ্রেণীর শিক্ষিত লোকেরা সঠিক পথ অবলম্বন করবে।

এই বই আমি তাদের জন্যেই লিখেছি যারা আলোকপ্রাপ্ত বিবেকের অধিকারী এবং সত্যিকার নিষ্ঠাবান, যারা একান্ত ধীরস্থিরভাবেই প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধানী। অথচ নির্লজ্জ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র এবং মিথ্যা প্রচারণা তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী বা সমাজতন্ত্রী চক্রান্তকারীদের কেউই একথা কামনা করে না যে, এরা ইসলামের প্রকৃত রূপ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করুক—প্রকৃত স্বাধীনতা এবং সম্মান ও মর্যাদার অদ্বিতীয় পথ অবলম্বন করুক।

আমি এই শ্রেণীর যুবক বন্ধুদের হাতে এই বইখানি তুলে দিচ্ছি এবং দোয়া করছি এর সাহায্যে ইসলাম সম্বন্ধে তাদের যাবতীয় সন্দেহ ও সংশয় দূরীভূত হোক। আমীন।

–মুহাম্মাদ কুতুব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইসলাম কি এ যুগে অচল ?

আধুনিক বিজ্ঞানের বিস্ময়কর সাফল্য পাশ্চাত্যের লোকদেরকে এমনভাবে মুগ্ধ করেছে যে, তাদের সকলের মধ্যেই এই মানসিকতার সৃষ্টি হয়েছে যে, বিজ্ঞান ধর্মকে চিরতরেই অচল করে দিয়েছে। উহার কোন কার্যকারিতাই বর্তমান নেই। প্রখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ ও সমাজবিজ্ঞানীদের প্রায় সকলেই এই অভিমত পোষণ করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, ইউরোপের প্রসিদ্ধ মনস্তাত্ত্বিক ফ্রয়েড ধর্মের পুনরুজ্জীবন প্রচেষ্টাকে ব্যাংগ করে লিখেছেন ঃ "মানুষের জীবন স্পষ্ট রূপেই তিনটি মনস্তাত্ত্বিক যুগ অতিক্রম করে এসেছে। কুসংস্কারের যুগ, ধর্মের যুগ এবং বিজ্ঞানের যুগ। এখন চলছে বিজ্ঞানের যুগ। সুতরাং ধর্মীয় কথাবার্তার এখন আর কোন গুরুত্ব নেই ; উহা বাসী হয়ে গেছে, উহার মর্যাদা ও মূল্য বলতে কিছুই অবশিষ্ট নেই।"

ধর্মবিরোধিতার মূল কারণ

ইতিপূর্বে ভূমিকায় বলা হয়েছে যে, ধর্ম সম্পর্কে ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের যাবতীয় বিরোধিতার মূল কারণ ছিল ধর্মযাজকদের বিরুদ্ধে তাদের বিরতিহীন সংগ্রাম। এই সংঘর্ষে ধর্মযাজকরা যে কর্মকাণ্ডের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় তাতে এরা যুক্তিসংগত কারণেই ভাবতে শুরু করে যে, ধর্ম হচ্ছে রক্ষণশীলতা, বর্বরতা, উদ্ভট ধ্যান-ধারণা, অর্থহীন চিন্তা-ভাবনা এবং অযৌক্তিক কর্মতৎপরতার সমষ্টি মাত্র। এ কারণেই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হল ঃ ধর্মের জ্ঞানকে চিরতরেই শেষ করে দেয়া হোক এবং তদস্থলে বিজ্ঞানকে অগ্রসর করে দেয়া হোক ; তাহলেই বিজ্ঞানের আলোকে মানবতা এবং মানবীয় সভ্যতার উৎকর্ষ ও ক্রমবিকাশের ধারা অব্যাহত থাকার সুযোগ লাভ করবে।

ইউরোপের অন্ধ অনুসরণ

ধর্মের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের শত্রুতার মূল কারণ ছিল ইহাই। কিন্তু মুসলমান নামধারী কিছু সংখ্যক ধর্মবিরোধীদের অবস্থা হল এই যে, না তারা এই বিরোধিতার মূল কারণ বুঝতে সক্ষম, না পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের অবস্থা ও পরিবেশের পার্থক্য নির্ণয় করতে সমর্থ। অথচ ধর্মের বিরোধিতা করতে থাকে নিরলসভাবে। তাদের এই বিরোধিতা কোন গভীর চিন্তা বা বিচার-বিশ্লেষণের ফল নয়, বরং ইউরোপের অন্ধ অনুসরণের বাস্তব ফসল। তাদের নিকট ইউরোপের লোকেরা যে পথ অনুসরণ করছে তা-ই হচ্ছে উন্নতি ও সমৃদ্ধির একমাত্র পথ।—তারা যেহেতু ধর্মের পেছনে ছুটে চলে না, সেহেতু আমাদেরও কর্তব্য হল ধর্মের অনুসরণ না করা। নইলে লোকেরা আমাদেরকে রক্ষণশীল ও কুসংস্কারপন্থী বলে বিদ্রূপ করতে থাকবে।

দুর্ভাগ্য যে, এরা ভুলে যান যে, ধর্মের সাথে শত্রুতা করার ক্ষেত্রে ইউরোপীয় চিন্তাবিদগণ না অতীতে কোন সময়ে একমত ছিলেন, না বর্তমানে একমত রয়েছেন। তাদের মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক চিন্তাবিদই নাস্তিক্য-বাদী সভ্যতার ঘোর বিরোধী ; তারা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছেন যে, ধর্ম হল মানুষের এক অপরিহার্য মনস্তাত্বিক ও যৌক্তিক প্রয়োজন।

ইউরোপীয় চিন্তাবিদদের সাক্ষ্য

ইউরোপীয় চিন্তাবিদদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় এবং সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হচ্ছেন জ্যোতির্বিজ্ঞান বিশারদ মিঃ জেমস জীন্‌স (James Jeans)। একজন নাস্তিক ও সংশয়বাদী যুবক হিসেবে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। কিন্তু স্বীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার পর সবশেষে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ধর্ম মানবীয় জীবনের একটি অপরিহার্য প্রয়োজন ; কেননা আল্লাহর প্রতি ঈমান না এনে বিজ্ঞানের মৌলিক সমস্যাসমূহের সমাধান করা সম্ভবপর নয়। প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী জীন্‌স ব্রীজ (Jeans Bridge) ধর্মকে সমর্থন করতে গিয়ে এতদূর অগ্রসর হয়েছেন যে, তিনি জড়বাদ ও আধ্যাত্মিক- তার সংমিশ্রণে বিশ্বাস ও আমলের একটি ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতি রচনা কালে প্রাণ খোলাভাবেই ইসলামের প্রশংসা করেছেন। ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত সাহিত্যিক সমারসেট মম (Somerset Maugham) ধর্ম সম্বন্ধে আধুনিক ইউরোপের নেতিবাচক ভূমিকা সম্পর্কে বলেন ঃ

"ইউরোপ একজন নতুন খোদা–বিজ্ঞান–সৃষ্টি করেছে এবং পুরানো খোদা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।"

ইউরোপের নতুন খোদা

কিন্তু ইউরোপের এই নতুন খোদা এক চরম পর্যায়ের বহুরূপী। প্রতি মুহূর্তেই এর রূপকে পাল্টে দেয়া হচ্ছে। এর বক্তব্য ও ভূমিকা এক অব্যাহত পরিবর্তনের নির্মম শিকার। এই খোদা আজ যে বিষয়টিকে বলছে চরম সত্য, কাল আবার সেই বিষয়টিকেই বলছে নির্ভেজাল মিথ্যা, স্পষ্ট ধোঁকা বা সম্পূর্ণরূপেই বাতিল। পরিবর্তনের এই চক্র এমনিই চলছে, উহা কখনো বন্ধ হচ্ছে না। ফলে উহার পূঁজারী ও উপাসকদের উদ্বেগ ও অস্থিরতাও হর-হামেশাই চলছে। এই প্রকার বহুরূপী ও সদা পরিবর্তনশীল খোদার নিকট তারা কি-ই বা আশা করতে পারে ? আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের উপর আজ যে উৎকণ্ঠার মেঘ পুঞ্জিভূত হয়ে উঠেছে এবং যে নানাবিধ মনস্তাত্বিক ও স্নায়ু যুদ্ধে (Cold War) তারা জড়িয়ে পড়ছে তা তাদের আভ্যন্তরীণ মরণ ব্যধির প্রকাশ্য নিদর্শন ব্যতীত অন্য কিছুই নয়।

বিজ্ঞানের নতুন জগত

বিজ্ঞানকে খোদার আসনে বসিয়ে দেয়ার কারণে আরেকটি ফল হয়েছে এই যে, আমরা-আপনারা যে জগতে বসবাস করছি তা আজ সম্পূর্ণরূপেই অসার ও লক্ষ্যহীন বস্তুতে পরিণত করা হয়েছে। তার না আছে কোন মহৎ উদ্দেশ্য, না আছে কোন স্পষ্ট ব্যবস্থাপনা ; সর্বোপরি এমন কোন স্বত্তা বা শক্তিও বর্তমান নেই যা তাকে পথপ্রদর্শন করতে সক্ষম। তার উপর চলছে শুধু পরস্পর বিরোধী শক্তিসমূহের বিরতিহীন দ্বন্দ্ব। তার প্রতিটি বিষয়ই রদবদলের শিকার। অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনাই হোক, সরকার ও জনগণের পারস্পরিক সম্পর্কই হোক—এর প্রতিটি জিনিসই বদলে যায়, এমনকি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যও পরিবর্তিত হয়ে যায়। একথা সুস্পষ্ট যে, এই অন্ধকার ও ভয়ানক জগতে মানুষ স্থায়ী উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা ছাড়া কিছুই লাভ করতে পারছে না। বিশেষ করে যখন তার পরিমণ্ডলে সর্বোচ্চ কোন স্বত্তার সাথে তার কোন পরিচয় থাকে না তখন ভয়ানক মসিবতের দিনে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লে এমন কেউ থাকে না যার আঁচলে সে আশ্রয় নিতে পারে—যার সান্ত্বনায় সে নতুন করে অনুপ্রাণিত হতে পারে।

শান্তির একমাত্র পথ

ধর্ম এবং কেবলমাত্র ধর্মই মানুষকে তার হারানো শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরিয়ে দিতে পারে। উহা মানুষের অন্তরে সততার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়ে অন্যায় ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আত্মোৎসর্গ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে তোলে ; উহা তাকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় ঃ 'যদি সত্যিকার অর্থেই স্বীয় রব এবং প্রকৃত প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাও তাহলে তোমাকে বাতিলের দাপট ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মূর্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে হবে এবং গোটা বিশ্বে কেবল তোমার প্রভুর হুকুমতই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে ; এই পথে যত অন্তরায় ও বিপদ আসুক না কেন ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে তার মোকাবেলা করতে হবে। আর এ জন্যে শুধু আখেরাতের পুরস্কারের প্রতিই লক্ষ্য রাখতে হবে।' তাহলে আজকের দুনিয়ার জন্যে শান্তি ও নিরাপত্তার—অন্য কথায়—ধর্মের প্রয়োজন নেই কি?

ধর্মকে বাদ দিলে

ধর্মকে বাদ দিলে জীবনের অর্থ বা সারবত্তা বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। ধর্মের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস, এই বিশ্বাসের ফলে মানুষের জীবনে নিত্য-নতুন অবকাশের পরশ লেগে যায় এবং আর সামনে নতুন নতুন সম্ভাবনার দিগন্তও উন্মোচিত হয়। নইলে সে হীনমন্যতার (Inferiosity Complex) যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতির নির্মম শিকারে

পরিণত হয়। পারলৌকিক জীবনকে অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে ঃ মানুষের সমগ্র আয়ুর একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে সম্পূর্ণরূপেই বাদ দেয়া এবং উহাকে অন্ধ প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনার হাতে ছেড়ে দেয়া। এর ফলে মানুষ প্রবৃত্তির লালসা চরিতার্থ করার কাজেই সম্পূর্ণরূপে মশগুল হয়ে যায়। তখন তার যাবতীয় কর্মতৎপরতার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় ঃ আরামে-আয়েশের যত উপায় উপাদান হস্তগত করা তার পক্ষে সম্ভবপর তার সবটুকুই সে করবে, আর এ ক্ষেত্রে কেউ তার সাথে ভাগ বসাক তা সে কখনো বরদাস্ত করবে না। বস্তুত এখান থেকেই যাবতীয় শত্রুতা ও পাশবিক সংঘর্ষের সূচনা হয়। কেননা যারা প্রবৃত্তির দাস তারা এই দুনিয়ার ভালো-মন্দ যে কোন বাধাকেই অপসারিত করার জন্যে উন্মাদ হয়ে উঠে এবং অপেক্ষাকৃত কম সময়ের মধ্যে অধিক হতে অধিকতর স্বার্থ হাসিলের জন্যে অস্থির হয়ে যায়। তার মনে কোন উপরস্থ স্বত্তার ভীতি বলতে কিছুই বর্তমান থাকে না। কেননা পূর্ব থেকেই সে বিশ্বাস করে যে, এই পৃথিবীর কোন খোদাও নেই এবং বিচার করে শাস্তি বা পুরস্কার দেয়ার কোন ব্যবস্থাপনাও নেই।

সংকীর্ণ দৃষ্টি ও নিরুৎসাহিতা

পরকাল অস্বীকার করার কারণে মানুষ তার আশা-আকাংখা ও চিন্তা-ভাবনার নিম্নতম স্তরে নেমে যায়। তার যাবতীয় ধ্যান-ধারণার উৎকর্ষ ও ক্রমোন্নতি বন্ধ হয়ে যায়—তার লক্ষ্য ও কর্মপন্থা সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগীর পরিচায়ক হয়ে দাঁড়ায়। গোটা মানবতাই চিরন্তন গৃহযুদ্ধের এক আখড়ায় পরিণত হয়। এমনি করে তার হাতে এতটুকুও সময় থাকে না যে, জীবনের কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। এই নতুন জগতে স্নেহ-মমতা সহানুভূতি বা সৌহার্দ্যের কোন স্থান থাকে না ; বস্তুগত আরাম-আয়েশের সন্ধান এবং প্রবৃত্তির লালসা চরিতার্থ করার নেশা এ সকল কথা চিন্তা করারই অবকাশ দেয় না। এবং দেয় না বলেই জীবনের উচ্চতর মূল্যবোধ এবং মহত্তসূচক আশা-আকাংখার প্রতি সে শ্রদ্ধাশীল হতে পারে না।

জড়বাদিতার কুফল

একথা নিশ্চিত যে, জড়বাদী মানুষ বস্তুগত উপকারও লাভ করে থাকে, কিন্তু জড়বাদ (Materialism) এমন এক অভিশাপ যে, উহার কারণে এই বস্তুগত উপকারটুকুও বিনষ্ট হয়ে যায়। মানুষ এই বস্তুগত ভোগ-বিলাসে এতদূর অন্ধ হয়ে যায় যে, বিনা কারণে অন্যান্য মানুষের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রামে লিপ্ত হয়। প্রবৃত্তির লোভ-লালসা এবং ঘৃণা ও অবজ্ঞার প্রবল সয়লাবকে বিন্দুমাত্রও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না—উহার দুর্বার গ্রাস থেকে নিজেকে কখনো মুক্তও করতে পারে না। যে সকল জাতি এই জড়বাদকে অনুসরণ করছে তারা এক

সার্বক্ষণিক দ্বন্দ্ব ও গৃহবিবাদের করুণ শিকারে পরিণত হয়েছে। ফলে তাদের জীবনের সকল প্রকার ব্যবস্থাপনা ও রূপ কাঠামো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে এবং বিজ্ঞান ও তার আবিষ্কৃত মারণাস্ত্রগুলো মানবজাতিকে শান্তি দেয়ার পরিবর্তে ধ্বংস করার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

সংকীর্ণতার প্রতিকার

জড়বাদ মানুষের সংকীর্ণ দৃষ্টিরই একটি দিকমাত্র। উহার কুফল থেকে বাঁচতে হলে মানবিক চিন্তার দিগন্তকে আরো প্রসারিত করতে হবে। কিন্তু এই লক্ষ্য একমাত্র ধর্মের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। একমাত্র ধর্মই মানুষকে নতুন সম্ভাবনা ও মহৎ চিন্তা-ভাবনার প্রতি আকৃষ্ট করতে পারে। কেননা ধর্মের দৃষ্টিতে জীবন শুধু এই জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় ; বরং উহার পরেও অনন্তকাল পর্যন্ত এই জীবন চলবে।—এই বিশ্বাস মানুষের মনে আশা-আকাংখার নতুন আলো প্রজ্জ্বলিত করে রাখে ; তাকে অন্যায়, অনাচার, জুলুম ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রাণপণ যুদ্ধ করার প্রেরণা যোগায় এবং তাকে জানিয়ে দেয় ঃ পৃথিবীর সকল মানুষই তার ভাই। স্নেহ-মমতা, পারস্পরিক সহানুভূতি ও সমবেদনা এবং বিশ্বজনীন এই ভ্রাতৃত্বের শিক্ষাই মানুষকে শান্তি, নিরাপত্তা, স্বস্তি ও উৎকর্ষতা প্রদান করতে সক্ষম। এই সকল সত্যের বিপক্ষে কে এমন উক্তি করতে পারে যে, মানুষের জন্যে ধর্মের কোন প্রয়োজন নেই ? অথবা শত শত বছর পূর্বে ধর্মের যেমন প্রয়োজন ছিল এ যুগে তেমন প্রয়োজন নেই ? বস্তুত একটি সর্বাংগ সুন্দর জীবনের জন্যে ধর্ম মানুষকে যেভাবে গড়ে তুলতে সক্ষম তেমনিভাবে গড়ে তোলা পৃথিবীর অন্য কোন শক্তির পক্ষে সম্ভবপর নয়।

আলোক স্তম্ভ

ধর্ম মানুষকে নিজের জন্যে বাঁচার স্থলে অন্যের জন্যে বাঁচতে শিক্ষা দেয়, তার সম্মুখে একটি মহান ও পবিত্র লক্ষ্য উপস্থাপিত করে এবং সেই লক্ষ্য হাসিল করার জন্যে যে কোন দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদকে হাসিমুখে বরণ করতে শেখায়। মানুষ যদি ধর্ম প্রদত্ত এই ঈমান ও নিশ্চিত বিশ্বাস থেকে বঞ্চিত হয়ে যায় তাহলে সে নিজের ব্যক্তি সত্তা ছাড়া অন্য কারুর প্রতি দৃষ্টি দিতে পারে না। ফলে তার সমগ্র জীবনই জঘন্য স্বার্থপরতার এক এলবামে পরিণত হয়। তখন তার ও হিংস্র পশুর মধ্যে বিন্দুমাত্রও পার্থক্য থাকে না। ইতিহাসে এমন অসংখ্য মানুষ অতীত হয়েছেন যারা সত্যের জন্যে সংগ্রাম করেছেন এবং নিজেদের জানও কুরবান করেছেন। অথচ তাদের এই কুরবানী ও সংগ্রামের সুফল তারা দুনিয়াতে লাভ করতে পারেননি। তাই প্রশ্ন জাগে, তাহলে কেন তারা এমন এক সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেছেন যার ফলস্বরূপ দুনিয়াতে তো তারা কোন বস্তুগত সুবিধা ভোগ করতে পারেননি, বরং আগে

থেকে তাদের নিকট যে ধন-সম্পদ বর্তমান ছিল তাও তারা হারাতে বাধ্য হয়েছেন ? এর উত্তর কেবল একটিই এবং তাহলো 'ঈমান'। এই সকল মহৎ ব্যক্তিদের অস্তিত্ব ঈমানের সামান্যতম ঝলক মাত্র। পক্ষান্তরে লোভ-লালসা, ঈর্ষা-বিদ্বেষ, হীনতা-স্বার্থপরতা, ঘৃণা-অবজ্ঞা ইত্যাদি এমন নিকৃষ্ট স্বভাব যে, উহার মাধ্যমে সত্যিকার ও স্থায়ী সাফল্য অর্জিত হতে পারে না। উহার চাকচিক্য একান্তই বাহ্যিক ও অস্থায়ী। উহার সাহায্যে মানুষ শুধু নগদ কিছু পাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠে। ফলে কোন মহান বা গুরুত্বপূর্ণ কাজ তার মাধ্যমে সাধিত হয় না। এবং সে জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্যে পার্থিব স্বার্থের কথা চিন্তা না করে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে দীর্ঘকাল ধরে প্রাণপণ জিহাদ করার শক্তিও অর্জন করতে পারে না।

ঘৃণার উপাসক

কিছু সংখ্যক নামকরা সংস্কারবাদী ভালোবাসার পরিবর্তে ঘৃণার মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের পক্ষপাতী। ঘৃণাই তাদের সবকিছু। ঘৃণাই তাদের শক্তি ও পুষ্টি আহরণের কেন্দ্রবিন্দু। এবং উহার আশ্রয় নিয়েই যাবতীয় দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদ-আপদের সময়ে সাহস ও দৃঢ়তার সাথে তাদের সংস্কার-অভিযান অব্যাহত রাখেন। এই ঘৃণার লক্ষ্যবস্তু কখনো হয় কোন বিশেষ দল, কখনো হয় বিশ্বের সকল মানুষ, আবার কখনো হয় বিশ্ব ইতিহাসের কোন বিশেষ যুগের মানুষ। মানবতা বিমুখ সংস্কারবাদীদের এই দলটি বাহ্যত কিছু উদ্দেশ্যও চরিতার্থ করেন। চরম উত্তেজনা, নির্দয় ব্যবহার ও অগ্নিমূর্তি দেখিয়ে নিজেদের স্বার্থ শিকারের আশায় দৃঢ়পদ থাকার মহড়াও দেখাতে পারেন এবং নানাবিধ প্রবঞ্চনাও মেনে নিতে পারেন। কিন্তু যে বিশ্বাসের ভিত্তিমূল হচ্ছে ভালোবাসার পরিবর্তে ঘৃণা তার সাহায্যে মানবতার কোন কল্যাণ হতে পারে না। তার মাধ্যমে সমাজের কিছু প্রচলিত অন্যায় ও বে-ইনসাফী বন্ধ হতে পারে, কিন্তু মানবতা বিধ্বংসী এই সকল কর্মকাণ্ডের স্থায়ী ও অব্যর্থ চিকিৎসা তাতে বর্তমান নেই। এ কারণেই সমাজের অন্যায়-অবিচার দূর করার নামে যে সংস্কারমূলক পন্থা-পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে তাতে করে উহার নিয়ন্ত্রিত বা কমে যাওয়ার পরিবর্তে বহু গুণে বেড়েই চলেছে। তাই কবির ভাষায় বলা যায় ঃ

"ঔষধ বাড়ছে যত রোগ বাড়ছে তত।"

আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক

পক্ষান্তরে যে বিশ্বাসে আশু বস্তুগত লাভের কামনা করা হয় না, নিছক ঘৃণা ও শত্রুতার সাথেও যার কোন সম্পর্ক নেই এবং যা মানুষের অন্তরে প্রেম-প্রীতি, স্নেহ-মমতা, ত্যাগ ও পরার্থপরতা—এমনকি সমগ্র বিশ্ববাসীর কল্যাণের উদ্দেশ্যে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করার দুর্বার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে,

প্রকৃতপক্ষে সেই বিশ্বাসই মানুষকে সত্যিকার ও স্থায়ী নেয়ামত দ্বারা সৌভাগ্য-শালী করতে পারে এবং ভবিষ্যতের সুখী ও সমুন্নত জীবনের নিশ্চয়তা দিতেও সক্ষম। এই বিশ্বাসের মৌল উপাদান হল আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং তার অকৃত্রিম ভালোবাসা। উহা ব্যক্তিগত জীবনকে পবিত্র করে তোলে এবং প্রত্যেকটি মানুষকে তার নৈকট্যলাভের সুযোগ দেয়। কিন্তু আখেরাতের প্রতি আস্থা না থাকলে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং তাকে ভালোবাসার কোন অর্থই থাকে না। আখেরাতের ধারণা মানুষকে নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার বাণী শুনায়, এক অনন্ত অসীম ও চিরস্থায়ী জীবনের নিশ্চয়তা দেয়। ফলে তার এই অটল বিশ্বাস জন্মে যায় যে, দৈহিক মৃত্যুর সাথে সাথে তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে না, তার পার্থিব জীবনের বিরতিহীন জিহাদও নিষ্ফল হয়ে যায় না। বরং ইহলৌকিক জীবনে কোন পুরস্কার না পেলেও পরবর্তী পারলৌকিক জীবনে তা সে অবশ্যই লাভ করবে।

এই অকল্পনীয় ফল কেবল আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসের কারণেই লাভ হয়ে থাকে। কিন্তু ইসলাম শুধু এতটুকু করেই ক্ষান্ত হয় না, উহা মানুষকে আরো অনেক কিছু দান করে, সে কথা এর চেয়েও সুন্দর ও আকর্ষণীয়।

ইসলাম সম্পর্কে একটি ভুল ধারণা

যারা ইসলামকে একটি অতীত কাহিনী বলে মনে করে এবং বর্তমান যুগে উহার প্রয়োজন ও কার্যকারিতাকে সম্পূর্ণরূপেই অস্বীকার করে তারা মূলত ইসলামের প্রকৃত মর্ম সম্পর্কেই অজ্ঞ এবং উহার মূল মিশন ও লক্ষ্য কি তাও অবগত নয়। শৈশব থেকে সাম্রাজ্যবাদী এজেন্টরা পাঠ্য পুস্তকের মাধ্যমে তাদেরকে যা কিছু শিখিয়েছে সেই পঠিত বিষয়কেই তারা বারবার উচ্চারণ করে চলেছে। তাদের ধারণায়, ইসলাম আগমনের একমাত্র লক্ষ্য হল মানুষকে মূর্তিপূজা থেকে মুক্ত করা ও আরব গোত্রগুলোর পারস্পরিক শত্রুতাকে নির্মূল করে তাদেরকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করা, তাদেরকে মদ্য পান, জুয়া, কন্যা হত্যা এবং এই ধরনের নীতি বিগর্হিত কাজ থেকে রক্ষা করা। কার্যত ইসলাম আরবদের পারস্পরিক গৃহযুদ্ধকে বন্ধ করে তাদের শক্তিকে বিনষ্ট হতে দেয়নি এবং সেই শক্তিকে সমগ্র দুনিয়ায় স্বীয় পয়গামকে প্রচার করার কাজে ব্যবহার করেছে। মুসলমানদেরকে এই উদ্দেশ্যে বহু জাতির সাথে যুদ্ধ করতে হয়েছে। ফলে বর্তমান সীমারেখার মধ্যে বিশ্বের মানচিত্রে এক বিরাট ভূখণ্ডে একটি শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ ছিল এক ঐতিহাসিক মিশন। ইহা এখন পূর্ণাংগ রূপ পরিগ্রহ করেছে ; দুনিয়া থেকে মূর্তিপূজা বিদায় নিয়েছে, আরব গোত্রগুলো এখন বড় বড় জাতিতে পরিণত হয়েছে। তাই এখন ইসলামের আর প্রয়োজন নেই, জুয়া ও মদ্য পানের যে ব্যাপারটুকু রয়েছে বর্তমান কৃষ্টি ও

সংস্কৃতির যুগে তার উপর কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় না। মোটকথা, তাদের দৃষ্টিতে ইসলাম এক বিশেষ যুগের জন্যেই একটি উপযুক্ত জীবনব্যবস্থা হিসেবে কার্যকর ছিল, কিন্তু দুনিয়া আজ এতদূর এগিয়ে গেছে যে, উহার নিকট থেকে দিকনির্দেশনা নেয়ার আর কোন প্রয়োজনীয়তাই নেই। এ কারণে দিক-নির্দেশনা কিংবা আলো গ্রহণের জন্যে আমাদের উহার প্রতি তাকাবার কোন আবশ্যকতা নেই ; বরং আধুনিক মতাদর্শ ও জীবনদর্শন থেকে দিকনির্দেশনা গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। এর মধ্যেই আমাদের মুক্তি ও কল্যাণ নিহিত।

পাশ্চাত্যের ও প্রাচ্যের শিষ্যগণ উস্তাদের মুখস্থ করানো কথাগুলোকে বারবার উচ্চারণ করে একান্ত অজ্ঞাতসারে নিজেদের অদূরদর্শিতা ও মূর্খতাকে ফাঁস করে দিচ্ছে। এই হতভাগারা না ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান রাখে, না তারা জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। এ কারণে আরো অগ্রসর হওয়ার পূর্বে ইসলামের মর্ম এবং উহার দাওয়াত ও পয়গাম সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন।

ইসলামের বৈপ্লবিক মর্ম

এক বাক্যেই একথা বলা যায় যে, মানবতার উৎকর্ষতার পথে অন্তরায় হতে পারে এবং সততা ও কল্যাণের পথ থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে এরূপ সবকিছুর দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করাই হচ্ছে ইসলাম। যে অন্যায়-উৎপীড়ন ও বল্গাহীন স্বৈরাচারী শক্তি মানুষের জান-মাল, ইজ্জত-সম্ভ্রম ও আত্মপ্রত্যয়কে লুণ্ঠন করে নেয় তা থেকে আজাদী হাসিল করাই ইসলাম। ইসলাম মানুষকে শিক্ষা দেয় ; আল্লাহ এবং একমাত্র আল্লাহই যাবতীয় প্রশাসনিক ক্ষমতার একমাত্র মালিক ; তিনিই মানুষের প্রকৃত হুকুমদাতা। নিখিল জাহানের সমস্ত মানুষই তার জন্মগত প্রজা, তিনিই মানুষের তকদিরের মালিক ; তার ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেউ কারুর উপকার করতে পারে না কিংবা দুঃখ-দুর্দশাও দূর করতে পারে না। কিয়ামতের দিন পূর্ববর্তী-পরবর্তী সময়ের সকল মানুষকে তার দরবারে একত্র করা হবে এবং তিনি প্রতিটি ব্যক্তির সারা জীবনের কার্যকলাপের হিসেব গ্রহণ করবেন।—ইসলামের এই শিক্ষা মানুষকে ভয়-ভীতি জুলুম-নিপীড়ন, অত্যাচার-অবিচার এবং শোষণ-লুণ্ঠন থেকে মুক্তিদান করে।

প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্তি

এখানেই শেষ নয়, ইসলাম আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে যাবতীয় কুপ্রবৃত্তি এবং রিপুর দাসত্ব থেকেও মানুষকে মুক্ত করে দেয় ; এমনকি জীবনের মায়া থেকেও মানুষকে নিস্পৃহ ও উদাসীন করে দেয়। বস্তুত জীবনের মায়া এমন এক মানবীয় দুর্বলতা যে, উহার কারণেই স্বৈরাচারী শাসকরা তাদের হীন স্বার্থ উদ্ধার করতে থাকে এবং অন্য মানুষকে তাদের গোলাম ও দাসানুদাস বানাতে থাকে। মানুষের মধ্যে যদি এই দুর্বলতা না থাকত তাহলে কখনো সে অন্যের

দাসত্ব করতে রাজী হতো না এবং স্বৈরাচারী দানবকে ইবলীসী নর্তন-কূর্দন দখাবারও সুযোগ দিত না। স্বৈরাচার (Dictatorship) ও অন্যায় উপৎপীড়নের বিরুদ্ধে মস্তক অবনত করার পরিবর্তে দুর্বার সাহস ও বীর বিক্রমে উহার মোকাবেলা করার শিক্ষা দিয়ে ইসলাম মানুষকে মহাকল্যাণের পথে পরিচালিত করেছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

"হে নবী ! আপনি বলে দিন ঃ যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের সেই ব্যবসায়—যা মন্দা পড়ার ভয়ে তোমারা ভীত এবং তোমাদের সেই বাসস্থল—যা নিয়ে তোমরা সন্তুষ্ট —তোমাদের নিকট আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে জিহাদের চেয়ে অধিক প্রিয় হয় তাহলে অপেক্ষা করতে থাক যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর চূড়ান্ত ফায়সালা নিয়ে তোমাদের নিকট আসেন। আর আল্লাহ অন্যায়কারী লোকদেরকে পথপ্রদর্শন করেন না।"—(সূরা আত তাওবা ঃ ২৪)

জীবনের মূল শক্তি

সম্প্রীতি, সৌহার্দ, নিষ্ঠা, সততা এবং জীবনের মহান ও পবিত্র লক্ষ্য অর্জনের জন্যে আল্লাহর পথে জিহাদ এবং যাবতীয় লোভ-লালসার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে উহাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার উদ্দেশ্যে যে সাধনার প্রয়োজন তার মূলে একমাত্র কার্যকরী শক্তি হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা। ইসলাম এই ভালোবাসা বৃদ্ধির শিক্ষাই মানুষকে দান করে। এর সাহায্যে মানুষ বল্গাহীন কামনা-বাসনাকে সংযত রাখতে সক্ষম হয় এবং গোটা জীবনে কেবলমাত্র আল্লাহর ভালোবাসাকে পরম ও চরম লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করতঃ উহাকেই অব্যর্থ শক্তি হিসেবে দেখতে চায়। যে ব্যক্তি এই মহান সম্পদ থেকে বঞ্চিত সে মুসলমানই হতে পারে না।

দুনিয়ার উপাসকদের ভুল ধারণা

হতে পারে, লোভ-লালসা বা কুপ্রবৃত্তির অনুসারীদের কেউ স্বীয় অদূরদর্শিতার কারণে এরূপ ভাবতে পারে যে, অন্য লোকদের তুলনায় তার জীবন অধিকতর

সফল এবং সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরপুর। কিন্তু অনতিবিলম্বেই তাকে এই সংকীর্ণতার শাস্তি ভোগ করতে হয় ; যখন তার আলস্যের স্বপ্ন ভেংগে যায় তখনই সে দেখতে পায় যে, সে কুপ্রবৃত্তির গোলাম ছাড়া আর কিছুই নয় ; তার অদৃষ্টে প্রবঞ্চনা, দুর্ভাগ্য, অস্থিরতা এবং ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই নেই। কেননা মানুষ একবার যদি তার প্রবৃত্তির হাতে আত্মসমর্পণ করে তাহলে পুনরায় আর কোনদিন সে উহাকে কাবু করতে পারে না। কেননা যতই সে পেতে থাকে ততই তার লোভও বাড়তে থাকে। এমনি করে মানুষ পশুত্বের সর্বনিম্ন স্তরে নেমে যায় এবং আনন্দ ও ভোগ-বিলাসের সাগরে এমনভাবে ডুবে যায় যে, অন্য কিছুর হুঁশ বলতে তার কিছুই থাকে না। অনস্বীকার্য যে, মানবীয় জীবন এবং উহার বহুমুখী সমস্যা সম্পর্কে এই গতিবিধি বস্তুগত বা আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে কোন অবদানই রাখতে পারে না। কেননা বস্তুগত বা আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যে সর্বপ্রথম শর্ত হচ্ছে প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করা। এই শর্ত পালিত হলেই বিজ্ঞান, কলা ও ধর্মীয় জগতে উন্নতি করা সম্ভব।

দুনিয়া সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিকোণ

ইসলাম প্রবৃত্তির দাসত্ব পরিহার করার জন্যে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলেও এ জন্যে তার অনুসারীদেরকে একদিকে যেমন বৈরাগ্য অবলম্বন করার অনুমতি দেয় না, তেমনি অন্যদিকে পবিত্র ও নির্দোষ দ্রব্যাদি থেকে উপকৃত হতেও নিষেধ করে না। উহা এই দুই চরম অবস্থা পরিত্যাগ করে ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যম পন্থা অবলম্বন করার জন্যে নির্দেশ দেয়। উহার দৃষ্টিতে এই দুনিয়ায় যা কিছু পাওয়া যায় তার সমস্তই কেবল মানুষের উপকারের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। ইসলাম মানুষকে জানিয়ে দেয় ঃ "জগত তোমার জন্যে, তুমি জগতের জন্যে নও।"এ কারণেই উহার নিছক আনন্দ উপভোগ ও প্রবৃত্তির দাসত্বকে মানুষের মর্যাদার পক্ষে হানিকর বলে মনে করে। দুনিয়ার এই দ্রব্যসামগ্রী মানুষকে কেবল এ জন্যে দেয়া হয়েছে যে, মানুষ যেন এর সাহায্যে তার মহান লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়। মানুষের জীবনের লক্ষ্য হল আল্লাহর দ্বীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা। আর মানবতাকে পূর্ণতা দান করার জন্য এই হল একমাত্র পথ।

ইসলামের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য

জীবনে ইসলামের দৃষ্টিতে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ও লক্ষণীয় উদ্দেশ্য রয়েছে। ব্যক্তি জীবনের পরিমণ্ডলে উহা প্রত্যেকটি মানুষের জন্য এত পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও উপায়-উপাদানের ব্যবস্থা করতে চায় যাতে করে সে একটি সুন্দর ও পবিত্র জীবনযাপন করতে সমর্থ হয়। আর সমষ্টিগত জীবনের অংগনে উহার লক্ষ্য হলো ঃ এমন একটি সমাজ গড়ে উঠুক যার যাবতীয় শক্তিই মানুষের সামগ্রিক উন্নতি ও কল্যাণের জন্য ব্যয়িত হতে পারে, ইসলামী জীবন দর্শনের

আলোকে যেন গোটা মানব সভ্যতায় অগ্রসর হতে পারে এবং ব্যষ্টি ও সমষ্টি —তথা ব্যক্তি ও সমাজের ভারসাম্য যেন এমনভাবে সংরক্ষিত হয় যাতে করে কারুর প্রাপ্য ও অধিকার কখনো ভূলুণ্ঠিত না হয়।

মানুষের চিন্তার স্বাধীনতা

ইসলাম মানুষকে চিন্তার স্বাধীনতা দান করে একটি কার্যকর শক্তির ব্যবস্থা করেছে। উহা নিছক খেয়াল-খুশী ও কুসংস্কারমূলক চিন্তাধারাকে কখনো সমর্থন করে না। ইতিহাসে চিন্তা ও আমলের যে বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতার কারণে মানুষ যুগে যুগে হাবুডুবু খেয়েছে তার মধ্যে কতক ছিল মানুষের উদ্ভট চিন্তার বাস্তব ফসল। নিজ নিজ যুগের এই পরিস্থিতির কথা মানুষ অবশ্যই জানত। কিন্তু তাদের এই বিভ্রান্তির ধারায় এমন কিছু কথাও বর্তমান ছিল যার কুষ্টিনামায় তাদের মনগড়া দেবদেবীর নির্বুদ্ধিতামূলক কার্যকলাপের স্পষ্ট সন্ধান পাওয়া যায়। মোটকথা, ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে মানুষের চিন্তা এক বিভ্রান্তির অন্ধকারে আঘাতের উপর আঘাত খেয়ে চলছিল। ইসলাম এসে উহাকে সঠিক নির্দেশনা দিয়ে পূর্ণতা ও পরিপক্কতা দান করে এবং সেই সকল উদ্ভট ধারণা ও কুহেলিকা থেকে উহাকে আজাদ করে দেয় যা তাদের মনগড়া দেবদেবীর কল্প-কাহিনী, ইসরাঈলী ও খৃষ্টীয় কাহিনীর অপরিপক্ক ভূঁয়া দর্শন ও অলীক চিন্তাধারা সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। ইসলাম এরূপেই গোটা মানবজাতিকে তাদের প্রকৃত দ্বীন ও প্রকৃত প্রভুর সমীপে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ দেয়।

ইসলাম ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব

ইসলামের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো উহার বক্তব্য ও শিক্ষা অত্যন্ত সহজ ও সরল। জটিলতা বা প্যাঁচ বলতে উহাতে কিছুই নেই। উহাকে হৃদয়ঙ্গম করা যেমন সহজ, তেমনি সহজ উহাকে নিশ্চিত সত্য বলে বিশ্বাস করা। ইসলাম চায় ঃ মানুষকে যে যোগ্যতা দান করা হয়েছে তারা তার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করে তাদের পারিপার্শিক জীবন ও জগত সম্পর্কে অধিক হতে অধিকতর জ্ঞান লাভ করুক এবং তাদের চতুর্দিকের আসমান-জমিনের রহস্যও উন্মোচন করুক। কেননা ইসলাম মানবীয় জ্ঞান ও ধর্ম—তথা বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে অযৌক্তিক সমঝোতা এবং মৌল উপদানগত বৈপরীত্যকে কখনো স্বীকার করে না। খৃষ্ট ধর্মের ন্যায় উহা মানুষকে দুর্বোধ্য জ্ঞান, গোলমেলে বিশ্বাস এবং অযৌক্তিক দর্শনের উপর ঈমান আনার জন্যে বাধ্য করে না। এবং ঐ সকল বিষয়ের প্রতি ঈমান আনাকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার জন্যে অপরিহার্য শর্ত বলে ঘোষণা দেয় না। এবং আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করা ছাড়া যে সকল বৈজ্ঞানিক সত্যকে (Facts) সমর্থন করা যায় না তা মেনে নেয়ার জন্যেও উহা

মানুষকে কখনো হুকুম দেয় না। এখানেই শেষ নয়, ইসলাম মানুষকে পরিস্কার-ভাবে জানিয়ে দেয় ঃ এই পৃথিবীতে যে সকল দ্রব্যসামগ্রী মানুষ লাভ করছে এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যে সকল শক্তি দিবারাত মানুষের সেবায় নিয়োজিত রয়েছে তার সবকিছুই পরম দয়ালু ও মেহেরবান আল্লাহর অফুরন্ত রহমত ও অযাচিত স্নেহের উপহার ছাড়া অন্য কিছুই নয়। সুতরাং বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অনুসন্ধান চালিয়ে মানুষ যে নতুন নতুন সম্পদ আবিষ্কার করছে তাও প্রকৃত প্রস্তাবে সেই দয়ালু প্রভুর অপরিমেয় স্নেহের এক বহিঃপ্রকাশ। এ কারণে তাদের অবশ্য কর্তব্য হলো, তারা তার কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে থাকবে এবং অধিক হতে অধিকতর প্রস্তুতি, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সাথে তার দাসত্ব করবে। ইসলাম জ্ঞান ও বিজ্ঞানকে মন্দ, ঈমানের বরখেলাফ বা বিরোধী বলে মনে করে না। বরং উহাকে আল্লাহর প্রতি ঈমানের অপরিহার্য অংগ বলে মনে করে।

ইসলামের প্রয়োজনীয়তা

যে সমস্যাগুলোর কথা এতক্ষণ আলোচনা করা হলো উহার সমাধানের জন্যে মানুষ এখনো ব্যস্ত রয়েছে। মানুষের উচ্চ আশা ও মহান উদ্দেশ্য এখনো অর্জিত হয়নি। এখনো মানুষ নানাবিধ নির্বুদ্ধিতা ও প্রবঞ্চনার শিকার। উশৃংখল ও স্বৈরাচারী শাসন এখনো পুরোদমে চলছে। উহার নির্মম নিস্পেষণে মানুষ এখনো ধুকে ধুকে মরছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই মানবতার উপর পশুত্বের রাজত্ব চলছে। তাহলে একথা অস্বীকার করা যায় কি যে দুনিয়ার জন্যে এখন ইসলামের অপরিহার্য প্রয়োজন ?—মানুষের পথপ্রদর্শনের জন্যে এখনই ইসলামকে তার ভাস্বর ভূমিকায় অগ্রসর হতে হবে ?

মূর্তিপূজার অভিশাপ

আজ দুনিয়ার অর্ধেক লোকই প্রাচীন যুগের লোকদের ন্যায় মূর্তিপূজার অভিশাপে আক্রান্ত। ভারত, চীন এবং দুনিয়ার আরো কয়েকটি দেশকে এর দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায়। অবশিষ্ট দুনিয়ার অধিকাংশ জনপদ অন্য এক বাতিল খোদার নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে আছে। এই বাতিল খোদা মানবীয় চিন্তা ও ধ্যান-ধারণাকে প্রাচীন যুগের মূর্তিপূজার চেয়ে কোন অংশেই কম বিকৃত করে দেয়নি। আজকের মানুষকে সহজ-সরল পথ থেকে বিচ্যুত করার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা অপরিসীম। আজকালকার পরিভাষায় এই বাতিল খোদার নাম হচ্ছে 'আধুনিক বিজ্ঞান'।

পাশ্চাত্যের লোকদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগি

সৃষ্টিজগতের রহস্য অবগত হওয়ার মাধ্যম হিসেবে বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম। এ কারণে উহার কীর্তিসমূহের তালিকাও বড় বিস্ময়কর। কিন্তু

পাশ্চাত্যের লোকেরা যখন উহাকে খোদার আসনে বসিয়ে দিয়েছে এবং ভক্তি-শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও আনুগত্যের একমাত্র কেন্দ্রে পরিণত করেছে তখন উহার যাবতীয় সাফল্য ও কৃতিত্ব অভাবনীয় অনুতাপ ও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। পাশ্চাত্যের লোকদের এই দুঃখজনক ভুলের পরিণতি এই হয়েছে যে, তারা পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতা নির্ভর বিজ্ঞানের (Empirical Science) অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সীমাবদ্ধ মাধ্যম ছাড়া অন্যান্য জ্ঞানলাভের মাধ্যম থেকে নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করে ফেলেছে। ফলে মানবতা আজ মঞ্জিলে মকসুদের নিকটবর্তী হওয়ার পরিবর্তে অধিকতর দূরে সরে গেছে। মানুষের সামনে উৎকর্ষ ও প্রচেষ্টার যে অপরিসীম সম্ভাবনা বর্তমান ছিল তা পাশ্চাত্যের লোকদের সংকীর্ণ দৃষ্টি ও জড়বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে রহিত হয়ে গেছে। কেননা যে বিজ্ঞান কেবল যুক্তির পাখায় ভর করে চলে তা মানবতার গতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না। উহা যুক্তি ও রূহ উভয়ের সাহায্যই গ্রহণ করে থাকে এবং যখন এরূপ গ্রহণ করবে কেবল তখনই স্রষ্টার নৈকট্য এবং তার সৃষ্ট সবকিছুর মূল স্বরূপ উদঘাটন করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে।

বিজ্ঞানের উপর সীমাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ

বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদাররা একথাও বলে থাকে যে, কেবলমাত্র বিজ্ঞানই মানুষের জীবন ও সৃষ্টিজগতের যাবতীয় রহস্য উদঘাটন করতে সক্ষম। এ কারণে বিজ্ঞান যা সমর্থন করবে একমাত্র তাকেই প্রকৃত সত্য বলে গ্রহণ করতে হবে। অন্যান্য সবকিছুকে একান্তই বাজে ও অর্থহীন বলে সাব্যস্ত করতে হবে। অথচ আবেগের বশবর্তী হয়ে তারা ভুলে যায় যে, বহু বিস্ময়কর আবিষ্কার সত্ত্বেও বিজ্ঞান এখনও উহার প্রাথমিক যুগ অতিক্রম করতে পারেনি। এখনো এমন অসংখ্য বিষয় রয়েছে যে সম্পর্কে বিজ্ঞানের তথ্যাদি অসম্পূর্ণ এবং আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়। কেননা সে সকল ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের আওতাই সীমিত, উহার অভিজ্ঞতাও অগভীর ; উহার এতদূর যোগ্যতাই নেই যে, উহার গভীর স্তরে উপনীত হতে পারে। কিন্তু এসব দেখেশুনেও তারা দাবী করছে যে, 'রূহ' নামে কোন জিনিসের অস্তিত্বই নেই। তাদের মতে ইন্দ্রিয় জগতের বাইরে অদৃশ্য জগতের কোন কিছুর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের কোন মাধ্যম মানুষের কাছে নেই ; স্বপ্ন যেমন কোন মাধ্যম নয়, তেমনি 'টেলিপ্যাথি'ও (দূর অভিজ্ঞান)[১] কোন বাহন নয়। আধুনিক যুগে রূহকে অস্বীকার করার ভিত্তি

১. দূর অভিজ্ঞান বা Telepathy -কে বর্তমান যুগে একটি বাস্তব সত্য বলে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু হঠধর্মিতার পরাকাষ্ঠা হলো এই যে, আধুনিক বিজ্ঞানীরা মানবীয় রূহের সাথে এর কোন সম্পর্ক স্বীকার করতেই নারাজ। তারা একে স্মৃতির বিরতি অথচ এক অজ্ঞাত উপলব্ধি বা শক্তি বলে সাব্যস্ত করেন। দূর অভিজ্ঞানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত হলো হযরত উমর

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা নয়। বরং উহার মূল ভিত্তি হচ্ছে জড়বিজ্ঞানের অপর্যাপ্ত ও অনুপযুক্ত যন্ত্রপাতির ক্ষমতা বহির্ভূত হওয়া। বস্তুত এ কারণেই ইহা বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য উদঘাটনে বহুলাংশেই ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। হয়ত বা উচ্চস্তরের অনেক তত্ত্ব ও তথ্যকে মানবীয় জ্ঞানের বাইরে রেখে দেয়ার মধ্যে মানবীয় কল্যাণ নিহিত আছে বলে স্রষ্টার ইচ্ছাক্রমেই মানুষ এভাবে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মানুষের নির্বুদ্ধিতার ফলে ইহাই তাদের বিভ্রান্তি ও অস্বীকৃতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং নিজেদের খেয়াল-খুশী মতই ধরে নিয়েছে যে, 'রূহ' নামে কোন কিছুর অসিত্বই নেই।

বর্তমান যুগের জ্ঞানের বহর

মোটকথা জ্ঞানের এই মূর্খতার রাজ্যেই বর্তমান যুগের মানুষ আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এতে করে সহজেই অনুমান করা যায় যে, আজ ইসলামের কত বড় প্রয়োজন। কেননা একমাত্র ইসলামের কারণেই মানুষ আধুনিক ও প্রাচীনকালের অযৌক্তিক ও উদ্ভট চিন্তাধারা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। মানুষের নির্বুদ্ধিতা সর্বপ্রথম মূর্তিপূজার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। আর এখন তা বিজ্ঞান পূজার মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রাচীন ও আধুনিক যুগের সর্ববিধ অযৌক্তিক চিন্তাধারা থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত মানুষের বুদ্ধি ও আত্মা কখনো প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করতে পারে না। আর ইহা লাভ করার মাধ্যম মাত্র একটিই এবং তা হচ্ছে ইসলাম। কেবল এই স্থানেই ইসলাম মানবতার একমাত্র ভরসার স্থল হিসেবে আবির্ভূত হয়। ইসলামই ধর্ম ও বিজ্ঞানের কল্পিত দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে সক্ষম। এবং এরূপেই পাশ্চাত্যের লোকদের নির্বুদ্ধিতার ফলে বিপন্ন বিশ্ব যে শান্তি ও নিরাপত্তা হারিয়ে ফেলেছে তা লাভ করে সৌভাগ্যশালী হতে পারে।

ইউরোপ ও প্রাচীন গ্রীস

সভ্যতার ক্ষেত্রে আধুনিক ইউরোপ প্রাচীন গ্রীসের উত্তরাধিকারী। রোম সাম্রাজ্যের মাধ্যমে এই উত্তরাধিকার ইউরোপ পর্যন্ত পৌছেছে। গ্রীক মিথলজিতে মানুষ এবং দেবতাদের পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত ভয়ংকর। তারা একে অন্যের বিরোধী এবং শত্রু। তাদের মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষ এবং দ্বন্দ্ব-কলহ সর্বদাই চলছে। এ কারণে বিশ্বপ্রকৃতির গুপ্ত রহস্য উন্মোচনের ক্ষেত্রে মানুষ যতটুকু সাফল্য অর্জন করছে উহা দেবতাদের পরাজয় ও ব্যর্থতার ফসল ছাড়া অন্য

(রা)-এর একটি বিশেষ ঘটনা। একদিন জুম'আর খুৎবা দেয়ার সময়ে হঠাৎ তার বক্তব্য বন্ধ করে শত শত মাইল দূরে অবস্থানকারী তার প্রেরিত সেনাবাহিনী কমাণ্ডার হযরত 'সারিয়া' (রা)-কে লক্ষ্য করে হুকুম দিলেন ঃ হে সারিয়া ! পাহাড়ের দিকে, হে সারিয়া। পাহাড়ের দিকে।" শত শত মাইল দূর থেকে হযরত সারিয়া এই শব্দ শ্রবণ করেন এবং সংগে সংগেই পাহাড়ের দিকে মোড় পরিবর্তন করেন এবং এরূপে তার সেনাবাহিনী ঘাপটি মারা শত্রুসৈন্যের হাত থেকে রক্ষা পান।

কিছুই নয় ; মানুষ যেন উহা প্রাণপণ যুদ্ধ করে কোন মতে দেবতাদের কাছ থেকে উদ্ধার করছে। এই হিংসুটে অসহায় দেবতারা পরাজিত না হলে মানুষকে রহস্য উদঘাটন বা আবিষ্কারের কোন সুযোগই দিত না এবং প্রকৃতির যে সম্পদ ও অবদানের সাহায্যে মানুষ উপকৃত হচ্ছে তা থেকেও তারা বঞ্চিত হত। গ্রীক চিন্তাধারার এই দৃষ্টিতে বিজ্ঞানের প্রতিটি সাফল্য হিংসুটে দেবতাদের বিরুদ্ধে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও বিজয়লাভের এক একটি স্পষ্ট প্রমাণ।

ইউরোপীয় সভ্যতার প্রাণ

গ্রীক সভ্যতার এই ন্যক্কারজনক প্রাণই ইউরোপীয় সভ্যতার মূলে অবচেতনভাবে কাজ করে চলেছে। কখনো এর বহিঃপ্রকাশ ঘটছে বৈজ্ঞানিক সত্য ও ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে, আবার কখনো ঘটছে আল্লাহ সম্পর্কে ইউরোপীয় চিন্তাধারায়। এ কারণেই আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞানীরা তাদের বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বকে এমনভাবে তুলে ধরছে যে, উহা যেন তারা কোন অধিকতর বড় শক্তির নিকট থেকে যুদ্ধ করে হস্তগত করেছে। আর উহার অনিবার্য ফল-স্বরূপ প্রকৃতির সব শক্তিকেই তারা অধীন করে ফেলেছে। এক অদৃশ্য স্রষ্টার সামনে মানুষ যে দুর্বলতা ও বিনয় প্রকাশ করে এসেছে উহার মূল কারণ ছিল তার দুর্বলতার অনুভূতি। কিন্তু প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিজ্ঞান যে সাফল্য লাভ করছে তার ফলে মানুষের উক্ত দুর্বলতার অনুভূতি স্বাভাবিকভাবেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং পরিশেষে এমন এক দিন আসবে যখন মানুষ নিজেই নিজের খোদা হয়ে বসবে। কিন্তু এর জন্যে প্রয়োজন হলো জীবন মৃত্যুর যাবতীয় রহস্য তাকে জানতে হবে এবং নিজেদের পরীক্ষাগারে জীবনকে সৃষ্টি করার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। বস্তুত এ কারণেই আজকের বিজ্ঞানীরা তাদের পরীক্ষাগারে জীবন সৃষ্টির প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করছে। কেননা তাদের ধারণায় এই কার্যে সাফল্য লাভ করলে তাদের এবং অদৃশ্য খোদার মধ্যে আর কোন পার্থক্যই থাকবে না এবং অন্য কারুর সম্মুখে মাথানত করার কোন আবশ্যকতাই থাকবে না।

আশার ক্ষীণ রেখা

আধুনিক পাশ্চাত্য জগত যে আভ্যন্তরীণ ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে তার মধ্যে উপরোক্ত ব্যধিই সবচেয়ে বিপজ্জনক। উহা গোটা জীবনকেই ভয়ঙ্কর আযাব দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। মানবতাকে বিভেদ-বৈষম্য ও অরাজকতার জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করেছে। মানুষ পারস্পরিক শত্রুতায় মারাত্মকভাবে লিপ্ত হয়েছে। তাদের জীবনে না আছে শান্তি ও নিরাপত্তা ; না আছে কোন স্বস্তি ও সৌন্দর্য। এমতাবস্থায় আশার একমাত্র ক্ষীণরেখা হচ্ছে 'ইসলাম'। খোদাহীন পাশ্চাত্যবাসীদের সৃষ্ট ধ্বংসলীলা থেকে বাঁচার জন্যে আল্লাহর আইনের আনুগত্য

ছাড়া অন্য কোন পন্থা নেই। ইসলামই মানুষকে জীবনের একটি সুষ্ঠু দৃষ্টিভংগী প্রদান করতে সক্ষম। ইসলাম তাকে বলে দেয় ঃ দুনিয়ায় তুমি যে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক কৃতিত্ব অর্জন করছ উহা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের দয়ালু ও স্নেহশীল প্রভুরই অযাচিত দান। তোমরা যদি একে মানব সেবার মাধ্যম হিসেবে চালু রাখ তাহলে তিনি তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হবেন এবং তোমাদের পুরস্কৃত করবেন। তোমাদের প্রভু তোমরা যতই জ্ঞান লাভ কর না কেন—কিংবা প্রকৃতির রহস্য যত অধিকমাত্রায় আবিষ্কার কর না কেন, তাতে তিনি কখনো অসন্তুষ্ট হন না। কেননা তার এরূপ আশংকা নেই যে, তার কোন সৃষ্ট জীব জ্ঞান অর্জন করে কস্মিনকালেও তার খোদায়িত্বের জন্যে বিপদের কারণ হতে পারে। তিনি অসন্তুষ্ট হন কেবল তখনই এবং একমাত্র তাদের উপরই যারা তাদের জ্ঞান-গবেষণা এবং বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতাকে মানবজাতির কল্যাণ ও শান্তির পরিবর্তে তাদের পতন ও ধ্বংসের কাজে প্রয়োগ করে।

আধুনিক যুগের নতুন খোদা

চরিত্র ও আমলের দিক থেকে বর্তমান দুনিয়া আজ যেখানে অবস্থান করছে, আজ থেকে চৌদ্দ শ' বছর পূর্বেও সেখানেই অবস্থান করছিল। তখন একমাত্র ইসলামই তাকে বাতিল উপাস্য এবং মিথ্যা খোদার অকটোপাস থেকে মুক্তি দিয়েছিল। আজকের মিথ্যা খোদার হাত থেকেও ইসলামই মানুষকে নাজাত দিতে সক্ষম। মিথ্যা খোদারা আজ স্বৈরাচার, রাজতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের পোশাক পরিধান করেছে। একদিকে একজন পুঁজিবাদী নিঃস্ব শ্রমিকের রক্ত চুষে চুষে ফুলে উঠছে। আর অন্যদিকে প্রোলেটারিয়েট ডিরেকটরশীপের নামে কিছু লোক খোদায়ী শান-শাওকাত নিয়ে বসে আছে। এরা গণ-আযাদীর নামে মানুষের স্বাধীনতাকে পদদলিত করছে। অথচ বড় গলায় চিৎকার করছে যে, তারা জনসাধারণের আশা-আকাংখা পূরণ করে চলেছে।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

ইসলাম যখন মানুষকে প্রকৃত স্বাধীনতার বাণী শুনিয়েছে তখন কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, তাহলে যারা আজ সমগ্র ইসলামী দুনিয়াকে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করছে এবং ইসলামের নামে মুসলমানদেরকে লাঞ্ছিত ও পদদলিত করছে তাদের দুঃসহ জুলুম ও নিষ্ঠুর স্বৈরাচারী শাসনের কবল থেকে ইসলাম মানুষকে কেন রক্ষা করতে পারছে না ? এই প্রশ্নের উত্তর হলো ঃ শাসকরা ইসলামের নাম ব্যবহার করছে বটে, কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এই যে, তাদের সরকারী ব্যবস্থাপনার কোথাও এই ইসলামের কোন স্থান নেই ; এমনকি তাদের বাস্তব জীবন এবং উহার আশেপাশেও ইসলামের কোন চিহ্ন নেই। বরং এই নামজাদা মুসলমান শাসকরা সেই সকল লোকের সাথে সম্পর্ক রেখে চলেছেন যাদের প্রসংগ উত্থাপন করে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ○

"এবং যে লোকেরা আল্লাহর নাযিলকৃত আইন অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না তারা জালিম।"–(সূরা আল মায়েদা ঃ ৪৫)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا○ (النساء :٦٥)

("না, হে মুহাম্মাদ !) তোমার প্রভুর শপথ, এরা কখনো মু'মিন হতে পারে না যতক্ষণ না তাদের পারস্পরিক মতানৈক্যের স্থলে তোমাকে ফায়সালাকারী হিসেবে গ্রহণ করবে ; অতপর তুমি যা ফায়সালা করবে সে সম্পর্কে কোন দ্বিধা না করবে, বরং উহাকে শিরোধার্য করে নেবে।"

বর্তমান মুসলমান ডিকটেটর

যে ইসলামের প্রতি আমরা মানুষকে আহ্বান জানাই এবং যে ইসলামকে জীবনের একমাত্র পথপ্রদর্শক রূপে গ্রহণ করার আবেদন জানাই সেই ইসলামের সাথে এই ইসলামের দূরতম সম্পর্কও বর্তমান নেই যাকে প্রাচ্যের আধুনিক মুসলমান শাসকগণ নিজেদের ইসলাম হিসেবে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে। এই শাসকদের অন্তরে আল্লাহর আইনের প্রতি এতটুকু শ্রদ্ধাবোধ নেই ; তারা যখন তখন এই আইনের প্রতি বৃদ্ধাংগুলি দেখিয়ে থাকে। এতে তাদের অন্তরাত্মা বিন্দুমাত্রও কেঁপে উঠে না। জীবনের যাবতীয় কার্যকলাপ, লেনদেনের ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন থেকে সাহায্য গ্রহণের কোন প্রয়োজন তারা অনুভব করে না। বরং যা তাদের ভালো লাগে তাকেই তারা গ্রহণ করছে—চাই উহা ইউরোপের কোন দেশের মনগড়া আইন হোক কিংবা ইসলামী শরীয়াতের কোন বিধান হোক ; আর যা তাদের নিকট খারাপ লাগছে কিংবা তাদের স্বার্থের পরিপন্থী মনে হচ্ছে তা তারা প্রত্যাখ্যান করছে।—তারা না মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ, না আল্লাহর প্রতি। তারা মানুষ এবং আল্লাহ উভয়ের সাথেই গোস্তাখি করার অপরাধে অপরাধী। কেননা তাদের গ্রহণ-বর্জনের মাপকাঠি হক ও সততা নয়। বরং তা হচ্ছে তাদের ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করা এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ।

আমরা যে ইসলামের সাথে পরিচিত তা অহঙ্কারী বাদশা বা স্বৈরাচারী জালিম শাসকদের অস্তিত্বকে বিন্দুমাত্রও বরদাশত করে না। শুধু তা-ই নয়, উহা জনসাধারণকে যেভাবে আল্লাহর আইনের অধীনে নিয়ন্ত্রিত করে ঠিক তেমনিভাবে এই সকল শাসককেও আবদ্ধ করে রাখে। আর যদি এরা এ জন্যে প্রস্তুত না হয় তাহলে চিরকালের জন্যে এদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়। কেননা ঃ

فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۚ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ

"যা খড়কুটা তা অবিলম্বেই উড়ে যায় আর যা মানুষের জন্যে কল্যাণকর তা পৃথিবীতে থেকে যায়।"–(সূরা আর রা'দ ঃ ১৭)

ইসলামী সরকার

অন্য কথায় বলা যায়, ইসলামী সরকারে ডিক্টেটর বা স্বৈরাচারীর কোন স্থান নেই। কেননা ইসলাম স্বৈরাচারী শাসন বা রাজতন্ত্রকে আদৌ সমর্থন করে না। এমনকি ইহা কোন ব্যক্তিকে অন্য মানুষের উপর আল্লাহ ও রাসূলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজের মনগড়া আইন চাপিয়ে দেয়ার অধিকারও দেয় না। ইসলামী সরকারে শাসকমণ্ডলীকে আল্লাহ এবং জনসাধারণ উভয়ের নিকটই জবাবদিহি করতে হয়। এই জবাবদিহির দাবীই হচ্ছে এই যে, মানুষের মধ্যে তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর আইন প্রবর্তন করতে হবে। এ কর্তব্যে যদি তারা অবহেলা করে তাহলে জনগণকে আদেশ-নিষেধ করার অধিকার তাদের থাকে না। এবং এরপর আইনসংগতভাবেই তারা জনতার আনুগত্য লাভের কোন দাবী করতে পারে না। ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা) তাঁর সর্বপ্রথম ভাষণে এই বিষয়টির প্রতি অংগুলি নির্দেশ করে বলেন ঃ

"তোমরা আমার আনুগত্য করবে যতক্ষণ আমি আল্লাহর আনুগত্য করি। কিন্তু যদি আল্লাহর আনুগত্যের সীমালংঘন করি তাহলে আমার আনুগত্য করা তোমাদের কর্তব্য নয়।"

এতে করে প্রমাণিত হয় যে, সরকারী কোষাগার এবং আইন রচনার ক্ষেত্রে শাসকমণ্ডলীর অধিকার একজন সাধারণ নাগরিকের চেয়ে কোন অংশেই বেশী নয়। এছাড়া একথাও স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, মুসলিম সমাজের সদস্যরা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে স্বাধীন, পক্ষপাতহীন এবং সর্বপ্রকার শঠতা ও প্রবঞ্চনা থেকে মুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে এবং নির্বাচন চলাকালীন সময়ে ইনসাফ ও শালীনতার ভেতর দিয়ে কাউকে নেতৃত্বের উপযুক্ত বলে রায় না দিলে ইসলামের দৃষ্টিতে কোন নেতাই জনগণকে শাসন করার অধিকার অর্জন করতে পারে না।

শ্রেষ্ঠত্ব ও বীরত্বের ধর্ম

ইসলামী রাষ্ট্র উহার নাগরিকবৃন্দকে কেবল আভ্যন্তরীণ স্বৈরাচারী শাসকদের হাত থেকেই রক্ষা করে না, বরং বাইরের সকল প্রকার আক্রমণ থেকেও হেফাযত করে। চাই সে আক্রমণ সাম্রাজ্যবাদী শোষণ (Exploitation) রূপে হোক কিংবা অন্য কোন পন্থায় হোক। এর কারণ হলো ঃ ইসলাম স্বয়ং একটি

বীরত্ব, বাহাদুরী ও শক্তির ধর্ম। মানুষ তার সুউচ্চ আসন থেকে পতিত হয়ে মিথ্যা ও বাতিল খোদা তথা সাম্রাজ্যবাদের সামনে অপদস্থ হোক—ইসলাম ইহা কখনো বরদাশত করতে পারে না। ইসলাম মানুষকে জীবনযাপনের একটি সহজ-সরল পদ্ধতি প্রদান করেছে। এবং তাকে এই বলে উৎসাহিত করে যে, স্বীয় প্রভুর সন্তুষ্টি হাসিল করার জন্যে পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে তার পথে জিহাদে অবতীর্ণ হও। নিজের আশা-আকাংখাকে তার মহান ইচ্ছার অধীন করে দাও। নিজের যাবতীয় মাধ্যম ও উপায়-উপাদানকে কাজে লাগিয়ে সাম্রাজ্যবাদ (Imperialism) উপনিবেশবাদ (Colonialism) ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে দুর্বার গতিতে ঝাপিয়ে পড়।

সাম্রাজ্যবাদ থেকে মুক্তিলাভের পথ

এ জন্যে আসুন। আমরা সবাই একতাবদ্ধ হয়ে ইসলামের অনুসরণ করি। এর পতাকা তলে সমবেত হয়েই আমরা সাম্রাজ্যবাদের সকল চিহ্নকে নির্মূল করে দিতে পারি। সাম্রাজ্যবাদের যে দানব এখনো পর্যন্ত সমস্ত দুনিয়াকে তার শক্তি পরীক্ষার লক্ষ্যস্থলে পরিণত করে রেখেছে তার হিংস্র থাবা থেকে মানুষকে রক্ষা করার এই একটি পথই এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। এখান থেকেই প্রকৃত স্বাধীনতার সূচনা হতে পারে। অতপর কেউ কারুর দাসানুদাস হবে না ; সকল মানুষের চিন্তা-প্রত্যয়, আমল-আখলাক, উপায়-উপার্জন ও নীতি-নৈতিকতার পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জিত হবে। সকলের ইজ্জত-আবরু ও মান-সম্ভ্রমের —নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। কেননা স্বয়ং সরকারই এর হেফাযতের পরিপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করবে। কেবল এরূপেই আমরা সঠিক অর্থে মুসলমান এবং আমাদের রবের কৃতজ্ঞ বান্দা বলে পরিগণিত হতে পারি—সেই রবের যিনি একমাত্র ইসলামকে আমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করেছেন ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ط (المائدة : ٣)

"আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে তোমাদের জন্যে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং আমার নেয়ামত তোমাদের জন্যে সমাপ্ত করলাম। আর তোমাদের জন্যে ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মঞ্জুর করে নিলাম।"

–(সূরা আল মায়েদা ঃ ৩)

বিশ্বজনীন সংশোধন কর্মসূচী

ইসলামের বৈপ্লবিক সংশোধন কর্মসূচীর গণ্ডি কেবল মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং নিজস্ব প্রকৃতির দিক থেকেই ইহা একটি বিশ্বজনীন

সংশোধনী প্রোগ্রাম। আজকের যে বিপন্ন দুনিয়া পারস্পরিক যুদ্ধ ও বিবাদ-বিসম্বাদের নির্মম শিকার এবং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশংকায় প্রকম্পিত তার জন্যে ইহা একটি অপ্রত্যাশিত নেয়ামত ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের দু'টি শিবির

গোটা বিশ্ব আজ পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র নামক দু'টি বিপরীত শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। উভয় শিবিরই একটি আরেকটির বিরুদ্ধে সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান। প্রত্যেকটিরই লক্ষ্য হলো সমগ্র দুনিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করা এবং বিশ্বের বাজার ও সামরিক কৌশলগত (Stratagic) ঘাটিগুলো হস্তগত করা। কিন্তু সমস্ত মতানৈক্য সত্ত্বেও একটি বিষয়ে তারা সম্পূর্ণরূপেই এক। আর সেটি হলো তাদের সাম্রাজ্যবাদী নীতি। উভয় শিবিরই একইভাবে বিশ্বের সকল দেশ ও জাতিকে তাদের আজ্ঞাবহ গোলামে পরিণত করতে চায়। বস্তুত এই লক্ষ্যেই তারা অধিক হতে অধিক মাত্রায় মানবীয় এবং বস্তুগত উপায়-উপাদান নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে সচেষ্ট। দুনিয়ার অন্যান্য মানুষের মর্যাদা তাদের দৃষ্টিতে বোবা প্রাণীর চেয়ে কোন অংশেই অধিক নয়। অথবা বড়জোর তারা তাদের কাজের হাতিয়ার ; কেননা তাদের মাধ্যমেই তারা নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করতে সক্ষম হয়।

একটি তৃতীয় ব্লক

ইসলামী বিশ্ব যদি সাম্রাজ্যবাদের এই বর্বরোচিত আধিপত্য ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হতে পারে তাহলে আন্তর্জাতিক যে শত্রুতা ও হানাহানি বিশ্ব শান্তিকে বিপন্ন করে তুলেছে তার হাত থেকে বহুলাংশেই রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। মুসলিম দেশগুলো একই কাতারে সামিল হতে পারলে অতি সহজেই একটি তৃতীয়—মুসলিম ব্লক—গঠিত হতে পারে। এই প্রকারের কোন ব্লক সৃষ্টি হলে উহা বিশ্ব রাজনীতিতে একটি কেন্দ্রীয় শক্তির গুরুত্ব লাভ করতে পারে। কেননা ভৌগলিকভাবে এই মুসলিম দেশগুলো আধুনিক ও প্রাচীন পৃথিবীর একেবারে মাঝে অবস্থিত। এই ভৌগলিক অবস্থানের কারণে মুসলিম দেশগুলো স্বীয় কল্যাণের তাগিদে একেবারেই স্বাধীনভাবে যে কোন শিবিরের সাথে মিলিত হতে পারে এবং প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ার হওয়ার পরিবর্তে নিজেদের বৃহত্তর যৌথ সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে পারে।

সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন

ইসলাম মানুষের একমাত্র ভরসাস্থল। এর উপরই তার ভবিষ্যত নির্ভরশীল। বর্তমান চিন্তাধারা ও আদর্শিক দ্বন্দ্বের আবর্তে ইসলামী আদর্শের সাফল্যই মানুষকে মুক্তির নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম। আর ইসলামের বিজয় কোন মরিচীকা

বা অসম্ভব ব্যাপার নয়। সকল মুসলমানই যদি উহার অনুসারী হয়ে যায় তাহলে প্রথমে যেমন ইসলামের প্রতিষ্ঠান সম্ভবপর ছিল আজও তেমনি সম্ভব। শুধু মুখে মুখে উহার আনুগত্যের কথা না বলে আজই তারা শপথ গ্রহণ করুক ঃ দুনিয়ার বুকে ইসলামকে বিজয়ী ও সফল না করা পর্যন্ত তারা ক্ষ্যান্ত হবে না। ইনশাআল্লাহ্, এ জন্যে তাদের বাইরের কোন শক্তির সাহায্যও গ্রহণ করতে হবে না। ইসলামের এই বিজয়ের ফলে আধুনিক মানুষের নিকট উন্মুক্ত হবে উন্নতি ও সমৃদ্ধির এক নতুন দুয়ার। যে তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধের আশংকায় তারা শংকিত তার অবসান হবে চিরতরে, বিশ্বব্যাপী স্নায়ু যুদ্ধ, বিভেদ-বৈষম্য, রোগব্যধি ও মানসিক দ্বন্দ্বের কোন চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যাবে না—অন্য কথায় আনন্দ, সন্তুষ্টি, নিরাপত্তায় ভরপুর হয়ে উঠবে মানুষের জীবন।

পাশ্চাত্যের উন্নতির স্বরূপ

সমস্যার আরেকটি দিক আমরা পর্যালোচনা করে দেখি। পাশ্চাত্য জগত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অপরিমেয় সাফল্য লাভ করেছে বটে, কিন্তু মানবতার ক্ষেত্রে এখনো উহা দারুণ পশ্চাতে এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন। বিজ্ঞান তাদেরকে বস্তুগত স্বাচ্ছন্দ দান করেছে ঠিকই, কিন্তু আদর্শ মানুষ উপহার দিতে পারেনি। মানবতার উৎকর্ষ থেমে গিয়েছে ; মহৎ গুণাবলীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তাদের অন্তর থেকে মুছে গিয়েছে। আধুনিক সভ্যতা রূহ বা মনের চেয়ে বস্তুর প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে অধিক, আধ্যাত্মিকতার চেয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকে প্রাধান্য দিয়েছে বেশী। ফলে সমষ্টিগত মহান উদ্দেশ্যের পরিবর্তে ব্যক্তিগত আরাম-আয়েশ ও স্বার্থসিদ্ধির চিন্তাকেই অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এ কারণেই আধুনিক যুগের লোকেরা দৈহিক আনন্দ ও ভোগ-বিলাসের পেছনেই অন্ধের মত ছুটে চলেছে। অনস্বীকার্য যে, এই অবস্থাকে মানুষের উন্নতি বা মানবতার উৎকর্ষ নামে অভিহিত করা যায় না। কেননা মানুষের বা মানবতার উন্নতির অর্থ নিছক বস্তুগত বা বৈজ্ঞানিক উন্নতিই হতে পারে না। বরং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় ও পশু প্রবৃত্তির নাগপাশ থেকে পরিপূর্ণ আযাদীও এই অর্থের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত এই স্থানেই ইসলাম আমাদের সহায়তা করে। কেননা ইসলামই মানুষকে সত্যিকার উন্নতি ও উৎকর্ষের পথে পরিচালিত করতে সক্ষম।

প্রকৃত উন্নতির মাপকাঠি

দ্রুতগামী উড়োজাহাজ, আণবিক বোমা, রেডিও, টেলিভিশন, উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক বাল্‌বকে উন্নতি বলা হয় না ; ঐগুলোকে উন্নতির সমার্থক মনে করা মারাত্মক ভুল। কেননা মানবীয় উন্নতি পরিমাপ করার কোন ক্ষমতা ঐগুলোর নেই। প্রকৃত উন্নতি অনুধাবন করতে হলে দেখতে হবে যে, মানুষ কি তার পাশবিক প্রবৃত্তি ও স্বভাবকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম, না সে এখনো পর্যন্ত

ঐগুলোর খেলনা মাত্র ? এখনো যদি সে স্বীয় কুপ্রবৃত্তির সামনে একান্ত অসহায় ও দুর্বল এবং উহার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে কোন কথা চিন্তা করতে অক্ষম হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, সে প্রকৃত উন্নতি হতে এখনো অনেক দূরে। এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর সাফল্য সত্ত্বেও মানুষ হিসেবে এখনো সে অনুগ্রহের পাত্র।—তাকে উন্নত বা সাফল্যের অধিকারী বলার তো কোন প্রশ্নই উঠে না।

উন্নতির এই মাপকাঠি বাহির থেকে আমদানী করে মানুষের উপর চাপিয়ে দেয়া ধর্ম বা নীতিশাস্ত্রের মনগড়া কোন মাপকাঠি নয়। কোন কল্পনা-বিলাসও নয়—বরং একান্তই বাস্তব ঘটনা। স্বয়ং ইতিহাসই এর সাক্ষী। ইহা একটি অকাট্য ঐতিহাসিক সত্য যে, নৈতিক ও মানবীয় মাপকাঠি পরিহার করে যখন কোন জাতি আরাম-আয়েশ ও বিলাস-ব্যসনে মত্ত হয়ে যায় তখন অতীতের শক্তি-সামর্থ, সম্ভ্রম ও মর্যাদা এবং বীরত্ব ও বাহাদুরীকে ধরে রাখতে পারে না এবং মানুষের সমষ্টিগত কল্যাণ ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রেও কোন অবদান রাখতে পারে না। প্রাচীন গ্রীস, ইরান বা রোমক সাম্রাজ্যের ধ্বংসের কথাই বলুন কিংবা আব্বাসী যুগের শেষ ভাগে স্বয়ং মুসলমানদের শৌর্য-বীর্যের পতনের কথাই বলুন—সর্বত্রই এই আনন্দ-উল্লাস বা ভোগ-বিলাসের বিষাক্ত ছোবল সবকিছুকেই নির্মূল করে দিয়েছে। নগ্নতা ও ব্যভিচারের জঘন্য দৃষ্টান্ত —ভোগবাদী ফরাসী জাতি দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে যে নির্লজ্জ ভূমিকা রেখেছে তা কেউ ভুলতে পারে কি ? শত্রুদের সম্মুখে অস্ত্র সমর্পণ করতে তাদের বিন্দুমাত্রও দেরী হয়নি; সামান্য আঘাতেই তারা মাথা নত করে দিয়েছে, শত্রুদের একবারের আঘাতও তারা সহ্য করতে পারেনি। কেননা তাদের লোকগুলোর জাতি ও দেশ রক্ষার যতটুকু চিন্তা ছিল তার চেয়ে অধিক চিন্তা ছিল স্ব স্ব জান-মাল ও আরাম- আয়েশের। জাতীয় গৌরব, সম্মান ও খ্যাতির চেয়ে এই চিন্তায়ই তারা অস্থির হয়ে পড়েছিল যে, তাদের পাপ কেন্দ্র রাজধানী প্যারিস এবং উহার নাচঘরগুলো যেন শত্রুর বোমাবর্ষণ থেকে কোন মতে বেঁচে যায়।

আমেরিকার দৃষ্টান্ত

অনেকে এই প্রসংগে আমেরিকার দৃষ্টান্ত তুলে ধরে। তাদের বক্তব্য হলো ঃ আমেরিকার লোকেরা ভোগ-বিলাসে মত্ত ; অথচ পৃথিবীর একটি মহাশক্তি হিসেবে পরিগণিত এবং উৎপাদনের দিক থেকেও তাদের স্থান অনেক উপরে। কথাগুলো নিশ্চয়ই ঠিক। কিন্তু আমাদের বন্ধুরা ভুলে যায় যে, বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক পর্যায়ে আমেরিকা এখনো একটি তরুণ শক্তি। আর অনস্বীকার্য যে, তরুণদের গোপনীয় রোগগুলো প্রচ্ছন্ন অবস্থায়ই বিরাজ করতে থাকে ; উহার কোন নিদর্শন বাহ্যিকভাবে গোচরীভূত হয় না। কেননা সামাজিক ব্যবস্থাপনার

প্রতিরক্ষা শক্তি এতদূর মজবুত যে, আভ্যন্তরীণ ব্যধির আলামতগুলোকে স্পষ্ট হতে দেয় না। বস্তুত কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি কোন সমাজের বাহ্যিক স্বাস্থ্য ও চাকচিক্য দেখে ধোকা খেতে পারে না এবং চিত্তাকর্ষক পোশাকে আবৃত মারাত্মক ব্যধির আভাস থেকেও অসতর্ক থাকতে পারে না। একথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে, চরিত্র ও নৈতিকতার পর্যায়ে আমেরিকার অবস্থা পাশ্চাত্যের অন্যান্য জাতির চেয়ে কোন দিক থেকেই উন্নত নয়। নিম্নলিখিত দু'টি সংবাদ দিয়েই ইহা সহজে প্রমাণিত হয়। আরো প্রমাণিত হয় যে, বহুবিধ সাফল্য ও কৃতিত্ব সত্ত্বেও বিজ্ঞান এখনো মানবীয় প্রকৃতির মৌলিক পরিবর্তন ও উন্নতি সাধন করতে সক্ষম নয়। স্বয়ং বিজ্ঞানও আল্লাহর আইনের একটি অংশমাত্র।—আল্লাহর আইন যাবতীয় পরিবেশ ও ঘটনা থেকে চিরমুক্ত। অবিচল এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ বলেন ঃ

فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيْلاً ع (فاطر : ٤٣)

"তাই তোমরা আল্লাহর বিধানকে পরিবর্তনশীল পাবে না।"

—(সূরা ফাতের ঃ ৪৩)

দু'টি সংবাদ

কিছুকাল পূর্বে সংবাদপত্রের এক তথ্য বিবরণীতে বলা হয়েছে যে, আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ৩৩জন কর্মচারীকে আপত্তিকর নৈতিক অপরাধ এবং নিজ দেশের গোপনীয় তথ্যাদি শত্রু দেশের নিকট ফাঁশ করার অভিযোগে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করে দিয়েছে।

দ্বিতীয় সংবাদ হলো ঃ আমেরিকার সৈন্যদের মধ্যে পলাতক কাপুরুষ সৈন্যের সংখ্যা হলো ১ লাখ ২০ হাজার। আমেরিকার মোট সৈন্যদের মধ্যে এই সংখ্যাটি যে বিরাট তাতে কোন সন্দেহ নেই। অথচ জাতি হিসেবে আমেরিকানরা এখনো তরুণ এবং বিশ্বের মোড়ল হওয়ার স্বপ্নও তারা দেখছে। কিন্তু এতো কেবল শুরু। ভোগ-বিলাস ও বস্তুবাদী জীবনধারা থেকে নিবৃত্ত না হলে পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের মতই তাদেরকে ধ্বংস হতে হবে। তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা এই হলো প্রকৃতির অমোঘ বিধান।

আমেরিকার অন্ধকার দিক

আমেরিকার অন্য দিকটির প্রতিও আমরা দৃকপাত করি। অভাবনীয় উৎপাদন, অসংখ্য উপায়-উপাদান ও প্রচুর ধন-সম্পদ সত্ত্বেও মহত্ব ও নৈতিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে আমেরিকাবাসীরা আজ বন্ধ্যা। জাতি হিসেবে তারা আজ বস্তুগত লোভ-লালসা, ভোগ-বিলাস এবং নগ্নতা ও নির্লজ্জতার সাগরে নিমজ্জিত। নিরেট পশুত্বের স্তর অতিক্রম করে কোন কিছু বিচার-বিশ্লেষণের

সৌভাগ্য তাদের খুব অল্পই হয়। কৃষ্ণাঙ্গই আমেরিকানদের সাথে যে অমানুষিক ও পাশবিক ব্যবহার করা হচ্ছে তা আমেরিকানদের সেই বর্বরোচিত ও নির্লজ্জ চরিত্রেরই সুস্পষ্ট দর্পণ—যা দেখলে সত্যিই মানুষের দয়ার উদ্রেক হয়। মানবতার উপর পশুত্বের এই যে বিজয়—এ পাশবিকতার মধ্যেই যেন আনন্দ, এ পাশবিকতার দাসত্বেই যেন শান্তি—একি মানবতার লাঞ্ছনা নয় ? এই চরিত্র নিয়ে তারা সত্যিকার উন্নতি লাভ করতে পারবে কি ?

সততা ও কল্যাণের পথ

সমগ্র দুনিয়া আজ অন্ধকার। তবে মুক্তিলাভের একটি পথ এখনো উন্মুক্ত রয়েছে। সেটি হচ্ছে ইসলামের পথ। যেভাবে চৌদ্দ শ' বছর পূর্বে ইহা মানুষকে পাশবিক প্রবৃত্তির হাত থেকে মুক্তি দিয়েছিল তেমনিভাবে আজও ইহা মানুষের সহায়তা করতে পারে। আজও ইহা প্রবৃত্তির অক্টোপাস থেকে মুক্ত করে তাকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম—এমন মানুষ যে তার আধ্যাত্মিক মানকে অধিক হতে অধিকতর উন্নত করার লক্ষ্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে যাতে করে গোটা জীবনই সৎ ও কল্যাণকর কর্মতৎপরতায় ভরে উঠবে এবং সর্বত্রই উহার অনুশীলন অব্যাহত গতিতে চলতে থাকবে।

ইসলামের পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের সম্ভাবনা

কেউ হয়ত বলতে পারে : ইসলামের পুনরুজ্জীবন এক অসম্ভব ব্যাপার এবং উহার জন্যে চেষ্টা করাও নিষ্ফল। কিন্তু তাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, অতীতে যেমন প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলে উহা মানুষের পাশবিক চরিত্রকে নির্মূল করতে পারে তেমনিভাবে আজও উহা ইতিহাসের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে সক্ষম। কেননা মানবীয় প্রকৃতিতে কোন মৌলিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়নি ; ইহা অতীতে যেমন ছিল আজও ঠিক তেমনি আছে। ইসলামের যখন আবির্ভাব ঘটে তখন দুনিয়ার নৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা তেমনি শোচনীয় ছিল যেমনটি আজ আমরা প্রত্যক্ষ করছি। প্রাচীন ও আধুনিক এই দুরাবস্থার মধ্যে বাহ্যিক রূপ ছাড়া অন্য কোন ব্যবধান নেই। নৈতিক পথভ্রষ্টতার ক্ষেত্রে প্রাচীন রোম আধুনিক লণ্ডন, প্যারিস এবং আমেরিকার শহরগুলোর চেয়ে পেছনে ছিল না। একই রূপে আজকের সমাজতন্ত্রী দেশসমূহে যে ধরনের যৌন অরাজকতা (Sexual Anarchy) বর্তমান ঠিক সেই ধরনের উচ্ছৃংখলতাই চালু ছিল প্রাচীন ইরানে। বস্তুত এরূপ ঐতিহাসিক পটভূমিতেই ইসলামের আগমন ঘটে। আর উহা অনতিবিলম্বেই স্বীয় অনুসারীদের নৈতিক জীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করে—ভোগ-লালসার গভীর তলদেশ থেকে তাদেরকে উদ্ধার করে। তাদের জীবনের এক মহান লক্ষ্য স্থির করে দেয়, তাদের আচরণ ও কর্মতৎপরতায় এক দুর্বার

চেতনার সৃষ্টি করে দেয়। সততা ও কল্যাণের পথে আমরণ জেহাদের প্রেরণা জাগ্রত করে দেয়, মানুষের সম্মুখে শান্তি ও সমৃদ্ধির দ্বার উন্মুক্ত করে দেয় এবং ইলম ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে এমন এক আন্দোলনের সূচনা করে যা সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতকে প্রভাবিত করেছে। ফলে গোটা বিশ্ব চিন্তারাজ্যের এক মহাবিপ্লবের সাথে পরিচিত হয়ে উঠে এবং ইসলামী বিশ্ব সারা বিশ্বের উন্নতি-সমৃদ্ধি ও দিকনির্দেশনা লাভের অদ্বিতীয় কেন্দ্রে পরিণত হয়। বলা বাহুল্য, ইসলাম এরূপে শতাব্দীর পর শতাব্দীকাল ধরে বিশ্ববাসীকে পথ দেখিয়েছে। কিন্তু সুউচ্চ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের এই দীর্ঘ ইতিহাসে ইসলামী বিশ্ব বস্তুগত কিংবা আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে অন্যদের চেয়ে কখনো পেছনে থাকেনি। কেননা নৈতিক পথভ্রষ্টতা, যৌন অরাজকতা এবং নাস্তিক্যবাদকে ইসলাম কখনো বরদাশত করে না, এমনকি উহার সূচনা বা বিকাশলাভেরও কোন সুযোগ দেয় না। বস্তুত এ কারণেই দেখা যায় যে, উক্ত সময়ে সততা, ভদ্রতা এবং মানবীয় চেষ্টা তৎপরতার সকল ক্ষেত্রে বিশ্বের সকল জাতিকে দিকনির্দেশনা দেয়ার গৌরব একমাত্র মুসলমানরাই অর্জন করেছিল এবং তাদের জীবনধারাই সকল মানুষের জন্যে আদর্শ জীবনধারা হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল। কিন্তু দুখের বিষয়, এরপর তারা ক্রমে ক্রমে ইসলামের মূলনীতি থেকে সরে যেতে থাকে। এরূপে এমন এক সময় এসে গেল যে, তাদের জীবনে মহান লক্ষ্য ও মৌলনীতির কোন আভাস অবশিষ্ট রইল না এবং তারা জৈবিক ভোগ-লালসা ও পশুপ্রবৃত্তির দাসানুদাসে পরিণত হলো। ফলে আল্লাহর অটল বিধান অনুযায়ী দুনিয়াতেই তাদের শাস্তি ভোগ করতে হলো এবং তাদের বীরত্ব ও সৌভাগ্যের সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল।

আধুনিক ইসলামী আন্দোলন

আধুনিক ইসলামী আন্দোলন অত্যন্ত দ্রুতগতিতে শক্তিশালী হয়ে উঠছে। ইহা অতীত থেকে আধ্যাত্মিক পুষ্টি হাসিল করছে। বর্তমান কালের যাবতীয় নিষ্কলুষ ও বৈধ উপায়-উপাদানসমূহ কাজে লাগাচ্ছে এবং দূর ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে মঞ্জিলে মকসুদে উপনীত হওয়ার জন্যে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। তার ভবিষ্যত উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান ; তার মাধ্যমে সেই অলৌকিক ঘটনারই (Miracle) পুনরাবির্ভাব হতে পারে যা একবার অতীতে হয়েছিল। এরপরে মানুষ আর পাশবিক লোভ-লালসার দাস বলে পরিগণিত হবে না। বরং দুনিয়ার ঝঞ্ঝাটে মশগুল এবং হয়রান হওয়া সত্ত্বেও স্বাধীন মানুষের ন্যায় মাথা উঁচু করে চলতে পারবে। কেননা তখন তার লক্ষ্যস্থল পার্থিব ভোগ-বিলাস বা আনন্দ-উল্লাস নয়। বরং তার পরম ও চরম লক্ষ্য হলো সাত আসমানেরও অনেক উর্ধে।

একটি পূর্ণাংগ জীবনব্যবস্থা

এর অর্থ এই নয় যে, ইসলাম নিছক একটি আধ্যাত্মিক প্রত্যয় কিংবা কোন নীতিশাস্ত্র অথবা আসমান-জমিন সংক্রান্ত একটি গবেষণামূলক তত্ত্ব। বরং ইসলাম হচ্ছে জীবন যাপনের একটি বাস্তব পদ্ধতি। দুনিয়ার সকল দিক ও বিভাগের সব সমস্যার সমাধানই এর মধ্যে বর্তমান। উহার আওতা থেকে কোন কিছুই বাদ পড়েনি। উহা মানব জীবনের যাবতীয় সম্পর্ককে—চাই উহা রাজনৈতিক হোক কিংবা অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় হোক অথবা সামাজিক—সুবিন্যাস্ত করে দেয় এবং উহার জন্যে সুষ্ঠু আইন-কানুন রচনা করে পরিপূর্ণ রূপে বাস্তবায়িত করে তোলে। ইসলামের এই কর্মতৎপরতার সর্বাধিক প্রশংসনীয় বিষয় হলো ঃ উহা ব্যষ্টি ও সমষ্টি, ব্যক্তি ও সমাজ, যুক্তি ও ধারণাজ্ঞান, আমল ও ইবাদাত, আসমান ও জমিন এবং দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যে এমন এক ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য এনে দিয়েছে যে, জীবনের এই বহুমুখী দিক ও বিভাগগুলো একটি সুসমন্বিত এদের বিভিন্ন অংশে পরিণত হয়ে গিয়েছে।

বর্তমান অধ্যায়ে ইসলামের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। অবশ্য পরবর্তী অধ্যায়সমূহে প্রাচ্যবিদদের (Orientalists) প্রচারিত ভ্রান্ত চিন্তাধারা আলোচনা প্রসংগে ইসলামী জীবনব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হবে। তবুও পাঠকদের সুবিধার জন্যে কিছু কথা তুলে ধরতে চাই।

ইসলামের প্রথম বৈশিষ্ট্য

ইসলাম সম্পর্কে সর্বপ্রথমেই একথা নিশ্চিতরূপে বুঝে নিতে হবে যে, ইহা নিছক কিছু চিন্তা (বা ধর্মমত) নয়। বরং ইসলাম হচ্ছে একটি বাস্তব জীবনব্যবস্থা। মানুষের জীবনে যা কিছু প্রয়োজন তার একটিকেও ইহা বাদ দেয়নি। বরং যেগুলো মেটাবার জন্যে সমস্ত কার্যই তাদের সামনে উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

ইসলামের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য

মানব জীবনের প্রকৃত চাহিদা মেটাবার জন্যে ইসলাম জীবনের সকল ক্ষেত্রে সুবিচার ও ভারসাম্য স্থাপন করতে চায়। কিন্তু তাই বলে উহা মানব প্রকৃতির সীমাবদ্ধতাকে কখনো উপক্ষো করে না। উহা সংশোধনের যাত্রা ব্যক্তি জীবন থেকেই শুরু করে এবং সমগ্র জীবনে দেহ ও আত্মা এবং বুদ্ধি ও প্রবৃত্তির চাহিদাগুলোর ভেতর এমন সামঞ্জস্য বিধান করে যাতে উহার কোনটিই তার বৈধ সীমা অতিক্রম করে অগ্রবর্তী না হতে পারে। আধ্যাত্মিকতার উন্নত

সোপানে আরোহণ করার জন্যে ইসলাম মানুষের জৈবিক চাহিদাগুলোকে যেমন চাপা দেয়নি, তেমনি ভোগ-বিলাস ও প্রবৃত্তির লালসা চরিতার্থ করার অবাধ সুযোগ দিয়ে মানুষকে একদম পশু হয়ে যাওয়ার সুযোগও দেয়নি। কার্যত উহা দেহ ও আত্মা উভয়েরই যথার্থ মূল্যায়ণ করে পারস্পরিক সামঞ্জস্যের ব্যবস্থা করে এবং উহার বৈধ চাহিদাগুলো মেটাবার সুযোগ করে দেয়। দেহ ও আত্মার এই সামঞ্জস্যের ফলে মানবীয় ব্যক্তিত্ব যাবতীয় বিভেদ, বৈষম্য এবং পারস্পরিক সংঘর্ষশীল উন্মাদনার হাত থেকে বেঁচে যায়। মানুষের ব্যক্তি জীবন এভাবে সুস্থ ও সর্বাংগ সুন্দর হওয়ার পর ইসলাম ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের চাহিদাগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্যে তৎপর হয়ে উঠে। উহা কোন ব্যক্তিকে অন্যান্য ব্যক্তি কিংবা সমাজের বিরুদ্ধাচরণ করার অবকাশ দেয় না এবং সমাজকেও কোন ব্যক্তির অধিকার হরণ করার সুযোগ দেয় না। এমনকি কোন দল বা জাতি অন্য কোন দল বা জাতির উপর প্রভুত্ব স্থাপন করুক—ইহাও ইসলাম সমর্থন করে না। মোটকথা ইসলাম সমাজের সংঘর্ষশীল শক্তিগুলোর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নিজ হস্তেই রেখে দেয় ; উহার পারস্পরিক দ্বন্দ্বের যাবতীয় সম্ভাবনাকে নাকচ করে দিয়ে উহার মধ্যে এমনভাবে সামঞ্জস্য বিধান করে যে, ঐগুলো মিলিতভাবে মানবতার অকল্পনীয় কল্যাণ সাধন করতে পারে।

সামাজিক শক্তিসমূহের সামঞ্জস্যতা

ইসলামই একই সাথে জৈবিক ও আত্মিক, দৈহিক ও আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও মানবীয় শক্তিসমূহের মধ্যে এক অভাবনীয় সামঞ্জস্যতা এনে দেয়। ইসলাম কমিউনিজমের ন্যায় জীবনযাপনের জন্যে মানবীয় কার্যকারণের চেয়ে অর্থনৈতিক কার্যকারণকে অধিকতর গুরুত্ব দিতে নারাজ। আবার 'মানবীয় জীবনের ব্যবস্থাপনা কেবল দর্শনের কল্পনা-বিলাসের উপরই নির্ভরশীল'—এরূপ চিন্তাধারাকেও ইসলাম কোন স্বীকৃতি দেয় না। কেননা উহা সমাজকে উহাদের কোন একটির কিংবা কোন অংশের সমার্থক বলে সমর্থন করে না। বরং সমাজের জন্যে ইসলাম উহার প্রত্যেকটিকেই সমান গুরুত্ব দেয় এবং ঐগুলোকে সুবিন্যস্ত করে মানবতার সার্বিক কল্যাণে নিয়োজিত করে।

ইসলামের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য

সর্বদাই স্মরণ রাখতে হবে যে, একটি সমাজদর্শন এবং একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা হিসেবে ইসলামের একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু শাখা-প্রশাখায় বাহ্যিকভাবে কিছু মিল থাকলেও না কমিউনিজমের সাথে এর কোন সম্পর্ক রয়েছে, না পুঁজিবাদী ব্যবস্থাপনার সাথে। উভয় ব্যবস্থাপনার মধ্যে যা কিছু কল্যাণকর তার সবটুকুই এর মাঝে বর্তমান, কিন্তু উহাদের ত্রুটি ও দুর্বলতা থেকে ইহা সম্পূর্ণরূপেই মুক্ত। ইহা আধুনিক পাশ্চাত্যের ন্যায় ব্যক্তিকে

এতদূর শক্তিশালী করতে নারাজ যাতে করে গোটা সমাজই তার হাতে আবদ্ধ হয়ে যায়। সমাজ সেখানে তার আযাদীকে বিন্দুমাত্রও খর্ব করতে পারে না। ব্যক্তির এই অবাধ ও নিরংকুশ স্বাধীনতা আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাপনার প্রধান ভিত্তি। এই বল্গাহীন স্বাধীনতা অন্যদের জন্যে—এমন কি যে সমাজ তাকে উর্ধে তুলে দিয়ে যথেচ্ছ স্বাধীনতার সুযোগ দিয়েছে তার জন্যেও মারাত্মক বিপদ হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে সমাজ জীবনকে বিশ্লেষণ করে ইসলাম সমাজের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরেপ করতেও ইচ্ছুক নয়। যদিও বর্তমান যুগে পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহে সমাজের প্রতি এরূপ গুরুত্ব প্রদান এক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। ঐ দেশগুলোর সরকারী ব্যবস্থাপনায় গুরুত্ব বলতে যা আছে তা একমাত্র সমাজেরই। উহাই জীবনের একমাত্র ভিত্তি। উহার বিপক্ষে ব্যক্তির কোন স্থান বা গুরুত্ব নেই। সমাজ থেকে পৃথক করে তার অস্তিত্বের ধারণা করাও এক অসম্ভব ব্যাপার। এর অনিবার্য ফল হয়েছে এই যে, ঐ সকল রাষ্ট্রে একমাত্র সমাজই সকল শক্তি ও স্বাধীনতার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যক্তি সেখানে সমাজের প্রাধান্যকে চ্যালেঞ্জও করতে পারছে না এবং তার চাহিদা ও অধিকার সম্পর্কেও কিছু বলতে পারছে না। এই মতাদর্শের ক্রোড় থেকেই জন্মগ্রহণ করেছে সমাজতন্ত্র। তার দাবী হলো ঃ সকল ব্যক্তির ভাগ্যের মালিক একমাত্র রাষ্ট্র। রাষ্ট্রই নাগরিকদের উপর অপরিসীম ও সমস্ত শক্তির অধিকারী, উহার খেয়াল-খুশি অনুসারেই তাদের চলতে হবে।

সমাজ জীবনের ভিত্তি

সমাজতন্ত্র এবং পুঁজিবাদের এই দুই চরম চিন্তাধারা ইসলাম দিয়েছে এক ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যবর্তী অবস্থা। ইহা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়কেই সমান গুরুত্বপূর্ণ মনে করে এবং এই দু'টির মধ্যে এমন সামঞ্জস্য বিধান করে যে, একদিকে ব্যক্তির যোগ্যতা বৃদ্ধি এবং গুণপনা বিকাশের সর্বাধিক স্বাধীনতার সুযোগ দেয়া হয়, কিন্তু অন্যান্য ব্যক্তিদের অধিকার হরণ কিংবা তাদের উপর সামান্যতম জুলুম করার অবকাশ দেয়া হয় না। আর অন্য দিকে জীবনের সকল দিক ও বিভাগের ভারসাম্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সমাজকে—তথা উহার পরিচালনা কাঠামো অর্থাৎ রাষ্ট্রকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক নির্ধারণের ব্যাপক অধিকার প্রদান করা হয়। ইসলামের এই সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি হচ্ছে ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক ভালোবাসা ও সম্প্রীতি।—সমাজতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী সমাজের ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত অসন্তোষ বা শ্রেণী সংগ্রামের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

ওহী ভিত্তিক জীবনব্যবস্থা

এখানে এ সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে যে, ইসলামের এই অনন্য জীবনব্যবস্থার ভিত্তি কোন অর্থনৈতিক পরিবেশ বা কারণ নয় ; বিভিন্ন শ্রেণী বা

দলীয় স্বার্থের সংগ্রামের ফসলও ইহা নয়।—বরং ইহা একটি ওহী ভিত্তিক জীবনব্যবস্থা। বিশ্বব্যাপী ইহা এমন এক সময়ে লাভ করেছে যখন তাদের জীবনে অর্থনৈতিক কারণের (Factors) কোন গুরুত্ব ছিল না এবং সামাজিক সুবিচারের বর্তমান ধারণার সাথেও কোন পরিচয় ছিল না। বস্তুত মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যায়, সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ উভয়ই অনেক পরবর্তীকালের ফসল। ইতিহাসের দিক থেকে ইসলামী জীবনব্যবস্থাই বিশ্বের সর্বপ্রথম জীবনব্যবস্থা হওয়ার একমাত্র গৌরবের অধিকারী।

জীবনের মৌলিক প্রয়োজন

দৃষ্টান্ত স্বরূপ মানুষের জীবনের মৌলিক প্রয়োজনের কথাই ধরুন। সচরাচর বলা হয় যে, কালমার্কসই হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি যিনি আহার, বাসস্থান এবং যৌন তৃপ্তির ব্যবস্থাকে মানুষের মৌলিক প্রয়োজন হিসেবে চিহ্নিত করে সরকারের জন্যে অবশ্য কর্তব্য বলে ঘোষণা করেছেন যে, সকল নাগরিকের এই প্রয়োজন অবশ্য অবশ্যই মেটাতে হবে। কালমার্কসের এই ঘোষণাকে মানবীয় চিন্তাজগতে এক বিপ্লব বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অথচ এ সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই যে, কালমার্কসের জন্মের তের শ' বছর পূর্বে ইসলামের মাধ্যমে গোটা পৃথিবী এই বৈপ্লবিক ঘোষণার কথা জানতে পেরেছে। ইসলামের পয়গম্বর হযরত মুহাম্মাদ (সা) ঘোষণা করেছেন ঃ

"যে ব্যক্তি আমাদের (অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের) কর্মচারী হিসেবে কাজ করছে তার স্ত্রী না থাকলে তার বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। তার বাসস্থান না থাকলে বাসস্থানের বন্দোবস্ত করতে হবে. তার চাকর না থাকলে চাকরের এবং সওয়ারীর প্রাণী না থাকলে সওয়ারীরও ব্যবস্থা করতে হবে।" এই ঐতিহাসিক ঘোষণায় শুধু পরবর্তী সময়ে কালমার্কসের ঘোষিত মানুষের মৌলিক অধিকারের কথাই বলা হয়নি, বরং আরো কিছু অধিকারের কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু ইসলাম এই অধিকার প্রদানের জন্যে সমাজতন্ত্রের ন্যায় শ্রেণীবিদ্বেষ, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এবং মানবীয় মূল্যবোধ অস্বীকৃতির মাধ্যমে গোটা সমাজকে জাহান্নামে পরিণত করেনি এবং কেবলমাত্র আহার-বাসস্থান ও যৌন বিহারের বেড়াজালে মানুষকে পশুর ন্যায় বন্দী করে রাখেনি।

স্থায়ী জীবনব্যবস্থা

ইসলামের এই বৈশিষ্ট্যসমূহের আলোকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ইসলাম এমন একটি সর্বাত্মক নীতি ও বিধানের সমন্বিত রূপ যে, মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগের সুখ ও সমৃদ্ধির সর্বাদিক অবকাশই এতে

বর্তমান। উৎসাহ-আবেগের কথাই বলুন, চিন্তা-ভাবনা বা কর্মতৎপরতার কথাই বলুন, ইবাদাত বন্দেগী বা ব্যবসা-বাণিজ্যের কথাই বলুন, সামাজিক সম্পর্ক বা আধ্যাত্মিক আচরণের কথাই বলুন—সবকিছুই এর অন্তর্ভুক্ত। এই বিভিন্নমুখী দিকগুলোকে সুসমন্বিত করে ইসলাম একটি সর্বাংগীন সুন্দর, ভারসাম্যপূর্ণ ও অনন্য জীবনব্যবস্থা মানুষকে উপহার দিয়েছে। এরূপ সর্বাত্মক ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থার প্রয়োজন থেকে মানুষ কোন যুগে মুক্ত থাকতে পারে কি ? বাস্তব জীবনে এর মুখাপেক্ষী না হয়ে পারে কি ? নিশ্চয়ই পারে না। কোন দিনই ইহা পুরানো বা অচল হতে পারে না। কেননা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের দিক থেকে ইহা জীবনের সমার্থকও নয়, বরং ইহা নিজেই জীবন। এই বিশ্বের বুকে যতদিন পর্যন্ত মানবজীবনের অস্তিত্ব থাকবে ততদিন এই ব্যবস্থাও বর্তমান থাকবে ; স্থায়িত্বের এই নিদর্শন কস্মিনকালেও মুছে যাবে না।

বর্তমান যুগের প্রয়োজন

বর্তমান যুগের পরিস্থিতি ও সমস্যাটির প্রেক্ষাপটে কোন বিবেকবান ব্যক্তি একথা সমর্থন করতে পারে না যে, আধুনিক যুগের মানুষ কোনো যুক্তিসংগত কারণে ইসলামী জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধকার যুগে মানুষ যে সকল অন্যায়-অনাচারে মশগুল ছিল আজকের এই বিংশ শতাব্দীতেও মানুষ সেই পথই অনুসরণ করে চলেছে। আলোকপ্রাপ্ত চিন্তাধারার এই উন্নত যুগেও মানুষ জঘন্যতম বর্ণবিদ্বেষের করুণ শিকার। দৃষ্টান্তের প্রয়োজন হলে আমেরিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতি তাকিয়ে দেখুন। নৈতিক চরিত্র, সংস্কৃতি ও মানবতার বিশাল ক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীর মানুষকে ইসলামের নিকট থেকে এখনো অনেক কিছুই শিখতে হবে। ইসলাম তো বহু পূর্বেই জাতিভেদ, বর্ণবিদ্বেষ এবং গোত্রীয় বৈষম্য থেকে মানবজাতিকে মুক্তি দিয়েছিল এবং আজও একমাত্র উহাই এই অভিশপ্ত ঘৃণার হাত থেকে সমগ্র বিশ্ববাসীকে রক্ষা করতে পারে। কেননা ইসলাম শুধু সাম্য ও মৈত্রীর একটি সুন্দর নীল নকসা পেশ করেই ক্ষান্ত হয়নি। বরং বাস্তব কর্মতৎপরতার ভেতর দিয়েও এই সাম্যকে পূর্ণাংগভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেখিয়েছে। সে সাম্যের কোন নযীর বিশ্ব ইতিহাসে নেই। ইসলামের এই সোনালী যুগে রক্ত, বর্ণ বা গোত্রীয় ভিত্তিতে জীবনের কোন ক্ষেত্রেই কোন শ্বেতাংগ কৃষ্ণাংগের চেয়ে অধিক মর্যাদা পায়নি। ইসলামের দৃষ্টিতে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বলাভের একমাত্র ভিত্তি হচ্ছে ন্যায়-পরায়ণতা ও আল্লাহভীতি। এ কারণেই ইসলাম দাস প্রথা বিলুপ্ত করে দাসদেরকে শুধু দাসত্বের অভিশাপ থেকেই মুক্তি দেয়নি। বরং সামগ্রিক প্রগতি ও স্বাচ্ছন্দ্যলাভের সকল সম্ভাবনার দ্বারই তাদের জন্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এমনকি দাসদের জন্যে সরাসরি রাষ্ট্র ও সমাজের সকল দায়িত্বপূর্ণ পদে

সমাসীন হওয়ার অধিকারও দান করেছে। হযরত বিশ্বনবী (সা) স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন ঃ

"নেতার আদেশ শ্রবণ কর এবং তার আনুগত্য কর। সে হাবশী ক্রীতদাস হলেও তার আনুগত্য কর—যতক্ষণ সে তোমাদেরকে আল্লাহ্র আইন মোতাবেক পরিচালিত করবে।"

নাগরিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন

আরো একটি দিক থেকেও আজকের বিশ্ব ইসলাম থেকে উদাসীন থাকতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদ ও স্বৈরাচারের যাঁতাকলে পৃথিবীর মানুষ আজ যেভাবে নিষ্পেষিত হচ্ছে এবং যে হিংস্রতা ও বর্বরতার নাগপাশে ধুকে ধুকে মরছে তা থেকে বাঁচার জন্যে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন পথ খোলা নেই। একমাত্র ইসলামই তাদেরকে সাম্রাজ্যবাদ ও স্বৈরাচারের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। কেননা একমাত্র ইহাই সাম্রাজ্যবাদ ও উহার অবাধ লুণ্ঠন কার্যের ঘোর বিরোধী। ইসলামের উন্নতির যুগে মুসলমানগণ তাদের বিজিত জাতির সাথে যে মহৎ, উদার ও ভদ্রতাসূচক ব্যবহার দেখিয়েছে তার কথা আধুনিক ইউরোপের লোকেরা স্বপ্নেও চিন্তা করতে পারে না। এই পর্যায়ে হযরত উমর (রা)-এর একটি বিচারের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। একজন কিবতীকে বিনা কারণে প্রহার করার অপরাধে তিনি মিসরের প্রখ্যাত বিজয়ী বীর হযরত আমর বিন আছের ছেলেকে বেত্রাঘাতের শাস্তি দিয়েছিলেন।—এমনকি স্বয়ং পিতাকেও শাস্তি দিতে উদ্যত হয়েছিলেন। এই একটি মাত্র ঘটনা দ্বারাই অনুমান করা যেতে পারে যে, ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকগণ কত অধিকমাত্রায় নাগরিক অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করত।

পুঁজিবাদের অভিশাপ

আজকাল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার যে অভিশাপ সারা বিশ্বকে গ্রাস করে ফেলেছে এবং যা সমগ্র মানবীয় জীবনকে বিষাক্ত করে তুলেছে তা থেকে মুক্তি পেতে হলেও ইসলাম ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা নেই। সুদ গ্রহণ ও সম্পদ লুণ্ঠনের যে ভিত্তির উপর পুঁজিবাদী ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে ইসলাম তার ঘোর বিরোধী। ইসলাম উহাকে নিষিদ্ধ করেই ক্ষান্ত হয়নি, উহার সহায়ক মাধ্যমগুলোকেও নির্মূল করার ব্যবস্থা করেছে। এক কথায়, বর্তমান দুনিয়া থেকে পুঁজিবাদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপকে একমাত্র ইসলামই দূর করতে সক্ষম।

সমাজতন্ত্রের মূল উৎপাটন

ঠিক একই রূপে জড়বাদী তথা নিরীশ্বরবাদী সমাজতন্ত্রের মূলোৎপাটনের জন্যেও ইসলামই হচ্ছে একমাত্র কার্যকরী হাতিয়ার। কেননা উহা পরিপূর্ণ রূপে

সামাজিক সুবিচারই প্রতিষ্ঠা করে না, বরং উহার সংরক্ষণের জন্যেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এবং একই সংগে মহৎ মানবীয় গুণাবলী এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের বিকাশ ও উন্নয়নের জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। উহার সমাজতন্ত্রের ন্যায় কোন সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগির শিকার না হওয়ার কারণে উহা নিছক ইন্দ্রিয়জগৎ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। কিন্তু নিজস্ব এই বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও ইসলাম উহার অনুসরণের জন্যে অন্যদের উপর কোন শক্তি প্রয়োগ করে না। কেননা বিশ্বাস ও ধর্মীয় ব্যাপারে উহা কোন জবরদস্তিকে আদৌ সমর্থন করে না। এবং করে না বলেই প্রোলেতারী স্বৈরাচারী শাসনেরও সে পক্ষপাতী নয়। এ পর্যায়ে উহার মূলনীতি হলো ঃ

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

"দ্বীনের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই। সঠিক বিষয়কে ভ্রান্ত চিন্তাধারা থেকে পৃথক করে দেয়া হয়েছে।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৬)

বর্তমানে সমগ্র জগতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের যে ঘনঘটা চলছে তার হাত থেকে রক্ষা পেতে হলেও ইসলাম ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু ইহা তখনই সম্ভবপর যখন সমগ্র মানবজাতি একমাত্র ইসলামকেই তাদের জীবনের দিশারী হিসেবে গ্রহণ করবে এবং প্রকৃত শান্তি ও সমৃদ্ধির পথ অবলম্বন করার জন্যে এগিয়ে আসবে।

মোটকথা, ইসলামের যুগ এখনো শেষ হয়নি ; বরং প্রকৃতপক্ষে সেই যুগের সূচনা হয়েছে মাত্র। ইহা কোন নিষ্প্রাণ মতাদর্শ নয় ; বরং ইহা একটি বৈপ্লবিক জীবনবিধান। ইহার অতীত যেমন গৌরবময় ও উজ্জ্বল তেমনি উহার ভবিষ্যতও ভাস্বর ও দীপ্তিমান। ইউরোপ যখন অজ্ঞতা ও মূঢ়তার গভীর অন্ধকারে হাতড়িয়ে ফিরছিল তখন গোটা বিশ্ব ইসলামের আলোকেই সমুদ্ভাসিত হয়ে উন্নতির শীর্ষ শিখরে আরোহণ করেছিল।

ইসলাম ও দাসপ্রথা

দাসপ্রথা ইতিহাসের ন্যক্কারজনক কর্মকাণ্ডের এক জঘন্যতম উদাহরণ। মুসলিম নব্য শিক্ষিতদেরকে ইসলামের প্রতি বিরূপ ও শত্রুভাবাপন্ন করে তোলার জন্যে কমিউনিষ্টরা সাধারণত এই অস্ত্রটিই বেশী ব্যবহার করে থাকে। তাদের বক্তব্য হলো ঃ ইসলাম যদি সকল যুগের জন্যেই গ্রহণযোগ্য হতো এবং মানুষের সকল প্রয়োজনই মেটাতে পারত তাহলে কস্মিনকালে মানুষকে দাস বানানোর অনুমতি দিত না। এমনকি দাসপ্রথাকে বরদাশতও করতে পারত না। এই দাস সমস্যাই একথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করে যে, এই জীবনব্যবস্থা কেবল একটি বিশেষ যুগের জন্যেই উপযুক্ত ছিল ; এখন উহার কোন প্রয়োজন নেই। স্বীয় লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার পর উহা আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

সন্দেহের আবর্তে

সংশয়ের এই বাস্তব পরিবেশে মুসলিম যুবকেরাও দিশেহারা হয়ে পড়ছে। তারাও আজ দ্বিধা ও সংকোচের শিকার হয়ে ভাবতে শুরু করেছে ঃ ইসলাম দাসপ্রথার অনুমতি কেমন করে দিল ? ইসলাম আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থা। সকল যুগের সকল এলাকার মানুষের উন্নতিই ইসলামের লক্ষ্য। কিন্তু ইহা দাসপ্রথাকে কেমন করে সমর্থন করলো ? পরিপূর্ণ সাম্যের মূলনীতির উপর ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত—যা বিশ্বের সকল মানুষকেই একই পিতা-মাতার সন্তান হিসেবে গণ্য করে যা এই পূর্ণাংগ সাম্যের ভিত্তিতে একটি নবতর আদর্শ মানবসমাজ বাস্তবেই গঠন করে দেখিয়েছে সেই ইসলাম উহার সমাজব্যবস্থায় দাসপ্রথাকে কেমন করে গ্রহণ করলো এবং কেমন করেই বা উহার জন্যে বিভিন্ন আইন-কানুন নির্ধারণ করলো ? আল্লাহ কি এ-ই চান যে, মানবজাতি প্রভু ও দাস নামে দু'টি চিরস্থায়ী শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে থাকুক ? তিনি কি ইহা কামনা করেন যে, মানুষের একটি শ্রেণী ইতর বা বোবা জন্তুর ন্যায় হাটে-বাজারে বেচা-কেনা হতে থাকুক ?—অথচ তিনিই তো তার পবিত্র গ্রন্থে ঘোষণা করেছেন ঃ

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ ـ

—"এবং নিশ্চয়ই আমি বনি আদমকে সম্মানিত করেছি।"

—(সূরা বনি ইসরাঈল ঃ ৭০)

আর তিনি যদি ইহা কামনা না করে থাকেন তাহলে তিনি তাঁর গ্রন্থে কেন ইহাকে মদ, জুয়া, সুদ ইত্যাদির ন্যায় স্পষ্ট ভাষায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করেননি ? মোটকথা আজকের মুসলমান যুবকরা একথা তো অবশ্যই জানে যে, ইসলামই

প্রকৃত দ্বীন। কিন্তু তারা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ন্যায় দারুণ উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতার শিকার। এই অবস্থারই নিখুঁত চিত্র নিম্ন আয়াতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে ঃ

وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى ط قَالَ اَوَ لَمْ تُؤْمِنْ ط قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ ط

"যখন ইবরাহীম বলেছিলেন ঃ হে আমার প্রভু, তুমি আমাকে দেখিয়ে দাও কিরূপে তুমি মৃতকে জীবিত কর। তিনি বললেন ঃ তুমি কি বিশ্বাস কর না ? সে বলল ঃ বিশ্বাস তো অবশ্যই করি ; তবে আমার আত্মা যেন সন্তোষ লাভ করে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৬০)

পক্ষান্তরে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর ইতরামি ও ষড়যন্ত্রের ফলে যাদের ধীশক্তি আজ আচ্ছন্ন—প্রত্যয় ও চিন্তাধারা দিগভ্রষ্ট তারা কোন কিছুর মর্ম বা হাকীকত পর্যন্ত পৌছার চেষ্টা করতেই নারাজ। কোন সত্য উদঘাটনের জন্যে যে ন্যূনতম ধৈর্য ও উৎসাহের প্রয়োজন তাও তাদের নেই। বস্তুত তারা আবেগ ও প্রবৃত্তির স্রোতে ভেসে চলেছে ; কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা ব্যতিরেকেই তারা রায় দিচ্ছে ঃ ইসলাম একটি পুরানো কাহিনী মাত্র। এখন উহার কোন প্রয়োজন নেই।

সমাজতান্ত্রিক প্রবঞ্চনার রহস্য

সমাজতন্ত্রের প্রচারকরা মানুষকে এই বলে ধোঁকা দিচ্ছে যে, তারা হলো এক বৈজ্ঞানিক মতবাদের ধারক ও বাহক। কিন্তু তাদের বৈজ্ঞানিক মতাদর্শের প্রকৃত মর্ম হলো ঃ উহা তাদের নিজস্ব চিন্তাধারার ফসল নয়, বরং তারা উহা ভিন দেশীয় প্রভুদের নিকট থেকে ধার করে এনেছে। অথচ এই ধার করা চিন্তাধারাকে তারা এমন ভাব-ভঙ্গিতে প্রচার করছে যে, যেন উহা এক অপরিবর্তনীয় চিরন্তন সত্য, উহার আবিষ্কর্তা কেবল তারাই ; উহার কোথাও দ্বিমতের অবকাশ নেই। তাদের সে সত্যটি (!) হলো 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ' (Dialectical Materialism)। এই মতাদর্শ অনুযায়ী মানুষের জীবন কয়েকটি নির্দিষ্ট ও অপরিহার্য অর্থনৈতিক স্তর অতিক্রম করছে। প্রথম স্তর হলো সমাজবাদ। দ্বিতীয় স্তরে হলো দাসপ্রথা, সামন্তবাদ ও ধনতন্ত্র। আর তৃতীয় এবং শেষ স্তর হলো দ্বিতীয় সমাজবাদ। এই মতাদর্শের দৃষ্টিতে এটাই হলো মানবেতিহাসের শেষ অধ্যায়। যে সকল প্রত্যয় ও চিন্তাধারা এবং ব্যবস্থাপনা ও মতাদর্শের সাথে মানবেতিহাসের সম্পর্ক বিরাজমান উহা তাদের নিজ নিজ যুগের নির্দিষ্ট অর্থনীতি ও সামাজিক ঘটনাবলীর প্রতিধ্বনি মাত্র। এছাড়া আর কিছুই নয়। অতীতের জন্মলব্ধ বিশ্বাস ও মতাদর্শ এবং জীবনব্যবস্থাসমূহ নিজ

নিজ যুগের জন্যে অবশ্যই কার্যকরী ছিল। কেননা তৎকালীন অর্থনৈতিক কাঠামো ও পরিবেশের সাথে উহার পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য বর্তমান ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ের অধিকতর উন্নত যুগের জন্যে উহা গ্রহণযোগ্য হতে পারেনি। কেননা প্রত্যেক যুগের অর্থনীতি ও পরিবেশ সম্পূর্ণ আলাদা ; আর এই নীতি ও পরিবেশই হলো মতাদর্শ ও জীবনব্যবস্থার মূল ভিত্তি। অনস্বীকার্য যে, প্রত্যেক নতুন যুগের মতাদর্শ উহার পূর্ববর্তী যুগের চেয়ে উৎকৃষ্ট ও উন্নত। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, মানবজীবনের জন্যে এমন কোন একক ও চিরস্থায়ী জীবনব্যবস্থা রচিত হতে পারে না যা পরবর্তী সকল যুগের জন্যেই সমানভাবে কার্যকরী ও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। ইসলাম এমন এক যুগে এসেছিল যখন দাস যুগের পরিসমাপ্তি ছিল আসন্ন এবং সামন্ত যুগ ছিল আগত প্রায়। এ কারণেই ইসলাম এমন আইন-কানুন, বিশ্বাস ও চিন্তাধারা উপস্থাপিত করেছে যাতে সেই যুগের অর্থব্যবস্থার পটভূমি ও পরিবেশ পূর্ণমাত্রায় প্রতিফলিত হয়েছে। তৎকালীন প্রচলিত দাসপ্রথার সত্যায়ন এবং সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থার স্থায়ীকরণের কারণ ইহাই। কেননা মহান (!) কালমার্কসের হৃদয়গ্রাহী ফরমান অনুযায়ী ইহা কখনো সম্ভবই ছিল না যে, পরবর্তী সময়ের অধিকতর উন্নত অর্থনৈতিক পরিবেশের অনুপস্থিতিতে ইসলাম তৎকালের উপযোগী আইন-কানুন ও জীবন পদ্ধতি রচনা করতে সক্ষম।

সমাজতন্ত্রীদের এই প্রবঞ্চনার রহস্য কোথায় ? এর উত্তর পেতে হলে আসুন, দাস সমস্যার সঠিক ইতিহাস এবং উহার সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক পটভূমি বিশ্লেষণ করে দেখি যে এর মূল কারণ কোথায়।

দাসপ্রথার ভয়ঙ্কর চিত্র

আজ যদি কেউ বিংশ শতাব্দীর মন-মানসিকতার পটভূমিতে দাসপ্রথার কথা চিন্তা করে এবং মানুষের ক্রয়-বিক্রয় ও রোমকদের ন্যাক্কারজনক অপরাধের কথা স্মরণ করে তাহলে তার সম্মুখে দাসপ্রথার এক ভয়ঙ্কর চিত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। তখন সে একথা কিছুতেই মেনে নিতে পারবে না যে, কোন ধর্ম বা জীবনব্যবস্থা একে বৈধ বলে গণ্য করতে পারে কিংবা ইসলাম —যার বেশীর ভাগ আইন-কানুন ও নিয়ম-নীতিই মানুষকে দাসত্বের যাবতীয় শৃংখল থেকে মুক্তি প্রদানের উপর নির্ভরশীল—একে নির্দোষ বলে ফতুয়া দিতে পারে। কিন্তু এই চিন্তাধারার মূলে রয়েছে ইসলাম সংক্রান্ত সঠিক জ্ঞানের অভাব। কেননা দাস প্রথার এই ভয়ঙ্কর চিত্রের সাথে ইসলামের আদৌ কোন সম্পর্ক নেই।

ইসলামের কীর্তি

এই পর্যায়ে ঐতিহাসিক সাক্ষ্যের প্রতি আমরা একবার দৃকপাত করি। এ একটি ঐতিহাসিক সত্য যে, রোমকদের ইতিহাসের অন্ধকার ও ভয়ঙ্কর

অপরাধের সাথে ইসলামী ইতিহাসের আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। রোম সাম্রাজ্যে দাসেরা যে ধরনের জীবনযাপন করত তার বিস্তৃত সাক্ষ্য-প্রমাণ আমাদের নিকট বর্তমান। উহার আলোকে ইসলামের কারণে দাসদের জগতে যে অভাবনীয় বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল তা আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি। উহা ইসলামের এমন এক ভাস্বর ও অক্ষয় কীর্তি যে উহার পর দাসপ্রথা বিলোপের জন্য অন্য কিছুর প্রয়োজন হয়নি। ইসলাম শুধু এতটুকু করেই ক্ষান্ত হয়নি ; বরং মানবীয় স্বাধীনতার প্রকৃত ধারণা তুলে ধরার সাথে সাথে বাস্তব ক্ষেত্রে উহাকে কার্যকরী করে দেখিয়েছে।

রোম সাম্রাজ্যে দাসপ্রথা

রোমকদের রাজত্বকালে দাসদেরকে মানুষ বলেই গণ্য করা হতো না। তারা ছিল নিছক পণ্য সামগ্রী। অধিকার বলতে তাদের কিছুই ছিল না। অথচ তাদের পালন করতে হতো দুঃসহ ও কঠিনতম দায়িত্ব। এই দাসেরা আসত কোথেকে ? এর সবচে' বড় মাধ্যম ছিল যুদ্ধ। মহান কোন উদ্দেশ্য বা নীতির জন্যে এ সকল যুদ্ধ সংঘটিত হতো না। বরং অন্যকে দাস বানিয়ে নিজেদের হীনতম স্বার্থ উদ্ধারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার জন্যেই এ যুদ্ধগুলো করা হতো। এ সকল যুদ্ধে যাদেরকে বন্দী করা হতো তাদের সবাইকেই দাস বানানো হতো। রোমকরা এই সকল যুদ্ধের মাধ্যমে নিজেদের আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস ও সুখ-ঐশ্বর্যের দ্রব্য সামগ্রী, ঠাণ্ডা ও গরম গোছলখানা ও বহুমূল্য পোশাক-পরিচ্ছদ, মজাদার পানাহার ও আমোদ-প্রমোদের পথ প্রশস্ত করত। পতিতাবৃত্তি, মদ্যপান, নাচ-গান, ক্রীড়া-কৌতুক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়া তারা যেন চলতে পারত না। জৈবিক আনন্দ, যৌন ব্যভিচার ও বিলাস- ব্যসনের উপায়-উপাদান হাসিল করার জন্যেই তারা বাইরের এলাকাসমূহ আক্রমণ করত এবং সেখানকার নারী-পুরুষদেরকে গোলাম বানিয়ে তাদের ভয়ঙ্কর পশুপ্রবৃত্তির চরিতার্থ করত। ইসলাম যে মিসরকে রোমকদের সাম্রাজ্যবাদী পাঞ্জা থেকে মুক্ত করেছিল তা ছিল তাদের জঘণ্যতম পাশবিকতার নিষ্ঠুর শিকার। মিসর ছিল তাদের যব উৎপাদনের প্রধান বাজার এবং ভোগ- বিলাসের দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহের একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম।

দাসদের করুণ অবস্থা

রোমকদের সাম্রাজ্যবাদী লোভ-লালসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তাদের জৈবিক আনন্দ ও ভোগ-বিলাসের সামগ্রী সরবরাহ করার জন্যে দাসদেরকে পালে পালে মাঠে নেয়া হতো। সেখানে (চতুষ্পদ প্রাণীর মত) তাদের সারাদিন পরিশ্রম করতে হতো। কিন্তু এ সত্ত্বেও পেট ভরে দু' মুঠো খাবার তাদের নসীবে হতো না। বরং এত সামান্য খাবার তাদের সামনে ফেলে দেয়া হতো যে, তা

খেয়ে কোন মতে তাদের প্রাণটি রক্ষা পেত এবং তাদের প্রভুদের কাজ করতে পারত। নিষ্প্রাণ বৃক্ষ এবং অন্য প্রাণীর চেয়েও তাদের অবস্থা নিকৃষ্ট ছিল। দিনে যখন তাদেরকে কাজে খাটানো হতো তখন যাতে করে তারা রক্ষক বা প্রহরীদেরকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যেতে না পারে সেজন্যে তাদের পায়ে ও মাজায় লোহার বেড়ি পরিয়ে দেয়া হতো। কারণে-অকারণে তাদের পিঠে বৃষ্টির মত চাবুক মারা হতো। কেননা তাদের প্রভুরা কিংবা তাদের স্থানীয় কর্মীরা তাদেরকে ইতর জীবের মত প্রহার করতে বড়ই আনন্দ অনুভব করত। সন্ধ্যায় যখন তাদের কাজ শেষ হয়ে যেত তখন তাদেরকে দশ-দশ, বিশ-বিশ বা পঞ্চাশ-পঞ্চাশজন করে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে খুপরীর মধ্যে আটকিয়ে রাখা হতো। যে খুপরীগুলো এতদূর অপরিষ্কার ও পূতিগন্ধময় থাকতো যে, পোকা-মাকড়, ইঁদুর-ছুঁচো ছাড়া অন্য কিছুই সেখানে বসবাস করতে পারত না। এই খুপরীর মধ্যেও তাদের হাত-পাগুলোকে বেড়ি মুক্ত করা হতো না। ইতর ও চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে তারা খোলা ও প্রশস্ত ঘরে রাখার ব্যবস্থা করত, কিন্তু এই বনী আদমদেরকে সেই সুবিধাটুকু থেকেও বঞ্চিত করে রাখত।

রোমকদের জীবনের জঘন্য দিক

দাসদের প্রতি রোমকদের সবচে' জঘন্য ও রোমাঞ্চকর ব্যবহার আমরা তাদের চিত্তবিনোদন তথা আনন্দ উপভোগের প্রক্রিয়ার মধ্যে দেখতে পাই। উহার মাধ্যমেই তাদের সেই বন্য স্বভাব, নিকৃষ্টতম বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতম হিংস্রতার পরিচয় পাওয়া যায় যা রোমক সংস্কৃতির ভাবধারার সাথে অংগাংগি-ভাবে জড়িত ছিল।—এবং উহাই বর্তমান যুগের ইউরোপ ও আমেরিকা তাদের যাবতীয় সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র ও উপায়-উপকরণের সাথে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে।

একটি পাশবিক খেলা

প্রভুদের চিত্তবিনোদন ও মনোরঞ্জনের জন্যে কিছু সংখ্যক দাসের হাতে তরবারি ও বল্লম দিয়ে জোর করে একটি আসরে ঢুকিয়ে দেয়া হতো। তার চারদিকে তাদের প্রভুরা এবং অনেক সময়ে রোম সাম্রাজ্যের শাহানশাও উপস্থিত হতেন। তারপর নির্দিষ্ট সময়ে দাসদেরকে হুকুম দেয়া হতো প্রত্যেকেই যেন অন্যান্য সকলকে ক্ষতবিক্ষিত ও টুকরা টুকরা করে ফেলে। তখন শুরু হয়ে যেত তাদের পারস্পরিক মরণ পণ যুদ্ধ। এমনি করে যুদ্ধ যখন শেষ হতো তখন দেখা যেত, হয়ত দু'একটি প্রাণীই কোন রকমে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় বেঁচে আছে এবং আর সবাই শত-সহস্র ভাগে বিভক্ত হয়ে সমস্ত আসরে ছড়িয়ে আছে। জীবিত দাসদেরকে তারা বিজয়ী বলে ঘোষণা করত এবং বিকট অট্টহাসি ও মুহুর্মুহু হাততালি দিয়ে তাদেরকে অভিনন্দন জানাত।

রোমক যুগে দাসদের অবস্থা

গোটা রোম সাম্রাজ্যে এ-ই ছিল দাসদের সামাজিক অবস্থা। এখানে রোমকদের আইনে দাসদের কী মর্যাদা ছিল তা আলোচনা করতে চাই না। এবং তাদের যে প্রভুদের হাতে ছিল তাদের জীবন-মরণ—যারা তাদের হীনস্বার্থ উদ্ধারের জন্যে এই প্রাণীগুলোর উপর চালাতো লোমহর্ষক অত্যাচার তাদের একচ্ছত্র অধিকার সম্বন্ধেও কিছু বলতে চাই না। কেননা এই হতভাগ্য দাসেরা সমাজের কোন শ্রেণীর নিকট থেকেই কোন প্রকার সহানুভূতি পেত না।

সারা বিশ্বে দাসদের করুণ অবস্থা

ইরান, ভারত ও অন্যান্য দেশের দাসরাও ছিল একই রূপ মজলুম ও অসহায়। রোমক দাসদের তুলনায় তাদের অবস্থা কোন দিক থেকেই ভালো ছিল না। খুঁটিনাটি বিষয়ে তারতম্য থাকলেও দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে দাসদের অবস্থান ও সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য ছিল না। তাদের জীবনের কোন মূল্যই ছিল না। কোন নিরপরাধ দাসকে হত্যা করা এমন কোন অপরাধ ছিল না যাতে করে তাকেও প্রাণদণ্ড ভোগ করতে হয়। অথচ তাদের উপর দায়িত্ব ও কর্তব্যের বোঝা এত পরিমাণ চাপানো হতো যে, তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে যেত। কিন্তু তাদের অধিকার বলতে কিছুই ছিল না। দুনিয়ার সকল দেশেই দাসদের ব্যাপারে সকলের দৃষ্টিভংগি ছিল এক ও অভিন্ন। এবং সামাজিক অধিকার সম্পর্কেও কোন পার্থক্য ছিল না।—পার্থক্য ছিল কেবল নিষ্ঠুরতার পরিমাণ ও উৎপীড়নের পদ্ধতির ক্ষেত্রে। কোথাও উৎপীড়ন চলতো জঘন্যতম প্রদর্শনীর মাধ্যমে, আবার কোথাও চলতো কিছুটা হালকাভাবে।

ইসলামের বৈপ্লবিক ঘোষণা

বিশ্ব মানবতার এই অধঃপতনের যুগেই ইসলামের আবির্ভাব ঘটে ঃ ইসলাম দাসদেরকে তাদের হারানো মর্যাদা পুনরায় ফিরিয়ে দিল। প্রভু ও দাস উভয় শ্রেণীকে সম্বোধন করে ইসলাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করল ঃ

بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ج (النساء : ٢٥)

—"তোমরা সবাই একই গোত্রের লোক।"-(সূরা আন নিসা ঃ ২৫)

ইসলাম স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিল ঃ যে আমাদের কোন দাসকে হত্যা করবে তাকে উহার বদলা হিসেবে হত্যা করা হবে। যে তার নাক কেটে দিবে তার নাকও কেটে দেয়া হবে। যে তাকে খাসী (বা পুরুষত্বহীন) করে দেবে তাকেও তদ্রূপ করে দেয়া হবে।"[১] উহা দাস ও মুনিবদের নিকট সমস্ত মানুষের একই উৎসস্থল, একই আবাসভূমি এবং একই প্রত্যাবর্তনস্থলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে ঃ "তোমরা সকলেই আদমের

১. বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসা'ঈ।

সন্তান এবং আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে মৃত্তিকা থেকে।"[১] ইসলাম প্রভুকে কখনো প্রভু হিসেবে মর্যাদা দেয়নি ; বরং মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দেয়ার জন্যে তাকওয়া বা আল্লাহভীতিকেই একমাত্র ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে। বলা হয়েছে ঃ "তাকওয়া ছাড়া কোন আরব কোন আজমীর চেয়ে, কোন শ্বেতাংগের চেয়ে কোন কৃষ্ণাংগ কিংবা কোন কৃষ্ণাংগের চেয়ে কোন শ্বেতাংগ মর্যাদা হাসিল করতে পারে না।"[২]

ন্যায়বিচার ভিত্তিক ব্যবহারের শিক্ষা

ইসলাম প্রভুদেরকে তাদের অধীনস্থ দাসদের সাথে ন্যায়বিচার ভিত্তিক ব্যবহারের জন্যে নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ বলেন ঃ

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ لا وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْرًا ۝

"মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার কর, আত্মীয়, ইয়াতিম ও মিসকীনদের সাথে সদাচরণ কর এবং প্রতিবেশী আত্মীয়, অপরিচিত নিকটবর্তী জন, পার্শ্ববর্তী সহচর, মুসাফির (ভ্রমণকারী) এবং তোমাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদের প্রতি এহ্সান ও বদান্যতা প্রদর্শন কর। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে পসন্দ করেন না, যে অহংকারী ও গর্বিত।"
—(সূরা আন নিসা ঃ ৩৬)

পারস্পরিক সম্পর্কের মূলভিত্তি

ইসলাম মানুষের নিকট এই সত্যও তুলে ধরেছে যে, প্রভু ও দাসের মূল সম্পর্ক মুনিব ও গোলাম কিংবা হুকুমদাতা ও হুকুম পালনকারীর সম্পর্ক নয়। বরং তা হচ্ছে ভ্রাতৃত্ব ও ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক। এ কারণেই ইসলাম প্রভুকে তার অধীনস্থ দাসীকে বিবাহ করারও অনুমতি দিয়েছে। আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ط وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ط بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ج فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ـ

---

১. মুসলিম ও আবু দাউদ।
২. আল বুখারী।

"তোমাদের ভেতর যে ব্যক্তি খান্দানী মুসলমান নারীকে বিবাহ করার সামর্থ রাখে না সে যেন তোমাদের সেই সকল দাসীদের ভেতর থেকে কাউকে বিবাহ করে নেয়—যারা তোমাদের অধীন এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী। আল্লাহ তোমাদের ঈমানের অবস্থা ভালো করেই অবগত আছেন। তোমরা সবাই একই গোত্রের লোক। সুতরাং তোমরা তাদের অভিভাবকদের অনুমতি নিয়ে তাদেরকে বিবাহ কর এবং উৎকৃষ্ট পন্থায় তাদের দেনমহর পরিশোধ কর।"—(সূরা আন নিসা ঃ ২৫)

দাসদের মানবীয় ধারণা

ইসলাম প্রভুদেরকে এই ধারণা দিতে সক্ষম হয়েছে যে, দাসরা তাদের ভাই। বিশ্বনবী (সা) বলেন ঃ "তোমাদের দাসরা তোমাদের ভাই। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যার অধীনে তার কোন ভাই থাকবে সে যেন তার জন্য সেইরূপ খাওয়া পরার ব্যবস্থা করে যেরূপ সে নিজের জন্যে করবে। এবং যে কাজ করার মত শক্তি তার নেই সে কাজ করার হুকুম যেন সে না দেয়। আর একান্তই যদি সে সেইরূপ কাজের হুকুম দেয় তাহলে সে নিজে যেন তার সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসে।"[১] এখানেই শেষ নয়। ইসলাম দাসদের আশা-আকাংখা ও অনুভূতি উপলব্ধির প্রতিও যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেছে। হযরত বিশ্বনবী (সা) বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন (দাসদের সম্বন্ধে) এরূপ না বলে যে, এ আমার দাস এবং এ আমার দাসী ; উহার পরিবর্তে বলতে হবে, ঐ আমার সেবক এবং এ আমার সেবিকা।"[২] হাদীসের এই শিক্ষা অনুযায়ীই হযরত আবু হুরাইরা (রা) যখন দেখতে পান যে, এক ব্যক্তি ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে এবং তার গোলাম তার পেছনে পায়ে হেটে যাচ্ছে, তখন তিনি ঐ ব্যক্তিকে বললেন ঃ তাকেও ঘোড়ার পিঠে তোমার পেছনে বসিয়ে দাও ; কেননা সে তোমার ভাই ; তোমার ন্যায় তারও একটি প্রাণ আছে।"

দাসদের সার্বিক কল্যাণ ও সমান অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে ইসলামের কীর্তি যেমন অমর। তেমনি সুদীর্ঘ। আরো সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে ইসলা-মের যে বৈপ্লবিক পদক্ষেপের ফলে দাসরা অভূতপূর্ব সামাজিক মর্যাদা ও সম্মানলাভ করেছে সে সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা গেল।

ইসলামী বিপ্লবের পর

ইসলাম আসার পর দাসদের জীবনে যে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয় তার ফল হলো এই যে, তারা আর বাজারের পণ্য সামগ্রী হয়ে রইল না। যথেচ্ছ

১. আল বুখারী।
২. এ হাদীসের বর্ণনাকারী ছিলেন হযরত আবু হুরাইরা (রা)।

বেচা-কেনার হাত থেকে তারা চিরতরে মুক্তি পেল এবং মানবেতিহাসের এই প্রথম বারই তারা স্বাধীন মানুষের মর্যাদা ও অধিকার লাভের সৌভাগ্য অর্জন করল। ইসলাম আসার পূর্বে তাদেরকে মানুষ বলেই গণ্য করা হতো না, বরং মানুষ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর এবং অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর এক প্রকার জীব বলে মনে করা হতো। ওদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো ঃ ওরা অন্যদের সেবা করবে এবং তাদের অত্যাচার-উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনা নীরবে সহ্য করবে। দাসদের সম্পর্কে এরূপ ন্যক্কারজনক দৃষ্টিভংগীর অনিবার্য ফল ছিল এই যে, দাসদেরকে বেধড়ক মেরে ফেলা হতো। বর্বরোচিত ও পাশবিক শাস্তির চর্চাস্থল বলে গণ্য করা হতো, চরম ঘৃণার্হ ও কঠিন কাজ করতে বাধ্য করা হতো। অথচ কারো অন্তরে তাদের জন্যে সামান্যতম দয়া বা সহানুভূতির উদ্রেক হতো না। ইসলাম দাসদেরকে এই করুণ অবস্থা থেকে উদ্ধার করে স্বাধীন মানুষদের সাথে একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে দেয়। ইসলামের এই কীর্তি কোন মুখরোচক ঘোষণামাত্র নয় বরং মানবেতিহাসের এক অমোঘ সত্য ; উহার পাতায় পাতায় ইহার সাক্ষ্য বর্তমান।

ইউরোপের সাক্ষ্য

ইউরোপের পক্ষপাত তথা ইসলাম বিদ্বেষী লেখকগণও এ সত্যকে অস্বীকার করতে পারেনি যে, ইসলামের প্রথম যুগে দাসরা এমন এক সমুন্নত সামাজিক মর্যাদা লাভ করেছিল যার নযীর বিশ্বের কোন দেশ বা জাতির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। মুসলিম সমাজব্যবস্থায় তাদেরকে এরূপ সম্মানজনক আসন দান করা হয়েছিল যে, দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পরেও কোন দাস তার পূর্ববর্তী প্রভুদের বিরুদ্ধে সামান্যতম গাদ্দারীর কথাও কল্পনা করতে পারেনি। বরং এরূপ করাকে তারা চরম ঘৃণার্হ ও জঘন্য কাজ বলে বিবেচনা করত। মুক্তিলাভের পর একদিকে যেমন পূর্ববর্তী প্রভুর পক্ষ থেকে কোন আশংকার কারণ থাকত না। অন্যদিকে তেমনি পূর্বের মত তার প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়ারও কোন হেতু অবশিষ্ট থাকত না। বরং সে তার পুরাতন প্রভুর মতই একজন স্বাধীন মানুষ বলে বিবেচিত হতো।—এরূপে স্বাধীন হওয়ার পরে সে তার প্রভু গোত্রের একজন স্বাধীন সদস্য হিসেবেই গণ্য হতো। ইসলাম প্রভু ও দাসদের মধ্যে অভিভাবকত্বের এমন এক বন্ধন প্রতিষ্ঠিত করে দিত যে মুক্তির পরবর্তী পর্যায়ে উহাকে রক্তের সম্বন্ধের চেয়ে কোন অংশেই কমশক্তিশালী বলে বিবেচনা করা যেত না।

দাসদের জান ও মানবতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন

অধিকন্তু দাসদের জানের প্রতিও এতদূর সম্মান প্রদর্শন করা হলো যে, একজন স্বাধীন মানুষের মতই তার জানকেও পরিপূর্ণ নিরাপত্তা দেয়া হলো

এবং এ নিরাপত্তার জন্যে যাবতীয় আইন-কানুনও রচনা করা হলো। এমনকি এর বিপক্ষে যে কোন ধরনের কথা ও কাজকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হলো। হযরত বিশ্বনবী (সা) মুসলমানদেরকে তাদের দাস-দাসীকে দাস বা দাসী —গোলাম ও বাঁদী বলে সম্বোধন করতে নিষেধ করে দিলেন এবং তাদেরকে এই মর্মে শিক্ষা দিলেন যে, তাদেরকে এমনভাবে ডাকতে হবে যাতে করে তাদের মানসিক দূরত্ববোধ বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং তারা নিজেদেরকে তাদের প্রভুদের পরিবারভুক্ত সদস্য মনে করতে শুরু করে। হযরত বিশ্বনবী (সা) বলেন ঃ ইহা নিশ্চিত যে, আল্লাহই তোমাদেরকে তাদের প্রভু হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকেও দাস বানিয়ে তাদের অধীনস্থ করে দিতে পারতেন।"[১] এর মর্মার্থ হলো ঃ তারা এক বিশেষ অবস্থায় ও ঘটনাচক্রে দাস হতে বাধ্য হয়েছে। কেননা মানুষ হিসেবে তাদের এবং তাদের প্রভুদের মধ্যে তো বিন্দুমাত্রও পার্থক্য নেই। ইসলাম একদিকে প্রভুদের অহেতুক অহংকারকে কমিয়ে দিয়েছে এবং অন্যদিকে দাসদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করে এক অনাবিল মানবীয় সম্পর্কের বন্ধনে তাদেরকে প্রভুদের সাথে আবদ্ধ করে দিয়েছে। ফলে প্রভু ও দাস পরস্পর ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। পারস্পরিক মৈত্রী ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পরবর্তী পর্যায়ে এই ভালোবাসাই সমস্ত মানবীয় সম্পর্কের ভিত্তি রচনা করেছে। দৈহিক নিপীড়ন বা ক্ষতি সাধনের জন্যে প্রভু ও দাস উভয়ের জন্যে একই প্রকার দণ্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে আদৌ কোন পার্থক্য কিংবা বৈশিষ্ট্যের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়নি। "যে আমাদের কোন দাসকে হত্যা করবে তাকেও হত্যা করা হবে।" —ইসলামের এই সুদূরপ্রসারী বিধান অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ইহা নিষ্কলুষ মানবীয় স্তরে প্রভু ও দাসদের মধ্যে পূর্ণাংগ সাম্য স্থাপন করতে চায় ;—উভয়ই জীবনের সকল দিক ও বিভাগে সমান অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করুক—ইহাই একমাত্র কাম্য।

দাসদের মানবীয় অধিকার

ইসলামী শিক্ষার ফলে এই সত্যটিও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, দাস থাকা অবস্থায়ও কোন দাসকে তার মানবীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে হয় না। ইসলামী শরীয়াতের এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা শুধু দাসদের জান ও ইজ্জতের নিরাপত্তার জন্যেই যথেষ্ট ছিল না, বরং ইহা এতদূর উদার ও ভদ্রতাপূর্ণ ছিল যে, ইসলামের পূর্বাপর কোন ইতিহাসেই এর নযীর খুঁজে পাওয়া যায় না। এই পর্যায়ে ইসলাম এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে যে, কোন দাসের চেহারার উপর চড় মারাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শুধু আদব শিক্ষা দেয়ার জন্যে যে চড় মারার

১. এহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীন—ইমাম গাজ্জালী (র)।

অনুমতি দেয়া হয়েছে তার জন্যেও সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন বিধিবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। যাতে করে কোন প্রভু শাস্তি দেয়ার ক্ষেত্রেও বৈধ সীমালংঘন করতে না পারে। প্রকৃতপক্ষে শিশুদের দুষ্টামি বন্ধ করার জন্যে বড়রা যে ধরনের শাস্তি দিয়ে থাকে তার চেয়ে কঠিন শাস্তি দাসদের জন্যে কখনো বৈধ করা হয়নি। আর এই ধরনের শাস্তিও ইসলামের বিপ্লবোত্তর যুগে দাসদের মুক্তির জন্যে আ-ইনগত ভিত্তি বলে বিবেচিত হয় এবং তারা মুক্তিলাভের ন্যায্য অধিকার লাভে সমর্থ হয়। বস্তুত এ-ই ছিল দাস মুক্তির সর্বপ্রথম পর্যায়। এখন আসুন, তাদের মুক্তিলাভের পরবর্তী বিভিন্ন পর্যায় তথা পূর্ণাংগ স্বাধীনতার প্রতি একবার দৃকপাত করি।

স্বাধীনতার প্রথম পর্যায়

প্রথম পর্যায়ে ইসলাম দাসদেরকে মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা দান করেছে। তাদের অতীতের মানবীয় মর্যাদা পুনরুদ্ধার করে দিয়েছে এবং স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, একই যৌথ মানবতার সূত্রে গ্রথিত বলে সকল দাসই তাদের প্রভুদের ন্যায় একই মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী ঃ স্বাধীনতার গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়ে তারা মানবতাকে কোন দিন হারায়নি এবং প্রাকৃতিক বা জন্মগত কোন দুর্বলতারও শিকার হয়নি। বরং কিছু বাহ্যিক অবস্থা ও পরিবেশের কারণেই তাদের স্বাধীনতাকে হরণ করা হয়েছিল এবং যাবতীয় সামাজিক কর্মকাণ্ডের পথ তাদের জন্যে রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছিল। এই বাহ্যিক অবস্থা—তথা দাসত্বকে বাদ দিলে তারা অন্যান্য লোকদের মতই মানুষ ; এবং মানুষ হিসেবে তাদের প্রভুদের ন্যায় তারা, যাবতীয় মানবীয় অধিকার লাভের উপযুক্ত।

পূর্ণাংগ স্বাধীনতার পথ

কিন্তু ইসলাম এতটুকু করেই ক্ষান্ত হয়নি। কেননা অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে মানুষের পূর্ণাংগ সমতা বিধান। এ নীতির দাবীই হলো ঃ বিশ্বের সমস্ত মানুষ সমান এবং স্বাধীন মানুষ হিসেবে মানবীয় অধিকার লাভের ক্ষেত্রেও সবাই সমান। এ জন্যেই ইসলাম দাসদেরকে পুরোপুরি স্বাধীন করে দেয়ার উদ্দেশ্যে দু'টি কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রথমটি হলো সরাসরি মুক্তিদান (বা 'ইতক্) অর্থাৎ প্রভুদের পক্ষ থেকে দাসদেরকে স্বেচ্ছায় মুক্তি প্রদান করা। এবং দ্বিতীয়টি হলো মুক্তির লিখিত চুক্তি (বা মুকাতাবাত) অর্থাৎ প্রভু ও দাসের মধ্যে মুক্তিদানের লিখিত চুক্তি সম্পাদন।

সরাসরি মুক্তিদান

সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন মুনিব কর্তৃক তার কোন দাসকে দাসত্বের যাবতীয় বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেয়াকে ইসলামের পরিভাষায় ইত্ক

(বা মুক্তিদান) বলা হয়। ইসলাম এই পদ্ধতিটিকে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে কার্যকরী করে তোলে। হযরত বিশ্বনবী (সা)-ও এই ক্ষেত্র তাঁর অনুসারীদের সামনে সর্বোত্তম নমুনা উপস্থাপিত করেন। তিনি নিজেই তার সমস্ত দাস চিরতরে মুক্ত করে দেন। তাঁর সাহাবীবৃন্দও তার অনুসরণ করে নিজ নিজ দাসদেরকে আযাদ করে দেন। হযরত আবু বকর (রা) তো তার ধন-সম্পত্তির এক বিরাট অংশ ব্যয় করে কাফের প্রভুদের নিকট থেকে তাদের দাসদেরকে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন। এমনকি দাস ক্রয় করে মুক্ত করে দেয়ার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের বায়তুলমালে একটি নির্দিষ্ট অংশ বরাদ্দ করে রাখা হতো। হযরত ইয়াহইয়া (রা) বলেন ঃ খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজীজ (রা) একবার আমাকে যাকাত ইত্যাদি আদায় করার জন্যে আফ্রিকা প্রেরণ করেন। আমি যাকাত ও সাদকা সংগ্রহ করে উহা বিতরণ করার জন্যে উহার হকদার তালাশ করতে শুরু করলাম। কিন্তু যাকাত-সাদকার অর্থ গ্রহণ করার কোন ব্যক্তিকেই খুঁজে পেলাম না। কেননা হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ (রা) সমস্ত মানুষকেই সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। অতপর আমি উক্ত অর্থ দ্বারা একজন দাস খরিদ করলাম এবং তাকে আযাদ করে দিলাম।"

গোনাহর কাফ্ফারা

হযরত বিশ্বনবী (সা) একটি নিয়ম করে দিয়েছিলেন যে, যদি কোন দাস দশজন মুসলমানকে লেখাপড়া শেখাত কিংবা মুসলিম সমাজের এই ধরনের কোন সেবায় শরীক হতো তাহলে তিনি তাকে আযাদ করে দিতেন। অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআনে কিছু কিছু গোনাহর কাফ্ফারা স্বরূপ দাস মুক্তির নির্দেশ দেয়া হয়েছে। স্বয়ং হযরত বিশ্বনবী (সা)-ও তাঁর উম্মতদেরকে বলেছেন যে, কতক গোনাহর কাফ্ফারা হচ্ছে গোলামদেরকে আযাদ করে দেয়া। ফলে অসংখ্য গোলাম আযাদী লাভ করে ধন্য হয়। কেননা গোনাহ ছাড়া কোন মানুষ নেই ; কাজেই বহু মানুষই স্ব স্ব গোনাহর কাফ্ফারার জন্যে গোলামদেরকে আযাদ করে দেয়। স্বয়ং হযরত বিশ্বনবী (সা) এরশাদ করেন ঃ "বনী আদমের মধ্যে কোন ব্যক্তিই গোনাহ থেকে মুক্ত নয়।" এই পর্যায়ে কোন মু'মিন কর্তৃক কাউকে ভুল করে মেরে ফেলার দৃষ্টান্ত পেশ করা যেতে পারে এবং এই দৃষ্টান্তই দাস মুক্তি সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভংগি সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট হয়ে উঠে। ইসলামে কোন মু'মিন ভুলবশত কাউকে মেরে ফেললে তার কাফ্ফারা হিসেবে কোন মু'মিন গোলামকে আযাদ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসদের জন্যে রক্তপণ নির্ধারণ করা হয়েছে। এই প্রসংগে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ اِلَىٰٓ اَهْلِهٖٓ

"এবং যে ব্যক্তি কোন মু'মিনকে ভুলবশত হত্যা করে তার কাফ্‌ফারা হলো এই যে, একজন মু'মিন দাসকে মুক্ত করে দেবে এবং নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসদেরকে রক্তপণ প্রদান করবে।"—(সূরা আন নিসা ঃ ৯২)

মু'মিনের হত্যা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভংগি

একজন মু'মিনকে কেউ ভুলক্রমে হত্যা করলেও হত্যাকারীকে আইনগত দণ্ড না দেয়া পর্যন্ত তাকে সামাজিক কর্মকাণ্ড থেকে বঞ্চিত করাই হলো ইসলামের স্পষ্ট বিধান। এ কারণেই হত্যাকারীর জন্যে হুকুম হলো ঃ নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস ও সমাজের অধিকারকে যে ক্ষুণ্ন করা হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ তাকে দিতে হবে ;—ওয়ারিসদেরকে দিতে হবে রক্তপণ হিসেবে যুক্তিসংগত পরিমাণ অর্থ এবং সমাজকে দিতে হবে একজন ব্যক্তি—সদ্য মুক্ত একজন গোলাম, যাতে করে সে নিহত ব্যক্তির শূন্যতা পূরণ করতে সক্ষম হয়। অন্য কথায় ইসলামের দৃষ্টিতে নিহত ব্যক্তির হত্যার পর একজন দাসকে মুক্তি দেয়ার অর্থই হলো সে স্থলে আর একজন ব্যক্তিকে জীবিত করা। হত্যাকারী তো একজন মানুষকে ধ্বংস করে তার খেদমত থেকে গোটা সমাজকে বঞ্চিত করেছিল। কিন্তু উহার কাফ্‌ফারা বা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সে যখন একজন গোলামকে আযাদ করে দিল তখন সমাজ আর একজন সেবক লাভ করল। বস্তুত দাসদের কল্যাণের জন্যে এতদূর ব্যাপক ভূমিকা নেয়ার পরেও ইসলামের দৃষ্টিতে দাসত্ব যেন মৃত্যুরই নামান্তর। আর এ কারণেই ইসলাম বাস্তব জীবনের সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে এই পতিত দাসদেরকে পুনরুত্থান ও চিরমুক্তির জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার কাজ অব্যাহত রেখেছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় ঃ 'সরাসরি মুক্তিদান' (বা 'ইত্‌ক) পদ্ধতির মাধ্যমে এত বিরাট সংখ্যক দাস স্বাধীনতা লাভ করে যে, উহার নযীর কোন প্রাচীন বা আধুনিক জাতির ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। এখানে ইহাও লক্ষণীয় যে, মুসলমানগণ এত বিরাট সংখ্যক দাসকে কোন পার্থিব স্বার্থে মুক্ত করে দেয়নি, বরং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যেই তারা এই কাজ সম্পন্ন করেছে।

মুক্তির লিখিত চুক্তি

ইসলামী বিধানে দাস স্বাধীন করে দেয়ার দ্বিতীয় পদ্ধতি ছিল 'মুকাতাবাত' অর্থাৎ লেখাপড়ার পদ্ধতি। যদি কোন দাস তার প্রভুর নিকট মুক্তিলাভের দাবী করত তাহলে মুকাতাবাতের এই পদ্ধতি অনুযায়ী নির্ধারিত অর্থলাভের পরিবর্তে সেই দাসকে মুক্তি দেয়া প্রভুর জন্য অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে পড়ত। প্রভু ও দাস উভয়ে এই অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করে নিত। এ বিষয়ের লিখিত চুক্তিকেই বলা হতো 'মুকাতাবাত'। এই চুক্তি অনুসারে দাস যখন উপরোক্ত অর্থ পরিশোধ করে দিত তখন তাকে আযাদ করা ছাড়া প্রভুর কোন উপায়

থাকত না। কোন প্রভু মুক্তি দিতে না চাইলে দাস আদালতে বিচারের প্রার্থনা করত। আদালত উক্ত অর্থ আদায় করে দাসের নিকট মুক্তিপত্র প্রদান করত।

যে সকল দাস নিজ নিজ প্রভুর সুমতি, বদান্যতা ও তাকওয়ার উপর ভরসা করে কবে কখন ভাগ্যক্রমে তার দাসত্বের বন্ধন খুলে যাবে—এই অপেক্ষায় না থেকে কিছু অর্থের বিনিময়ে স্বাধীনতা লাভ করতে পারত তাদের সকলের জন্যেই ইসলাম এই পদ্ধতির মাধ্যমে স্বাধীনতার দ্বার উন্মুক্ত করে দিল।

ইসলামী সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা

কোন দাস যখন চুক্তির মাধ্যমে আযাদ হওয়ার আবেদন করত তখন তার প্রভু যে শুধু উক্ত আবেদন প্রত্যাখ্যান করতে অসমর্থ ছিল তাই নয়। বরং সে দাসকে এতটুকু দুশ্চিন্তাও করতে হতো না যে, তার প্রভু কোন প্রতিশোধমূলক বা অমানবিক ব্যবহর শুরু করতে পারে। কেননা স্বয়ং ইসলামী সরকারই হতো তার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। এ কারণে মুকাতাবাতের চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর মুনিবকেই তার দাসকে তার খেদমতের বিনিময়ে বাধ্যতামূলকভাবে কিছু পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করে দিতে হতো যাতে করে সে চুক্তির অর্থ সংগ্রহ করতে পারে। মুনিব এতে সম্মত না হলে দাসকে এতটুকু সময় ও সুযোগ অবশ্যই দিতে হতো যাতে করে সে অন্য কারুর কাজ করে উক্ত অর্থ উপার্জনের সুযোগ পেতে পারে এবং ঐ অর্থ দিয়ে মুক্তিলাভ করতে পারে। ঠিক এই অবস্থাই চতুর্দশ শতাব্দীতে—অর্থাৎ বহু শতাব্দী পরে ইউরোপে সৃষ্টি হয়েছিল। অথচ উহার বহু পূর্বেই ইসলাম এই দাস প্রথা নির্মূলের কাজ পুরোপুরিই সমাধা করে দিয়েছিলো।

সরকারী কোষাগার থেকে সাহায্য প্রদান

এই পর্যায়ে ইসলামী রাষ্ট্র আরো একটি এমন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল যার কোন তুলনা মানবেহিতাসে নেই। সেটি হলো রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে মুক্তিপ্রার্থী দাসের জন্যে আর্থিক সাহায্য প্রদান। দাস প্রথা বিলুপ্ত করার জন্যে ইসলাম যে কতদূর দৃঢ়সংকল্প ও তৎপর তার বাস্তব প্রমাণ এখানেও বিদ্যমান। আর এই সাহায্য প্রদানের মূলে কোন পার্থিব স্বার্থও নিহিতি নেই ; বরং এর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো প্রভু পরোয়ারদেগার ও মহান মালিকের সন্তুষ্টি অর্জন। মানুষ যাতে করে পুরোপুরিভাবেই একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করার সুযোগ লাভ করতে পারে ইসলাম সে জন্যেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যাকাতের হকদার প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا .... وَفِى الرِّقَابِ

"যাবতীয় সাদকা কেবল দরিদ্র, অভাবী এবং উহার আদায়কারী কর্মীদের জন্যে ------------ এবং দাসদের মুক্ত করার জন্যে।"

—(সূরা আত তাওবা ঃ ৬০)

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, যে সকল দাস নিজেদের অর্জিত অর্থ দ্বারা মুক্তি লাভ করতে অক্ষম তাদেরকে যাকাতের তহবিল থেকে সাহায্য করতে হবে।

দু'টি বৈপ্লবিক নীতি

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় 'ইত্ক' ও 'মুকাতাবাত'—নিঃশর্ত মুক্তি ও অর্থের বিনিময়ে মুক্তি দাস প্রথার ভয়াল ইতিহাসের যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে অবশিষ্ট দুনিয়ার সে পর্যন্ত পৌঁছাতে অন্ততঃপক্ষে সাত শ' বছর অতিবাহিত হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, ইসলাম দাসদের অনুকূলে সর্বাত্মক হেফাযত ও পৃষ্ঠপোষকতার ব্যবস্থা করে সমগ্র দুনিয়াকে সমুন্নত করার যে পরিকল্পনা দিয়েছে তার ধারণা প্রাচীনকাল তো দূরের কথা আধুনিক যুগের কোন ইতিহাসেও বর্তমান নেই। ইসলাম মানুষকে দাসদের সাথে যে মহত্ত্ব উদারতা ও মহানুভবতা প্রদর্শনের শিক্ষা দিয়েছে এবং কোন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক চাপ কিংবা কোনরূপ লোভ-লালসা ছাড়াই দাসদেরকে স্বেচ্ছায় মুক্তি প্রদানের অদম্য প্রেরণার সৃষ্টি করেছে তার কোন নযীর মানবেতিহাসে নেই। পরবর্তীকালে ইউরোপে দাসরা যে স্বাধীনতা লাভ করেছে তাতে তারা ততটুকু সামাজিক মর্যাদাও লাভ করতে পারেনি যতটুকু ইসলামী সমাজে দেয়া হয়েছিল বহু শতাব্দী পূর্বে।

সমাজতান্ত্রিক বিভ্রান্তির স্বরূপ

উপরোক্ত ঐতিহাসিক সত্য কমিউনিষ্টদের ভ্রান্ত মতাদর্শ 'দ্বান্দ্বিক জড়বাদ' (Dialectcal Materialism)-কে খণ্ডন করার জন্যে যথেষ্ট। এ জড়বাদের মূল কথা ছিল ঃ ইসলাম মানবেতিহাসের একটি বিশেষ যুগের অর্থনৈতিক অবস্থা ও পরিবেশের ফসল। দ্বান্দ্বিক জড়বাদের অনুসরণে উহাই ছিল তৎকালীন অর্থনৈতিক ও বস্তুগত ঘটনাবলীর নিখুঁত দর্পণ। কিন্তু পরবর্তীকালের অধিকতর উন্নত অর্থনৈতিক পরিবেশে উহা অচল হয়ে যায়।

ইসলাম সমাজতন্ত্রীদের এই মিথ্যা ধূম্রজালকে একেবারেই ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে ; বরং একথাও বলা যেতে পারে যে, স্বয়ং ইসলামই তাদের মিথ্যা প্রতারণার অকাট্য প্রতিবাদ। ইসলাম আরব উপদ্বীপের ভেতরে ও বাইরে যে অপ্রতিরোধ্য শক্তি ও প্রভাব বিস্তার করেছে তাতে ইহা নিসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, কালমার্কসের মতাদর্শ সম্পূর্ণরূপেই ভুল। দাসদের সাথে ব্যবহার

কিংবা জীবনের অন্যান্য সমস্যার সমাধানের কথা হোক, সম্পদের বন্টন কিংবা নেতা ও অধীনস্ত তথা মুনিব ও কর্মচারীর পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ই হোক —প্রতি ক্ষেত্রেই ইসলামের বৈশিষ্ট্য সমুজ্জল। ইসলাম উহার সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমগ্র কাঠামোকে এমন এক স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আনুগত্যের ভিত্তিতে নির্মাণ করেছে যে, বিশ্বের সমাজব্যবস্থার ইতিহাসে আজও উহা একক এবং সর্বোচ্চ আসনের অধিকারী।

একটি প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ঃ এই প্রসংগে অনেকেই প্রশ্ন করতে পারে যে, যে ইসলাম দাসদের মুক্তির জন্যে এতদূর অগ্রসর, যা—তাদের মুক্তির জন্যে কোন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি না করেই শুধু আভ্যন্তরীণ প্রচেষ্টার মাধ্যমে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সৃষ্টি করতে সক্ষম তা উহার চূড়ান্ত পদক্ষেপ হিসেবে কেন এই প্রথাকে চিরতরে নিষিদ্ধ করে দেয়নি ? এরূপ করা হলে সমগ্র মানবজাতিই ইহার অপরিসীম কল্যাণ ও বরকত থেকে উপকৃত হতে পারত এবং একথাও চিরকালের জন্যে প্রমাণিত হতো যে, ইসলাম সত্যিই একটি পূর্ণাংগ জীবনবিধান। যে আল্লাহ বনী আদমকে আশরাফুল মাখলুকাত করে সৃষ্টি করেছেন তিনিই তাদের পথপ্রদর্শনের জন্যে এই জীবনবিধান অবতীর্ণ করেছেন।

উত্তর ঃ এর উত্তর জানার পূর্বে দাস প্রথার কারণে যে নানা প্রকার সামাজিক, মনস্তাত্বিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রতি দৃকপাত করা প্রয়োজন। কেননা উক্ত পরিবেশ ও সমস্যার কারণেই ইসলাম দাস প্রথার উপর সর্বশেষ আঘাত দিতে অগ্রসর হয়নি। বরং পরবর্তী কিছুকালের জন্যে ইহাকে বিলম্বিত করে দিয়েছে। বিষয়টির এই দিকের সমীক্ষণের জন্যে আমাদের একথাও মনে রাখতে হবে যে, দাস প্রথার পরিপূর্ণ বিলম্বিত ক্ষেত্রে যতটুকু বিলম্ব ঘটেছে উহা ইসলামের কাম্য ছিল না এবং ইসলামের অনাবিল প্রকৃতির পক্ষে উহা সম্ভবপরও ছিল না। এই বিলম্বের কারণ ছিল ভিন্নতর। পরবর্তী সময়ে বিভ্রান্তি ও বিমুখতার যে ঝোঁকপ্রবণতা ইসলামের অনাবিল উৎসকে ম্লান করে দিয়েছে তা-ই ছিল বিলম্বের একমাত্র কারণ।

দাসপ্রথার প্রকৃত ঐতিহাসিক পটভূমি

ইসলামের যখন আগমন ঘটে তখন এই দাসপ্রথার প্রচলন ছিল সমস্ত দুনিয়ায়। এবং এটা ছিল তৎকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার এক অবিচ্ছেদ্য অংগ। মানবীয় জীবনের জন্যে এটা ছিল অপরিহার্য। সুতরাং এই অবস্থার আমূল পরিবর্তন তথা দাসপ্রথাকে চিরতরে বন্ধ করার জন্যে এক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হওয়াই ছিল এক বিজ্ঞজনোচিত

কাজ। দীর্ঘমেয়াদ ও পর্যায়ক্রমের এই নীতি ইসলামের অন্যান্য বিধান কার্যকরী করার ক্ষেত্রেও অবলম্বন করা হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, মদ্যপানকে হঠাৎ করে একেবারেই পুরোপুরিভাবে নিষিদ্ধ করা হয়নি। বরং সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করার পূর্বে বহু বছর ধরে উহার বিপক্ষে মানুষের মন-মানসিকতা তৈরী করা হয়েছে।—যদিও এটা ছিল একটি ব্যক্তিগত অপরাধ এবং সেই জাহেলিয়াতের যুগে আরবে এমন লোকও বর্তমান ছিল যারা মদ্যপানকে অভদ্রোচিত কাজ মনে করে উহা কখনো স্পর্শ করত না। কিন্তু দাসপ্রথা সম্পর্কে আরবদের দৃষ্টিভংগি ছিল সম্পূর্ণ অন্যরূপ। তৎকালীন সমাজ কাঠামো এবং প্রচলিত মন-মানসিকতায় এর শিকড় ছিল অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত। কেননা ব্যক্তিগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের অসংখ্য কর্মকাণ্ডই এর সাথে সম্পর্কিত ছিল। বস্তুত দাসপ্রথার ভালো-মন্দ সম্পর্কে কারুর কোন লক্ষ্যই ছিল না। একমাত্র এ কারণেই এই প্রথার পুরোপুরি বিলুপ্তির জন্যে হযরত বিশ্বনবী (সা)-এর পবিত্র জীবন তথা পবিত্র কুরআনের অবতরণ শেষ হওয়ার পর থেকে আরো দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন ছিল। অতপর যথাসময়েই এই প্রথা বিলুপ্ত হয়ে যায়। আল্লাহ—যিনি সমগ্র সৃষ্টির একমাত্র স্রষ্টা এবং যিনি উহার স্বভাব প্রকৃতি সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল তিনি—খুব ভালোরূপেই জ্ঞাত আছেন যে, মদ্যপান নিষিদ্ধ করার লক্ষ্য কয়েক বছরের মধ্যেই কেবল মৌখিক নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। তাই তিনি যথাসময়েই উহাকে হারাম (বা নিষিদ্ধ) বলে ঘোষণা করেন। অনুরূপভাবে অচিরেই যদি দাসপ্রথাকে নিষিদ্ধ করা সময়োপযোগী হত তাহলে তিনি সাধারণভাবে কিছু উপদেশ দান করেই উহার অপকারিতা সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করে দিতেন এবং স্বীয় নীতি অনুযায়ী কোনরূপ বিলম্ব না করেই সুস্পষ্ট বিধান দিয়ে উহাকে চিরদিনের জন্যে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করতেন। কিন্তু অবস্থা অনুকূলে ছিল না বলেই তিনি তা করেননি।[১]

ইসলামের কর্মপদ্ধতি

আমরা যখন বলি যে, ইসলাম সমগ্র মানবজাতির জীবনপদ্ধতি এবং সকল যুগের সকল মানুষই উহার বিধান অনুসরণ করে এক পূতপবিত্র জীবনের সমস্ত

১. মদ্যপান ও দাসপ্রথার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। মদ্যপান কোন যুগেই মানুষের জন্যে অপরিহার্য প্রয়োজন বলে পরিগণিত হয়নি। উহা একটি অন্যায় কাজ। কিন্তু উহাকে বর্জন করলে ব্যক্তি বা সমাজ জীবনে কোন শূন্যতার সৃষ্টি হয় না। অথচ ইসলামের আবির্ভাবের যুগে দাসপ্রথা ছিল একটি অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজন। উহাকে হঠাৎ করে নিষিদ্ধ করে দিলে এমন এক শূন্যতার সৃষ্টি হতো যার ফলে অসংখ্য সংকট ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি হতো। ইসলাম তাই উহার বিলুপ্তির জন্যে এমন উপায় অবলম্বন করেছে যার ফলে উহার ধ্বংসাত্মক প্রভাব থেকেও মানুষ মুক্তি লাভ করেছে এবং সমাজেও কোন শূন্যতার সৃষ্টি হয়নি।(—অনুবাদক)

নিখুঁত ও সর্বাধিক কার্যকর নিয়ম-নীতির সাথে পরিচিত হতে পারে, তখন আমরা এই অর্থে বলি না যে, ইসলাম এমন একটি নিরেট জীবনব্যবস্থা যে চিরকালের জন্যে উহার শাখা-প্রশাখা বা খুঁটিনাটি বিষয়গুলো কী হবে তাও পূর্ব থেকেই নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। কেননা এই ধরনের বিস্তৃত দিকনির্দেশনা উহা শুধু মানুষের মৌলিক সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রেই দান করেছে ; ইতিহাসের উত্থান পতনের সাথে উহার কোন সম্পর্ক নেই। স্থান-কাল নির্বিশেষে উহা একই রূপ বর্তমান। উহার বাইরের সমস্যাগুলো পরিবর্তনশীল। সে ক্ষেত্রে ইসলাম এমন কিছু মূলনীতি পেশ করেই ক্ষ্যান্ত হয়েছে যাতে করে উহার আলোকে জীবনের উৎকর্ষ ও ক্রমবিকাশ বিন্দুমাত্রও বাধাগ্রস্ত না হয়।

ইসলাম দাসপ্রথা বিলোপের ক্ষেত্রে এই মূলনীতিই অবলম্বন করেছে। উহা দাসদের মুক্তির জন্যে শুধু যে 'ইত্‌ক' ও 'মুকাতাবাত' পদ্ধতি গ্রহণ করেছে তাই নয় বরং অতি প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা এই অবহেলিত মানবীয় সমস্যাটির একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্থায়ী সমাধানের পথও উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

মানবীয় প্রকৃতি ও ইসলাম

ইসলাম মানবীয় প্রকৃতিকে পরিবর্তন করার জন্যে আসেনি, এসেছে উহাকে পরিমার্জিত ও সুন্দর করে তোলার জন্যে। ইসলাম চায়, স্বীয় সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এবং বাইরের কোন চাপ ছাড়াই উহা যেন মানবতার শীর্ষ শিখরে উপনীত হতে পারে। বস্তুত ব্যক্তি জীবনে ইসলাম যে বিপ্লব সৃষ্টি করেছে—যে উৎকর্ষ ও সমৃদ্ধি এনেছে তার কোন তুলনা নেই ; অনুরূপভাবে মানুষের সমষ্টিগত জীবনে—তথা তাদের তাহজীব ও তামাদ্দুনের ক্ষেত্রে যে গৌরবময় অধ্যায় রচনা করেছে তারও কোন নযীর বিশ্ব ইতিহাসে নেই। কিন্তু এই সুমহান ও সর্বাত্মক সাফল্য লাভ সত্ত্বেও ইসলাম কখনো ইহা চায়নি যে, মানুষের মূল স্বভাব ও প্রকৃতিকে পরিবর্তন করে দিয়ে এমন এক দৃষ্টান্তমূলক শীর্ষে পৌছিয়ে দিবে যেখানে পরবর্তী ও বর্তমান মানবগোষ্ঠী বাস্তব ক্ষেত্রে কস্মিনকালেও পৌছতে সক্ষম হবে না। কেননা এমনটি হলে আল্লাহ তা'আলা এই জগতে মানুষকে নয়, বরং ফেরেশতাকেই সৃষ্টি করতেন এবং এমন আইন-কানুন দান করতেন যা কেবল ফেরেশতারাই মেনে চলতে সক্ষম হত। ফেরেশতাদের প্রকৃতি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ○

"তাদেরকে যে আদেশ দেয়া হয় তাতে তারা আল্লাহর (সামান্য মাত্রও) নাফরমানি করে না ; তাদেরকে যা আদেশ করা হয় তা তারা সাথে সাথেই পালন করে।"—(সূরা আত তাহরীম ঃ ৬)

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মানুষকে ফেরেশতা বানাতে চাননি ; চেয়েছেন ভালো মানুষ বানাতে। কেননা দুনিয়ার জন্যে তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষের যোগ্যতা ও গুণাবলী সম্পর্কে পুরোপুরিই অবগত ছিলেন এবং ইহাও তিনি অবগত ছিলেন যে, তাদের প্রকৃতিগত যোগ্যতা ও বৃত্তিসমূহের সর্বাত্মক উৎকর্ষের জন্যে কতখানি সময়ের প্রয়োজন—যাতে করে তার দেয়া আইন-কানুনসমূহ হৃদয়ঙ্গম করতঃ যথাযথরূপে মেনে চলতে পারে। সে যাইহোক, ইসলামের একচ্ছত্র গৌরব এবং একক শ্রেষ্ঠত্বকে প্রমাণ করার জন্য এই একটি বিষয়ই যথেষ্ট যে, মানবেতিহাসে উহাই সর্বপ্রথম দাসপ্রথার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠতম কণ্ঠে আওয়াজ তুলেছে এবং তাদের স্বাধীনতার এমন এক সর্বাত্মক আন্দোলন সৃষ্টি করেছে যার তুলনা দুনিয়ার অন্য কোন দেশে দীর্ঘ সাত শ' বছরেও খুঁজে পাওয়া যায় না। সাত শ' বছরে ঐ সকল দেশ এই আন্দোলনকে স্বাগত জানিয়ে স্ব স্ব এলাকার দাসমুক্তির জন্যে এগিয়ে এসেছে। বস্তুত আরব উপদ্বীপ থেকে যখন সাত শ' বছর পূর্বেই এই প্রথাকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করে দেয়া হয়েছিল তখন একথা সহজেই অনুমান করা যায় যে, অন্য যে কারণে এই প্রথাটি শতাব্দীর পর শতাব্দীকাল ধরে মূর্তিমান অভিশাপ হয়ে সমগ্র দুনিয়াকে গ্রাস করে রেখেছিল তা অবশিষ্ট না থাকলে ইসলাম আরব উপদ্বীপের ন্যায় উহার প্রভাবিত সমস্ত ভূখণ্ড থেকেই উহাকে নির্মূল করতে সক্ষম হতো। কিন্তু উক্ত কারণটি বিরাজমান থাকার ফলেই ইসলামের পক্ষে ইহা সম্ভবপর হয়নি। কেননা উহার সাথে মুসলমানগণ যেমন সম্পর্কিত ছিল তেমনি সম্পর্কিত ছিল অমুসলমানরাও। অথচ অমুসলমানদের উপর ইসলামের কোন আধিপত্য ছিল না। এ কারণেই তখন দাস প্রথার পরিপূর্ণ বিলুপ্তি সম্ভবপর হয়নি। উক্ত কারণটি ছিল যুদ্ধ ও উহার অনিবার্য ফলশ্রুতি। এই যুদ্ধই ছিল সে যুগের দাসপ্রথার সবচেয়ে বড় উৎস। আরো কিছুদূর অগ্রসর হয়ে এ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব।

স্বাধীনতার অপরিহার্য শর্ত

দাসপ্রথা সম্পর্কে আলোচনা করার সময়ে একথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, স্বাধীনতা কোন স্থান থেকে দান হিসেবে পাওয়া যায় না। বরং বাহুবল বা শক্তির জোরেই উহাকে অর্জন করতে হয়। কোন আইন রচনা করলে কিংবা কোন ফরমান জারি করলেই শত শত বছরের পুরানো দাসরা আপনা আপনিই স্বাধীন হয়ে যেতে পারে না। আমেরিকাবাসীদের এই পর্যায়ের অভিজ্ঞতা এই সত্যটির এক স্পষ্ট দর্পণ। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন কলমের এক খোঁচায় সে দেশের দাসদের স্বাধীনতার ফরমান জারি করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে কি শত শত বছরের দাস সত্যিই কি স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল ?—না, হয়নি। কেননা মানসিক ও আত্মিক দিক থেকে তারা এই স্বাধীনতার জন্যে প্রস্তুতই হতে পারেনি। এবং পারেনি বলেই তখনও এরূপ দৃশ্য দেখা গেছে যে,

আইনগতভাবে স্বাধীন হওয়ার পরেও তারা পূর্ববর্তী প্রভুদের নিকট যাচ্ছে এবং তাদের অনুরোধ করছে যে, তারা যেন তাদেরকে ঘর থেকে বের করে না দেন বরং আগের মতই দাস বানিয়ে রেখে দেন।

দাসদের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা

মানবীয় মনস্তত্ত্বের আলোকে এই বিষয়টির বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ঃ বাহ্যদৃষ্টিতে অস্বাভাবিক ও বিস্ময়কর মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি ততদূর বিস্ময়কর নয়। প্রত্যেক মানুষের জীবনই কিছুসংখ্যক নির্ধারিত অভ্যাস ও কর্মতৎপরতার সমষ্টি মাত্র। যে পরিবেশ ও অবস্থাসমূহের মধ্যে তার জীবন অতিবাহিত হয় উহা তার যাবতীয় ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাধারা—বরং তার গোটা মনস্তাত্ত্বিক ভাবধারাকেই প্রভাবিত করে।[১] এ কারণেই একজন দাসের মনস্তাত্ত্বিক গঠনপ্রক্রিয়া ও প্রকৃতি একজন স্বাধীন মানুষের মানসিক ও বাস্তব দৃষ্টিভংগি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। কিন্তু প্রাচীন যুগের লোকদের এই ধারণা কখনো সঠিক নয় যে, স্বাধীন ব্যক্তি ও দাসের মন-মানসিকতা ও চিন্তাধারার এই পার্থক্য মানুষের মৌলিক পার্থক্য ও মতভেদের ফসল মাত্র। বরং এই পার্থক্যের মূল কারণ হচ্ছে, স্থায়ী দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থেকে থেকে দাসের মনস্তাত্ত্বিক জীবনে একটি বিশেষ মেজাজের সৃষ্টি হয়। এতে করে সদাসর্বদাই আনুগত্য ও ফরমাবরদারির এক নিষ্প্রশ্ন স্বভাব তাকে প্রতিনিয়তই আচ্ছন্ন করে বসে ; উহার বাইরে কিছু কল্পনা করার ইচ্ছা বা শক্তিও সে হারিয়ে ফেলে। স্বাধীনতা বা স্বেচ্ছা প্রণোদিতভাবে কোন দায়িত্ব পালনের অনুভূতি বলতে তার কিছুই থাকে না। সমাজ ও রাষ্ট্রের কোন স্বাধীন ও দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসেবে যথাযথভাবে নিজ দায়িত্ব পালনের কোন ক্ষমতা তার থাকে না। সে যেমন নিজ থেকে স্বাধীনভাবে কোন কিছু চিন্তা করতে পারে না। তেমনি সাহসী হয়ে কোন কাজের বাস্তব পদক্ষেপও গ্রহণ করতে পারে না। বরং স্বাধীনতালাভের পর একজন স্বাধীন মানুষ যে সকল দায়িত্বপালনে সক্ষম হয় তা পালন করার যাবতীয় দায়িত্বই সে হারিয়ে বসে।

দাসদের জীবন

একজন দাস কেবল তখনই তার কাজ সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে পারে যখন তাকে কিছু ভাবতে না হয়। বরং তার কাজ মুনিবের হুকুম তামিল করা

---

১. জড়বাদীদের মতে মানুষের চিন্তাধারা বস্তুগত অবস্থার ফসলমাত্র। কিন্তু তাদের এ দাবী একটি ভ্রান্ত গোলক ধাঁধা বই অন্য কিছুই নয়। প্রকৃত ঘটনা এই যে, বস্তুগত ঘটনাবলী কেবল তখনই সম্পন্ন হয় যখন জীবনে পূর্ব থেকেই উহার জন্য এক মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি রচিত হয়। বাস্তব ঘটনাবলীর প্রভাব মানুষের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করে—একথা ঠিক ; কিন্তু ইহা কখনো ঠিক নয় যে, চিন্তাধারা ও মতাদর্শ বাস্তব ঘটনারই অনিবার্য ফল।

পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে। এ কারণে যদি কখনো তাকে নিজের ফায়সালা অনুসারে কাজ করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয় তাহলে সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে ; সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা তার বিলুপ্ত হয়ে যায়। সে জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যাপারেও স্বীয় কর্তব্য নির্ধারণ কিংবা উহার ফলাফলের সম্মুখীন হওয়ার সাহস সঞ্চয় করতে পারে না। এই হীনমন্যতার কারণ তার মানসিক বা দৈহিক দুর্বলতা নয় ; বরং মনস্তত্ত্বের ভাষায় এর কারণ হলো এই যে, তার কার্য-কলাপের সুফল-কুফলের মোকাবিলা করার নৈতিক সাহস থেকে সে বঞ্চিত হয়ে পড়ে ; সম্ভাব্য সংকট বা কুফলের ভয়ে সে ভীত হয়ে যায় এবং খামাখাই সে বুঝতে শুরু করে যে, উহা নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি তার নেই। অবশেষে হাত-পা গুটিয়ে বসে পড়ে এবং নিজের জান বাঁচাবার জন্যে এই কর্মচঞ্চল জীবন থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

প্রাচ্য জগতে দাসত্বের প্রভাব

নিকটবর্তী অতীতের মিসর ও পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে অনুমান করা যায় যে, পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের আমদানীতে মানসিক ও দৈহিক দাসত্ব প্রাচ্যের অধিবাসীদের জীবনকে কতদূর মূল্যহীন ও অথর্ব করে তুলেছে। পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নিজেদের ঘৃণ্য উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবেই এদের উপর মানসিক ও দৈহিক দাসত্বের জাল বিস্তার করেছে এবং ছেড়ে যাওয়ার সময়ে গোটা প্রাচ্য জগতকেই তাদের কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখে গেছে। বস্তুত এই হচ্ছে তাদের মানসিক দাসত্ব। এরই সুস্পষ্ট প্রকাশ আমরা দেখতে পাই পাশ্চাত্যের পদলেহনকারী লোকদের কথাবার্তা ও বক্তৃতার মাধ্যমে। তারা যখন ইসলামের কতক আইন-কানুনকে বস্তাপচা ও বেকার সাব্যস্ত করে এরূপ ধারণা পোষণ করে যে, বর্তমান যুগে উহা সম্পূর্ণরূপেই অচল তখন এর অন্তরালে তাদের সেই দাস্য মনোবৃত্তিই সক্রিয় হয়ে উঠে যার ফলে একজন দাস স্বেচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের এবং উহার সুফল-কুফলকে পৌরুষের সাথে মোকাবেলা করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। এ কারণেই যদি কোন ইংরেজ বা আমেরিকান আইনবিদ অধিক থেকে অধিকতর জঘন্য কোন আইনকে সমর্থন করে তাহলে এই লোকেরা খুব আনন্দের সাথে উহাকে জারি করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যায়। কেননা এমনি করে তারা নিজেদের ইচ্ছার স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এবং নিজেদের ক্ষমতার বলে উহাকে জারি করার ঝুঁকি থেকে বেঁচে যায়। পাশ্চাত্যের দেশসমূহে এখন যে কার্যালয় ব্যবস্থাপনা (Official Management) দেখা যায় উহাও সেই গোলামী যুগের স্মৃতি বহন করে চলেছে। এই সকল কার্যালয়ের নিষ্প্রাণ কর্মপদ্ধতি এবং উহার ভীতসন্ত্রস্ত কর্মচারীদের প্রতি তাকালে একথা সহজেই অনুমান করা যায় যে, দাসত্বের অভিশপ্ত ছায়া এখনও পাশ্চাত্যের

অধিবাসীদেরকে কী রূপে গ্রাস করে রেখেছে। রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের মধ্যে এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না যে, স্বেচ্ছায় সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কোন মতামত দিতে সক্ষম। উপরস্থ কর্মচারীদের দ্ব্যর্থহীন নির্দেশ ও পরামর্শ ব্যতিরেকে নিম্নস্থ কোন কর্মচারীই নিজ দায়িত্বে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। একই রূপে উপরস্থ কর্মচারীরাও তাদের নিম্নস্থ কর্মচারীদের ন্যায় কোন বিষয়ে স্বাধীনভাবে মতামত দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে না। স্ব স্ব বিভাগের মন্ত্রীদের আদেশ-নির্দেশ ছাড়া তারা কিছু করতে পারে না। তাদের যাবতীয় কর্তব্য-অকর্তব্য তাদের মর্জির উপরই নির্ভরশীল। তাদের মন-মানসিকতা যদি দাসদের মত না হতো তাহলে কিছুতেই তারা নিষ্প্রাণ মেশিনের মত হতে পারত না এবং এরূপ অসহায় জীবের মত অন্যের মুখাপেক্ষী হতে পারত না। তাদের এই সুনির্দিষ্ট দাস্য মনোবৃত্তি অন্যের ফরমাবরদারির জন্যে তো খুবই প্রশংসনীয়। কিন্তু স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতার বিচারে একেবারেই অর্থহীন। এই মনোবৃত্তির উপস্থিতিতে স্বাধীনতার দাবী কখনো পূর্ণ হতে পারে না এবং স্বাধীন জীবনযাপন করাও সম্ভবপর হতে পারে না। বলা বাহুল্য এ কারণেই তাদেরকে বাহ্যদৃষ্টিতে স্বাধীন বলে গণ্য করা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের অবস্থা দাসদের চেয়ে কোন অংশেই উৎকৃষ্ট নয়।

দাসত্বের মূল কারণ

প্রকৃত ঘটনা হলো এই যে, এই দাস্য মনোবৃত্তিই একজন দাসকে দাস বানিয়ে দেয়। প্রথম দিকে তো বাইরের কোন অবস্থার ফলে ইহার সৃষ্টি হয় ; কিন্তু যতই দিন যেতে থাকে ততই উহার বন্ধন দৃঢ় হতে দৃঢ়তর হতে থাকে এবং পরিশেষে ইহা এক পৃথক ও স্বতন্ত্র স্বভাবে পরিণত হয়। একটি বৃক্ষের শাখা যেমন কিছুকাল জমিনের উপর পড়ে থাকলে ধীরে ধীরে উহার শিকড় জমিনের নিচে বিস্তারলাভ করে এবং একদিন উহা একটি পৃথক বৃক্ষে পরিণত হয়। ঠিক তেমনি অবস্থাই একজন মানুষের মানসিকতার ক্ষেত্রেও সংঘটিত হয়।

সংশোধনের নির্ভুল পন্থা

এই প্রকার দাস্য মনোবৃত্তিকে কেবল দাসত্ব বিরোধী আইন প্রবর্তন করেই নির্মূল করা যায় না। উহাকে নির্মূল করার জন্যে প্রয়োজন নতুন পরিবেশ সৃষ্টি এবং আভ্যন্তরীণ বিপ্লব। এতে করে দাসদের মনস্তাত্ত্বিক ও প্রকৃতিগত ধারাকে সম্পূর্ণ নতুন খাতে প্রবাহিত করা যেতে পারে এবং ব্যক্তি চরিত্রের সেই সকল দিককে অনুপ্রাণিত করা যেতে পারে যার ফলে একজন মানুষ স্বাধীন মানুষ হিসেবে জীবনযাপনের সকল ক্ষেত্রে যাবতীয় দায়িত্ব পালনের জন্যে নির্দ্বিধায় অগ্রসর হতে পারে।

ইসলামের ধারাবাহিক কর্মপদ্ধতি

বস্তুত ইসলাম ঠিক এই পরিকল্পনা অনুযায়ীই কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে উহা দাসদের প্রতি উহার ভদ্রজনোচিত ও সুবিচারভিত্তিক ব্যবহারের শিক্ষা দিয়েছে। দাসদের মনস্তাত্ত্বিক ভারসাম্যতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং তাদের মধ্যে মানবীয় মর্যদা ও শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি সৃষ্টির জন্যে এই শিক্ষাই ছিল সর্বোৎকৃষ্ট বিধান (Prescription)। কেননা মানুষ একবার যখন মানবীয় মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে তখন তারা উহার দাবী ও দায়দায়িত্ব সম্বন্ধে আর ভীত হয় না।—এবং আমেরিকার নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দাসদের ন্যায় পুনরায় দাসত্বের আশ্রয় গ্রহণ করে নির্ঝঞ্ঝাট জীবনযাপনের জন্যেও লালায়িত হয় না।

দাসদের সাথে সদ্ব্যবহার এবং তাদের মানবীয় মর্যাদা ও সম্মান পুনরুদ্ধার পর্যায়ে মুসলিম জাতির ইতিহাস চরম বিস্ময়কর ও প্রশংসনীয় দৃষ্টান্তে ভরপুর। এ পর্যায়ে আমরা পবিত্র কুরআন ও হাদীস থেকে কিছু উদ্বৃতি ইতিপূর্বে পেশ করেছি। এখানে অত্যন্ত সংক্ষেপে হযরত বিশ্বনবী (সা)-এর বাস্তব জীবন থেকে কিছু ঘটনা উল্লেখ করছি।

দাস হলো প্রভুর ভাই

মদীনায় আগমনের পর হযরত বিশ্বনবী (সা) মুসলমানদের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন তাতে করে তিনি আরব প্রভুদেরকে আযাদকৃত দাসদের ভাই বানিয়ে দেন। হযরত বেলাল ইবনে রিবাহকে হযরত খালিদ ইবনে রুয়াইহার, হযরত জায়েদকে [যিনি স্বয়ং বিশ্বনবী (সা)-এর আযাদকৃত দাস ছিলেন] হযরত হামজার এবং হযরত খারিজাকে হযরত আবু বকরের ভাই বানিয়ে দেন। ভ্রাতৃত্বের এই সম্পর্ক রক্ত সম্পর্কের চেয়ে কোন অংশেই কম ছিল না। কেননা যাদেরকে একে অন্যের ভাই বানিয়ে দেয়া হলো তাদেরকে একে অন্যের উত্তরাধিকার বলেও গণ্য করা হলো।

দাসদের সাথে বিবাহ

ইসলাম এখানেই ক্ষ্যান্ত হয়নি, বরং আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়েছে। হযরত বিশ্বনবী (সা) তাঁর ফুফাতো বোন হযরত জয়নাবকে নিজের দাস হযরত জায়েদের নিকট বিবাহ দেন। কিন্তু হযরত বিশ্বনবী (সা)-এর কথায় হযরত জয়নাব সম্মত হলেও মানসিকভাবে তাদের দাম্পত্য জীবন সুখময় হয়নি। কেননা বিবাহের গভীরতম সম্পর্ক নির্ভর করে মানুষের—বিশেষ করে নারীর সূক্ষ্ম অনুভূতি ও চিন্তাধারার উপর। হযরত জয়নাবের বংশ ছিল ধনবান ও সম্মানীয়। অথচ হযরত জায়েদ ছিলেন দরিদ্র। বংশীয় মর্যাদা থেকে তিনি ছিলেন বঞ্চিত।

এই বিবাহে হযরত বিশ্বনবী (সা)-এর যে লক্ষ্য ছিল তা অর্জিত হয়েছিল নিসন্দেহে। নিজ বংশের একজন মেয়েকে একজন দাসের সাথে বিবাহ দিয়ে তিনি বিশ্ববাসীর নিকট এই সত্যই তুলে ধরেছেন যে, অত্যাচারী মানবগোষ্ঠী তাদেরই একটি শ্রেণীকে লাঞ্ছনা ও অবমাননার যে গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত করে রেখেছে সেখান থেকে বের হয়ে একজন দাসও কুরাইশ দলপতিদের ন্যায় ইজ্জত ও সম্ভ্রমের শীর্ষ শিখরে আরোহণ করতে পারে। কিন্তু ইসলামের যে মহান লক্ষ্য ছিল তা এতটুকু করেই অর্জিত হয়নি।

ইসলামী সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব

ইসলাম দাসদেরকে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব এবং জাতীয় অধিনায়কত্বের পদও প্রদান করেছে। হযরত বিশ্বনবী (সা) যখন আনসার ও মুহাজিরদের নিয়ে একটি সেনাবাহিনী গঠন করেন তখন তার সিপাহসালার (Commander in Chif) নিয়োগ করেন তাঁরই দাস হযরত জায়েদ (রা)-কে। হযরত জায়েদের ইন্তেকালের পর তিনি এই দায়িত্বভার তারই পুত্র হযরত উসামা (রা)-এর হস্তে অর্পণ করেন।—অথচ এই সেনাবাহিনীতে হযরত আবু বকর (রা) এবং হযরত উমর (রা)-এর ন্যায় মহা সম্মানীয় ও সর্বজনমান্য আরব নেতৃবৃন্দও বর্তমান ছিলেন—যারা তাঁর জীবদ্দশায় সুবিশ্বস্ত পরামর্শদাতা ছিলেন এবং তাঁর ওফাতের পর তাঁরই স্থলাভিষিক্ত হন। এরূপে হযরত বিশ্বনবী (সা) দাসদেরকে শুধু স্বাধীন মানুষের মর্যাদাই প্রদান করেননি, বরং স্বাধীন সৈন্যদের সুউচ্চ নেতৃত্বের পদও অলংকৃত করার সুযোগ দিয়েছেন। এই পর্যায়ে হযরত বিশ্বনবী (সা) এতদূর গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে, তিনি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন ঃ

> "শোন এবং নেতৃবৃন্দের আনুগত্য কর, একজন মস্তক মুণ্ডানো হাবশী দাসকেও যদি তোমাদের নেতা বানানো হয় তবুও তার আনুগত্য কর —যতক্ষণ সে তোমাদের মধ্যে আল্লাহর আইন জারি করবে।"
>
> -(আল বুখারী)

অন্য কথায় বলা যায়, ইসলাম একজন দাসের এ অধিকারকেও স্বীকৃতি দিয়েছে যে, ইসলামী রাষ্ট্রে সে সর্বোচ্চ পদও অলংকৃত করতে পারে। হযরত উমর (রা) যখন তার স্থলাভিষিক্ত খলীফা পদে লোক নির্বাচিত করার প্রয়োজন অনুভব করেন তখন তিনি বললেন ঃ "আবু হুযাইফার দাস সালেম যদি জীবিত থাকতেন তাহলে আমি তাকে খলীফা পদে নিয়োগ করতাম।" এই উক্তি মূলতঃ হযরত বিশ্বনবী (সা)-এর বক্তব্যের ব্যাখ্যা মাত্র। হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রা) তাঁদের জীবনে একে বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন।

হযরত উমর ও হযরত বেলাল (রা)

হযরত উমর (রা)-এর জীবন চরিত অধ্যয়ন করলে ইসলামী সমাজে আরো একটি দিক থেকে দাসদের মর্যাদা স্পষ্ট হয়ে উঠে। মদ সম্পর্কে হযরত

বেলাল ইবনে রিবাহ (একজন আযাদকৃত দাস) যখন হযরত উমরের মতকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেন তখন হযরত উমর (রা) যিনি ছিলেন তৎকালীন খলীফাতুল মুসলেমীন—কোনক্রমেই বেলাল (রা)-কে সম্মত করাতে না পেরে শুধু আল্লাহর দরবারেই দোয়া করলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِلَالًا وَّاَصْحَابَهٗ۔

"হে আল্লাহ ! বেলাল এবং তাঁর সাথীদের জন্যে আমাকে যথেষ্ট বানিয়ে দাও।"

প্রজাদের মধ্যে মাত্র একটি ব্যক্তির—একজন ভূতপূর্ব দাসের-বিরোধিতার জবাবে একজন খলীফাতুল মুসলেমীনের মানসিক প্রতিক্রিয়া যে কতদূর অর্থ-বহ ও মর্মস্পর্শী তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় কি ?

দাসদের সাথে সদ্ব্যবহারের মূল কারণ

অসংখ্য দৃষ্টান্তের মধ্যে মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্তের কথা এখানে আলোচনা করা হলো। এতে করে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম প্রথম পর্যায়ে দাসদেরকে কেবল মনস্তাত্ত্বিক ও মানসিক দিক থেকে স্বাধীনতালাভের জন্যে তাদের সাথে উদার ও সহানুভূতিমূলক ব্যবহারের শিক্ষা প্রদান করেছে। এবং এরই অনিবার্য ফল স্বরূপ তাদের মধ্যে মানবীয় মর্যাদার সঠিক চেতনা সৃষ্টি হয়েছে এবং তাদের অন্তরে হারানো স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার ইচ্ছা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। ইসলাম একদিকে মুসলমানদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছে যে, তারা স্বেচ্ছায় তাদের দাসদের আযাদ করে দিক এবং অন্যদিকে দাসদের মন-মানসিকতার স্তরকে উন্নত করার জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে এবং তাদেরকে এই নিশ্চয়তা দিয়েছে যে, তারা ইচ্ছা করলে তাদের হারানো স্বাধীনতা এবং তাদের প্রভুরা যে সকল অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে তা অবশ্যই লাভ করতে পারে। দাসদের এই মানসিক প্রশিক্ষণের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তাদের মধ্যে স্বাধীনতার স্পৃহা জাগ্রত করা এবং স্বাধীনতালাভের পরবর্তী সময়ের সর্বাত্মক দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা। এরূপে তারা যখন স্বাধীনতার জন্যে উপযুক্ততা অর্জন করে ঠিক তখনই ইসলাম বাস্তব ক্ষেত্রেও তাদেরকে আযাদ করে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করে। কেননা ঐ সময়েই তারা স্বাধীনতার জন্যে উপযুক্ত হয়ে উঠে এবং উহা রক্ষা করার যোগ্যতাও তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে যায়।

পাশ্চাত্য জগতের উপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব

একটি জীবনব্যবস্থায় মানুষের স্বাধীনতার স্পৃহাকে জাগ্রত করে দেয়া হয়—উহাকে ভাষা দেয়া হয়। উহার বাস্তব অভিব্যক্তির জন্যে প্রয়োজনীয় সকল

মাধ্যম ও পন্থা অবলম্বন করা হয় এবং এরপর যখনই সে স্বাধীনতার জন্যে আবেদন করে তখনই তাকে স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেয়া হয়। এবং আরেকটি জীবনব্যবস্থায় দাসদেরকে চিরকালের জন্যেই দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ দেখতে চায়, তাদেরকে এতদূর দুর্বল ও অসহায় করে রাখা হয় যে, বাইরের জগতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইনকিলাবের ফলে লাখ লাখ মানুষের হত্যা ও লুণ্ঠনের শিকার না হওয়া পর্যন্ত তারা স্বাধীনতার কোন আশা করতে পারে না। এই দু'টি ব্যবস্থায় আসমান-জমিন পার্থক্য বর্তম ।

দাস প্রথার বিলুপ্তির ক্ষেত্রে ইসলাম যে অন্যান্য জীবনপদ্ধতির তুলনায় বহুগুণে শ্রেষ্ঠ তার বিভিন্ন দিক বর্তমান। ইসলামের উদ্দেশ্য ছিল বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় দিক থেকেই দাসদের মুক্ত করা। আব্রাহাম লিঙ্কনের ন্যায় উহা দাসদেরকে মানসিকভাবে আযাদীর জন্যে উপযুক্ত করে তোলার পূর্বেই শুধু মহৎ উদ্দেশ্যের উপর ভরসা করে তাদের মুক্তির জন্যে একটি ফরমান জারী করাকেই যথেষ্ট বলে মনে করেনি। ইসলামের এই কর্মপদ্ধতি পর্যালোচনা করলে সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, মানুষের মনোবৃত্তি ও মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে ইসলামের প্রজ্ঞা কত গভীর এবং স্বীয় লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য পন্থা ও মাধ্যমকে ব্যবহার করার প্রশ্নে উহা কতদূর সক্রিয়। ইসলাম দাসদেরকে কেবল মুক্তই করেনি, বরং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে এতদূর উপযুক্ত করে তুলেছে যে, তারা স্বাধীনতার যাবতীয় দায়িত্বভারও সহজে বহন করতে পারে এবং স্বাধীনতার হেফাযত করতেও সক্ষম হয়। ইসলামের এই শিক্ষা গোটা সমাজব্যবস্থায় পারস্পরিক সহযোগিতা, ভালোবাসা এবং কল্যাণকামিতার প্লাবন সৃষ্টি করে দিয়েছে। অথচ ইউরোপের দাসরা মানবীয় অধিকার আদায়ের জন্যে প্রাণপণ লড়াই ব্যতিরেকে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারেনি। ইসলাম কোন বাধ্যবাধকতার কারণে কিংবা কোন চাপের মুখে দাসপ্রথাকে বিলোপ করেনি। ইউরোপে ন্যক্কারজনক শ্রেণী সংগ্রামের ফলে সেখানকার দাসরা আযাদীর সাথে পরিচিত হয়ে উঠেছে। অথচ ইসলাম নিজ থেকেই দাস প্রথা বন্ধ করার জন্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং কখনো উহা শ্রেণী সংগ্রাম শুরু হওয়ার অপেক্ষা করেনি। বিভিন্ন দল ও শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষ চরমে উঠুক, তিক্ততার পর তিক্ততা সৃষ্টি হোক এবং পরিশেষে এক সময়ে দাসরা কোন প্রকারে স্বাধীনতা লাভ করুক—ইহা ইসলামের কাম্য নয়। ইউরোপে শ্রেণী সংগ্রামের ফলে উদ্ভূত ঘৃণা ও তিক্ততা মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলোকে বিনষ্ট করে দিয়েছে। ফলে তাদের মানসিক উৎকর্ষকে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। দাসদের মানসিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের পর তাদের আযাদীর পূর্ণতার উদ্দেশ্যে ইসলাম যে সামাজিক ভিত্তি রচনা করেছে তার পর্যালোচনা আমরা এই অধ্যায়ের শেষ ভাগে করতে চাই।

যুদ্ধ ও দাসত্ব

ইতোপূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি যে, ইসলাম দাস হওয়ার একটিমাত্র কারণ ছাড়া সকল কারণকেই অত্যন্ত সাফল্যের সাথে দূর করতে সক্ষম হয়েছে। সে কারণটি হলো 'যুদ্ধ'। এটা দূর করা বাস্তবেই ইসলামের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। বস্তুত দাসদের স্বাধীনতা আন্দোলনের পর দাস হওয়ার এই একটি বড় কারণই অবশিষ্ট ছিল। এর বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো।

একটি প্রাচীন প্রথা

প্রাচীনকাল থেকেই দুনিয়ার সকল জাতির মধ্যেই এই প্রথা প্রচলিত ছিল যে, যুদ্ধের ময়দানে যে সেনাবাহিনী পরাজিত হতো তাদের সবাইকেই (একজনকেও বাদ না দিয়ে) হয় নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হতো কিংবা তাদেরকে দাস বানিয়ে[১] রাখা হতো। অতপর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে যুদ্ধের এই ঐতিহ্য অতীত মানব গোষ্ঠীর জীবনের জন্যে এক অপরিহার্য প্রয়োজন ও সত্য বলে পরিগণিত হয়।

মুসলমান যুদ্ধবন্দী

দুনিয়ার এই সামাজিক পটভূমিতে ইসলামের আবির্ভাব ঘটে এবং ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে কিছু সংখ্যক যুদ্ধও পরিচালিত করতে হয়। এই সকল যুদ্ধে যে সমস্ত মুসলমানকে বন্দী করা হতো কাফেররা তাদেরকে দাস বানিয়ে ফেলত ; তাদের যাবতীয় অধিকার ছিনিয়ে নেয়া হতো এবং সে যুগের দাসদের জন্যে নির্ধারিত উৎপীড়ন ও নির্যাতন তাদের উপরও চালানো হতো। নারীদের সতীত্ব ও ইজ্জতের প্রতি কোন সম্মান প্রদর্শন করা হতো না। বস্তুত নারীদের সতীত্ব বিনষ্ট করার ক্ষেত্রে বিজয়ীদের দ্বিধা বা সংকোচ বলতে কিছুই ছিল না। কোন কোন সময়ে পিতা-পুত্র ও বন্ধু-বান্ধবরা মিলিত হয়ে একই নারীর উপর ধর্ষণ চালাতো এবং এরূপে সে তাদের সাধারণ (Common) রক্ষিতা বলে গণ্য হতো। এই পর্যায়ে নারীত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ যেমন কোন বাধার সৃষ্টি করত না। তেমনি কুমারী বা বিবাহিতা হওয়ার প্রশ্নও তাদের মনে কোন দয়ার উদ্রেক করত না। যে সকল শিশুকে বন্দী করা হতো তাদেরকেও একই রূপ ভাগ্য বরণ করতে হতো।

একটি বাস্তব বাধা

এই পরিস্থিতিতে শত্রু পক্ষের যুদ্ধ বন্দীদেরকে হঠাৎ করে মুক্তি দেয়া ইসলামের পক্ষে বাস্তবেই সম্ভবপর ছিল না। কেননা এরূপ করলে তা কিছুতেই

১. Universal History of the World নামক ঐতিহাসিক বিশ্বকোষের ২২৮৩ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে ঃ "৫৯৯ খৃষ্টাব্দে রোম সম্রাট Marius বিভিন্ন যুদ্ধে কয়েক লক্ষ কয়েদীকে বন্দী করেন। তিনি তাদেরকে মুক্তি দিতে কিংবা মুক্তিপণ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং তাদের সবাইকেই মেরে ফেলেন।

কল্যাণকর হতো না। শত্রুরা এরূপ সুযোগ পেলে পাল্টা পদক্ষেপের আশংকা থেকে মুক্ত হয়ে যেত এবং সম্মানিত মুসলমানদেরকে দাস বানিয়ে ইচ্ছামতো নির্যাতন চালাতে থাকত। এই পরিস্থিতিতে ইসলামের জন্যে এই একটি পথই উন্মুক্ত ছিল যে, শত্রুরা মুসলমান কয়েদীদের সাথে যেমন ব্যবহার করবে শত্রু পক্ষের কয়েদীদের সাথেও তেমনি ব্যবহার করা হবে। মোটকথা ইসলামের সাথে শত্রু পক্ষের সহযোগিতা না করা পর্যন্ত যুদ্ধবন্দীদেরকে দাস রূপে গণ্য করার এই ঐতিহ্যকে খতম করা কিছুতেই সম্ভবপর ছিল না। এ কারণেই দাস প্রথাকে চিরতরে বিলুপ্ত করার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত—অন্য কথায় যুদ্ধবন্দী সম্পর্কে বিশ্বের সমস্ত জাতির একটি সাধারণ কর্মনীতি গ্রহণ না করা পর্যন্ত ইসলাম এর অস্তিত্বকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বরদাশত করেছে।

যুদ্ধের প্রাচীন ইতিহাস

প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত যুদ্ধের মানেই হচ্ছে বিশ্বাসঘাতকতা, ধোঁকাবাজি, উৎপীড়ন ও নির্যাতন। অন্য লোকদেরকে দাস বানিয়ে নিজেদের ঘৃণ্য উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার মাধ্যম হচ্ছে এই যুদ্ধ। এক একটি যুদ্ধের পেছনে সক্রিয় হয়ে উঠে বিভিন্ন জাতির ঘৃণ্য লোভ, দেশ জয়ের লালসা এবং স্বার্থ উদ্ধারের জঘন্য অভিলাষ। এ সমস্ত যুদ্ধ ছিল রাজা-বাদশা সেনানায়কদের ব্যক্তিগত স্বার্থ, অহংকার ও প্রতিশোধ স্পৃহার অনিবার্য ফসল। ন্যক্কারজনক ও স্বার্থ প্রণোদিত এই সকল যুদ্ধে যে সমস্ত কয়েদীকে বন্দী করা হতো তাদেরকে দাস বানাবার কারণ এই ছিল না যে, প্রত্যয় ও লক্ষ্যের দিক থেকে তারা ছিল বিজয়ীদের চেয়ে নিকৃষ্ট কিংবা দৈহিক, মনস্তাত্ত্বিক ও মানসিক যোগ্যতার দিক থেকে তারা ছিল তাদের চেয়ে পশ্চাদপদ বরং তাদের একমাত্র অপরাধ ছিল ; তারা পরাজিত, যুদ্ধ ক্ষেত্রে তারা পরাস্ত হয়েছে বিজয়ীদের হাতে। কাজেই বিজয়ীরা অধিকার হাসিল করতঃ তারা ইচ্ছামত তাদের উপর অত্যাচার চালাবে, তাদের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে, তাদের শান্তিপূর্ণ শহর ও বস্তিগুলোকে ধ্বংস করে দিবে এবং তাদের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবাইকেই তরবারি দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করে ফেলবে। তাদের এ কাজে বাধা দেয়ার কেউই ছিল না। কেননা তাদের সম্মুখে না ছিল কোন মহৎ উদ্দেশ্য, না ছিল কোন সমুন্নত জীবন বিধান।

যুদ্ধের পরিবর্তে জিহাদ

যুদ্ধের এই ঘৃণ্য দিকগুলোকে ইসলাম নির্মূল করে দিয়েছে। উহা আল্লাহর পথে জিহাদ ছাড়া অন্যান্য সকল প্রকার যুদ্ধকে নিন্দনীয় সাব্যস্ত করে উহাকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছে। উহা কেবল জিহাদকেই অবশিষ্ট রেখেছে। কেননা উহার উদ্দেশ্য হলো মানুষকে মানুষের জুলুম ও অত্যাচার-উৎপীড়ন থেকে রক্ষা

করা, সাম্রাজ্যবাদী ও নিষ্ঠুর শাসকদের কবল থেকে মানুষকে মুক্ত করা। সত্যকে গ্রহণ করার পথে তারাই ছিল বড় অন্তরায়। কেননা তারা আল্লাহর সৃষ্ট বান্দাদেরকে তার পথ থেকে বিচ্যুত করে নিজেরাই হয়েছিল তাদের আল্লাহ। সুতরাং তাদের উদ্ধত মস্তককে অবনত করার জন্যে প্রয়োজন ছিল অস্ত্রের দরকার ছিল তরবারির—যাতে করে মানুষ পেতে পারে তাদের সত্যিকার আযাদী। স্বেচ্ছায় বেছে নিতে পারে তাদের মুক্তির পথ। এই প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ لاَيُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ○ (البقرة : ١٩٠)

"এবং তোমরা আল্লাহর পথে সেই সমস্ত লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে। কিন্তু সীমালংঘন করো না। কেননা আল্লাহ সীমালংঘনকারীদেরকে ভালোবাসেন না।—(সূরা আল বাকারা ঃ ১৯০)

তিনি আরো বলেন ঃ

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ج

"এবং তোমরা তাদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ কর যতক্ষণ না সমগ্র দ্বীন আল্লাহর জন্যে হয়ে যায়।"—(সূরা আল আনফাল ঃ ৩৯)

ইসলামের পয়গাম শান্তি ও নিরাপত্তার পয়গাম। এ থেকে কোন মানুষই বিমুখ হতে পারে না এবং কেউ একে নিষ্প্রয়োজনও মনে করতে পারে না।

আজ ইসলামী দুনিয়ায় বিরাট সংখ্যক খৃষ্টান ও ইহুদী সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজেদের ধর্ম-কর্ম পালন করছে। এতে করে এই সত্যই দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ইসলাম স্বকীয় বিশ্বাস ও চিন্তাধারাকে কখনো জোর করে কারুর উপর চাপিয়ে দেয় না এবং এই প্রকার জবরদস্তির নীতিও কখনো সমর্থন করে না।[১]

অমুসলমানদের সাথে ইসলামের ব্যবহার

যদি কোন ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠী ইসলামী পয়গামকে স্বাগত জানায় এবং ইসলামের দেয়া সত্যকে গ্রহণ করে তাহলে মুসলমান এবং তাদের মধ্যে যাবতীয় শত্রুতা শেষ হয়ে যায় ; বরং তারাও মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় ; তখন তাদেরকে দাস মনে করা তো দূরের কথা তাদেরকে সামান্যতম

১. বিখ্যাত ইংরেজ লেখক আরনল্ড The Preaching of Islam নামক গ্রন্থে ইসলামের এই দাবী অকুণ্ঠভাবে সমর্থন করেছেন।

তুচ্ছ করারও অধিকার থাকে না। মুসলমানদের ন্যায় তারাও সমান অধিকার ও সুবিধা ভোগ করতে থাকে। কেননা মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন দলাদলি কিংবা আশরাফ-আতরাফের বৈষম্য সৃষ্টি করা সম্পূর্ণরূপে অবৈধ। অনারব ব্যক্তির চেয়ে কোন আরব শ্রেষ্ঠ নয়। এখানে শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি হচ্ছে মানুষের সৎকর্ম ও আল্লাহভীতি। অন্যদিকে যদি কেউ ইসলামকে দ্বীন হিসেবে গ্রহণ না করে, অথচ ইসলামের দয়ায় মুসলমানদের সাথে বসবাস করতে চায় তাহলে ইসলাম তাকে নিজের অনুসারী বানানোর জন্যে বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করে না ; বরং তার নিকট থেকে এক প্রকার নির্ধারিত কর আদায় করে তার সর্বাত্মক নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই করকে বলা হয় 'জিজিয়া'। ইহা গ্রহণের সময়ে ইসলাম এরূপ অংগীকারও করে যে, ইসলামী সরকার যদি কোন বাইরের শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তাকে রক্ষা করতে না পারে তাহলে এই করের সমুদয় অর্থ তাকে ফেরত দেয়া হবে।[১]

অন্যান্য ধর্ম ও উহার অনুসারীদের নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে একথা অবশ্যই স্মরণীয় যে, নিজ প্রত্যয় ও বিশ্বাস অনুযায়ী ইসলামই একমাত্র এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বীন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও উহা অন্যান্য ধর্মের পরিপূর্ণ হেফাযতের দায়িত্ব গ্রহণ করে। অবশ্য যদি কোন ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠী ইসলাম গ্রহণ না করে এবং ইসলামী রাষ্ট্রকে জিজিয়া দিতেও সম্মত না হয় তাহলে ইসলাম তাদেরকে দুষমন বলে গণ্য করে। বস্তুত তারা হচ্ছে এমন লোক যারা জিদ ও হটধর্মীর কারণেই নিজেদের বিদ্বেষকে জিইয়ে রাখতে চায় এবং কোন শান্তিপূর্ণ সমঝোতা বা সন্ধিকেও এড়িয়ে যেতে থাকে। এরাই যুগে যুগে হক ও সত্যের পথে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং তাদের যাবতীয় উপায়-উপাদান, ধন-সম্পদ

---

১. ইসলামী ইতিহাসে এর অংসখ্য ঘটনা বর্তমান। আমরা এখানে টি. ডাবলিউ আরনল্ড প্রণীত The Preaching of Islam নামক গ্রন্থ থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করছি। উহার ৫৮ পৃষ্ঠায় মিঃ আরনল্ড বলেন ঃ

"হীরার উপকণ্ঠে অবস্থিত এলাকাবাসীদের সাথে খালেদ (রা) যে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন তাতে লেখা ছিল ঃ যদি আমরা তোমাদের হেফাযত করতে পারি তাহলে জিজিয়া আমাদের প্রাপ্য, কিন্তু আমরা হেফাযত করতে না পারলে উহা আমাদের প্রাপ্য নয়।"

তিনি আরো বলেন ঃ

"আরব জেনারেল আবু উবায়দা (রা) সিরিয়ার বিজিত নগরসমূহের পরিচালকদের নিকট এরূপ লিখিত ফরমান প্রেরণ করেন যে, তিনি যেন জিজিয়া বাবদ আদায়কৃত সমুদয় অর্থ ঐ সকল শহরবাসীকে ফেরত দেন। অতপর হযরত আবু উবায়দা (রা) উক্ত শহরবাসীদের নিকট লিখেন ঃ আমরা তোমাদের অর্থ তোমাদের ফেরত দিচ্ছি ; কেননা এক বিরাট সেনাবাহিনী আমাদের আক্রমণ করছে। যেহেতু চুক্তি অনুযায়ী আমরা তোমাদের হেফাযত করতে সক্ষম নই। সেহেতু তোমাদের দেয়া কর আমরা ফেরত দিচ্ছি। আমরা জয়লাভ করলে আমাদের চুক্তি বলবৎ থাকবে এবং আমরা উহার শর্তাবলী মেনে চলব।"

ও প্রভাব-প্রতিপত্তিকে সত্যকে দাবিয়ে রাখার জন্যে কাজে লাগাতে থাকে। এদের সংশোধনের সমস্ত পথই যখন বন্ধ হয়ে যায়, ইসলাম কেবল তখনই এদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু এদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণার পূর্বে যাতে করে রক্তপাতকে এড়িয়ে যাওয়া যায় সে উদ্দেশ্যে ইসলাম এদেরকে যথারীতি 'আলটিমেটাম' দেয়। এই আলটিমেটামই হচ্ছে ইসলামের পক্ষ থেকে সন্ধি স্থাপনের শেষ পদক্ষেপ। কেননা পারত পক্ষে ইসলাম কখনো রক্তপাত কামনা করে না—কামনা করে দুনিয়ার সর্বত্র শান্তি ও নিরাপত্তায় ভরে উঠুক। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط

—"আর যদি তারা সন্ধির দিকে অগ্রসর হয় তাহলে তোমরাও সন্ধির দিকে অগ্রসর হও এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর।"

—(সূরা আল আনফাল ঃ ৬১)

জেহাদ ইসলামের মূল প্রাণ

সকল মানুষ 'সিরাতে মুস্তাকিম'—তথা আল্লাহ্‌র দেয়া সরল পথ অবলম্বন করুক—ইহাই ইসলামের কাম্য। আর এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যেই সৃষ্টি হয়েছে ইসলামী যুদ্ধের সুদীর্ঘ ইতিহাস। এই লক্ষ্যে শান্তিপূর্ণ মাধ্যমে অগ্রসর হওয়া যখন অসম্ভব হয়ে পড়ে তখন বাধ্য হয়েই ইসলাম শক্তিপ্রয়োগ করে। ইসলামের এই যুদ্ধ কোন সেনাপতির স্বার্থপরতা কিংবা দিগ্বিজয়ের নেশার ফসল নয়। অন্য মানুষকে দাস বানানোর চিন্তাও এর পশ্চাতে কার্যকর নয়। এই যুদ্ধ কেবল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হয় এবং তার সন্তুষ্টি লাভই হলো একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু ইসলাম শুধু লক্ষ্যের কথা বলেই ক্ষ্যান্ত হয়নি, বরং এই সকল যুদ্ধের জন্যে যথারীতি নিয়ম-কানুনও নির্ধারিত করে দিয়েছে। হযরত বিশ্বনবী (সা) মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ

"আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে যাও এবং তার পথে যুদ্ধ কর। যে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধাচরণ করে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। কিন্তু প্রতিশ্রুতি ভংগ করো না। মৃতদেহ বিকৃত করো না এবং কোন শিশুকে হত্যা করো না।"[১]

হযরত বিশ্বনবী (সা) যারা বাস্তবেই মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে তাদেরকে বাদ দিয়ে অন্যদের উপর হাতিয়ার তুলতে নিষেধ করেছেন। এমনি করে যাবতীয় মালামাল ও ধন-সম্পদ ধ্বংস করতে এবং কারো ইজ্জত ও সম্ভ্রম নষ্ট করতে কঠোরভাবে বারণ করেছেন। আর কোন অন্যায় ও বিপর্যয়

১. মুসলিম, আবু দাউদ ও তিরমিযী।

সৃষ্টির উৎসাহ যাতে বৃদ্ধি না পায় সে জন্যে তাদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ○ (المائدة : ٦٤)

"এবং আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে ভালোবাসেন না।"
—(সূরা আল মায়েদা ঃ ৬৪)

ইসলামী জিহাদের অতুলনীয় ঐতিহ্য ও ইতিবৃত্ত

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মুসলমানগণ তাদের সকল যুদ্ধে—এমনকি খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত 'ক্রুসেড'-এর বিভিন্ন যুদ্ধেও উপরোক্ত ঐতিহ্যসমূহ রক্ষা করে চলেছে। খৃষ্টানরা যখন জেরুজালেম অধিকার করে নেয় তখন তারা সেখানকার মুসলিম জনবসতিসমূহকে তাদের নিষ্ঠুরতম অত্যাচারের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে। তাদের ইজ্জত ও সম্ভ্রম লুণ্ঠন করে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকেই পশুর মত জবাই করে ; এমনকি শহরের মুসলমানদের সর্ববৃহৎ মসজিদটিও তাদের নাপাক হাত থেকে রেহাই পায়নি। কিন্তু মুসলমানরা যখন পুনর্বার ঐ শহরটিকে দখল করে তখন মুসলমানরা সেই সকল জালেমদের উপর আদৌ কোন হস্তক্ষেপই করেনি—যদিও আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে জুলুম ও সীমালংঘনের প্রতিশোধ গ্রহণের পূর্ণ অধিকার দিয়েছে ঃ

فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ص

"যে তোমাদের বিরুদ্ধে সীমালংঘন করবে তোমরাও তার বিরুদ্ধে অনুরূপ সীমালংঘন কর।"—(সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৪)

মুসলমানগণ প্রতিশোধ গ্রহণের পরিবর্তে তাদের পূর্ববর্তী শত্রুদের সাথে এমন উদার ও ভদ্রজনোচিত ব্যবহার করেছে যার নযীর কেউ কোনদিন দেখেনি। বস্তুত মুসলমানদের এই সামরিক মহান লক্ষ্য ও অতুলনীয় ঐতিহ্যের কারণেই বিশ্বের সকল অমুসলিম জাতির উপরেই মুসলমানদের আসন। ইসলাম অতি সহজেই এরূপ চিন্তাধারা ছড়িয়ে দিতে পারত যে, যারা মূর্তিপূজার অভিশাপে অভিশপ্ত এবং হক ও সত্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার তারা কোন মানুষই নয়। বরং আধা বন মানুষ এবং এ কারণে তারা মানুষের দাস হয়ে থাকারই উপযুক্ত। মানসিক ও মানবীয় গুণাবলীর দিক থেকে তারা যদি নিম্নমানের না হতো তাহলে হক ও সত্যের দুশমন তারা কেমন করে হতে পারে ? এবং কেমন করেই বা তারা সত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারে ? সুতরাং যেহেতু তাদের এই ভূমিকা মানবতার সম্পূর্ণ বিপরীত তাই এরা কোন ইজ্জত ও সম্মানের পাত্র হতে পারে না এবং দুনিয়ায় স্বাধীন মানুষেরা যে নির্দিষ্ট স্বাধিকার ভোগ করছে তাতেও তাদের কোন অধিকার থাকতে পারে না।

ইসলাম অতি সহজেই এই দৃষ্টিভংগী গ্রহণ করতে পারতো। কিন্তু ইসলাম তা করেনি। ইসলাম না এরূপ কথা বলেছে, না মুসলমানদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছে যে, যুদ্ধবন্দীরা মানুষ নয়—ওরা আধা বর্বর মানুষ, ওদেরকে দাস বানানোই সংগত। বরং এর বিপরীত, একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই কেবল দায়ে ঠেকে ওদেরকে গোলাম বানিয়ে নিয়েছে ; কেননা তাদের শত্রুরা তাদের ভাইদেরকে—যারা বন্দী হয়ে তাদের হস্তগত হয়েছে—দাস বানিয়ে ফেলেছে। একমাত্র এই কারণেই ইসলাম তখন দাস প্রথা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করার ঘোষণা দিতে পারেনি ; বরং একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত উহাকে বিলম্বিত করেছে। সারা দুনিয়ায় আন্তর্জাতিকভাবে যখন এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পরবর্তী কোন যুদ্ধে যারা বন্দী হবে তাদের ব্যাপারে আর যাই করা হোক না কেন কাউকেই দাস বানানো যাবে না। তখনই ইসলামের ইঙ্গিত লক্ষ্য পূর্ণমাত্রায় অর্জিত হয়। এর পূর্বে যদি ইসলাম একতরফাভাবে দাস প্রথা রহিত করে দিত তাহলে মুসলমানদের শত্রুরা হত বাঘের চাইতেও হিংস্র ; মুসলমানরা কাউকে দাস বানাবে না, অথচ অমুসলমানরা মুসলমানদেরকে দাস বানাবার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে মুসলমান বন্দীদের উপর চালাতো অমানুষিক অত্যাচার ও পাশবিক উৎপীড়ন।

দাসপ্রথা ইসলামী জীবন পদ্ধতির অংগ নয়

প্রসংগত বলা প্রয়োজন যে, যুদ্ধবন্দীদের সাথে ব্যবহার সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের মাত্র একটি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاۤءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ۚ

"অতপর হয় অনুগ্রহ করে ছেড়ে দিতে হবে, নতুবা বিনিময় গ্রহণ করে ছেড়ে দিতে হবে—যতক্ষণ না যোদ্ধারা অস্ত্র ত্যাগ করে।"

—(সূরা মুহাম্মাদ ঃ ৪)

এই আয়াতে যুদ্ধবন্দীদেরকে দাস বানানোর কোন কথা নেই। যদি থাকতো তাহলে এটা চিরকালের জন্যে ইসলামের যুদ্ধ সংক্রান্ত একটি আইনে পরিণত হতো। আয়াতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে ঃ হয় পণ গ্রহণ করে, নতুবা পণ না নিয়ে শুধু অনুগ্রহ প্রদর্শন করে যুদ্ধবন্দীদেরকে মুক্ত করে দিতে হবে। বস্তুত এই দু'টি কথাই ইসলামী যুদ্ধবিধির একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যুদ্ধবন্দী সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের হুকুম অনুযায়ী উক্ত দু'টি পন্থাই কেবল গ্রহণ করা যেতে পারে। অন্য কোন পন্থা গ্রহণের কোন অবকাশ নেই। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, প্রাথমিক যুগে মুসলমানরা যে যুদ্ধবন্দীদেরকে দাস বানাতো তার কারণ এটা ছিল না যে, দাস বানানোই ছিল ইসলামের অপরিহার্য আইন।

বরং তৎকালীন বিশ্ব পরিস্থিতির বাস্তব তাগিদেই মুসলমানদেরকেও যুদ্ধ-বন্দীদেরকে দাস বানানো অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। মোটকথা উহা ছিল সমকালীন পরিস্থিতির বাস্তব প্রয়োজন। ইসলামের শাশ্বত যুদ্ধনীতির সাথে উহার কোন সম্পর্ক ছিল না।

ইসলাম দাসপ্রথা কখনো চালু রাখতে চায়নি

দাসপ্রথার পক্ষে যত তাগিদই বর্তমান থাকুক না কেন ইসলাম কখনো চায়নি যে, যুদ্ধবন্দীদেরকে অবশ্যই দাস বানাতে হবে। বরং অবস্থা ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলামের নিয়ম ছিল ঃ যদি শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ ফিরে আসত তাহলে কাউকেই দাস বানানো হতো না। হযরত বিশ্বনবী (সা) স্বয়ং বদরের যুদ্ধে ধৃত মক্কার নেতাদের কাউকে মুক্তিপণ নিয়ে এবং কাউকে বিনা পণেই মুক্তিদান করেন। অনুরূপভাবে তিনি নাজরানের খৃস্টানদের নিকট থেকে জিজিয়া নিতে সম্মত হন এবং উহার বিনিময়ে তাদের সকল বন্দীকে মুক্ত করে দেন। ইসলামের এই ভাস্বর কার্যকলাপের প্রতি লক্ষ্য করে বিশ্বমানবতা ধীরে ধীরে এতদূর উপযুক্ত হয়ে উঠে যে, অতীতের অন্ধকার থেকে আলোকের পথে বেরিয়ে আসতে উদ্যত হলো—যুদ্ধবন্দীদের সমস্যাটির একটি মানবিক সমাধান খুঁজে বের করার জন্যেও ব্যস্ত হয়ে উঠল।

বিভিন্ন যুদ্ধে মুসলমানরা যাদেরকে বন্দী করে তাদের সাথে কোন প্রকার দুর্ব্যবহার করা হয়নি ;—না কোন রূপ নির্যাতন করা হয়েছে, না কখনো তুচ্ছ বা হেয় করার চেষ্টা করা হয়েছে বরং তাদের হারানো স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। এবং তার জন্যে শুধু এতটুকু শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, মুক্তির পর সে যেন স্বাধীন মানুষের মত দায়িত্বশীল জীবনযাপন করতে সক্ষম হয়। এই শর্ত পালিত হলে কোনরূপ ইতস্তত না করেই তাকে আযাদ করে দেয়া হতো। অথচ তাদের মধ্যে এমন লোকও থাকত যে মুসলমানদের হাতে বন্দী হওয়ার পূর্বে কয়েক পুরুষ ধরেই দাস হিসেবে জীবনযাপন করে এসেছে। মূলত এদেরকে ইরান ও রোমের বাদশারা অন্যান্য দেশ থেকে ধরে নিয়ে আসত এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময়ে এদেরকে সৈন্য হিসেবে ব্যবহার করত।

শত্রুপক্ষের ধৃতা মহিলা

দাসী অথবা বন্দী মহিলার প্রতিও যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করতে ইসলাম কখনো ভুল করেনি। অথচ এদের সম্পর্ক ছিল শত্রুপক্ষের সাথে এবং যুদ্ধে পরাজিত হয়েই এরা মুসলমানদের হাতে এসে পৌছতো। কিন্তু ইসলাম কখনো এদের ইজ্জত ও সম্ভ্রম নষ্ট করার অনুমতি দেয়নি, যুদ্ধলব্ধ গনীমতের মালও মনে করার সুযোগ দেয়নি। এবং (অন্যান্য দেশের ন্যায়) সকলের

সাধারণ সম্পত্তি (Common Property) সাব্যস্ত করে বল্গাহীন ব্যভিচার ও পাশবিকতারও কোন অবকাশ দেয়নি। বরং (সম্ভ্রম ও সতীত্ব সংরক্ষণের একমাত্র পন্থা হিসেবে) ইসলাম এদেরকে কেবল মালিকদের জন্যেই নির্ধারিত করে দিয়েছে এবং তাদেরকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ দিয়েছে। অন্য কারুর জন্যে এদের সাথে যৌন সম্পর্কস্থাপন করাকে সম্পূর্ণরূপে অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। অধিকন্তু ইসলাম এই মহিলাদের স্বাধীন হওয়ার জন্যে 'মুকাতাবাতের' পন্থাও উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এমনকি এই নিয়মও প্রবর্তন করেছে যে, মালিকের ঔরষে এদের কেউ সন্তানবতী হলে সাথে সাথেই সে নিজে নিজে স্বাধীন বলে গণ্য হবে এবং তার সন্তানও স্বাধীন মানুষ হিসেবে বিবেচিত হবে। এতে করে কয়েদী মহিলাদের প্রতি ইসলাম কতদূর উদার, মহৎ ও অনুগ্রহপরায়ণ তা সহজেই পরিস্ফুট হয়ে উঠে।

ইসলামে এই হচ্ছে দাসদের ইতিবৃত্ত। মানবেতিহাসের এ এক ভাস্বর অধ্যায়। নীতির দিক থেকে ইসলাম ইহা পসন্দ করেনি। বরং নিজস্ব সকল উপায়-উপাদানের মাধ্যমে একে নির্মূল করার চেষ্টা করেছে এবং এ পর্যায়ে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে কোন ভুল করেনি। সাময়িকভাবে উহার অস্তিত্বকে যে স্বীকার করে নিয়েছে তার একমাত্র কারণ ছিল এই যে, তখন উহার কোন বিকল্পই ছিল না। কেননা উহার পরিপূর্ণ বিলুপ্তির জন্যে শুধু মুসলমানদের সম্মতিই যথেষ্ট ছিল না, বরং অমুসলিম দুনিয়ার সহযোগিতাও ছিল এক অপরিহার্য বিষয়। বাইরের দেশগুলোর যুদ্ধবন্দীদেরকে দাস বানানোর ফায়সালা পরিহার না করা পর্যন্ত ইসলামের একার পক্ষে এর বিলুপ্তি সম্ভবপরই ছিল না। পরবর্তী সময়ে দুনিয়ার সমস্ত জাতি যখন সম্মিলিতভাবে উহা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন ইসলাম উহাকে স্বাগত জানায়। কেননা ইসলামী জীবনব্যবস্থার অন্যতম মৌলনীতি হচ্ছে সাম্য। ইসলাম বিশ্বাস করে ঃ সাম্য ও স্বাধীনতা বিশ্বমানবতার এক মৌলিক অধিকার।

আধুনিক যুগে দাস ব্যবসা

পরবর্তী বিভিন্ন যুগে মানুষের ক্রয়-বিক্রয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের যে দৃষ্টান্ত মুসলিম দেশগুলোতে পাওয়া যায় তার সাথে ইসলামের বিন্দুমাত্রও সম্পর্ক নেই। এই ব্যবসা ইসলামী জিহাদের কোন ফসল নয়। এ হচ্ছে ইসলামের নামে অপরাধকারী মুসলিম শাসকদের নির্লজ্জ অপরাধের ঘৃণ্য কাহিনী। তাদের অন্যান্য অপরাধগুলোকে ইসলামের সাথে সম্পর্কিত করা যেমন সঠিক নয়, ঠিক তেমনি এই দাস বেচা-কেনার ঘটনাকেও ইসলামী নাম দেয়া সংগত নয়।

দাসপ্রথা প্রসঙ্গে আলোচনার সারমর্ম

দাসপ্রথার পর্যালোচনার সময়ে নিম্নলিখিত কথাগুলো স্মরণ রাখা একান্ত প্রয়োজন ঃ

এক ॥ দাসপ্রথা চালু রাখার ঘৃণ্য নেশা ঃ ইসলামের পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন দেশ দাসপ্রথার পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকে এবং বিভিন্ন রূপে ও বিভিন্ন পন্থায় উহাকে চালু রাখে। অথচ ঐ সময়ে উহাকে অব্যাহত রাখার কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। তাদের এ কর্মকাণ্ডের একমাত্র কারণ ছিল রাজ্য বিজয়ের অভিলাষ এবং প্রবল ক্ষমতা লিপ্সা। আর এই উদ্দেশ্যেই প্রত্যেকটি দল ও জাতিই অন্য দল ও জাতিকে দাস বানাবার নেশায় মেতে উঠতো। এ ছাড়া দাস হওয়ার পেছনে আরেকটি বড় কারণ ছিল দরিদ্রতা। যারা দরিদ্র ঘরে জন্মগ্রহণ করত কিংবা ক্ষেতে-খামারে শ্রমিক বা চাষী হিসেবে কাজ করত তাদেরকে অত্যন্ত অধম ও অপাংক্তেয় বলে গণ্য করা হতো এবং দাসের ন্যায় তাদেরকে নানা কাজে ব্যবহার করা হতো। দাসত্বের এই সর্ববিধ রূপকেই ইসলাম বন্ধ করার জন্যে বদ্ধপরিকর ছিল। এ কারণেই যে রূপটি দূরীভূত করার পরিবেশ তখনও পর্যন্ত সৃষ্টি হয়নি সেটি ছাড়া অন্যান্য সমস্ত রূপকেই ইসলাম বন্ধ করে দেয়।

দুই ॥ দাসপ্রথার আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তি ঃ ইউরোপে দীর্ঘকাল ধরে বিশেষ কোন প্রয়োজন ছাড়াই এই দাসপ্রথা বর্তমান ছিল। এমনকি এর বিলুপ্তির পরেও পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে ইউরোপবাসীরা এর বিলুপ্তির জন্যে সহযোগিতা করেনি। বরং কিছু বাধ্যবাধকতার কারণে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই একে রহিত করার জন্যে অগ্রসর হয়েছে। স্বয়ং ইউরোপিয়ান লেখকরাই একথার সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, ইউরোপে দাসপ্রথা বিলুপ্ত হওয়ার মূলে রয়েছে নিছক অর্থনৈতিক কারণ। তাদের দাসরা তাদের প্রভুদের ধন-সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধির স্থলে উল্টো নিজেরাই হলো তাদের অর্থনৈতিক বোঝা। কেননা একদিকে যেমন প্রভুদের স্বার্থে পরিশ্রম করার মানসিকতা দুর্বল হয়ে যায়, তেমনি অন্য দিকে দৈহিক শক্তিও হ্রাস পেতে থাকে। তাদের খোরাকী ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যা ব্যয় হতো তা তাদের মাধ্যমে অর্জিত আয়ের চেয়ে অনেকগুণ বেশী হতে থাকে। ফলে ধীরে ধীরে এই অর্থনৈতিক কারণেই দাস প্রথা একদিন বিলুপ্ত হয়ে যায়। সুদ ও লোকসানের সমস্যা সম্পর্কেও স্মরণ রাখতে হবে যে, ইসলামের মহান ও পবিত্র লক্ষ্যের সাথে এর বিন্দুমাত্রও সম্পর্ক নেই। ইসলাম বিশ্বমানবতাকে এক মহান চিন্তাধারা উপহার দিয়েছে এবং দাসদেরকে মুক্ত করে তাদের জীবনকে ধন্য করেছে। অথচ ইউরোপবাসীরা তাদেরকে আযাদী না দেয়ার জন্যে সর্ববিধ শক্তি নিয়োগ করেছে। কিন্তু যখন অর্থনৈতিক কারণে একেবারেই নিরুপায় হয়ে পড়েছে কেবল তখনই তাদেরকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছে। বস্তুত এ কারণেই দেখা যায় যে, ইউরোপের ইতিহাসে যে বহু সংখ্যক রক্তক্ষয়ী সমাজ বিপ্লবের আলোচনা বর্তমান। ইসলামের ইতিহাসে তার চিহ্নমাত্র নেই। অনস্বীকার্য যে, এসব বিপ্লবের পরে সেখানকার প্রভুদের পক্ষে সম্ভপরই ছিল না

যে, নিজেদের দাসগুলোকে দাস বানিয়ে তাদের অধীনে রাখবে। সুতরাং অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা তাদেরকে মুক্ত করে দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু একটি একটি করে বহু সমাজ বিপ্লব সংঘটিত হলেও সেখানকার দাসরা তাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখার কোন গ্যারান্টি পায়নি। বরং তাদের দাসত্ব ও পরনির্ভরতার বন্ধন আগের চেয়েও কঠিন হয়ে পড়ে। তাদের অদৃষ্ট তাদের চাষী জমিনের সাথে বাঁধা পড়ে যায়। ফলে জমিন বেচা-কেনার সাথে তাদের বেচা-কেনাও বাধ্যতামূলকভাবে চলতে থাকে। কেননা কোন চাষীই তার নির্ধারিত জমিন ত্যাগ করে অন্য কোথাও যাওয়ার আইনগত অধিকার পেত না। এরূপ কেউ করলে তাকে পলাতক বলে গণ্য করা হতো এবং গ্রেফতার করতে পারলে তার শরীরে দাগ দেয়া হতো এবং পুনরায় তাকে জমিনের মালিকের নিকট হস্তান্তর করা হতো। দাসপ্রথার এই রূপটি সমগ্র ইউরোপে আঠারো শতকের ফরাসী বিপ্লব (French Revoletion) পর্যন্ত বর্তমান ছিল। তাই বলা চলে যে, ইউরোপে দাসপ্রথার বিলুপ্তি ইসলামের দেয়া নিঃশর্ত আযাদীর এগার শ' বছর পরেই ঘটেছে।

তিন ॥ "দেখিতে মাকাল ফল ---" ঃ কিন্তু অপেক্ষা করুন। সুন্দর নাম, চিত্তাকর্ষক শব্দ ও মনোহর বাক্য দ্বারা যেন প্রতারিত না হন। খুব ঘটা করে বলা হয় ঃ ফরাসী বিপ্লবের পরে ইউরোপে এবং আব্রাহাম লিংকনের ফরমান জারির পর আমেরিকায় দাসপ্রথার বিলুপ্তি ঘটেছে এবং দুনিয়াও উহার বিরুদ্ধে ফায়সালা দিয়েছে। কিন্তু ভেতরের অবস্থা ততদূর সুন্দর নয়। বাস্তব ঘটনা এই যে, দাসপ্রথার অসিত্ব এখনো দুনিয়ায় বর্তমান। যদি তা না হতো, তাহলে সাম্রাজ্যবাদের দেবতা বহুরূপী সেজে সারা দুনিয়ার বুকে নেচে বেড়াতে পারত না। দাসত্বের অভিশাপ থেকে যদি দুনিয়া মুক্তই হয়ে থাকে তাহলে আলজিরিয়া ফ্রান্সের হিংস্রতা ও বর্বরোচিত তাণ্ডব লীলাকে কি নামে অভিহিত করা যাবে? আমেরিকা উহার স্বদেশী নাগরিক হাবশীদের উপর যে কুৎসিত ও পাশবিক অত্যাচার চালাচ্ছে তাকে কী বলা হবে? ইউরোপবাসীরা দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাংগ লোকদের উপর যে অমানুষিক নির্যাতন চালাচ্ছে তাকেই বা কি নামে আখ্যায়িত করা হবে?

দাসত্বের নতুন নাম

একটি জাতি যে আরেকটি জাতিকে পদানত করে তাদের মানবিক অধিকারসমূহ কেড়ে নেয় তাকে দাস বানানো ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় কি? দাসত্বের মর্ম ইহাই। সুতরাং আসুন। আমরা যেন মনমাতানো শ্লোগানে বিভ্রান্ত না হই। বরং উহার স্বরূপ উদঘাটনের চেষ্টা করি এবং দাস বানানোর এই রূপগুলোর উপর আযাদী, মৈত্রী, সাম্য ভ্রাতৃত্বের লেবেল লাগাবার চেষ্টা না

করি। কেননা মনোরম লেবেল দ্বারা কোন নিকৃষ্ট ও খারাপ জিনিসকে উৎকৃষ্ট ও ভালো বলে চালিয়ে দেয়া যায় না। অনুরূপভাবে কোন জঘন্য অপরাধের উপর পর্দা ঝুলিয়ে দিয়েও উহাকে লুকিয়ে রাখা যায় না। বিশেষ করে গোটা মানবজাতি যার তিক্ত অভিজ্ঞতা একবার-দু'বার নয়, বরং বারবার লাভ করে সে ক্ষেত্রে এর কথা কল্পনাও করা যায় না।

ইসলামের সত্যনিষ্ঠা

নিজস্ব অবস্থান ও ভূমিকা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ইসলাম কখনো কারুর তোষামোদ করতে জানে না। প্রতিটি ক্ষেত্রেই উহা নিজস্ব ভূমিকাকে একেবারে সুস্পষ্ট করে তোলে—যাতে করে উহার মূল লক্ষ্য ও পরিকল্পনা কারুর নিকট অজ্ঞাত না থাকে। উহা একেবারে পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় দাসত্ব সম্পর্কে উহার নিজস্ব দৃষ্টিভংগী উপস্থাপিত করেছে, উহার মূল কারণসমূহ চিহ্নিত করেছে উহাকে বিলুপ্ত করার পন্থা-পদ্ধতি নির্দেশ করেছে এবং চিরতরে নির্মূল করার পথও রচনা করে দিয়েছে।

আধুনিক সভ্যতার কপটতা

ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত কৃত্রিমতায় ভরপুর চাকচিক্যময় আধুনিক সভ্যতার প্রকৃত লক্ষ্য ও কর্মসূচী উভয়ই এক অস্পষ্টতা ও কুহেলিকার শিকার। ইহা নিজস্ব লক্ষ্য ও পরিকল্পনা যেমন প্রকাশ করতে পারছে না। ঠিক তেমনি কর্মপদ্ধতিরও ব্যাখ্যা দিতে পারছে না। উহার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঃ "চেহারা সুন্দর কিন্তু ভেতরটা চেংগিজের চেয়েও অধিক অন্ধকার।" তিউনিসিয়া, আলজিরিয়া ও মরক্কোতে এই সভ্যতার অনুসারীরা হাজার হাজার মানুষকে শুধু এই অপরাধেই হত্যা করেছে যে, তারা স্বাধীনতার দাবী করেছিল, নিজেদের জন্যে কেবল মানুষ হওয়ার সম্মানটুকু চেয়েছিল। নিজেদের জন্মভূমিতে অন্যদের পরিবর্তে শুধু নিজেদের হুকুমাত কায়েম করতে চেয়েছিল। নিজেদের ভাষায় কথাবার্তা বলার সুযোগটুকু পেতে চেয়েছিল। আরো চেয়েছিল দুনিয়ার অন্যান্য স্বাধীন জাতির মত তাদের জন্মভূমিও স্বাধীন হোক এবং সেখানে তারা বাইরের হস্তক্ষেপ ছাড়াই স্বাধীন থেকে নিজেদের ইচ্ছা ও আকাংখা অনুযায়ী নিজেদের দ্বীন ও আকীদা মোতাবেক জীবনযাপনের সুযোগ লাভ করুক— নিজেদের আকাংখা অনুসারে নিজেদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক নির্ধারণ করুক। অথচ আধুনিক সভ্যতার ধ্বজাধারীরা এই নিষ্পাপ ও নিরপরাধ লোকদের রক্তে নিজেদের হাত রঞ্জিত করেছে, পচিয়ে-গলিয়ে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে শাস্তিগৃহে আবদ্ধ করে রেখেছে, তাদের মান-ইজ্জত লুণ্ঠন করেছে, তাদের মহিলাদের সতীত্ব বিনষ্ট করেছে, নিজেরা বাজি লাগিয়ে বেয়নেট দিয়ে গর্ভবতী মহিলাদের পেট চিরে ফেলেছে। বিশ শতকের এই পৈশাচিক সভ্যতার

পতাকাবাহীরাই বন্য জানোয়ারের চেয়েও ঘৃণাকর কার্যে লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু সর্বত্রই তারা সদম্ভে ঘোষণা করেছে যে, তারা বিশ্ববাসীকে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যেই বহির্গত হয়েছে। এরা এদের জঘন্য ব্যভিচার ও পাশবিক কার্যকলাপকে 'আলো' ও 'উন্নতি' বলে অভিহিত করছে। অথচ আজ থেকে দীর্ঘ তের শ' বছর পূর্বে ইসলাম বাইরের কোন চাপ বা বাধ্যবাধকতা ছাড়াই নিছক মানবতার সম্মানের জন্যেই দাসদের সাথে সদ্ব্যবহার করেছে এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে ঃ দাস হওয়া মানবজীবনের কোন স্থায়ী ব্যাপার নয়। উহা একটি সাময়িক অবস্থা মাত্র। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার পূজারীরা একে বর্বরতা, রক্ষণশীলতা বা সেকেলে চিন্তা বলে সমালোচনা করছে।

"বুদ্ধির নাম দিন বাতুলতা
আর বাতুলতার নাম বুদ্ধি,
যা ইচ্ছে তাই করুন আপনি
চলুক আপনার শুদ্ধি।"

অনুরূপভাবে আমেরিকার বড় বড় হোটেল-রেস্তোরাঁ এবং প্রমোদ-উদ্যানে লিখে রাখা হয় ঃ কেবল শ্বেতাংগদের জন্যে", "কালো লোক ও কুকুরের প্রবেশ নিষিদ্ধ" ইত্যাদি। এছাড়া যখন সুসভ্য (!) আমেরিকানদের কোন দল কোন কৃষ্ণাংগকে নিজেদের বন্য স্বভাব ও বর্বরতার (Lynching) শিকার বানিয়ে প্রকাশ্য রাস্তায় নিজেদের পায়ের জুতার তলায় পিষে পিষে মেরে ফেলে তখন দেখা যায় যে, বর্বরতা ও পাশবিকতার এই তাণ্ডবলীলা পুলিশ নীরবে প্রত্যক্ষ করতে থাকে—কিন্তু মৃত্যু পথযাত্রী এই মজলুম মানুষটিকে রক্ষা করার কোন প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করে না। অথচ ভাষা, ধর্ম ও মানুষ হওয়ার দিক থেকে তারা একই শ্রেণী এবং একই দেশের অধিবাসী। আধুনিক সভ্যতার দাবীদারদের এই অপরাধ বন্য জানোয়ারকেও হার মানায়। কিন্তু এতে করেও তাদের সংস্কৃতি, ভদ্রতা ও প্রগতি বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ন হয় না ; তাদের উন্নত ও সভ্য হওয়ার পথেও কোন অন্তরায় থাকে না।

"আমরা যদি 'আহ ! করি হয় অপরাধ,
ওরা যদি হত্যা করে, নাহি অপবাদ।"

একদিকে রয়েছে তথাকথিত সভ্য মানবগোষ্ঠীর এই ন্যক্কারজনক কার্যকলাপ এবং অন্যদিকে রয়েছে ইসলামী ইতিহাসের জ্বলন্ত উদাহরণ। হযরত উমর ফারূক (রা) যখন মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলীফা তখন একজন গোলাম তাকে হত্যা করার হুমকি দেয়। কিন্তু খলীফাতুল মুসলেমীন সর্বময় ক্ষমতার মালিক হওয়া সত্ত্বেও উক্ত গোলামকে কিছুই বলেননি। তাকে না

গ্রেফতার করলেন, না দেশ থেকে বিতাড়িত করলেন এবং না এই বলে জল্লাদের হাতে অর্পণ করলেন যে, সে একটি আধা বর্বর লোক, হক ও সত্যকে প্রত্যক্ষ করার পরেও শুধু হঠধর্মী করে বাতিল ও মিথ্যার অনুসরণ করে চলেছে। উক্ত হুমকির উত্তরে হযরত উমর (রা) কেবল এতটুকু বললেন ঃ "এই গোলামটি আমাকে হত্যা করার হুমকি দিয়েছে।" এরপর না তিনি এর কৈফিয়ত তলব করেছেন, না তার স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করেছেন। অতপর সে গোলাম কার্যতই যখন উক্ত ঘৃণ্য কাজটি করে ফেলেছে ঠিক তখনই তার বিরুদ্ধে খলীফাকে হত্যা করার অভিযোগ আনা হয়েছে।

আফ্রিকায় ইংরেজদের জুলুম

ইংরেজরা আফ্রিকায় কৃষ্ণাংগ অধিবাসীদের সাথে যে ব্যবহার করেছে, বৃটিশ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত খবর অনুযায়ী তারা যে পাশবিক তাণ্ডবলীলা দেখিয়েছে এবং মানবীয় মৌলিক অধিকার থেকে তাদেরকে যেভাবে বঞ্চিত করেছে তা ইংরেজদের তথাকথিত ন্যায়পরায়ণতা ও আধুনিক তাহজীবের চূড়ান্ত সাক্ষ্য। বৃটিশদের বিচার ও আধুনিক তাহজীবের যথার্থ রূপই এখানে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। বস্তুত যার উপর ভিত্তি করে পাশ্চাত্যের লোকেরা বিশ্বের সকল জাতির চেয়ে নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ বলে দাবী করছে সেই "সর্বশ্রেষ্ঠ" ও "গৌরবময়" জীবনব্যবস্থার ভেতরকার রূপ ইহাই। অথচ যে ইসলামে শত্রু পক্ষের কয়েদীদেরকে একমাত্র সাম্যের ভিত্তিতে চিরকালীন দাসে পরিণত না করে শুধু সাময়িকভাবে দাস বানাবার অনুমতি দিয়েছে সেই ইসলামকে তারা নিকৃষ্ট, বর্বরোচিত ও রক্ষণশীল বলে আখ্যায়িত করছে। তাদের মতে ইসলাম একটি রক্ষণশীল ধর্ম। কেননা উহা পশুর মত মানুষকে শিকার করার অনুমতি দেয়নি। নিছক কালো চামড়া হওয়ার অপরাধে কাউকে জবাই কিংবা তার মালামাল লুণ্ঠন করার অবকাশ দেয়নি। শুধু তাই নয়। উহার রক্ষণশীলতা তো এমন পর্যায়ের যে, উহা পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে ঃ

"শোন ও আনুগত্য কর, যদিও তোমার শাসক একজন মাথা মুণ্ডানো হাবশী হয়।"

কয়েদী নারীদের সমস্যার সমাধান

কয়েদী নারীদের সমস্যাটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। যুদ্ধে যে সকল অমুসলিম নারী বন্দী হতো তাদের জন্যে ইসলামী সমাধান ছিল ঃ তাদেরকে মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হতো। প্রয়োজন হলে এক একজনকে একাধিক নারীর দায়িত্বও অর্পণ করা হতো। এরা হতো দাসী এবং দায়িত্ব গ্রহণকারী মুসলমানরা হতো তাদের প্রভু। শুধু এই প্রভুদেরই অধিকার থাকত নিজ নিজ দাসীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করার। এমনকি ইচ্ছা করলে কেউ

নিজ দাসীকে বিবাহও করতে পারত। (আর এ অবস্থায় সে দাসী না থেকে স্বাধীন নারীর মর্যাদা লাভ করতো।) আধুনিক ইউরোপ ইসলামের এই বিধান দেখে ঘৃণায় নাক সিটকাচ্ছে। অথচ যে সকল নারী-পুরুষ পাশবিক উত্তেজনা তথা কামরিপু চরিতার্থ করার জন্যে পরস্পর অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করছে এবং এ পর্যায়ে কোন নির্দিষ্ট আইন বা মানবিক নীতির ধার ধারে না তাদের অবস্থা দেখে ইউরোপের কেউ নাক সিটকায় না। বল্গাহীন যৌন ব্যভিচার তাদের নিকট কোন অপরাধ নয়। মূলত ইসলামের অমার্জনীয় অপরাধ হলো এই যে, উহা ব্যভিচার সমর্থন করে না এবং ইউরোপ যে পশুর মত অবাধ, উচ্ছৃংখল, নির্লজ্জ ও প্রকাশ্য ব্যভিচারে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে ; ইসলাম তাকে বিন্দুমাত্রও সহ্য করে না। সম্ভবত এ কারণেই ইউরোপবাসীরা ইসলামের নাম শুনলেই ক্ষিপ্ত হয়ে যায়।

কয়েদী নারীদের করুণ অবস্থা ও ইসলাম

অন্যান্য জাতির মধ্যে কয়েদী নারীদের সাথে যে লজ্জাকর ও পাশবিক ব্যবহার করা হতো তার কোন তুলনা নেই। কয়েদী হওয়ার পর বেশ্যাবৃত্তি ও যথেচ্ছ ব্যভিচার ছাড়া তাদের জীবনযাপনের কোন পন্থাই অবশিষ্ট থাকতো না। কেননা সামাজিক মর্যাদা বলতে তারা কিছু পেত না। সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় কোন শক্তিই তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করতো না। তাদের ইজ্জত ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্যেও কেউ এগিয়ে আসতো না। তাদের মালিকরাই তাদের রক্ষক হতে পারতো। কিন্তু তারা তাদেরকে কেবল অর্থ উপার্জনের হাতিয়ার হিসেবেই ব্যবহার করতো। বেশীর ভাগ সময়ে মালিকরাই তাদেরকে দিয়ে গণিকাবৃত্তি করাতো। কিন্তু তাদের ভাষায় যখন "রক্ষণশীল ও অনুন্নত" ইসলামের যুগ শুরু হলো তখন তাদের গণিকাবৃত্তি ও অশ্লীল ব্যভিচারের পথ সম্পূর্ণরূপেই বন্ধ হয়ে যায় এবং এরূপ আইন করে দেয়া হলো যে, বৈধ মালিক ছাড়া অন্য কেউই এই দাসীদের দ্বারা উপকৃত হতে পারবে না। এবং অর্থনৈতিক বা যৌন অস্থিরতা বা বাধ্যবাধকতা যাতে করে অন্যায় পথে চালিত না করে এবং মালিকদের রক্ষণাবেক্ষণে থেকে নির্দোষ ও মানবীয় জীবনযাপন করতে পারে সে জন্যে দাসীদের অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্বও মালিকদের স্কন্ধে ন্যস্ত করা হলো।

নারী স্বাধীনতার রহস্য

কিন্তু ইউরোপের "অতি সমঝদার" পণ্ডিতরা ইসলামের এই "মূঢ়তা ও বর্বরতার" ঘোর বিরোধী। তাদের মতে ইসলামের এই কার্যপদ্ধতি মূঢ়তা ও কুসংস্কারের শেষ স্মৃতি। সুতরাং তারা এই ব্যভিচার ও দেহ ব্যবসাকে শুধু বৈধ বলেই গণ্য করে না। বরং আইনগতভাবে এর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করছে। উপরন্তু তারা তাদের সাম্রাজ্যবাদী জঘন্য পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়িত

করার লক্ষ্যে সারা দুনিয়ায় এই পূতিগন্ধময় ব্যভিচার ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে বদ্ধপরিকর। তাই তো এই অভিশাপ আজ সারা দুনিয়ায় প্রবলভাবে বিরাজমান। এ জন্যে তারা নতুন নতুন নাম রচনা করছে এবং নানা বর্ণের চিত্তাকর্ষক আবরণ দিয়ে উহাকে আবৃত করার চেষ্টা করছে। নারী স্বাধীনতার যত দাবীই করা হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে এখনও তারা মজলুম ; এখনো তারা পুরুষদের মন ভুলাবার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আধুনিক যুগের সুসজ্জিতা বেশ্যা বা নর্তকী এবং ঘৃণ্য পেশার নারীকে কোন দিক থেকেই কি সত্যিকার স্বাধীন নারী হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় ? আজকে নারী সমাজ কি প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করছেন ? ইসলাম দাসী এবং মালিকদের মধ্যে যে মানবিক ও আত্মিক সম্পর্কের বিধান দিয়েছে এবং তাদের জন্যে শারাফাত ও পবিত্রতার যে ব্যবস্থা করেছে তার সাথে আধুনিক সভ্যতার অধীনে নারীদের যৌন ব্যভিচার ও নগ্ন কার্যকলাপের কোন তুলনা হতে পারে কি ?

বেশ্যাবৃত্তি ও আধুনিক সভ্যতা

ইসলামের মতাদর্শ ও চিন্তাধারা একেবারে সুস্পষ্ট। কিন্তু আধুনিক সভ্যতা এই বৈশিষ্ট্য থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত। ইহা অস্থিরতা ও দ্বিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্যতার এক করুন শিকার। এরই একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত হচ্ছে বেশ্যাবৃত্তি ও দেহ ব্যবসায়। তথাকথিত আধুনিক সভ্যতা একে দাস যুগের একটি স্মৃতি বলে আখ্যায়িত করে। অথচ একে জিইয়ে রাখাই নয়। বরং এর দ্রুত প্রসারের জন্যে এদের ক্রমবর্ধমান চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই। এ সময়ে তাদের বক্তব্য হলো ঃ এ একটি "অপরিহার্য সামাজিক প্রয়োজন।"

এখন এই "অপরিহার্য সামাজিক প্রয়োজন" সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা গেল ঃ

মারাত্মক আত্মচিন্তা

বর্তমান যুগে বেশ্যাবৃত্তির সবচে' বড় কারণ হলো আধুনিক সভ্যতার মারাত্মক আত্মচিন্তা। এ কারণে আধুনিক ইউরোপের কোন সভ্য (?) ব্যক্তিই একমাত্র নিজের ছাড়া অন্য কারুর অর্থনৈতিক বোঝা বহন করতে আগ্রহী নয়—চাই সে স্ত্রী থেকে কিংবা তার সন্তান-সন্ততি হোক। সে শুধু যৌন পিপাসা চরিতার্থ করার জন্যে পাগল—নিজের আনন্দ-উল্লাসের জন্যে উন্মাদ ; কিন্তু কোন দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করতে একেবারে নারাজ। বস্তুত সে যৌন পিপাসা মেটাবার জন্যে যে নারীর সন্ধান করে সে ক্ষেত্রে উক্ত নারীর দেহটিই থাকে তার একমাত্র লক্ষ্যবস্তু।

বেশ্যাবৃত্তির মূল কারণ

বেশ্যাবৃত্তিকে "অপরিহার্য সামাজিক প্রয়োজন" আখ্যা দিয়ে বর্তমান যুগের আলোকপ্রাপ্ত লোকেরা এরই ভিত্তিতে নারীদের এই দাসত্বকে বৈধ করার জন্যে

প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। কিন্তু ইহা নিছক দৃষ্টিবিভ্রম মাত্র। কেননা এই বেশ্যাবৃত্তির মূল কারণ হচ্ছে আধুনিক যুগের লোকগুলোর প্রবৃত্তির দাসত্ব এবং চিন্তার বিভ্রান্তি। এ কারণে যতদিন তাদের মানবতার মান উন্নত না হবে ততদিন পর্যন্ত বেশ্যাবৃত্তির এই অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় নেই।

এখানে একথাও স্মরণযোগ্য যে, পাশ্চাত্যের যে সকল "সুসভ্য (!) সরকার পরবর্তী যুগে বেশ্যাবৃত্তির উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে তার মূল কারণ নারীদের নারীত্ব বা মানবতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন নয়। তাদের নৈতিক, মনস্তাত্বিক ও মানসিকতার অভিধানেও এমন কিছু নেই যাতে করে তারা বেশ্যাবৃত্তিকে ধ্বংসাত্মক বা ঘৃণাকর বলে বর্জন করতে পারে। বরং তার মূল কারণ ছিল (উর্বশী তিলোত্তমার) সাজসজ্জা ও রূপের পসরা নিয়ে সুন্দরী সোসাইটি গার্লস এর বাজার সরগরম হওয়া। এদের অবাধ বিচরণের মুখে বেশ্যাবৃত্তির সামাজিক অপরিহার্যতার দিন ফুরিয়ে এসেছে এবং ব্যভিচার সম্পর্কে পাপ-পুণ্যের ধারণা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদের নির্লজ্জতার অবস্থা এই যে, তের শ' বছর আগেকার দাসীদের জীবন সম্পর্কে ইসলামের গৃহীত পদক্ষেপ নিয়ে অসংযত ভাষায় ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে। অথচ ইসলাম দাসীদের সমস্যা সমাধান কল্পে একটি অস্থায়ী নীতি গ্রহণ করেছিল মাত্র। ইসলাম তখনই একথা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিল যে, ইহা ইসলামের কোন স্থায়ী বা শাশ্বত ব্যবস্থা নয়। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, নেহাত নির্লজ্জের মত তারা ইসলামের সমালোচনা করে আর নিজেদের ব্যাপারে একথা ভুলে যায় যে, যে বিশ শতকের সভ্যতাকে তারা মানবতার সর্বোচ্চ অপরিবর্তনীয় ও শাশ্বত অধ্যায় বলে চিৎকার করছে তার চেয়ে উহা যে কত সহস্র গুণে পবিত্র, প্রাকৃতিক এবং পূর্ণাংগ তা ভাষায় প্রকাশ করা দুঃসাধ্য।

সোসাইটি গার্লস

আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজে যৌন নেশাগ্রস্তা, বিলাসীনী ও আনন্দ উল্লাসে নিমজ্জিতা সোসাইটি গার্লস যে নির্ভীকতা ও অবাধ স্বাধীনতার ভেতর দিয়ে নিজেদের দেহকে অন্যের হাতে তুলে দিচ্ছে তা দেখে আমাদের বিভ্রান্ত হওয়া সমীচীন নয়। এত কোন স্বাধীনতা নয়। এ হচ্ছে দাসত্বের এমন একটি রূপ যেখানে একটি দাস একান্ত স্বেচ্ছায় তার দাসত্বের শৃংখল নিজের গলায় পরিধান করছে। কিন্তু দাস্য মনোবৃত্তি সম্পন্ন এই মহিলাদের অস্তিত্ব এবং স্বাধীন ও মর্যাদাবান মানুষ না হওয়ার এই পৈশাচিক মানসিকতাকে ইসলাম কখনো সমর্থন করে না এবং একে স্থায়ী করার পক্ষেও কোন সনদ দিতে পারে না। এ ছাড়া দুনিয়ার অন্য কোন ধর্ম বা জীবনদর্শন উক্ত ইচ্ছাকৃত মানবতা বিধ্বংসী দাসত্বকে সমর্থন করতে পারে না।

ইউরোপীয় সভ্যতার আসল কীর্তি

ইউরোপীয় সভ্যতার ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করার জন্যে এই হাল-হাকীকতই যথেষ্ট। উহা এমন এক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও মানসিক ব্যধি সৃষ্টি করে দেয় যাতে করে মানুষ বাধ্য হয়েই মর্যাদাপূর্ণ স্বাধীনতার চেয়ে ঘৃণ্য ও কুৎসিত দাসত্বকেই প্রাধান্য দিচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে ইউরোপীয় সভ্যতা আজ পর্যন্ত যে কীর্তি স্থাপন করেছে তার বহর এতটুকুই। এক কথায় বলা যায় ঃ

"বেকারত্ব, দারিদ্র আর মদ্যপান,
নাচ-গান, নগ্নতার ঘৃণ্য অভিযান।"

ইউরোপে দাসত্বের মুল কারণ

এই হলো ইউরোপীয় দাসত্বের সংক্ষিপ্ত উপাখ্যান। ইউরোপের ইতিহাস নর-নারী নির্বিশেষে সকল জাতি ও গোত্রের দাসত্বের ইতিহাস। এ ইতিহাস সৃষ্টির পেছনে রয়েছে বহু কারণ। এবং সৃষ্টির পরে যুগের পর যুগ ধরে কোন সামাজিক প্রয়োজন কিংবা বাধ্যবাধকতা ছাড়াই একে অবশিষ্ট রাখা হয়েছে। ইউরোপে এমন কোন পরিস্থিতিরও সৃষ্টি হয়নি যাতে করে তের শ' বছর পূর্বে ইসলামের সংস্পর্শে আসতে পারে এবং বাধ্যবাধকতার কারণে দাসত্বের মাত্র একটি রূপকে অব্যাহত রাখতে পারে। বরং অবস্থা ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ইউরোপীয় সভ্যতার ঘৃণ্য ও অমানবিক প্রকৃতির ফলেই গোটা ইউরোপে দাসত্বের এই অবৈধ প্রচলন। এর পশ্চাতে 'অপরিহার্য প্রয়োজন' বলে কিছু নেই এবং বাধ্যবাধকতারও কোন প্রশ্ন নেই।

সমাজতান্ত্রিক দেশে

আধুনিক সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর প্রতিও দৃকপাত করা যাক। ঐ সকল দেশের অধিবাসীরাও দাসত্বের অভিশাপে জর্জরিত। সমাজতন্ত্রের দেবতা সাম্রাজ্যবাদের পায়ের তলায় নিষ্পেষিত হচ্ছে। তাদের প্রভু মাত্র একজন। আর সে হলো সরকার। অবশিষ্ট সকল লোককেই মুখ বুজে এই সরকারের আনুগত্য করতে হবে। এই দাসত্বের বহর এতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত যে, কোন নাগরিকের নিজ পেশা বা চাকুরী বেছে নেয়ার স্বাধীনতাও তার নেই। কেননা সে একজন আজ্ঞাবহ গোলাম মাত্র। আর গোলামের নিজস্ব মর্জি বলতে কিছুই থাকে না। এই দিক থেকে সমাজতান্ত্রিক দেশ ও পুঁজিবাদী দেশের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। একটিতে একমাত্র সরকারই হচ্ছে সর্বময় ক্ষমতার নিরংকুশ অধিকারী এবং আরেকটিতে বড় বড় পুঁজিপতি হচ্ছে যাবতীয় ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিক আর অন্যেরা হচ্ছে তাদের অনুগ্রহের ভিখারী।

পাঠকদের সমীপে

আলোচ্য বিষয়ের উপসংহারের পূর্বে পাঠকদের সমীপে একটি আরজ করতে চাই। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র উভয়ের সমর্থকদেরকে নিজ নিজ

জীবনাদর্শের প্রশংসায় পঞ্চমুখ দেখতে পাবেন। কিন্তু আমরা আশা করি, তারা যদি আমাদের কথাগুলোর প্রতি লক্ষ্য করেন তাহলে তারা প্রতারিত হবেন না। আমাদের পাঠকবৃন্দও আশা করি, একথা অনুধাবন করতে পেরেছেন যে, নামের দিক থেকে পার্থক্য থাকলেও সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ মূলত প্রাচীনকালের দাসত্বেরই নতুন রূপ মাত্র।—"সভ্যতা" ও "সামাজিক উন্নতি"র ছদ্মবেশে স্থায়ী হয়ে বসেছে। ইসলামের নির্দেশিত "সরল পথ" বর্জন করে মানবতা কি উন্নতিলাভ করেছে, না ক্রমান্বয়ে অবনতি ও নৈতিক অধপতনের শিকার হয়ে চলেছে। পাঠকবৃন্দ তা সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন। তারা আরো উপলব্ধি করতে পারবেন যে, দুনিয়া আজ ইসলামের দিকনির্দেশনার উপর কতদূর নির্ভরশীল।

ইসলাম ও সামন্তবাদ

অতি সম্প্রতি আমি শুনতে পেলাম, জনৈক ছাত্র এম. এ ডিগ্রী নেয়ার জন্যে একখানি পুস্তিকা (Thesis) লিখে প্রমাণ করেছে যে, ইসলাম একটি সামন্তবাদী ব্যবস্থা। আমি অবাক হয়ে গেলাম। ভাবলাম, ছাত্রটিকে তো এই ভেবে ক্ষমা করা যায় যে, প্রকৃতপক্ষেই তার জ্ঞানের অভাব এবং এ কারণেই সে ভুল করে বসেছে। কিংবা তার উদ্দেশ্যই ছিল ইসলামকে কলংকিত করা এবং প্রকৃত অবস্থার সম্যক জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছে করেই উহাকে এড়িয়ে গেছে। কিন্তু যে সকল বিজ্ঞ শিক্ষক তাকে উক্ত পুস্তিকার ভিত্তিতে সনদ দিচ্ছেন তাদের দৃষ্টিভংগিকে কিভাবে বিশ্লেষণ করা যায় ? ইসলামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং ইসলামের সামগ্রিক ইতিহাস সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা ও উদাসীনতাকে কি নামে আখ্যায়িত করা যায় ?

কিন্তু পরবর্তী মুহূর্তেই আমার যখন স্মরণ হলো যে, এই শিক্ষকমণ্ডলী কারা এবং কেমন করে তাদের মন-মগজ তৈরী করা হয়েছে, তখন আমার বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ থাকল না। কেননা এই শিক্ষকমণ্ডলী আমাদের এমন এক বিজ্ঞ সমাজের সাথে সম্পর্কিত যাদের দৃষ্টি অন্যের প্রচারণার সাথে একেবারেই আচ্ছন্ন। যাদের মন-মগজে অন্যদের মতাদর্শ ও চিন্তাধারা ছাড়া আর কিছুই নেই। তারা ভিন্নদেশী এক্সপ্লয়েটেশান (Explitation)-এর সার্থক ফসল। মিঃ ডানলপের (Dunlop) বিশেষ কর্মব্যস্ততার মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল এই শিক্ষকমণ্ডলীই।[১] এদেরকে বাহ্যত আধুনিক জ্ঞান অর্জন করার জন্যে প্রেরণ করা হয়েছিল। কিন্তু মূলত এও ছিল তাদের চক্রান্তেরই একটি অংশ মাত্র। —উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক শিক্ষিতদেরকে তাদের নিজস্ব তাহজীব, তামাদ্দুন ও ঐতিহ্য থেকে উদাসীন করে তোলা—যাতে করে তারা নিজেদের ধর্ম, ইতিহাস, বিশ্বাস ও চিন্তাধারাকে ঘৃণা করতে শেখে এবং পাশ্চাত্যের প্রভুদের অন্ধ অনুসারী হওয়াকে গৌরবের কারণ বলে মনে করতে থাকে। এ কারণে এরা যদি ইতিহাস ও ঐতিহাসিক সত্যকে বিকৃত করার কাজে বরাবর লিপ্ত থাকে তাহলে তাতে বিস্মিত হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে ?

সামন্তবাদের বৈশিষ্ট্য

মূল বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে সামন্তবাদের মর্ম ও উহার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে আমরা ডক্টর

---

১. মিঃ ডানলপ ছিল একজন ইংরেজ অফিসার। বৃটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষ থেকে তাকে মিসরের শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও পরিচালনার জন্যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল।

রাশেদ আল বেরভী প্রণীত "আন নেযামুল এশতেরাকী" (সমাজতান্ত্রিক জীবন-ব্যবস্থা) নামক পুস্তক থেকে নিম্নলিখিত উদ্বৃতি পেশ করছি। পুস্তকখানি অতি-সম্প্রতি ইউরোপে প্রকাশিত হয়েছে। বিজ্ঞ লেখক সামন্তবাদের ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসংগে বলেন ঃ

"সামন্তবাদী ব্যবস্থাপনা নিছক একটি উৎপাদনী ব্যবস্থাপনা, উহার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে এতে এক শ্রেণীর দাস থাকে। এই ব্যবস্থায় জমির মালিক বা তাদের কর্মকর্তারা উৎপন্ন ফসলের একটি নির্দিষ্ট অংশ কিষাণদের কাছ থেকে আদায় করে এবং এই পর্যায়ে তারা কিছু নির্দিষ্ট পরিমাণ সুযোগ-সুবিধাও লাভ করে থাকে। জমিদাররা কিষাণদের নিকট থেকে তাদের খেয়ালখুশী অনুযায়ী যে কোন প্রকার সেবা গ্রহণের অধিকার লাভ করত। কিষাণদের নিকট থেকে নগদ বা বাকীতে জমির খাজনাও নিতে পারত। এর কারণ হলো ঃ সামন্তবাদী ব্যবস্থা তার অধীনস্থ লোকদেরকে দু'টি উল্লেখযোগ্য শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন ঃ

(১) জমিদার ও জায়গীরদার (বা সামন্ত) এবং

(২) কিষাণ ও মজদুর। এদের সামাজিক মর্যাদা এদের কাজ ও দায়িত্বের মানগত পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়ে যেত। কিষাণ, চাষী ও গোলাম এই সামাজিক মর্যাদা পরিবর্তনেরই বিভিন্ন নাম। এদের মধ্যে কয়েকটি শ্রেণীর এখন অসিত্ব নেই এবং অবশিষ্টগুলো ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।"

বিনা পয়সায় বাধ্যতামূলক শ্রম

"কিষাণরা জমিন তৈরী করে বীজ বুনায় এবং ফসল ফলায়। এ জন্যে তাদেরকে কিছু ফসল দেয়া হতো—যাতে করে তারা পরিবার-পরিজনদের কিছু অন্নের ব্যবস্থা করতে পারে। এরূপে ক্ষেত-খামারে তাদের ঝুপড়ি বানাবার জন্যেও কিছু জমিন দেয়া হতো। এই সুবিধাটুকুর বিনিময়ে তারা জমিদারদের ক্ষেতে চাষাবাদের হাতিয়ার ও প্রাণীগুলোকে নিয়ে হাল চালাত। ফসল কাটার সময়ে তারা কোন পারিশ্রমিক না নিয়েই মালিকদের কাজ করে দিত। কোন কোন সময়ে তারা নিজ নিজ সাধ্য অনুযায়ী হাদিয়া-তোহ্ফাও পেশ করত। অধিকন্তু বাধ্যতামূলকভাবে তাদেরকে নিজ নিজ শস্য জমিদারদের কলে ভাংগাতে হতো এবং আংগুরের রস বের করতে হলেও তাদেরই মেশিনে গিয়ে বের করতে হতো।"

সামন্তদের বিচার ও পরিচালনার অধিকার

সামন্তবাদী ব্যবস্থায় জমিদাররাই তাদের এলাকায় বসবাসকারী কিষাণদের যাবতীয় বিচার ও পরিচালনার সর্বাত্মক অধিকার লাভ করত। এই ব্যবস্থাপনায়

ফসলের মূলে থাকত একমাত্র কিষাণরাই। কিন্তু আজকাল স্বাধীনতা বলতে আমরা যা বুঝি সে ধরনের স্বাধীনতা এই কিষাণরা কখনো ভোগ করত না। যে জমিনে তারা কাজ করত তার মালিক হওয়ার অধিকারও তাদের ছিল না। এ জমিন না তারা বিক্রয় করতে পারত, না তাদের মৃত্যুর পর তাদের সন্তান-সন্ততিরা উহার অধিকারী হতো। না তারা উহা কাউকে দান করতে পারত। তাদের প্রভুরা (জমিদাররা) যখন ইচ্ছা তখনই তাদের বাধ্যতামূলক শ্রম আদায় করত কিংবা বিনা পয়সায় খাটিয়ে নিত। যতবড় ক্ষতিই হোক না কেন এর বিরুদ্ধে টু শব্দটি করার অধিকারও কারুর ছিল না। এখানেই শেষ নয় ; জমিদারদের প্রতি আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ এই দরিদ্র কিষাণদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে বড় রকমের কর দিতে হতো। এই করের পরিমাণও নির্ধারণ করত এই জমিদাররা। যদি কোন জমিদার তার জমিন অন্য কোন জমিদারের নিকট বিক্রয় করে ফেলত তাহলে উক্ত জমিনের সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট কিষাণরাও বিক্রি হয়ে যেত এবং নতুন জমিদারের মালিকানাধীন দাস বলে গণ্য হতো। নিজের জঠর জ্বালা নিবারণের জন্যে অন্য কোথাও কাজ করার উপায় থাকত না এবং নিজ ইচ্ছায় নিজের জমিদারকে ছেড়ে অন্য কোন জমিদারের কাজ করার এখতিয়ার থাকত না। মোটকথা সামন্তবাদী যুগের এই কমিউন শ্রেণীকে প্রাচীন যুগের দাস এবং আধুনিক যুগের কৃষকদের মধ্যবর্তী অবস্থা বলা যেতে পারে।"

"কিষাণকে জমিন দেয়া বা না দেয়ার অধিকার ছিল জমিদারের। কোন কিষাণকে কী পরিমাণ দেয়া হবে তা ফায়সালা করার এখতিয়ার ছিল কেবলমাত্র জমিদারের। কিষাণের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী হবে তাও নির্ধারণ করত এই জমিদার। এরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার সময়েও জমিদার না কিষাণদের অভাব-অভিযোগ বা অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখত। না এতটুকু পরোয়া করত যে, তার এই সিদ্ধান্তের ফলে পার্শবর্তী সামন্তদের উপর কি প্রভাব পড়বে।"

কিষাণদের পলায়ন

বিজ্ঞ লেখক আরো বলেন ঃ "এই সকল কারণে খৃস্টীয় তের শতকে সেই অবৈধ পলায়ন আন্দোলন শুরু হয় যার অনিবার্য ফল স্বরূপ পরিশেষে 'কৃষি-কর্মী'র আবির্ভাব ঘটে। ইতিহাসে এই আন্দোলন 'কিষাণ পলায়ন' নামে খ্যাত। এর একটি ফল হলো এই যে, জমিদাররা এমন একটি সমঝোতায় পৌছল যে, প্রত্যেক জমিদার তার পলাতক কিষাণকে ফিরে পাওয়ার দাবী করে ফিরিয়ে নিতে পারবে। এই সমঝোতা অনুযায়ী সামন্তরা এই অধিকারও পেল যে, ইচ্ছা করলে তারা জায়গীরে অনধিকার প্রবেশকারী সকল কৃষককে

গ্রেফতার করতে পারবে। কিন্তু এতদূর কড়াকড়ি সত্ত্বেও 'কিষাণ পলায়ন' রোধ করা গেল না। বরং উল্টো এতখানি বেড়ে গেল যে, 'পলায়ন' এই যুগের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যে পরিণত হলো। ফলে জমিদাররা নিরুপায় হয়ে নিজ নিজ জমিন চাষ করানোর জন্যে অধিক হতে অধিকতর ভাড়াটিয়া শ্রমিকদের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হলো ; জমিদারদের পারস্পরিক সমঝোতা বেকার হয়ে গেল। অন্য কথায় বলা যায়, এখন থেকে জমিদার ও কিষাণদের পারস্পরিক সহযোগিতার একটি পরিবেশ সূচিত হলো। বস্তুত এতে করে আরেকটি সুফল হলো এই যে, জমিদাররা এখন থেকে জোর করে বিনা পয়সায় খাটানোর পরিবর্তে শ্রমিকদেরকে নগদ পয়সা দিয়ে কাজ করাতে শুরু করল।"

"অতপর যতই দিন যেতে লাগল ততই কিষাণরা অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল হয়ে উঠতে লাগল। অন্যদিকে পুরানো যুগের ধনিক শ্রেণী ও সামন্তরা তাদের প্রয়োজন এতদূর বৃদ্ধি করেছিল যে, (এই পরিবর্তিত অবস্থায়) তাদের যাবতীয় উপায়-উপাদান একত্র করেও তারা সে প্রয়োজন মেটাতে পারল না। কিষাণরা তখন সামন্তদের এই দুরবস্থার সুযোগ গ্রহণ করল। তারা নগদ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করে করে নিজ নিজ প্রভুর নিকট থেকে স্বাধীনতা অর্জন করতে শুরু করল। খৃস্টীয় তের শতকে যখন 'কৃষি কর্মীদের' স্বাধীনতা সার্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করে তখন পর্যন্ত এই অবস্থা অব্যাহত থাকে। অতপর কাল-পরিক্রমায় যে পরিবর্তনগুলো ঘটে তার মধ্যে সবচে' উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, সামন্তবাদী কাঠামো ভেংগে পড়ার উপক্রম হলো এবং পরবর্তী কয়েক শতকের মধ্যেই তা চিরকালের জন্যে বিলুপ্ত হলো।"[১]

এই হলো সামন্তবাদী ব্যবস্থার নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। উপরে আমরা যে উদ্ধৃতিসমূহ পেশ করেছি তার উদ্দেশ্য হলো ঃ পাঠকবৃন্দ যেন সামন্তবাদী ব্যবস্থা এবং উহার বৈশিষ্ট্যসমূহ পুরোপুরি বুঝতে সক্ষম হন এবং নিছক বাহ্যিক মিল দেখে উহাকে অন্য কোন ব্যবস্থার সাথে তালগোল পাকাবার হাত থেকে বেঁচে যেতে পারেন। প্রশ্ন হলো ঃ এই বৈশিষ্ট্য ও কর্মতৎপরতাপূর্ণ সামন্তবাদী ব্যবস্থা ইসলামী ইতিহাসের কোন্ যুগে এবং কোথায় পাওয়া গেছে?

ভুল বোঝার কারণ

'যে বাহ্যিক মিল থাকার কারণে অনেক লোক বিভ্রান্ত হয় এবং ভুল করে ঐ সকল সুযোগ সন্ধানী লোকদের জন্যে ইসলামের বিপক্ষে জাজ্বল্যমান মিথ্যা বলার জন্যে অজুহাত সৃষ্টি করে দেয় সেটি হলো এই যে, প্রাথমিক ইসলামী সমাজ দু'টি শ্রেণী[illegible]ত বিভক্ত ছিল ঃ (১) জমিদার ও (২) কিষাণ। কিষাণরা জমিদারদের জমি[illegible] কাজ করত। কিন্তু ইহা নিছক একটি বাহ্যিক মিল মাত্র।

১. আন নিযামুল ইস[illegible]কী ঃ পৃষ্ঠা-২২-২৩।

শুধু এতটুকু মিল দেখে কোনক্রমেই ইসলামের কৃষি ব্যবস্থাকে সামন্তবাদী ব্যবস্থা বলে আখ্যায়িত করা যায় না।

সামন্তবাদী ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহের আলোকে সামন্তবাদী ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহকে সংক্ষেপে নিম্নরূপ বলা যায় ঃ

(১) চিরস্থায়ী কৃষি গোলামী।

(২) চাষীদের উপর দায়িত্ব ও কর্তব্যের ক্ষমতাতিরিক্ত বোঝা অর্পণ। চাষীদের কর্তব্য ছিল ঃ

ক—সপ্তাহে পুরো একটি দিন জমিদারদের ক্ষেত-খামারে বিনা পয়সায় কাজ করতে হবে।

খ—বীজ বপন ও ফসল কাটার সময়ে কোন রূপ বিনিময় ছাড়াই বাধ্যতামূলকভাবে জমিদারের কাজ করে দিতে হবে।

গ—ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠান, তেহার-মেলা ও অন্যান্য আনন্দের দিনে নিজেদের হাজারো অভাব-অভিযোগ থাকলেও সবদিক থেকে সুখী ও ধনবান প্রভুদের (জমিদারদের) খেদমতে মূল্যবান উপঢৌকন পেশ করতে হবে।

ঘ—নিজেদের শস্য কেবলমাত্র নিজ নিজ জমিদারদের মেশিনে ভাংগাতে হবে।

(৩) জমিদারদের ক্ষমতা ও এখতিয়ার ছিল সুপ্রশস্ত ও অসীম, যেমন ঃ

ক—নিজেদের খেয়ালখুশী অনুযায়ী যাকে যে পরিমাণ ইচ্ছা সেই পরিমাণ জমি দিত।

খ—কৃষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য তারা নিজেরাই ইচ্ছামত নির্ধারণ করত এবং তাদেরকে তা অবশ্যই পালন করতে হতো।

গ—তারা তাদের জন্যে যে কর নির্ধারণ করত তা তাদেরকে বাধ্যতামূলকভাবেই পরিশোধ করতে হতো।

(৪) জমিদারদেরকে পরিচালনা ও বিচার ব্যবস্থার যে সীমাহীন অধিকার দেয়া হয়েছিল তা তারা কোন রাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ী নয়, বরং নিজ খেয়াল-খুশীমত প্রয়োগ করত এবং এ ব্যাপারে রাষ্ট্র কোন বাধার সৃষ্টি করতে আসত না।

(৫) সামন্তবাদী ব্যবস্থার পতনের যুগে কোন কৃষক আযাদী হাসিল করতে চাইলে তাকে বাধ্যতামূলকভাবে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমিদারকে প্রদান করতে হতো।

সামন্তবাদী ব্যবস্থার এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে সামনে রেখে কে বলতে পারে যে, ইসলামের সাথে এগুলোর দূরতম সম্পর্কও বর্তমান? ইসলামী ইতিহাসের কোন যুগেই এর কোন অস্তিত্ব নেই।

ইসলাম ও কৃষি গোলামী

ইসলাম কৃষি গোলামী (Serfdom)-কে বিন্দুমাত্রও বরদাশত করে না। উহা গোলামীর একটি মাত্র অস্থায়ী রূপ ছাড়া অন্য কোন রূপকে আদৌ সমর্থন করে না। সেই রূপটির যাবতীয় কারণ ও পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্বন্ধে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। উহার আলোকে কোন চাষীকে এক টুকরো জমিনের সাথে আবদ্ধ করে রাখার দাসত্বকে কখনো বৈধ বলার অবকাশ নেই। ইসলামী ইতিহাসে মাত্র এক প্রকার গোলামীই বর্তমান। এরা বিভিন্ন যুদ্ধে বন্দী হয়ে মুসলমানদের হস্তগত হতো। এতে করে দেখা যায় যে, প্রাথমিক ইসলামী সমাজে গোলামদের সংখ্যা স্বাধীন নাগরিকদের চেয়ে খুবই নগণ্য ছিল। এরা মালিকদের ক্ষেতে কাজ করত। পরিশেষে হয় মালিক স্বেচ্ছায় তার গোলামকে আযাদ করে দিত। নতুবা গোলাম নিজে 'মুকাতাবত' চুক্তির অধীনে কিছু অর্থের বিনিময়ে আযাদ হয়ে যেত। পাশ্চাত্যের সামন্তবাদী ব্যবস্থায় গোলামদের স্বাধীনতা লাভের এইরূপ কোন সুযোগ বর্তমান নেই। কেননা সে ব্যবস্থায় কিষাণ, চাষী বা শ্রমিকদেরকে স্বাধীনতা দেয়ার আদৌ কোন ইচ্ছা ছিল না। বরং এর সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে এরূপ চেষ্টা করা হয়েছে যে, গোলামীকে স্থায়ী করে তোলা হোক—কিষাণ, চাষী বা শ্রমিকরা আযাদীর চেষ্টা করেও যেন আযাদ হতে না পারে তার জন্যে সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হোক। পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে কৃষককে কৃষি-গোলাম মনে করা হতো। জমিনের সাথে সাথে এরূপ গোলামের বেচাকেনাও সম্পন্ন হতো। এ কারণে কোন জমিদার যখন কোন জমিন বেচে ফেলত তখন ঐ জমিনে যে কৃষকরা কাজ করত তারাও বিক্রি হয়ে যেত এবং নতুন মালিকের স্বত্ব বলে বিবেচিত হতো। এই কৃষি-গোলামরা যে জমিনে কাজ করত সে জমিন ত্যাগ করে অন্য কোথাও যেতে পারত না এবং জমিদারের যাবতীয় খেদমত ও চাকুরী থেকে অব্যাহতি লাভেরও কোন অধিকার পেত না। ইসলাম এই প্রকার কৃষি-গোলামীর কথা চিন্তাও করতে পারে না। উহা জীবন-মরণের মালিক এক ও লা-শরীক আল্লাহর গোলামী ছাড়া অন্য কারুর গোলামী ও আনুগত্যকে কখনো স্বীকার করে না। উহার স্পষ্ট বক্তব্য ঃ কোন মাখলুক বা সৃষ্টজীবের এমন কোন অধিকার নেই যে, তার ন্যায় অন্য কোন মাখলুককে তার গোলাম বানিয়ে রাখবে। কেননা এরূপ হওয়াটাই প্রকৃতি বিরোধী। এরূপ হওয়ার পেছনে নিশ্চয়ই কোন না কোন অনৈসলামিক উপাদান সক্রিয় থাকবে। ইসলাম এ ধরনের গোলামীকে একটি অস্থায়ী রূপ বলে মনে করে। এবং একে কোন মতেই স্থায়ী করতে চায় না ;—চায় উহার যাবতীয় উপায় ও অবলম্বনের সাহায্যে উহাকে চিরতরে বিলুপ্ত করে দিতে। এ কারণেই উহা একদিকে গোলামদের মধ্যে স্বাধীনতা লাভের স্পৃহা জাগ্রত করে দেয় এবং অন্যদিকে

স্বাধীনতাকামী গোলামদের সর্ববিধ সহায়তা দান রাষ্ট্রীয় কর্তব্য বলে বিধান দিয়েছে।

অর্থনৈতিক জীবনের গণ্ডিতেও ইসলাম এক মানুষের অধীনে আর একজন মানুষের দাসত্বকে কখনো সমর্থন করে না। উহা যুদ্ধবন্দীদেরকে গোলাম বানাবার অনুমতি সন্তুষ্টচিত্তে দেয়নি, দিয়েছে একান্ত নিরুপায় হয়ে। কেননা তখনকার পরিবেশে এই সমস্যার অধিকতর উৎকৃষ্ট সমাধান অন্য কিছুই ছিল না। যখনই সে সমাধান পাওয়া গেল—গোলামদের মধ্যে মন-মানসিকতার দিক থেকে একটি স্বাধীন সমাজে স্বাধীন নাগরিকদের উপযুক্ততা সৃষ্টি হলো—তখনই ইসলাম তাদের জন্যে আযাদীর পথ উন্মুক্ত করে দিল।

ইসলামী অর্থনীতির ভিত্তি

ইসলামী অর্থনৈতিক কাঠামো কাজের স্বাধীনতা, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং একে অন্যের সেবার প্রেরণার ভিত্তিতে রচনা করা হয়েছে। এ কারণেই ইসলামী সরকার উহার আওতাভুক্ত সকল অসহায় ও অক্ষম লোকদের অধিকার ও সুবিধাদির সংরক্ষণ করত ; অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় যারা পেছনে পড়ে গিয়ে জীবনযাপনের ন্যূনতম সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হতো সরকার তাদের অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করত। ইসলামী সমাজে কেউ ভূস্বামীদের গোলাম হয়ে থাকতে বাধ্য হতো না। কেননা স্বয়ং সরকারই নানা উপায় ও পদ্ধতি অবলম্বন করে তাদের স্বাধীনতা লাভের সুযোগ করে দিত। কিন্তু এর বিনিময়ে সরকার কখনো তাকে অপদস্থ করত না—তার স্বাধীনতা ও আত্ম-সম্মানবোধেও কোন আঘাত দিত না। আভ্যন্তরীণ মানসিকতা ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো উভয় দিক থেকেই ইসলাম সামন্তবাদী ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। উহা এমন এক যুগে আবির্ভূত হয়ে গোটা মানবতাকে সামন্তবাদী লুঠপাট থেকে রক্ষা করেছিল যখন কেউই আর কৃষি গোলামীর (Serfdom) খপ্পরে পড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়নি।

ইসলামী যুগের কৃষক

সামন্তবাদী ব্যবস্থায় কৃষকদের উপর সীমাতিরিক্ত কর্তব্য ও দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হতো। কিন্তু ইসলামী ইতিহাসে এরূপ কৃষকদের কোন অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায় না। ইসলামী যুগে কোন কৃষক অপরাধী সাব্যস্ত হলে ইসলামের দৃষ্টিতে ভূস্বামীর এ অধিকার থাকত যে, সে ইচ্ছা করলে উক্ত জমি তাকে না দিয়ে অন্য কাউকে দিতে পারত। কিন্তু কোন কৃষকের উপর জুলুম বা দুর্ব্যবহার করার কোন অধিকার তার থাকত না। কেননা ইসলাম ভূস্বামী ও কৃষকের পারস্পরিক সম্পর্ককে প্রভু ও গোলামের ভিত্তিতে নয়, বরং স্বাধীনতা ও সাম্যের ভিত্তিতে নির্ধারণ করে দিয়েছে।

ভূস্বামী ও কৃষকের পারস্পরিক সম্পর্কের রূপ

ইসলামের দৃষ্টিতে ভূস্বামী ও কৃষকদের পারস্পরিক আইনগত সম্পর্কের দু'টি রূপ হতে পারে ঃ

(১) পারস্পরিক চুক্তি এবং (২) বর্গাভিত্তিক চাষ (মুজারা'আত)। পারস্পরিক চুক্তির আওতায় কৃষক জমিনে উৎপন্ন সমস্ত ফসলের একটি নির্দিষ্ট অংশ জমিদারকে জমির ভাড়া বাবদ প্রদান করত। অবশিষ্ট ফসলের মালিক হতো এই কৃষক। সে এর সাহায্যে তার নিজের ও পরিবার-পরিজনদের প্রয়োজন মেটাতো। এমনি করে ইসলামী ব্যবস্থায় শুধু কৃষকদের স্বাধীনতাই সকল দিক থেকে নিরাপদ হতো না ; বরং জমিন ও উহার চাষাবাদের যে পদ্ধতি সমীচীন মনে করা হতো তাও অবলম্বন করতে পারত।

মুজারা'আত বা বর্গাভিত্তিক চাষ

অনুরূপভাবে মুজারা'আতের আওতায় কৃষকরা জমিনের ফসলে জমিদারদের সাথে সমান অংশীদার হয়ে যেত। জমিনের চাষাবাদ ও অন্যান্য পর্যায়ে যে অর্থ ব্যয় হতো তা একা জমিদার বহন করত। কৃষক শুধু জমির চাষাবাদ ও দেখা শুনার কাজই করত ; অন্য কোন দায়িত্ব তার থাকত না।

ইসলামী কৃষিনীতির বৈশিষ্ট্য

উপরোক্ত রূপ দু'টির কোনটিতেই জবরদস্তি বা বাধ্যতামূলকভাবে বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করাবার কোন অবকাশ নেই। কোন জমিদারেরই কোন শ্রমিক বা কৃষককে বেগার খাটানোর কোন এখতিয়ার নেই। এমনকি কোন জমিদার যে শাহী ক্ষমতা বা সুবিধা-সুযোগের মালিক হয়ে কৃষকদেরকে সীমাতিরিক্ত ডিউটির যাঁতাকলে তাদের মৌলিক অধিকার ছিনিয়ে নেবে এমন কোন সুযোগও বর্তমান নেই। কেননা ইসলাম জমিদার ও কৃষকদের সম্পর্কের ভিতকে একই রূপ আযাদী, একই রূপ কর্তব্য, একই সুবিধা এবং কিছু নেও কিছু দেও" (Give and Take)-এর সাম্যের উপর রচনা করেছে।

জমি বেছে নেয়ার স্বাধীনতা

ইসলামী নীতির প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, কৃষকদের এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে যে, জমিনের যে কোন খণ্ডই সে স্বেচ্ছায় ভাড়ার চুক্তিতে বেছে নিতে পারে। অনুরূপভাবে যে কোন জমিদারের যে কোন জমি মুজারা'আতের জন্য নিতে পারে এবং যখন ইচ্ছে তখনই ছেড়ে দিতে পারে।

চুক্তিতে সমতার বিধান

এই ব্যবস্থাপনার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, জমি সংক্রান্ত চুক্তির সময়ে জমিদারের বিপক্ষে কৃষককেও সমান মর্যাদা দেয়া হয়। কোনরূপ চাপ বা

ভয়-ভীতির কারণে সে চুক্তি করতে বাধ্য নয়। কেননা সেও ইসলামী সমাজের একজন স্বাধীন নাগরিক। সুতরাং এ ব্যাপারে তার পুরোপুরি অধিকার রয়েছে যে, সে যদি এই চুক্তিকে নিজের জন্যে কল্যাণকর বলে মনে না করে তাহলে সে উহা বাতিলও করতে পারে। জমিদার কোন চুক্তিকে তার উপর চাপিয়ে দেয়ার অধিকার রাখে না এবং চুক্তি করতে অস্বীকার করলে জমিদার কোন প্রতিশোধমূলক আচরণও করতে পারে না। মুজারা'আতের ক্ষেত্রেও কৃষকরা জমিদারদের বিপক্ষে আইনগতভাবেই সমান নিরাপত্তালাভের অধিকারী। তারা একে অন্যের সমান অংশীদার। জমির উৎপাদিত ফসল সমান দু'ভাগে ভাগ করে নেয়ার সে হকদার।

অবৈধ ফায়দা লোটার পরিবর্তে সাহায্য প্রদান

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পাশ্চাত্যের সামন্তবাদী ব্যবস্থায় ধর্মীয় ও অন্যান্য মেলা বা উৎসব অনুষ্ঠানে সুখী ও ধনী জমিদারদেরকে খুশী করার জন্যে দরিদ্র কৃষকরা বাধ্যতামূলকভাবে মূল্যবান উপহার পেশ করত। কিন্তু ইসলামী সমাজের চিত্র এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে দরিদ্র কৃষকরা ধনী জমিদারকে কখনো উপহার দেয়নি। বরং তাদের নিকট থেকে তারা হাদিয়া-তোহফা লাভ করত। ইসলামী যুগে সচ্ছল জমিদাররা ঈদ এবং অন্যান্য আনন্দোৎসবে— বিশেষ করে রমযান মুবারকে নিজেদের দরিদ্র কৃষক ভাইদের নিকট হাদিয়া-তোহফা পাঠিয়ে দিত, তাদেরকে দাওয়াত করত এবং সমাজের অন্যান্য অভাবী লোকজনদের সাহায্য করত। অন্য কথায় ইসলামী ব্যবস্থাপনায় সচ্ছল ও ধনী লোকেরা গরীব কৃষকদের নিকট থেকে সভ্য (!) ইউরোপের ন্যায় উপহারের নামে যথাসর্বস্ব কেড়ে নেয়ার পরিবর্তে তাদের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির জন্যে নিজেদের অর্থ-সম্পদ মুক্ত হস্তে ব্যয় করত। সুতরাং স্পষ্টতই দেখা যায় ঃ ইসলামে পাশ্চাত্যের সামন্তবাদী ব্যবস্থার ন্যায় কৃষকদেরকে জবরদস্তি বেগার খাটানো এবং অনাবশ্যক সীমাহীন দায়িত্বের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত করার কোন অবকাশ নেই।

নির্যাতনের হাত থেকে কৃষকদের নিরাপত্তা প্রদান

ইউরোপীয় সামন্তবাদী ব্যবস্থায় কৃষকদেরকে অবৈধভাবে গোলাম বানিয়ে রাখার, জবরদস্তি বেগার খাটাবার ও অন্যান্য নির্যাতনের বিনিময়ে জমিদাররা তাদেরকে অন্যের নির্যাতন ও জুলুম থেকে হেফাযত করার দায়িত্ব গ্রহণ করত। অথচ বাস্তব ঘটনা এই যে, ইসলামী যুগে কৃষকদের এরূপ নিরাপত্তা প্রদানের কোন প্রশ্নই কোন সময়ে উঠেনি। কেননা মুসলমান ভূস্বামী ও অন্যান্য ধনী ব্যক্তিরা এ ধরনের দায়িত্ব স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবেই পালন করেছে এবং ইহার পরিবর্তে তারা কোনদিন বিনিময় দাবী করেনি। শুধু আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার

জন্যেই তারা এই কাজের আঞ্জাম দিয়েছে। বস্তুত এই নিঃস্বার্থ প্রেরণাই অনাবিল বিশ্বাসের ভিত্তিতে রচিত ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে অন্যান্য জীবন-ব্যবস্থার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর বলে প্রমাণ করেছে। এক প্রকার ব্যবস্থায় মানুষ অন্য মানুষের উপকার করাকে ইবাদাত বলে গণ্য করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের জন্যে সচেষ্ট হয়। যখন আরেকটি ব্যবস্থায় নিজেদের ভাইদের উপকার করাও এক প্রকার ব্যবস্থা বলে পরিগণিত হয় এবং এ ক্ষেত্রে প্রত্যেকের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় ঃ মুনাফার অধিক হতে অধিকতর পরিমাণ সে নিজেই হস্তগত করবে এবং অন্যকে ন্যূন কল্পে যতটুকু না দিলে চলে না শুধু ততটুকুই দেবে। সুদের পেছনেও এই জড়বাদী হীন স্বার্থ বর্তমান। সুদের যে বেশী পাওনাদার সেই বাজিমাৎ করে এবং জীবনের সকল সুবিধাই সে যাতে কুক্ষিগত করতে পারে তার জন্যে সচেষ্ট হয়ে উঠে।

জমি নেয়ার স্বাধীনতা

সামন্তবাদী ব্যবস্থার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল ঃ জমিদারের এরূপ অধিকার ছিল যে, সে যাকে যতটুকু ইচ্ছা ততটুকু জমি চাষ করতে দিত এবং নিজের মর্জিমাফিক দায়িত্ব ও বেগার খাটাবার এক লম্বা-চওড়া ফিরিস্তি তৈরী করে কৃষকের ঘাড়ে বাধ্যতামূলকভাবে চাপিয়ে দিত। এটা ছিল কৃষি গোলামীর এক জঘন্য ইউরোপীয় সংস্করণ। ইসলামের সাথে এর বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। কেননা কৃষি গোলামী (Serfdom) ইহা আদৌ সমর্থন করে না। ইসলামে পাট্টার ভিত্তিতে জমি গ্রহণের ক্ষেত্রে কৃষকের হক ও এখতিয়ার তার ইচ্ছা কিংবা আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। কৃষকের বিপক্ষে জমিদারের কোন কথাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয় না। তার অধিকার শুধু এতটুকুই যে, পাট্টা নেয়ার সময়ে কৃষক যে পরিমাণ অর্থ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেবে সেই পরিমাণ অর্থ তাকে যথারীতি দিয়ে যেতে হবে।

অনুরূপভাবে মুজারা'আতের সময়ে কোন্ কৃষক কতটুকু জমি পাওয়ার অধিকারী ? ইসলামী ব্যবস্থায় এটা নির্ধারণের অধিকারও জমিদারকে দেয়া হয়নি। বরং ইহা নির্ভর করত কৃষকের মর্জির উপর। বংশের অন্য কোন ব্যক্তি বিশেষ করে তার পুত্রও যদি কৃষিকার্যে সহায়তা করার জন্যে উপস্থিত হয় এবং অধিক পরিমাণ জমি পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করত তাহলে কোন বাধার সৃষ্টি করা হতো না। মুজারা'আতের নীতি অনুযায়ী কৃষকের যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য কেবল নির্ধারিত জমি পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকত। এবং ফসল না উঠা পর্যন্ত উক্ত জমিনের স্বত্ব যৌথভাবে জমিদার ও কৃষকের থাকত। জমিদারের অন্যান্য জমি ও জায়গীরের দায়িত্ব এই কৃষককে বহন করতে হতো না। এবং ইউরোপীয় চাষীদের ন্যায় অন্য জমিতে কাজ করতে বাধ্য থাকত না।

জমিদার খোদাদের পতন

ইসলাম ও সামন্তবাদী ব্যবস্থার মধ্যে সবচে' গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হচ্ছে এই যে, সামন্তবাদী ব্যবস্থায় জমিদাররা কৃষক-শ্রমিকদের পরিচালনা ও বিচারের ক্ষেত্রে যে বল্গাহীন ও যথেচ্ছ অধিকার লাভ করেছিল তার কোন নযীর কেউ কল্পনাই করতে পারে না। নিজ নিজ এলাকার আওতায় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ব্যাপারেই তারা নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারত। তারাই ছিল সকলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। কিন্তু ইসলাম এসে সামন্তবাদী খোদার মূর্তিকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়। কেননা উহা অহেতুক সুবিধাবাদের ঘোর বিরোধী এবং উহার অপবিত্র স্পর্শ থেকে মানবজীবনকে পরিচ্ছন্ন করে তুলতে চায়।

ইউরোপের আইনব্যবস্থা ও সামন্তবাদ

ইউরোপীয়দের নিকট এমন কোন আইন ব্যবস্থাও ছিল না যার আলোকে তারা জমিদার ও কৃষকদের পারস্পরিক সম্পর্ককে সুবিন্যস্ত করতে সক্ষম হতো। পরবর্তী সময়ে রোমের যে আইন পাশ্চাত্যের আইন রচনায় ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে তা সামন্তদেরকে এত সুপ্রশস্ত ও সীমাহীন এখতিয়ার দান করেছিল যে, পরিশেষে তারা নিজ নিজ জায়গীর ও এলাকায় নিরঙ্কুশ বাদশাহ হয়ে বসেছিল। এ বাদশাহরা প্রজাদেরকে শুধু আইনই দিত না, বরং যথেচ্ছভাবে উহার প্রয়োগও করত। এই সামন্তরা একই সময়ে আইনও রচনা করত এবং পরিচালনা ও বিচারকার্যও সম্পন্ন করত। এরূপ এক দিক থেকে তারা রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্র কায়েম করে বসেছিল। রাষ্ট্রের চাহিদা মোতাবেক যতক্ষণ তারা ফৌজি ও আর্থিক সাহায্য অব্যাহত রাখতে সক্ষম হতো ততক্ষণ সরকার এই ক্ষুদে বাদশাহদের কোন কার্যেই কোন হস্তক্ষেপ করত না।

আইনের শাসন

ইসলাম এক রাষ্ট্রের মধ্যে আরেক রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে বিন্দুমাত্রও বরদাশত করে না। ইসলামী ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার থাকে একমাত্র একটাই। এই সরকারই দেশের আইন অর্থাৎ ইসলামী শরীয়াতকে সকল নাগরিকের জীবনে সামগ্রিকভাবে বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব গ্রহণ করে। উহার দৃষ্টিতে সকল নাগরিক একই রূপ সম্মান ও ইজ্জতের অধিকারী। কোন নাগরিককে কেবল তখনই শাস্তি দেয়া যেতে পারে, যখন সত্যিই তার অপরাধ প্রমাণিত হয়। পরবর্তীকালে সরকার যখন ইসলামী নীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে রাজতন্ত্রের ছাঁচে ঢালাই হয় তখনও তাতে ইসলামী সরকারের কিছু গুণ বর্তমান থাকে ; যেমন, কেন্দ্রীয় সরকারই উহার আওতাধীন সকল নাগরিকের যাবতীয় প্রয়োজন মেটাবার ব্যবস্থা করত এবং তাদের সকল প্রকার সুবিধা-সুযোগের প্রতি লক্ষ্য রাখত। ইসলামী সালতানাতের অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত কর্মতৎপরতার মাঝেও

সর্বত্র একই আইন কার্যকরী ছিল। বস্তুত এই আইনের শাসনই কৃষকদেরকে জায়গীরদারদের জুলুম-নির্যাতন, লুট-পাট এবং যথেচ্ছ পাশবিক আচরণ ও খামখেয়ালীর হাত থেকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে। কেননা তাদের উপর জায়গীরদার বা জমিদারদের নয়, বরং একমাত্র আল্লাহর আইনের শাসন কার্যকরী ছিল—যার দৃষ্টিতে স্বাধীন মানুষ হিসেবে শুধু জমিদার ও কৃষকরাই সমান ছিল না, সকল মানুষ সমান এবং একই রূপ ব্যবহার পাওয়ার অধিকারী ছিল। নিসন্দেহে মুসলমানদের ইতিহাসে দু' একটি ঘটনা এরূপ পাওয়া যায় যে, কিছু মুসলমান বিচারক ন্যায্য ইনসাফের পরিবর্তে ক্ষমতাসীনদের পক্ষ অবলম্বন করে জেনেশুনেই শাসক ও জায়গীরদারদের স্বার্থ রক্ষা করেছে। কিন্তু প্রথমত, ইসলামী ইতিহাসে এরূপ ঘটনার সংখ্যা খুবই নগণ্য। ইউরোপের ঐতিহাসিকরাও একে যৎসামান্য বলে উল্লেখ করেছে। সুতরাং একে ব্যতিক্রম ছাড়া অন্য কিছুই বলা যায় না। দ্বিতীয়ত, এই মুষ্টিমেয় দৃষ্টান্তের বিপক্ষে এত অসংখ্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বর্তমান যে, তাতে বিচারকগণ শুধু জমিদার, গভর্নর বা মন্ত্রিদের বিপক্ষে নয়, বরং স্বয়ং খলীফাদের বিরুদ্ধে এবং গরীব ও শ্রমিকদের পক্ষে ফায়সালা দিয়েছেন। অথচ এ জন্যে কোন বিচারককে বরখাস্তও করা হয়নি। কিংবা তার বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়নি।

চলাফেরার পূর্ণ স্বাধীনতা

ইসলামী ইতিহাসে ইউরোপের "কিষাণ পলায়ন"-এর ন্যায় কোন আন্দোলনের অস্তিত্ব নেই। এর একমাত্র কারণ ছিল ঃ ইসলামী ব্যবস্থায় কৃষকরা শুধু এক জায়গীর থেকে আরেক জায়গীরেই নয়। বরং ইসলামী রাষ্ট্রের বিশাল এলাকায় যেখানে খুশী সেখানে যাওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করত। তারা ইচ্ছামত স্থান বদলাতে পারত। অবশ্য মিসরীয় কৃষকদের ন্যায় কেউ যদি বিশেষ স্থান ত্যাগ করতে না চাইত তাহলে সে কথা ছিল স্বতন্ত্র। মিসর ছাড়া ইসলামী দুনিয়ার সব এলাকার কৃষকরাই চলাফেরার এই স্বাধীনতার মাধ্যমে নানাভাবে উপকৃত হয়েছে। কেননা তারা মিসরীয় কৃষকদের মত এক নির্দিষ্ট স্থানের মোহে আবদ্ধ হয়ে থাকেনি এবং ইউরোপীয় কৃষকদের মত নানাবিধ আইন ও সামাজিক নির্যাতনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিতও হয়নি।

স্বাধীনতা জন্মগত অধিকার

ইউরোপীয় সামন্তবাদের ইতিহাসের শেষ যুগে কৃষকরা কেবল মূল্য দিয়েই তাদের স্বাধীনতা ক্রয় করতে পারত। কিন্তু মুসলমানদের ইতিহাসে এ ধরনের কোন নযীর নেই। এর পরিষ্কার কারণ হলো ঃ ইসলামী ইতিহাসে কৃষকদেরকে কখনো কৃষি গোলাম বানানো হয়নি। তারা স্বাধীন হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে এবং স্বাধীনতার সকল অধিকারই তারা অর্জন করেছে। এ পর্যায়ে অন্যান্য কোন

শ্রেণীর লোকদের সাথে কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং ইউরোপীয় কৃষকদের মত তাদের অর্থ দিয়ে স্বাধীনতা ক্রয়ের কোন প্রশ্নই উঠেনি।

মুসলমান জায়গীরদারদের জনহিতকর কাজ

এই প্রসংগে আমাদের আরো একটি বিষয় স্মরণীয়। সেটি হলো ঃ ইতিহ-াসের প্রতিটি যুগে ইসলামী দুনিয়ায় ছোট-বড় জায়গীর দেখা যায়। এগুলোর আয় থেকে শুধু যে তারা নিজেদের প্রয়োজন মেটাতো তা-ই নয়, বরং স্থল ও নৌপথের বাণিজ্য পরিচালনা এবং শিল্প ও কারিগরীর পৃষ্ঠপোষকতাও করত। অন্য কথায় তাদের এই ভূমিকার ফলে সামাজিক ও জাতীয় কল্যাণের পথ সুপ্রশস্ত হতো। পক্ষান্তরে ইউরোপে যখন সামন্তবাদের অভ্যুদয় ঘটে তখন উহার প্রবল স্রোতে শিল্প ও ব্যবসায়ের যেটুকু যা পূর্বে ছিল তা খড়কুটার মত ভেসে গেল। এরপরে গোটা ইউরোপে মানসিক অবনতি এবং শিক্ষাগত স্থবিরতা যুগের পর যুগ ধরে চলতে থাকে। পরিশেষে ইসলাম এসে তাদেরকে মূঢ়তার অন্ধকার থেকে বের করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে সমুজ্জ্বল করে তোলে। এর একটি সুযোগ হয়েছিল ক্রুসেডের সময়ে। তখনই সমগ্র ইউরোপ প্রথমবারের মত ইসলামী দুনিয়ার সংস্পর্শে এসেছিল। আর দ্বিতীয় সুযোগ হয়েছিল যখন স্পেন ভূখণ্ডে তারা মুসলমানদের সম্মুখীন হয়েছিল। ইউরোপ ও ইসলামের এই সম্পর্কের ফলে একদিন জ্ঞানের রাজ্যে রেনেসাঁ আন্দোলনের সৃষ্টি হয় এবং গোটা ইউরোপ ধীরে ধীরে বহু শতাব্দীর ধর্মীয় ও শিক্ষাগত স্থবিরতার হাত থেকে মুক্তিলাভ করে।

ইসলামী দেশসমূহে সামন্তবাদ

ইসলামী দুনিয়ায় ইসলাম যতদিন সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় শক্তি হিসেবে কার্যকর ছিল ততদিন কোন ইসলামী দেশেই সামন্তবাদ প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। কেননা আধ্যাত্মিক ও অর্থনৈতিকভাবে এবং মৌলিক বিশ্বাস ও বুনিয়াদী চিন্তাধারার ক্ষেত্রে ইসলাম ও সামন্তবাদ একটি আরেকটির সম্পূর্ণ বিপরীত। যে সকল কারণ ও পরিবেশের উপর ভিত্তি করে সামন্তবাদ গড়ে উঠে ইসলাম তার প্রত্যেকটিকে অংকুরে বিনষ্ট করে দেয়। মুসলিম ইতিহাসের উমাইয়া ও আব্বাসী যুগে যে জায়গীরদারী ব্যবস্থা দেখা যায় তার পরিসর ও প্রভাব একান্তভাবেই সীমিত। উহা কখনো এতদূর বিস্তার লাভ করেনি যাতে করে উহাকে মুসলমানদের সমাজ জীবনের কোন অপরিহার্য অংগ বলে সাব্যস্ত করা যেতে পারে।

ইসলামী দুনিয়ায় পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব

উসমানী শাসনের পতনের শেষ যুগে ইসলামী দুনিয়ায় সামন্তবাদের কিছু প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু তখন ছিল এমন একটি যুগ যখন মুসলমানদের

ঈমান ও আকীদা দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং তাদের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের নিয়ন্ত্রণ এমন লোকদের হাতে চলে গিয়েছিল যারা শুধু নামে মাত্রই মুসলমান ছিল। ঠিক এই যুগেই যখন পাশ্চাত্যের আল্লাহবিমুখ, জড়বাদী ও ধ্বংসাত্মক সভ্যতা বিজয়ীবেশে ইসলামী দুনিয়ায় প্রবেশ করে, তখন পরিস্থিতি আরো শোচনীয় হয়ে উঠে। এই নতুন সভ্যতা মুসলিম দেশসমূহে ষড়যন্ত্রের পর ষড়যন্ত্র করে সামরিক অভ্যুত্থানের সৃষ্টি করে, তাদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে ফেলে, পারস্পরিক সৌহার্দ ও সহযোগিতার প্রেরণাকে বিনষ্ট করে দেয় এবং উহার স্থলে পুঁজিবাদী লুঠপাট ও আত্মসাতের জঘন্য লীলা সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়। আর এর অনিবার্য ফল স্বরূপ গরীব শ্রেণীর লোকেরা এমন এক দুর্ভাগ্য ও প্রবঞ্চনার নির্মম শিকারে পরিণত হলো যে, উহার অক্টোপাস থেকে আজও তারা মুক্তিলাভ করতে পারেনি। ইউরোপ থেকে আমদানী করা সামন্তবাদ এখনও কিছু সংখ্যক মুসলিম দেশে উহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে পুরোপুরি বর্তমান।

বর্তমান ইসলামী দুনিয়ায় যে সামন্তবাদ চলছে তার জন্যে ইসলাম বা ইসলামী সমাজব্যবস্থাকে বিন্দুমাত্রও দায়ী করা যায় না। কেননা ইসলাম না একে সৃষ্টি করেছে, না এর স্থিতি ও বিস্তৃতির জন্যে কোন ভূমিকা রেখেছে। এ জন্যে ইসলামকে শুধু তখনই দায়ী করা যেত যখন মুসলিম দেশসমূহে বাস্তবেই ইসলামী সরকার কার্যকরী থাকত এবং একমাত্র ইসলামী আইন-কানুনই প্রচলিত থাকত। এখন যে সকল "মুসলিম (!)" শাসক এই দেশসমূহের হর্তাকর্তা-বিধাতা তারা ইসলামী শাসনের কোন ধার ধারে না। বরং ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ধার করা আইন অনুসারে দেশ পরিচালনা করছে।

আলোচনার কয়েকটি বিশেষ দিক

আলোচনা প্রসংগে এমন কিছু সত্যকে উদঘাটিত করা হয়েছে যাকে কেন্দ্র করে আধুনিক বিশ্বের বহু মতাদর্শের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

এক ৷৷ সামন্তবাদের প্রতিষ্ঠায় কেবল ব্যক্তিগত মালিকানাই কার্যকরী নয় যে, উহার বিপক্ষে অন্য লোকদের চেষ্টার আদৌ কোন গুরুত্ব ছিল না। বরং সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থায় মালিকানা নীতি এবং জমিদার ও ভূমিহীনদের পারস্পরিক সম্পর্কের ফলেই উহা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। এ কারণেই ইসলামী যুগে ব্যক্তি মালিকানা প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও সামন্তবাদী ব্যবস্থার উল্লেখ ও বিস্তৃতি কোনদিনই সম্ভবপর হয়নি। ইসলাম নিছক একটি জীবনদর্শনই নয়, বরং বাস্তব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের সুষ্ঠু সামঞ্জস্য নিয়েই ইসলাম। বস্তুত উহা সমাজের সকল সদস্যের মধ্যে এমন এক অনাবিল

ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রচনা করে দেয় যাতে করে কোন সামন্তবাদী ব্যবস্থা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতেই না পারে।

দুই ॥ ইউরোপে যদি সামন্তবাদী ব্যবস্থার অভিশাপ অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে তার অর্থ এই নয় যে, এটা মানবীয় উন্নতির এমন এক মঞ্জিল যা অতিক্রম করা একান্তই অপরিহার্য। ইউরোপের এই অভিশাপে জর্জরিত হওয়ার একমাত্র কারণ ছিল সেখানে কোন নিখুঁত প্রত্যয় ও আদর্শ জীবন পদ্ধতির অস্তিত্বই ছিল না—যাতে করে মানবীয় সম্পর্কসমূহকে সমুন্নত করার কোন সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। একমাত্র ইসলামী দুনিয়ায় এই নেয়ামত বর্তমান ছিল এবং ছিল বলেই তারা উক্ত অভিশাপ থেকে বেঁচে গিয়েছে। ইউরোপে যদি এই নেয়ামত বর্তমান থাকত তাহলে সেখানে সামন্তবাদী ব্যবস্থা কোনদিন বিস্তারলাভ করতে পারত না।

তিন ॥ অর্থনৈতিক প্রগতির বিভিন্ন স্তর তথা প্রাথমিক সমাজতন্ত্র, দাসপ্রথা, সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ এবং দ্বিতীয় সমাজতন্ত্র—যা সমাজতন্ত্রীদের "দ্বন্দ্বগত জড়বাদ (Dialectical Materialism) নামক দর্শন হিসেবে মানবেতিহাসের এক অপরিহার্য অধ্যায়ে পরিণত হয়েছে—একমাত্র ইউরোপীয় ইতিহাসের পাতায় বর্তমান ; অন্য কোথাও এর অস্তিত্ব নেই। আর এগুলোর পশ্চাতে কোন শাশ্বত সত্যও নেই। ইউরোপের বাইরে দুনিয়ার কোন জাতিই উপরোক্ত স্তরগুলোর সম্মুখীন হয়নি। ইসলামী দুনিয়ার অবস্থাও অনুরূপ। তার ইতিহাসে সামন্তবাদের কোন অধ্যায় নেই, না সমান্তবাদের কোন স্তর বিরাজমান, আর না এরূপ কোন স্তর আসার সম্ভাবনা বর্তমান।

ইসলাম ও পুঁজিবাদ

ইসলামী দুনিয়ায় নয়, বরং ইউরোপেই পুঁজিবাদের জন্ম। এটা ছিল মেশিন আমদানীর প্রত্যক্ষ ফল। আর ঘটনাক্রমে মেশিন আবিষ্কৃত হয় ইউরোপে এবং সেখান থেকেই এটা দুনিয়ার অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে।

ইসলাম কি পুঁজিবাদের সমর্থক ?

ইসলামী দুনিয়া যখন পুঁজিবাদের সাথে পরিচিত হয় তখন পর্যন্ত পুঁজিবাদ ইউরোপের বিশেষ রঙে রঞ্জিত হয়ে উঠে। অন্যদিকে ইসলামী দুনিয়ার দুর্ভাগ্য ও পতন তখন আসন্ন। এবং তার সর্বত্রই মূর্খতা, দরিদ্রতা ও অধোগতির আলামত একেবারে স্পষ্ট। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আগমনের ফলে ইসলামী দুনিয়ায় কিছু বস্তুগত উন্নতি সাধিত হয়েছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু এর প্রতি লক্ষ্য করে অনেকেই এরূপ ভুল ধারণা পোষণ করেছে যে, ইসলাম পুঁজিবাদের সমর্থক এবং পুঁজিবাদের বর্তমান ত্রুটিসহ এটাকে নিজেদের মনে করতে কোন আপত্তি করে না। কেননা পুঁজিবাদের সাথে ইসলামের কোন মূলনীতি ও মৌলিক বিধানের কোন সংঘর্ষ নেই। বরং ইসলামে নাগরিকদেরকে যে ব্যক্তি মালিকানার অধিকার দেয় তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম পুঁজিবাদের পরিপন্থী নয়। বস্তুত এ হচ্ছে ইসলামের বিরুদ্ধে এক জ্বলজ্যান্ত মিথ্যা অপবাদ এর উত্তরে পুঁজিবাদের সমর্থকদের নিকট বলতে চাই ঃ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সুদী কারবার ও ইজারাদারীর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ইসলাম এর প্রত্যেকটিরই ঘোর বিরোধী। এবং আজ থেকে শত সহস্র বছর পূর্বে ইসলাম এটাকে হারাম ও নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছে। শুধু এই কথাটিই ইসলাম এবং পুঁজিবাদের মৌলিক পার্থক্য বিশ্লেষণ করার জন্যে যথেষ্ট।

যদি ইসলামী দুনিয়ায় মেশিন আবিষ্কৃত হত

আসুন একবার সমীক্ষা নিয়ে দেখা যাক, যদি ইসলামী দুনিয়ায় মেশিন আবিষ্কৃত হতো এবং তার ফলে যে অর্থনৈতিক প্রগতি ও স্বাচ্ছন্দের পরিবেশ সৃষ্টি হতো সে সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভংগী কি হতো এবং শ্রম ও উৎপাদনের শৃংখলা বিধানের জন্যে কোন্ ধরনের নিয়ম-কানুন রচনা করা হতো ?

পুঁজিবাদের প্রাথমিক যুগ

সকল অর্থনীতি বিশারদ এ বিষয়ে একমত, এমনকি পুঁজিবাদের মহাশত্রু কার্লমার্কসও একথা সমর্থন করেন যে, প্রাথমিক যুগে সকল মানুষই পুঁজিবাদ দ্বারা বহু উপকৃত হয়েছে, গোটা দুনিয়া তার মাধ্যমে উন্নতি ও সমৃদ্ধির নব নব মঞ্জিলের সাথে পরিচিত হয়েছে, উৎপাদন ও ফসল বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে,

পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে, জাতীয় মাধ্যমসমূহের প্রচলন ব্যাপক হয়ে উঠেছে এবং শ্রমিক ও মজুরদের জীবনযাপনের মান আগের চেয়ে—যখন তার একমাত্র ভিত্তি ছিল চাষাবাদ—বহুগুণ উন্নত হয়েছে।

অধোপতনের সূচনা

কিন্তু পুঁজিবাদের এই যুগ শীঘ্রই শেষ হয়ে যায়। কেননা তার স্বাভাবিক উন্নতির আড়ালে ক্রমে ক্রমে সকলের সম্পদ কয়েকজন পুঁজিবাদীর হাতে পুঞ্জিভূত হয়ে উঠে এবং গরীব, কৃষক ও শ্রমিকরা উক্ত সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। এতে করে শ্রমিক সংগ্রহ করা পুঁজিপতিদের জন্যে খুব সহজ হয়ে পড়ে এবং তাদের মেহনতের ফলে তাদের সম্পদ ও বাণিজ্যে অকল্পনীয় উন্নতি সাধিত হয়। কিন্তু তাই বলে তারা শ্রমিকদের—যারা সমাজতন্ত্রীদের মতে উৎপাদন বৃদ্ধির মূল কারণ—পারিশ্রমিক বৃদ্ধি করতে আদৌ সম্মত হয়নি। অথচ তাদের পারিশ্রমিক এত কম ছিল যে, ন্যূনতম মানসম্পন্ন জীবনযাপনও তাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তাদের মেহনতের ফলে যে মুনাফা হতো তা তাদের মুনিবরা হস্তগত করতো এবং নিজেদের আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের জন্যে দু' হাতে খরচ করতো।

পুঁজিবাদের ধ্বংসাত্মক কুফল

শ্রমিকদের এই নামমাত্র পারিশ্রমিক প্রদানের একটি ফল হলো এই যে, পুঁজিবাদী দেশসমূহের অধিবাসীদের ক্রয় ক্ষমতা বহুলাংশে হ্রাস পায় এবং তাদের উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী স্তুপ আকারে জমা হতে থাকে। এ কারণে পুঁজিপতিরা তাদের মাল বিক্রির নতুন নতুন বাজার সন্ধান করতে থাকে। এই সন্ধানের ফলেই একদিন উপনিবেশবাদ বাজার সৃষ্টি এবং কাঁচামাল সংগ্রহের তাগিদে আন্তর্জাতিক দাসত্বের দ্বার উন্মোচিত হয়। আর পরিশেষে যুক্তিসংগত কারণেই মানবতা বিধ্বংসী মহাযুদ্ধের সূচনা হয়।

স্থায়ী মন্দা বাজার

এ কারণেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রতিনিয়তই মন্দা বাজারের আশংকায় ভোগে। অপর্যাপ্ত পারিশ্রমিক এবং ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের বিপক্ষে চাহিদা হ্রাস পাওয়ার ফলে এই মন্দাভাব দেখা দেয়। বস্তুত এক একটি স্বল্পকালীন বিরতির পরেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এরূপ স্থায়ী সংকটে পতিত হয়।

খোড়া যুক্তি

কিছু সংখ্যক বস্তুবাদী লেখক বলছে ঃ পুঁজিবাদের এই খারাপ দিকগুলো পুঁজিরই স্বাভাবিক পরিণতি। পুঁজির সাথে এটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পুঁজিপতিদের বদ মতলব বা লুঠপাটের ঘৃণ্য উদ্দেশ্যের সাথে এর কোন সম্পর্ক

নেই। কিন্তু এই যুক্তিটি এত খোড়া যে একে মেনে নিলে একথাও স্বীকার করে নিতে হয় যে, চিন্তা ও প্রেরণার যত শক্তিই থাক না কেন, মানুষ তার অর্থনৈতিক অবস্থা ও বাস্তব ঘটনাবলীর হাতে নিছক খেলনার পুতুল মাত্র।

ইসলামের নীতি ঃ সমান মুনাফা

পুঁজিবাদের প্রাথমিক যুগে তা দ্বারা মানুষ যে উপকৃত হয়েছে, যে বস্তুগত উন্নতি ও সচ্ছলতা লাভ করেছে, ইসলাম তার কোনটিকেই অস্বীকার করে না এবং কোনটির বিরোধিতাও করে না। কিন্তু ইসলামী দুনিয়ায় উহা আবির্ভূত হলে ইসলাম উহাকে বল্গাহীনভাবে ছেড়ে দিত না ; বরং তার জন্যে এমন আইন-কানুন রচনা করতো যাতে করে শোষণ বা 'এক্সপ্লয়েটেশান'-এর কোন অবকাশই থাকত না। পুঁজিপতিদের কোন মতলব বা পুঁজি নিয়োগের কোন বৈশিষ্ট্যই একে রুদ্ধ করতে পারত না। ইসলাম এই পর্যায়ে যে মূলনীতি আমাদেরকে দিয়েছে তার আলোকে মালিকের ন্যায় শ্রমিকরাও মুনাফা লাভের অধিকারী। ইমাম মালেক (র)-এর মতে মালিক ও শ্রমিক মুনাফার সমান অংশীদার ; কেননা উক্ত মুনাফায় পুঁজির হিসসা যতটুকু বর্তমান, মেহনতের হিসসাও ততটুকু বর্তমান।

ইসলামী আইনের এই ধারায় একথা সুস্পষ্ট যে, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম যে কতদূর তৎপর তা কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু ইসলামে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার এই উদ্যোগ কোন বস্তুগত প্রয়োজন, কোন বাধ্যবাধকতা কিংবা কোন শ্রেণী সংগ্রামের ফলশ্রুতি হিসেবে গৃহীত হয়নি, বরং এটি ছিল তার আভ্যন্তরীণ মানসিক বিপ্লবের স্বাভাবিক ফল।

প্রাথমিক যুগে যাবতীয় শিল্প ও কারিগরী ছিল একান্তই সহজ ও সরল। এবং শ্রমিকরা হাতেই করতো বেশীর ভাগ কাজ। ইসলামের উপরোক্ত নীতির আলোকে পুঁজি ও মেহনতের পারস্পরিক সম্পর্ককে যদি মজবুত করে তোলা হতো তাহলে এমন একটি ন্যায়বিচার ভিত্তিক পরিবেশ সৃষ্টি হতো যাতে করে ইউরোপের তথাকথিত পুঁজিবাদের ধ্বংসাত্মক কুফলগুলো কখনো পরিদৃষ্ট হতো না।

সুদী ব্যাংক এবং ঋণ

অর্থনীতি বিশারদদের মতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যখন প্রাথমিক "উৎকৃষ্ট যুগ" থেকে বর্তমান "নিকৃষ্ট যুগে" পদার্পণ করে তখন থেকে জাতীয় ঋণদানই তার প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায়। এ জন্যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হলো। ব্যাংক মালিকরা অর্থনৈতিক কার্যক্রম এমনভাবে বিন্যস্ত করলো যে, তারা সুদ গ্রহণ করে সরকারকে ঋণ দিতে শুরু করে। ব্যাংক কার্যক্রমের অর্থনৈতিক ও আনুষ্ঠানিক

জটিলতার দিকে না গিয়ে পাঠকদের সমীপে আমরা এতটুকু বলতে চাই যে, এই ঋণদান এবং ব্যাংকের অধিকাংশ কার্যক্রমই সুদের ভিত্তিতে চলছে। অথচ ইসলাম এই সুদকে পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিষিদ্ধ করে দিয়েছে।

পুঁজিবাদের দ্বিতীয় ভিত্তি

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ব্যবসায় প্রতিযোগিতা। এর ফলে ছোট ছোট ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান সমূলে ধ্বংস হয়ে যায় কিংবা ঐগুলো একত্র হয়ে বড় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিযোগিতা করতে শুরু করে। এখান থেকেই ইজারাদারী (Monopoly) অস্তিত্বলাভ করে। কিন্তু ইসলাম ইজারাদারীরও ঘোর বিরোধী। হযরত বিশ্বনবী (সা) এরশাদ করেন ঃ

مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ -

"যে ইজারাদারী কায়েম করে সে পাপী।"

–(মুসলিম, আবু দাউদ ও তিরমিযী)

এই হলো পুঁজিবাদের দু'টি প্রধান ভিত্তি। ইসলাম নীতিগতভাবেই এর উভয়টির বিরোধী। এরপর ইসলাম ও পুঁজিবাদ যে এক নয় এ ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ অবশিষ্ট থাকে না। অবশ্য ইসলামের আওতায় যদি পুঁজিবাদের উদ্ভব হতো তাহলে উহার বর্তমান "নিকৃষ্ট যুগের" দোষগুলো কখনো সৃষ্টি হতো না এবং পুঁজিবাদের অন্যায় শোষণ, ঘৃণ্য উপনিবেশবাদ এবং ধ্বংসাত্মক যুদ্ধও কোনদিন সংঘটিত হতো না।

ইসলামী দুনিয়ায় শিল্প বিপ্লব হলে ইসলাম কী রূপে স্বাগত জানাবে

ইসলামী দুনিয়ায় শিল্প বিপ্লব হলে তাকে নিজের রঙে রঞ্জিত করতে আদৌ কোন অসুবিধা হতো না। তা শিল্প ও কারিগরীকে ছোট ছোট কারখানা পর্যন্ত —যে গুলোর মুনাফা মালিক ও শ্রমিকরা আপোষে বন্টন করে নিত—সীমাবদ্ধ করে রাখার জন্যে জোর দিত না। ফলে উৎপাদনের মাত্রা বহুল পরিমাণে বেড়ে যেত। অথচ মালিক ও শ্রমিকের সেই ধরনের সম্পর্ক কোন দিন গোচরীভূত হতো না যা উনিশ ও বিশ শতকের ইউরোপে (এক অভিশাপ রূপে) বিরাজমান। তার পরিবর্তে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এমন নীতির ভিত্তিতে নির্ণীত হতো যা আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি—যা যাবতীয় মুনাফাকে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সমান হারে বন্টন করার নির্দেশ দেয়।

এই ইসলামী নীতি অনুসরণ করার পর সুদ ও মওজুদদারী বিলুপ্ত হয়ে যেত এবং শ্রমিকরাও সেই বে-ইনসাফী, দরিদ্রতা ও লাঞ্ছনার হাত থেকে

অব্যাহতি লাভ করতো যা ইউরোপের পুঁজিবাদী ব্যবস্থার এক নির্মম বৈশিষ্ট্য হিসেবে পরিচিত।

সমাজতান্ত্রিক দাবীর প্রতিবাদ

ইসলাম সম্পর্কে ধারণা করা হয় ঃ বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, শ্রেণী সংগ্রাম ও অর্থনৈতিক চাপের মুখে সমাজতান্ত্রিক আইন-কানুনে যেমন পরিবর্তন এসেছে ঠিক তেমনি করে ইসলামের সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্যে তার আইন-কানুনেও আপনা আপনি বিভিন্ন সংস্কার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হয়েছে। এই ধারণা সম্পূর্ণরূপেই ভিত্তিহীন ও নিবুর্দ্ধিতামূলক। পূর্বেই আমরা প্রমাণ করেছি, দাসপ্রথা, সামন্তবাদ এবং প্রাথমিক পুঁজিবাদের যাবতীয় সমস্যার সমাধানে ইসলাম কীরূপে তার শ্রেষ্ঠত্বের আসন অধিকার করেছে। ইসলাম যে সর্বাত্মক সংস্কার সাধন করেছে তার কোনটার পেছনেই কোন বাইরের চাপ বর্তমান ছিল না ; বরং তার পশ্চাতে সক্রিয় ছিল ইসলামের অমোঘ নীতি ও শাশ্বত সুবিচার। সমাজতন্ত্রী লেখকরা ইসলামী নীতির কঠোর সমালোচনা করে থাকে। অথচ বাস্তব ঘটনা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের আদর্শ সমাজতান্ত্রিক (!) দেশ রাশিয়া সমান্তবাদী যুগ অতিক্রম করার পর ধনতান্ত্রিক যুগ অতিক্রম না করেই সরাসরি সমাজতান্ত্রিক যুগে প্রবেশ করেছে। অন্য কথায়, যে রাশিয়া কার্লমার্কসের দর্শনের একনিষ্ঠ প্রচারক তা বাস্তব কাজের মাধ্যমেই তার এ দর্শনকে অস্বীকার করেছে যে, প্রতিটি মানবসমাজকেই তাদের উন্নতির যুগে অবশ্যই নির্ধারিত যুগগুলোকে অতিক্রম করতে হবে।

ইসলাম ও উপনিবেশবাদ

উপনিবেশবাদী ব্যবস্থা, যুদ্ধ, অন্যান্য জাতির শোষণ এবং পুঁজিবাদের বিশ্বব্যাপী ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। ইসল-াম তার ঘোর বিরোধী ; নিজেদের উপনিবেশ স্থাপন কিংবা অন্য লোকদেরকে নিজেদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাও ইসলাম পসন্দ করে না। ইসলাম শুধু এক প্রকার যুদ্ধেরই অনুমতি দেয়। আর তাহলো ঃ জুলুম ও আক্রমণের বিরুদ্ধে কিংবা আল্লাহর কালেমা প্রতিষ্ঠার পথে শান্তিপূর্ণ মাধ্যমসমূহ ব্যর্থ হয়ে গেলে।

একটি ভিত্তিহীন ধারণা

সমাজতন্ত্রীও তাদের সমমনা লোকদের মতে উপনিবেশবাদ মানুষের উন্নতির একটি অপরিহার্য স্তর। একটি নিছক অর্থনৈতিক ব্যাপার হিসেবেই এটাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। শিল্পোন্নত দেশসমূহের উদ্বৃত্ত পণ্য সামগ্রী দেশের বাইরে বাজারজাত করণের জন্যে এটা ছিল অপরিহার্য। সুতরাং কোন নৈতিক

মতাদর্শ অথবা কোন নীতিমালাই এর সৃষ্টির পথ যেমন বন্ধ করতে পারে না। তেমনি এর হাত থেকে নিষ্কৃতিও লাভ করতে পারে না।

একটি প্রশ্ন

এখানে এ সত্যের পুনরাবৃত্তি একেবারেই নিষ্প্রয়োজন যে, মানুষের উন্নতির জন্যে উপনিবেশবাদকে একটি অপরিহার্য স্তর হিসেবে গণ্য করার অলীক কল্পনাকে ইসলাম কখনো সমর্থন করে না। সমাজতান্ত্রীরা এই দাবীও করে থাকে যে, শ্রমিকদের ডিউটির সময় কমিয়ে দিয়ে এবং উৎপন্ন দ্রব্যে তাদের অংশ বৃদ্ধি করে রাশিয়া তার উদ্বৃত্ত পণ্যের সুষ্ঠু সমাধান করতে সক্ষম হবে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া যদি এরূপে উদ্বৃত্ত পণ্য সমস্যার সমাধান করতে পারে তাহলে অন্যান্য ব্যবস্থা কি এমনি করে এ সমস্যার সমাধান করতে পারে না ? সুতরাং উপনিবেশবাদের স্তর অতিক্রম করা কেমন করে অপরিহার্য বলে গণ্য হতে পারে ?

একটি পুরানো সমস্যা

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, উপনিবেশবাদ মানবীয় প্রকৃতির একটি চিরন্তন দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ। এর সূচনা পুঁজিবাদের প্রভাবে হয়নি—যদিও আধুনিক মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত পুঁজিপতিরা এসে এর রক্তচোষা স্বভাবকে সহস্রগুণ বৃদ্ধি করে দিয়েছে। নির্যাতিত ও পরাভূত জাতিগুলোর উপর শোষণের যে স্টীম রোলার চালানো হচ্ছে তাতে একথা সুস্পষ্ট যে, প্রাচীন যুগের রোমীয় উপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ আধুনিক ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের তুলনায় কোন দিক থেকেই পেছনে ছিল না।

ইসলাম ও অন্যায় শোষণ

ইতিহাস আরো সাক্ষ্য দেয় যে, যুদ্ধের দিক থেকে ইসলাম বিশ্বের বুকে সবচে' পবিত্র ব্যবস্থা। যুদ্ধের ফল স্বরূপ কখনো কোন জাতিকে শোষণের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়নি এবং কারুর উপর দাসত্বও চাপিয়ে দেয়া হয়নি। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী দুনিয়ায় শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হলে ইসলাম উদ্বৃত্ত উৎপাদন সমস্যা (Problem of Surplus Production) এমন শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করতো যাতে করে যুদ্ধ অথবা উপনিবেশবাদ কোনটারই প্রয়োজন অনুভূত হতো না। বাস্তব ঘটনা এই যে, উদ্বৃত্ত উৎপাদন সমস্যা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বর্তমান বিকৃত রূপেরই একটি অনিবার্য ফল। অন্য কথায়, পুঁজিবাদের মৌলিক নীতিকেই যদি বদলে দেয়া যায় তাহলে উদ্বৃত্ত উৎপাদনের কোন অস্তিত্বই থাকতে পারে না।

সম্পদের কুক্ষিগত করণ ও ইসলাম

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সম্পদের কুক্ষিগত করণ পর্যায়ে সরকার একেবারেই নীরব ও অসহায়। কিন্তু ইসলামী ব্যবস্থায় সরকার এ ব্যাপারে অসহায় বা

নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা পালন করে না ; বরং সরকারই এমন নিশ্চয়তা প্রদান করে যাতে করে সম্পদ পুঞ্জিভূত হয়ে কোন ব্যক্তি বা পরিবারের কুক্ষিগত হয়ে না পড়ে এবং তার ফলস্বরূপ গোটা দেশবাসী দারিদ্র ও বঞ্চনার নির্মম শিকারে পরিণত না হয়। এরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়া ইসলামী শরীয়াতের কাম্য নয়। কেননা উহা চায় যে, দেশের সমস্ত সম্পদ আবর্তিত হয়ে যেন গুটিকতক ব্যক্তির হাতে পুঞ্জিভূত হয়ে না উঠে ; বরং সমস্ত সম্পদ এমনভাবে ব্যাপক ও বিস্তৃত হয়ে পড়ে যাতে করে সমস্ত জনসাধারণ উপকৃত হতে পারে। ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকদের দায়িত্ব হলো ঃ কাউকে কষ্ট না দিয়ে কিংবা কারুর উপর জুলুম না করে ইসলামী আইন বাস্তবায়িত করা। এই উদ্দেশ্যে আল্লাহর নির্ধারিত গণ্ডির ভেতর অবস্থান করে সরকারকে প্রভূত ক্ষমতা দান করা হয়েছে যাতে করে আল্লাহর আইনকে পুরোপুরিভাবেই প্রবর্তিত করতে সক্ষম হয় এবং তার ফলস্বরূপ দেশের সম্পদ গুটিকতক লোকের হাতেই আবদ্ধ হয়ে থাকার সুযোগ না হয়। ইসলামের দায়ভাগ সংক্রান্ত আইনই এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। এ আইনের লক্ষ্য হলো ঃ একটি পুরুষ যত ধন-সম্পদ পরিত্যাগ করবে উহা পরবর্তী পুরুষের লোকদের মধ্যে একটি সমীচীন পন্থায় বন্টিত হতে থাকবে। যাকাতের অবস্থাও অনুরূপ। যাকাতে ধনীদের বার্ষিক আয়ের শতকরা আড়াই ভাগ দরিদ্র লোকদের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির জন্যে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। অধিকন্তু ইসলাম পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সম্পদ সঞ্চয়কে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে এবং সম্পদ সঞ্চয়ের মূল কারণ হিসেবে বিবেচিত সুদকেও হারাম বলে ঘোষণা করেছে। এখানেই শেষ নয়, ইসলাম সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্ককে পারস্পরিক শোষণের পরিবর্তে পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত করে দিয়েছে।

মৌলিক প্রয়োজন পূর্ণ করার নিশ্চয়তা প্রদান

প্রসংগত স্মরণীয় যে, বিশ্বনবী (সা)-এর এরশাদ অনুযায়ী ইসলামী রাষ্ট্রকেই সমস্ত কর্মচারীর মৌলিক প্রয়োজন পূর্ণ করার দায়িত্ব পালন করতে হয়। হযরত নবী (সা) এরশাদ করেন ঃ

"যে ব্যক্তি আমাদের (অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের) কোন কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে সে অবিবাহিত হলে বিবাহের ব্যবস্থা করতে হবে। তার থাকার ঘর না থাকলে, ঘরের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। চাকর না থাকলে চাকর দিতে হবে। সওয়ারীর জন্যে কোন জন্তু না থাকলে জন্তুর ব্যবস্থা করতে হবে।"

মৌলিক প্রয়োজন পূর্ণ করার এই নিশ্চয়তা প্রদান ইসলামী রাষ্ট্রের কর্মচারী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। কেননা রাষ্ট্রের প্রতিটি ব্যক্তির জন্যেই ইহা প্রসারিত। ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্রের যে কোন ধরনের সেবায় যে-ই আত্মনিয়োগ করুক

না কেন সে-ই এই সুবিধা ভোগের হকদার। সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্র যখন উহার কর্মচারীদেরকে এই সুবিধা প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করে তখন সমাজের অন্যান্য সকলের জন্যেও এরূপ সুবিধা প্রদান উহার অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণেই যারা বার্ধক্য, অসুস্থতা, বিকলাংগতা বা বয়স কম হওয়ার কারণে উপার্জন করতে অক্ষম, ইসলামী রাষ্ট্র সরকারী কোষাগার থেকে তাদের যাবতীয় মৌলিক প্রয়োজন পূর্ণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করে। অনুরূপভাবে যাদের আয়ের উৎস খুবই সীমিত তথা প্রয়োজনের তুলনায় কম তাদের প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য প্রদানের দায়িত্বও ইসলামী সরকার গ্রহণ করে।

অতএব প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী রাষ্ট্র উহার সকল নাগরিকের জীবন-যাপনের জন্যে যাবতীয় মৌলিক প্রয়োজন পূর্ণ করার সমুদয় দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্যে ইসলাম যে কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে তা তেমন লক্ষ্যণীয় নয় ; লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো ইসলামী রাষ্ট্রের এই মূলনীতি যে, গোটা জাতির লাভ ও লোকসানে সকল ব্যক্তিকে সমানভাবে অংশীদার সাব্যস্ত করা। এতে করে কর্মচারী ও শ্রমিকরা শুধু যে অন্যদের শোষণ থেকেই বেঁচে যায় তা-ই নয়, বরং সুখী, সমৃদ্ধ ও সম্মানজনক জীবনযাপন করতেও সমর্থ হয়।

আজকের 'সভ্য' (!) পাশ্চাত্য জগতে পুঁজিবাদের যে জঘন্য রূপ ফুটে উঠেছে ইসলামী অনুশাসনের আওতায় উহা কখনো সৃষ্টিই হতে পারে না। ইসলামী শরীয়াতের কোন আইন—চাই উহা আইন প্রনেতার নিকট থেকে সরাসরি গ্রহণ ক রা হোক কিংবা পরবর্তী সময়ে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শরীয়াতের গণ্ডিতে থেকে 'ইজতিহাদ'-এর মাধ্যমে রচনা করা হোক—পুঁজি-পতিদেরকে এরূপ অনুমতি দেয় না যে, শ্রমিকদেরকে বঞ্চিত করে নিজেরা সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলবে। ইসলামে পুঁজিবাদের অন্যান্য অভিশাপও— যেমন উপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধ, গোলামী প্রভৃতি—অঙ্কুরিত হতে পারে না।

একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা

অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইসলাম শুধু ভালো ভালো আইন-কানুন উপহার দেয়াকেই যথেষ্ট মনে করে না ; বরং সাথে সাথে মানুষের সেই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির নিকটও আবেদন জানায় যাকে কমিউনাটরা শুধু এ কারণে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে যে, ইউরোপের ইতিহাসে উহার বাস্তব কার্যকারিতার কোন নিদর্শন বর্তমান নেই। ইসলামের মতে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ মানুষের বাস্তব জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংগ। এদিক থেকে ইসলাম একটি অদ্বিতীয় জীবন পদ্ধতি। উহা আত্মার পবিত্রতা ও সামাজিক শৃংখলাকে একটি পারস্পরিক মজবুত সম্পর্কে আবদ্ধ করে দেয়। উহা সমাজকে যেমন গুরুত্বহীন

মনে করে না, তেমনি ব্যক্তিকেও বল্গাহীনভাবে ছেড়ে দেয় না। এরূপ করলে চিন্তা ও আচরণের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা উহার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভবপর হতো না। ইসলামী আইন-কানুন নৈতিকতার ভিত্তিতে গড়ে উঠে। এ কারণেই ইসলামে আইন ও নৈতিকতার মধ্যে কোন বিরোধিতা বা সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় না ; বরং একটি আরেকটির সাথে সামঞ্জস্যশীল, একটিতে কোন অল্পতা দেখা দিলে অন্যটির দ্বারা তা পূর্ণ করা হচ্ছে ; তাদের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব বা পারস্পরিক বিরোধিতার কোন অবকাশ নেই।

বিলাসিতা ও অপব্যয় সীমিতকরণ

দেশের সম্পদ কতিপয় লোকের কুক্ষিগত হওয়ার অনিবার্য ফলস্বরূপ যে বিলাসিতা, আমোদ-প্রমোদ ও যথেচ্ছাচারিতার পথ উন্মুক্ত হয়ে যায় ইসলামী নৈতিকতার দৃষ্টিতে তা সম্পূর্ণরূপেই অবৈধ। ইসলাম উহাকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছে। উহা সম্পদশালীদেরকে নির্দেশ দেয় ঃ তারা যেন কর্মচারী ও শ্রমিকদের উপর বে-ইনসাফী না করে, তাদের পারিশ্রমিক যেন কম না দেয়। তাদের প্রাপ্য যেন পুরোপুরি পরিশোধ করে। কর্মচারীদের উপর জুলুম ও নির্যাতনের আরেকটি রূপ হলো সম্পদ সঞ্চয়। এ কারণে বে-ইনসাফী নির্মূল করার উদ্দেশ্যে এরূপ সঞ্চয়কেও বন্ধ করে দেয়া অপরিহার্য। বস্তুত ইসলাম তাই সম্পদ সঞ্চয় করে রাখার ঘোর বিরোধী। ইসলাম মানুষের মনে আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করার এমন প্রেরণা যোগায় যে, সে তার সবকিছু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে দান করে দিতে পারে। যে সমাজে সচ্ছল ব্যক্তিরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে অন্য ব্যক্তিদের জন্যে নিজেদের সম্পদ ব্যয় করতে অভ্যস্ত হয় সেখানে দরিদ্রতা ও বঞ্চনা বলতে কিছুই অবশিষ্ট থাকতে পারে না। কেননা এর উভয়টিই হীন স্বার্থপরতার অনিবার্য ফসল ; আর এই স্বার্থপরতার কারণেই ধনী ব্যক্তিরা তাদের সম্পদ ব্যক্তিগত আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের জন্যে ব্যয় করে ফেলে।

আধ্যাত্মিক উন্নতি ও আল্লাহর নৈকট্য

ইসলাম মানুষের যে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ প্রশস্ত করে দেয় তাতে করে সে আল্লাহর নৈকট্যলাভ করতে সমর্থ হয়। এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও আখেরাতের পুরস্কার লাভের আশায় সে স্বেচ্ছায় দুনিয়ার সমস্ত আরাম-আয়েশ ও সুযোগ-সুবিধা হাসিমুখে বর্জন করতে পারে। বস্তুত এই প্রকার মানুষ যারা আল্লাহকে পেলেই খুশী হয় এবং আখেরাতের সুখ-দুঃখের উপর আস্থাশীল তারা—কখনো সম্পদ সঞ্চয়ের ব্যধিতে আক্রান্ত হতে পারে না এবং স্বীয় স্বার্থের জন্যে অন্যের উপর জুলুম-নির্যাতন ও অযথা শোষণ চালাতে পারে না।

আইনের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অনুসরণ

ইসলাম মানুষকে আধ্যাত্মিক উন্নতির যে সোপানে পৌঁছিয়ে দেয় তাতে করে যে অর্থনৈতিক বিধি-বিধান পুঁজিবাদের ধ্বংসাত্মক দিকগুলোকে নির্মূল করে দেয় তার অনুসরণ করা একেবারেই সহজ হয়ে যায়। বস্তুত ইসলামী সমাজে যখন এই বিধি-বিধান প্রবর্তন করা হয় তখন সকল মানুষই স্বেচ্ছায় ও পরিপূর্ণ আন্তরিকতার সাথে উহা পালন করতে থাকে। কোন শাস্তির ভয়ে নয়, বরং নৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই আইন অনুসরণ করতে থাকে। কেননা মনে প্রাণে যা সে কামনা করে আইনের দাবী'ও তা-ই।

শেষ কথা

পরিশেষেও একথা পরিষ্কার ভাষায় বলা প্রয়োজন যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার যে ঘৃণিত ও কদর্য রূপ আজকাল ইসলামী দুনিয়ায় আধিপত্য বিস্তার করেছে, ইসলামী ব্যবস্থার সাথে তার দূরতম সম্পর্কও নেই। এ কারণে তার ধ্বংসাত্মক দিকগুলোর জন্যে কস্মিনকালেও ইসলামকে দায়ী করা যায় না।

ইসলাম ও ব্যক্তি মালিকানা

ব্যক্তি মালিকানা কি মানুষের একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ? কমিউনিষ্টরা উত্তর দিয়ে থাকে যে, তা নয়। তারা দাবী করে যে, মানুষের প্রাথমিক যুগ ছিল সমাজতন্ত্রের যুগ সে যুগের মানবসমাজে ব্যক্তি মালিকানা বলতে কিছুই ছিল না। তখন সকল জিনিসেই ছিল সকলের যৌথ মালিকানা। তাতে সবাই থাকতো সমান অংশীদার। তখন তাদের ভেতরে ছিল ভালোবাসা ও সহযোগিতা। ছিল ভাই ভাই হয়ে মিলে-মিশে থাকার পরিবেশ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ স্বর্ণ যুগ বেশী দিন স্থায়ী হলো না। কেননা কৃষিকাজ ও চাষাবাদ শুরু হওয়ার সাথে সাথে চাষের জমি ও উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ে তাদের পারস্পরিক ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। এবং এই বিরোধই ক্রমে ক্রমে তাদের যুদ্ধ-বিগ্রহের পথ প্রশস্ত করে দিল। সমাজতন্ত্রীদের দৃষ্টিতে এর একমাত্র সমাধান হলো সেই আদি সমাজতন্ত্রের দিকে ফিরে যাওয়া—যাতে করে ব্যক্তি মালিকানা ও তার যাবতীয় দ্বন্দ্ব-কলহ চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং সবকিছুতেই সবার যৌথ মালিকানা স্থাপিত হবে। ফলে সবাই উপকৃত হওয়ার সুযোগ লাভ করবে। সমাজতন্ত্রীদের মতে কেবল এভাবেই সারা দুনিয়ায় শান্তি, সমৃদ্ধি, ভালোবাসা ও সংহতি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

মনস্তত্ত্ব ও ব্যক্তি মালিকানার প্রেরণা

আবেগ-অনুভূতি, ধ্যান-ধারণা ও আচার-আচরণের কোন্‌টি স্বভাবজাত এবং কোন্‌টি অর্জিত—এ ব্যাপারে কোন সীমারেখা আছে কি ? মনস্তাত্ত্বিক পণ্ডিতরা এর বিভিন্ন জবাব দিয়েছে। কেননা এ ব্যাপারে তাদের মতানৈক্য অত্যন্ত মারাত্মক। ব্যক্তি মালিকানার ব্যাপারেও তাদের এরূপ মতভেদ বর্তমান। কতক মনোবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীর মতে ব্যক্তি মালিকানা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি ; এতে পরিবেশের কোন প্রভাব নেই। যেমন কোন শিশু তার খেলনাটি হাতছাড়া করতে চায় না। কারণ সে হয়ত ভাবছে, এতে করে তার খেলনার সংখ্যা কমে যাবে। কিংবা সে ভয় করছে যে, অন্য শিশুরা তার অবশিষ্ট খেলনাগুলোও নিয়ে যাবে। বস্তুত যেখানে শিশুর সংখ্যা দশ এবং খেলনা মাত্র একটি, সেখানে তাদের ঝগড়া হবেই। কিন্তু দশটি শিশুর জন্যে দশটি খেলনা থাকলে প্রত্যেক শিশুই একটি করে পাবে এবং তা নিয়ে খুশী থাকবে। ফলে তাদের মধ্যে ঝগড়ার লেশমাত্রও থাকবে না।

অপর্যাপ্ত প্রমাণ

সমাজতন্ত্রী ও তাদের সমমনা মনোবিজ্ঞানী ও সমাজ বিজ্ঞানীদের যুক্তির জবাবে আমাদের বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

এ পর্যন্ত কোন বিজ্ঞানীই এই মর্মে কোন অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপিত করতে সক্ষম হয়নি যে, ব্যক্তি মালিকানার প্রবৃত্তি মানুষের কোন সহজাত প্রবৃত্তি নয়। ব্যক্তি মালিকানার বিরোধীরা বড়জোর এতটুকু বলতে পারে যে, ব্যক্তি মালিকানার মানুষের সহজাত স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হওয়ার অনুকূলে কোন চূড়ান্ত প্রমাণ তাদের কাছে নেই।

শিশু ও খেলনার দৃষ্টান্ত

শিশু ও খেলনার দৃষ্টান্ত দ্বারা সমাজতন্ত্রী পণ্ডিতরা যে দৃষ্টিভংগী বিশ্লেষণ করতে চেয়েছে তার দ্বারা তাদের কল্পিত সিদ্ধান্তে কখনো উপনীত হওয়া যায় না। দশটি খেলনা থাকতে দশটি শিশুর পারস্পরিক ঝগড়া না হওয়া দ্বারা মানবীয় প্রকৃতিতে ব্যক্তি মালিকানার প্রবৃত্তির অনুপস্থিতি কখনো প্রমাণিত হয় না। বরং এর দ্বারা শুধু এতটুকু অবগত হওয়া যায় যে, সুষ্ঠু পরিবেশে ব্যক্তি মালিকানার স্পৃহা পূর্ণাংগ সাম্য স্থাপিত হলেও পূর্ণ হয়ে যায়, দৃষ্টান্ত দ্বারা মানুষের উপরোক্ত প্রবৃত্তির না থাকা প্রমাণিত হয় না। বরং উক্ত প্রবৃত্তির পূর্ণ হওয়ার একটি পদ্ধতি পরিস্ফুট হয়। কেননা এই সত্যও কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে, অনেক শিশু এমনও আছে যে, নিজেদের খেলনা থাকা সত্ত্বেও তারা সংগীদের খেলনাগুলো কেড়ে নেয় এবং তাদেরকে নিরুপায় করার পরিবেশ সৃষ্টি না করা পর্যন্ত তারা এ কাজ থেকে বিরত হয় না।

এ কোন্ স্বর্ণ যুগ !

সেই আদিকালের মানব সমাজকে সকল সমাজতন্ত্রীই স্বর্ণ যুগ বলে অভিহিত করে থাকে। অথচ তেমন কোন যুগের পক্ষে কোন অকাট্য প্রমাণ তারা উপস্থাপিত করতে পারেনি। যদি এর অস্তিত্ব ছিল বলে ধরেও নেয়া হয় তবুও আমাদের মেনে নিতে হবে যে, সেই স্বর্ণ যুগে ফসল উৎপাদনের কোন পন্থা-পদ্ধতির অস্তিত্ব ছিল না। এবং ছিল না বলে মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহেরও কোন অবকাশ ছিল না। এ যুগে মানুষের আহার্য সংগ্রহের জন্যে কোন প্রকার বেগ পেতে হতো না। তারা যখন ইচ্ছা গাছের ফল ছিঁড়ে খেতে পারতো, ধারাল অস্ত্র নিয়ে বনে-জংগলে শিকার করে জঠর জ্বালা নিবারণ করত। কিন্তু কোন ফল বা গোশত সঞ্চয় করে রাখার কোন প্রয়োজন হতো না। কেননা একদিকে যেমন উহা নষ্ট হয়ে যেত, তেমনি অন্যদিকে দেরী করে খেলে উহার স্বাদও খারাপ হয়ে যেত। সুতরাং যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি উহা নিঃশেষ করে ফেলত। তাই এই যুগের জীবনযাপনের যখন কোন দ্বন্দ্ব-কলহের প্রশ্নই উঠে না তখন ব্যক্তি মালিকানার স্বাভাবিক অনুপস্থিতি কখনো প্রমাণিত হয় না। কেননা ঐ যুগে দ্বন্দ্ব না থাকার আসল কারণ ছিল এই যে, ঐ সময়ে এমন কোন জিনিসের অস্তিত্বই ছিল না যা মানুষের ঝগড়ার কারণ বলে গণ্য হতে পারে।

বস্তুত এ কারণেই কৃষি ও চাষাবাদ শুরু হওয়ার সাথে সাথেই ঝগড়ার সূচনা হয়। কৃষি ও চাষাবাদ সমস্যাই মানুষের ভেতরকার দ্বন্দ্ব-কলহ প্রবণতাকে জাগ্রত করে দেয় এবং এখান থেকেই উহা সক্রিয় শক্তি হিসেবে আবির্ভুত হয়।

সাধারণ স্ত্রীত্ব দ্বন্দ্ব না হওয়ার কোন প্রমাণ নয়

যদি সমাজতন্ত্রীদের এই ধারণাকেও মেনে নেয়া হয় যে, প্রাথমিক যুগে নারী ছিল সকল পুরুষের সাধারণ স্ত্রী, তবুও চূড়ান্তরূপে এ দাবী প্রমাণিত হয় না যে, ঐ যুগে নারীদের কারণে পুরুষদের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব বা শক্তি পরীক্ষা বলতে কিছুই ছিল না। কেননা "সাধারণ স্ত্রীত্বের (Common Wifedom) নীতি" বহাল থাকলেও একজন নারী অন্যান্য নারীদের চেয়ে সুন্দরী হওয়ার কারণে দ্বন্দ্বের কারণ বলে পরিগণিত হতে পারে। এখানে আমাদের এ-ও দেখতে হবে যে, যদি একই রূপ সমান জিনিস নিয়ে কোন ব্যাপার হতো তাহলে অবশ্যই কোন দ্বন্দ্ব হতো না। কিন্তু যেখানে জিনিসের মান ও মূল্য সমান নয় এবং মানুষের বিবেচনায় ভালো-মন্দের পার্থক্য বর্তমান সেখানে মতভেদ ও দ্বন্দ্ব অবশ্যই অপরিহার্য।—সমাজতন্ত্রীদের স্বপ্ন "ফেরেশতাদের" আদর্শ সমাজও এই দ্বন্দ্বের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারবে না।

শ্রেষ্ঠ হওয়ার প্রেরণা

সেই প্রাচীন যুগ থেকেই মানুষের মধ্যে সমপর্যায়ের লোকদের তুলনায় বিশেষ সম্মানের অধিকারী হওয়ার আকাংখা বর্তমান। এ কারণে বাহাদুরী, দৈহিক শক্তি কিংবা অন্য কোন দিক থেকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করার চেষ্টা অব্যাহত গতিতে চলছে। এখনো কিছু আদিম গোত্রের সন্ধান পাওয়া যায়—যাদের জীবনকে সমাজতন্ত্রীরা আদি সাম্যবাদী জীবনের (!) দৃষ্টান্ত বলে মনে করে—যারা কেবল সেই সকল যুবকদের কাছে মেয়েদেরকে বিয়ে দেয় যারা কোন দ্বিধা-সংকোচ না করে নিজেদের পিঠে একশত কোড়া খেতে তৈরী হয়ে যায়। প্রশ্ন এই যে, কি কারণে এই যুবকেরা কোন ব্যথা বা যন্ত্রণার পরোয়া না করে দৈহিকভাবে এরূপ জখম হওয়ার জন্যে এগিয়ে আসে ? এর পরিষ্কার জবাব হলো এই যে, নিজের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ এবং অন্যদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ হওয়ার প্রেরণাই হচ্ছে এর একমাত্র কারণ। যদি এ ধারণা সত্য হয় যে, দুনিয়ার সকল জিনিসের মধ্যে পরিপূর্ণ সমতার নীতি বিরাজমান তাহলে কী কারণে একজন লোক অন্য একজন লোককে বলতে বাধ্য হয় ঃ "আমি তোমার মত নই। বরং তোমার চেয়ে ঢের ভালো।" মানবীয় প্রবৃত্তির এই দিকটি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, যদি ধরে নেয়া হয় যে, ব্যক্তি মালিকানা কোন প্রাকৃতিক প্রেরণা নয় তবুও উহার গভীর সম্পর্ক যে উপরোক্ত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের প্রেরণার সাথে বর্তমান তা কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। মানুষ যখন এই দুনিয়ায় পদার্পণ করেছে তখন থেকেই মানুষের মধ্যে এই প্রেরণা বর্তমান।

ব্যক্তি মালিকানা প্রসংগে

এখন দেখা যাক, ইসলামে ব্যক্তি মালিকানার স্বরূপ কি ? সমাজতন্ত্রীদের মতে ব্যক্তি মালিকানা ও বেইনসাফী ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ কারণে মানুষ যদি জুলুম-নির্যাতন এবং অবিচার থেকে বাঁচতে চায় তাহলে তাদেরকে ব্যক্তি মালিকানা বন্ধ করে দিতে হবে।

দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সত্য

সমাজতন্ত্রীরা তাদের দাবীর সময়ে দু'টি সত্য একেবারেই ভুলে যায়। একটি হলো ঃ মানুষের উন্নতি সকল প্রকার মানুষের সর্ববিধ প্রচেষ্টা ও সাধনার ফল। এবং দ্বিতীয়টি হলো ঃ 'আদি সাম্যবাদ' নামক আদর্শ যুগে (!) মানুষের উন্নতি ছিল শূন্যের কোঠায়। অন্য কথায়, মানুষ কেবল তখনই উন্নতি করতে শুরু করে যখন ব্যক্তি মালিকানার কারণে তাদের দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। সুতরাং এই প্রকার দ্বন্দ্ব মানুষের জন্যে কেবল অকল্যাণই নয়। বরং বৈধ গণ্ডি অতিক্রম না করলে এটাই যে মানুষের একটি মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বে-ইনসাফীর প্রকৃত কারণ

ইসলাম একথা স্বীকার করে না যে, দুনিয়ায় অত্যাচার-উৎপীড়ন এবং জুলুম ও বে-ইনসাফীর মূল কারণ হলো ব্যক্তি মালিকানা। ইউরোপ ও অন্যান্য অমুসলিম দেশে বে-ইনসাফীর যে বিবরণ পাওয়া যায় তার মূল কারণ ছিল এই যে, যে সকল সরকার এবং আইন রচনার যাবতীয় ক্ষমতা সচ্ছল ও ধনী লোকেদের হাতে ন্যস্ত ছিল। ফলে তারা এমন আইনই রচনা করে যার একমাত্র লক্ষ্য ছিল পুঁজিপতি ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করা। তাতে অন্য কোন শ্রেণীর উপর অবিচার বা উৎপীড়ন হয় কিনা সে দিকে কারুর কোন লক্ষ্যই ছিল না।

ইসলামে সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণীর অস্তিত্ব নেই

ইসলামে শাসক শ্রেণীর কোন অস্তিত্ব নেই। ইসলামী ব্যবস্থায় আইন রচনার দায়িত্ব কোন নির্দিষ্ট উঁচু শ্রেণীর হাতে ন্যস্ত নয় ; বরং তার সার্বিক ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতেই নিবদ্ধ যিনি মানুষের সকল শ্রেণীর একমাত্র খালেক এবং সমস্ত মানুষই তার চোখে সমান। কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা সমাজই এরূপ বিশেষ মান বা মর্যাদার অধিকারী নয় যে, সেই সুবাদে সে বা তারা অন্যদের উপর বে-ইনসাফী করার জন্যে অগ্রসর হবে। ইসলামী ব্যবস্থায় সমস্ত মুসলমান স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেদের শাসক নির্বাচন করবে ; কিন্তু কোন বিশেষ শ্রেণী বা দলকে নির্বাচন করার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। নির্বাচন অন্তে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর কোন মুসলিম শাসক নিজেদের

রচিত কোন আইন প্রবর্তনের কোন অধিকার লাভ করে না। সে শুধু আল্লাহর আইনের আনুগত্য করতে থাকে এবং সেই আইনই প্রবর্তন করতে বাধ্য হয়। আর যতক্ষণ সে আল্লাহর আইনের আনুগত্য করতে থাকে ততক্ষণ মুসলিম জনগণও তার আনুগত্য করতে থাকে। এ পর্যায়ে মুসলিম জাহানের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর বাণী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি খেলাফাতের দায়িত্ব গ্রহণের সময়ে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে বলেছিলেন ঃ

اَطِيْعُوْنِىْ مَا اَطَعْتُ اللّٰهَ فِيْكُمْ فَاِنْ عَصَيْتُ اللّٰهَ فَلاَ طَاعَةَ لِىْ عَلَيْكُمْ

"আমার আনুগত্য কর যতক্ষণ আমি তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহর আনুগত্য করি। আর যদি আমি আল্লাহর না-ফরমানি করি তাহলে তোমরা আমার আনুগত্য করবে না।"

ইসলাম কোন শাসককে আইন রচনার এরূপ অধিকার দেয় না যে, সে নিজেই আইন বিধিবদ্ধ করবে কিংবা অন্যকে আইন রচনার অধিকার অর্পণ করবে। আইনগত দিক থেকে কোন শাসকই একটি শ্রেণীকে অন্য আর একটি শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহের উপর প্রাধান্য দিতে পারবে না ; পুঁজিপতিদের প্রভাবে কোন শাসকের এ অধিকারও নেই যে, এমন কিছু আইন রচনা করবে যাতে করে সচ্ছল শ্রেণীর লোকদের হতে থাকবে সুবিধার পর সুবিধা, আর অন্যদের হতে থাকবে ক্ষতির পর ক্ষতি।

একথাও এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, আমরা যখন ইসলামী সরকারের কোন কথা বলি তখন আমাদের লক্ষ্যে থাকে ইসলামী ইতিহাসের সেই সোনালী যুগ যখন সত্যিকার অর্থেই ইসলামী আইন-কানুন ও শিক্ষা অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালিত হতো। খেলাফাতের অবসানের সাথে সাথে যখন পতনের যুগ শুরু হয়—অন্য কথায় রাজতন্ত্র শুরু হয় তখনকার কোন কথা আমরা চিন্তা করি না। ইসলাম ঐরূপ রাজতন্ত্রকে (যাকে শাসকরা খেলাফাত নামেই চালিয়েছে) কখনো সমর্থন করে না এবং করে না বলেই রাজা-বাদশাদের ভুল ও অন্যায় কার্যকলাপের জন্যে ইসলামকে বিন্দুমাত্রও দায়ী করা যায় না। ইসলামী শাসনের আদর্শ যুগ ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। কিন্তু তাই বলে এরূপ ভুল বোঝার কোন অবকাশ নেই যে, ইসলামী ব্যবস্থা একটি কল্পনার ফানুস মাত্র। বাস্তব জীবনে তাকে রূপায়িত করা যায় না। কেননা যে জীবন ব্যবস্থাকে একবার বাস্তব জীবনে সর্বাংগ সুন্দরভাবে সফল করে তোলা হয়েছে (এবং যা যুগের পর যুগ ধরে কল্যাণকর বলে উত্তীর্ণ হয়েছে) তাকে পুনর্বার রূপায়িত করার পথ কোন বাধাই থাকতে পারে না। এটাকে রূপায়িত করার জন্যে সকল মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালানো অবশ্য কর্তব্য। এটাও অনস্বীকার্য যে, ইসলামী শাসনব্যবস্থা বাস্তবায়িত করার জন্যে আজ যে অনুকূল পরিবেশ বর্তমান তা অতীতে কখনো ছিল না।

আইনের সাম্য

ইসলামী জীবন পদ্ধতিতে সচ্ছল শ্রেণীর খুশী অনুযায়ী আইন রচনার কোন এখতিয়ার নেই। ইসলামের মতে অধিকারের ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টির আদৌ কোন অবকাশ নেই। বরং ইসলামী বিধি অনুযায়ী সকল মানুষের সাথে একই রূপ ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যদি ইসলামী আইনের কোন ধারা বা উপধারার ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়—যেমন দুনিয়ার সব আইনের ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হয় তাহলে ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞদের মতামতকেই চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হবে। ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞদের গৌরবময় কীর্তি হলো এই যে, তারা কোনদিন সচ্ছল লোকদের প্রতি তাকিয়ে ইসলামী আইনকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এমনভাবে ব্যাখ্যা করেননি যাতে করে তা তাদের স্বার্থসিদ্ধির এবং অন্যান্য শ্রেণীর উপর অত্যাচার-উৎপীড়নের হাতিয়ার বলে পরিগণিত হতে পারে। বরং এর বিপরীত অবস্থা এই দেখা গেছে যে, তারা প্রতিনিয়তই লক্ষ্য রেখেছেন যাতে করে শ্রমিক ও মেহনতী শ্রেণীর মৌলিক প্রয়োজন মেটাবার পথে কোন অন্তরায় না থাকে ; এমনকি কোন কোন আইন বিশেষজ্ঞতো মুনাফার ব্যাপারে কৃষক-শ্রমিকের অংশ মালিকের সমান বলে সাব্যস্ত করেছেন।

মানুষের প্রকৃতি হীন নয়

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের প্রকৃতি এতদূর হীন নয় যে, ব্যক্তি মালিকানার ফল অনিবার্যরূপেই জুলুম ও বে-ইনাসাফীর রূপে প্রকাশিত হবে। মানুষের শিক্ষা ও সভ্যতার সম্পর্ক যতদূর বর্তমান তাতে দেখা যায় ইসলাম এই পর্যায়ে যে সাফল্য অর্জন করেছে তা অভূতপূর্ব ও তুলনাহীন। বস্তুত প্রভূত অর্থ-সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের অবস্থা ছিল ঃ

يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ط

"তারা সেই লোকদেরকে ভালোবাসে যারা হিজরত করে তাদের নিকট আসে এবং তাদেরকে যা কিছু দেয়া হয় তার কোন প্রয়োজনও তারা অন্তরে অনুভব করে না এবং নিজেদের চেয়ে তারা অন্যকে অগ্রগণ্য করে —যদিও তারা অনাহারে থাকে।"-(সূরা আল হাশর ঃ ৯)

তারা নিজেদের সম্পদে অন্যদেরকে শরীক করে নিতে আনন্দ লাভ করতো —অথচ এ ক্ষেত্রে দুনিয়ার কোন স্বার্থ লাভ করা তাদের উদ্দেশ্য থাকতো না। বরং এর বিনিময়ে তারা কামনা করতো আল্লাহর ক্ষমা এবং আখেরাতের পুরস্কার।

এই মহান ও পবিত্র আদর্শের কথা—আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য। গোটা মানবজাতির ইতিহাসে এটা একান্তই বিরল। এর আলোকেই আমাদের ভবিষ্যত হতে পারে মহীয়ান ও সমুজ্জল। আর এ থেকেই আমরা সহজে অনুমান করতে পারি যে, মানবতার মর্যাদা কত সমুন্নত ও দেদীপ্যমান।

একটি শক্তিশালী সমাজ

প্রসংগত আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, ইসলামের লক্ষ্য শুধু এতটুকুই নয় যে, মানুষ কেবল কল্পনার জগতেই ব্যস্ত থাকুক। ইসলাম মানুষের সর্বাত্মক কল্যাণ ও প্রগতিকে কেবল 'সুধারণা ও সদিচ্ছা'র মেহেরবানীর উপরই ছেড়ে দেয় না। নৈতিক ও আত্মিক পবিত্রতার প্রতি এতদূর গুরুত্বারোপ করা সত্ত্বেও ইসলাম মাবনজীবনের বাস্তব সমস্যাগুলোকে কখনো ছোট করে দেখে না। ইসলাম আইনের সাহায্যে এই আদর্শ বাস্তবায়িত করতে চায় যে, গোটা সমাজে যাবতীয় অর্থ ও সম্পদের সুষম ও সুবিচারভিত্তিক বন্টন ব্যবস্থা অব্যাহত থাকুক। নৈতিক পবিত্রতায় সমুন্নত করার সাথে সাথে উহা ন্যায়ভিত্তিক আইন-কানুনও উপহার দেয় এবং এমনি করে একটি শক্তিমান ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর মানবসমাজ গড়ে তোলে। সম্ভবত এই সত্যকেই ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা) তার এই বক্তব্যে পরিস্ফুট করে তোলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَزَعُ بِالسُّلْطَانِ مَالاَ يَزَعُ بِالْقُرْاٰنِ-

"নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তির সাহায্যে ঐ সকল জিনিস বন্ধ করে দেন, কুরআনের সাহায্যে যা বন্ধ হয় না।"

ইতিহাসের সাক্ষ্য

মোটকথা এরূপ দাবী করা আদৌ যুক্তিসংগত নয় যে, ব্যক্তি মালিকানা দ্বারা বে-ইনসাফী ছাড়া অন্য কিছুই সৃষ্টি হয় না। কেননা ইতিহাসে এমন বহু যুগ পাওয়া যায় যখন ব্যক্তি মালিকানা দ্বারা কোন বে-ইনসাফীর সৃষ্টি হয়নি। ইসলাম জমির মালিক হওয়ার সুযোগ দিয়েছে ; কিন্তু তা ইউরোপের সামন্তবাদের ন্যায় অভিশপ্ত রূপ গ্রহণ করেনি। ঐরূপ আশংকার পথ রুদ্ধ করার জন্যে ইসলাম এমন অর্থনৈতিক ও সামাজিক আইন রচনা করেছে যে, তার কারণে সামন্তবাদী ব্যবস্থা কখনো জন্মলাভ করতে পারেনি এবং ঐ সকল লোকও এক উন্নতমানের জীবনযাপন করতে সক্ষম হয়েছে। যাদের মালিকানায় জমি বলতে কিছুই ছিল না। বস্তুত এরূপ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা থাকার কারণেই ইসলামী দুনিয়ার ধনী লোকদের পক্ষে দরিদ্র লোকদের উপর জুলুম করার সুযোগই কোনদিন আসেনি।

ব্যক্তি মালিকানার অধিকার অবাধ নয়—সীমিত

যদি একথা মেনেও নেয়া হয় যে, ইসলামে পুঁজিবাদের উৎপত্তি ও বিকাশের সম্ভাবনা অবশ্যই ছিল তাহলে সাথে সাথে এ সত্যকেও মেনে নিতে হয় যে, ইসলামে পুঁজিবাদের কেবল সেই অংশই চলতে পারতো যতটুকু জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করতে সক্ষম হতো। ইসলাম একদিকে মানুষের স্বভাবকে পরিশুদ্ধ করে এবং অন্যদিকে এমন আইন-কানুন রচনা করে যাতে করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, অন্যায়, শোষণ এবং অত্যাচার-উৎপীড়নের কোন অবকাশই থাকে না। যদি ইসলামী ব্যবস্থা কার্যকরী হওয়ার কোন সুযোগ থাকতো তাহলে তার কর্মসূচী বাস্তবায়িত করে পাশ্চাত্য দুনিয়াকে বর্তমান শোচনীয় অবস্থা থেকে বহু পূর্বেই মুক্ত করা যেত। এছাড়া ইসলামকে ব্যক্তি মালিকানার যে অধিকার দেয়া হয়েছে তা একেবারে অবাধ ও নিরংকুশ নয়, বরং কতগুলো শর্তের অধীন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ইসলামের বিধান হলো এই যে, জনহিতকর ও জনসেবায় নিয়োজিত সকল উপায়-উপাদানের মালিকানা থাকবে জনগণের। কোন কোন সময় ইসলাম ব্যক্তি মালিকানাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ; কিন্তু যখন এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এটা অত্যাচার-উৎপীড়নের কারণ হবে না, কেবল তখনই তার অনুমতি প্রদান করে।

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার উদাহরণ

এ ব্যাপারে অধিক আলোকপাত করার উদ্দেশ্যে অমুসলিম দেশসমূহের ভেতর থেকে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার উদাহরণ দেয়া গেল। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান স্টেটটি নরওয়ে ও সুইডেন নামক দু'টি দেশ নিয়ে গঠিত। বহু গোত্র ও জাতীয় বৈষম্যের শক্তিশালী প্রবক্তা ইংরেজ, আমেরিকান ও ফরাসীরা একথা উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করে যে, সদাচার ও সভ্যতার মানদণ্ডে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ানদের কোন তুলনা নেই। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, এ হেন দেশেও ব্যক্তি মালিকানাকে নিষিদ্ধ করা হয়নি। তারা শুধু সম্পদের ইনসাফ ভিত্তিক ও সুষম বন্টনের ব্যবস্থা করেছে। এই উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যে তারা যে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে তার লক্ষ্য হলো শ্রেণী বৈষম্যকে ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে আসা এবং কাজ ও পারিশ্রমিকের মধ্যে একটি সুষ্ঠু অনুপাত বজায় রাখা। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার এই বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, ইসলামী আইনের কোন কোন দিকের বাস্তবায়নের ফলেই এই এলাকাটি অবশিষ্ট দুনিয়ার চেয়ে অধিক সাফল্যের অধিকারী।

আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহের মৌল ভিত্তি

যে সামাজিক মতাদর্শের উপর একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠে তা থেকে এটাকে কখনো পৃথক করা যায় না। বর্তমান যুগের প্রচলিত তিনটি

উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা—অর্থাৎ পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও ইসলাম—পর্যালোচনা করে আমরা এই সত্যের সন্ধান পাই যে, এই ব্যবস্থা ও মালিকানা সংক্রান্ত মতাদর্শের সাথে উহার নির্ধারিত সামাজিক পটভূমির এক গভীর সম্পর্ক বর্তমান।

পুঁজিবাদ

যে চিন্তাধারার উপর পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত তাহলো এই যে, ব্যক্তি সত্ত্বা নির্দোষ ও পবিত্র ; এ পবিত্রতাকে কোন অবস্থাতেই ক্ষুণ্ন করা যাবে না। কোনরূপ সামাজিক শর্তও উহার বিরুদ্ধে আরোপ করা যাবে না। এক কথায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থা অবাধ ব্যক্তি মালিকানার পক্ষপাতী, উহার বিপক্ষে কোন প্রকার শর্তকেই উহা বরদাশত করে না।

সমাজতন্ত্র

এর সম্পূর্ণ বিপরীত সমাজতন্ত্রের বুনিয়াদী দর্শন হলো এই যে, 'সমাজ'ই হলো একমাত্র ভিত্তি যার বাইরে পৃথক বা স্বাধীন অবস্থায় কোন ব্যক্তির আদৌ কোন অস্তিত্ব নেই। সমাজতন্ত্র তাই এই সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে মালিকানার সমস্ত অধিকার রাষ্ট্রের হাতে অর্পণ করে এবং ব্যক্তি মালিকানার যাবতীয় অধিকার জনসাধারণের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়।

ইসলাম

এই পর্যায়ে ইসলামের সমাজ দর্শন সম্পূর্ণরূপেই ভিন্ন। আর এ কারণে উহার অর্থব্যবস্থার সাথে উপরোক্ত অর্থব্যবস্থা দু'টোরও কোন মিল নেই। ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রশ্নে ইসলামের বক্তব্য স্পষ্ট। ইসলামী বিধি অনুযায়ী একটি ব্যক্তিকে একই সময়ে দ্বিবিধ দায়িত্ব পালন করতে হয়। একটি হলো ব্যক্তিগত এবং অন্যটি হলো সামাজিক। সামাজিক দায়িত্বের দিক থেকে একজন ব্যক্তি সমাজের সদস্য বলে বিবেচিত হয়। ইসলাম চায়, একজন ব্যক্তি এই উভয় প্রকার দায়িত্বের মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধান করে কর্মতৎপর হোক।

ইসলামের বৈশিষ্ট্য

ইসলামের এই সমাজ দর্শন কোন ব্যক্তিকে তার সমাজ থেকে যেমন পৃথক করে দেয় না। তেমনি উহাকে এমন সুযোগও দেয় না যাতে করে ব্যক্তি ও সমাজ দু'টি বিপরীত শক্তি হিসেবে পরস্পর সংঘর্ষশীল হয়ে উঠতে পারে। একই সময়ে একজন ব্যক্তি একদিকে স্বাধীন এবং অন্য দিকে সমাজের আশা-আকাংখা এবং অপর দিকে ব্যক্তি ও সমাজভুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিদের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির একটি সুষ্ঠ সমন্বয় সাধন করতে চায়। কিন্তু এই সমন্বয়ের লক্ষ্যে উহা ব্যক্তি স্বার্থকে যেমন উপেক্ষা করে না। তেমনি সামাজিক কল্যাণকেও বিসর্জন

দেয় না। উহার আইন সমাজের জন্যে যেমন ব্যক্তিকে ধ্বংস করে দেয় না, তেমন এক বা একাধিক ব্যক্তির সুবিধার জন্যে গোটা সমাজে অনাচার ও অশান্তি সৃষ্টিরও অনুমতি দেয় না। উহা একদিকে ব্যক্তির হেফাযত করে এবং অন্যদিকে গোটা সমাজকে অশান্তি ও বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করে।

একটি ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভংগি

ইসলামী অর্থব্যবস্থা পারস্পরিক সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধানের এমন একটি ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যা পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের দু'টি চরম অবস্থার মাঝামাঝি একটি সর্বাঙ্গীন সুন্দর ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভংগি ছাড়া অন্য কিছুই নয়। এতে উভয় ব্যবস্থার কল্যাণকর দিকগুলো তো অবশ্যই বর্তমান কিন্তু উহাদের বিভ্রান্তি ও ক্ষতিকর দিক থেকে সম্পূর্ণরূপেই মুক্ত। ইহা নীতিগতভাবে ব্যক্তি মালিকানার অনুমতি দেয়। কিন্তু বিভিন্ন গণ্ডি দিয়ে উহাকে এমনভাবে সীমিত করে দেয় যে, উহা মানুষের কল্যাণ ছাড়া অন্য কিছুই করতে পারে না। অন্য দিকে ইসলাম শাসক মণ্ডলী ও সমাজকে মানুষের সমষ্টিগত জীবনের প্রতিনিধি হিসেবে ব্যক্তি মালিকানার জন্যে আইন রচনার এবং সামাজিক কল্যাণের প্রেক্ষিতে উহাতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার অধিকার দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না।

অন্যায় কাজের সংশোধন

ইসলাম ব্যক্তি মালিকানা সমর্থন করে ; কেননা উহার মাধ্যমে যে অন্যায় কাজের সম্ভাবনা থাকে তার সংশোধনের যোগ্যতাও উহার আছে। এবং এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উপায়-উপকরণও উহা অবলম্বন করে থাকে। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, নীতিগতভাবে ব্যক্তি মালিকানাকে সমর্থন করার পর সমাজকে উহার সুষ্ঠু প্রয়োগ ও নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান উহাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করার চেয়ে সহস্রগুণ উত্তম। বিশেষ করে যখন এরূপ কল্পনার উপর ভিত্তি করে উক্ত মালিকানাকে অস্বীকার করা হয় যে, ব্যক্তি মালিকানার প্রেরণা মানবীয় প্রকৃতির কোন অপরিহার্য অংগ নয় এবং মানব জীবনে উহার কোন প্রয়োজনও নেই তখন উহার প্রয়োজনীয়তা কত অধিক তা ভাষায় প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। স্বয়ং রাশিয়ায় যে সরকার এই ব্যক্তি মালিকানাকে সীমিতভাবে সমর্থন করেছে তাতে করে সুস্পষ্টরূপে এটাই প্রমাণিত হয় যে, মানবীয় প্রকৃতির দাবীর সাথে সমন্বয় বিধান করা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের জন্যেই কল্যাণকর।

তাই প্রশ্ন জাগে, তাহলে ব্যক্তি মালিকানাকে নিষিদ্ধ করা হবে কোন্ যুক্তিতে ? এবং কেনই বা ইসলামের নিকট এরূপ দাবী করা হবে যে, ইসলামে উহাকে হারাম বলে গণ্য করা হোক ?

সমাজতান্ত্রিক অভিজ্ঞতার ব্যর্থতা

সমাজতন্ত্রের দাবী হলো ঃ মানবসমাজে সাম্য স্থাপন করার লক্ষ্যে ব্যক্তি মালিকানাকে খতম করা অপরিহার্য। কেননা এরূপেই একজন মানুষকে অন্যান্য মানুষের দাসত্ব ও গোলামীর হাত থেকে মুক্তি দিতে সক্ষম। রাশিয়ায় উৎপাদনের উপায়-উপকরণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানাকে খতম করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু যে সকল উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্যে ইহা করা হয়েছিল তা কি অর্জিত হয়েছে ? কিন্তু স্ট্যালিনের আমলে রাশিয়া সরকারকে অতিরিক্ত কাজ করানোর জন্যে শ্রমিকদেরকে অতিরিক্ত পারিশ্রমিকের লোভ দেখাতে হয়েছিল। আর এরূপে তিনি শ্রমিকদেরকে সমান পারিশ্রমিক দেয়ার নীতিকে কার্যতই অস্বীকার করেছেন।

রাশিয়ায় আজ সকল কর্মচারীকে কি একই পরিমাণ পারিশ্রমিক দেয়া হয় ? সেখানকার ডাক্তার ও নার্সদেরকে কি একই রূপ বেতন দেয়া হয় ? স্বয়ং বিশিষ্ট সমাজতন্ত্রীরাই বলে থাকে যে, রাশিয়ায় প্রকৌশলী ও শিল্পীদের আয় সবচেয়ে বেশী। এতে করে অবচেতনভাবেই তারা স্বীকার করছে যে, রাশিয়ায় বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পারিশ্রমিকের পার্থক্য এখনো বহুল পরিমাণে বর্তমান। আর এ বৈষম্য কেবল বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং একই শ্রেণীর লোকদের মধ্যেও যথেষ্ট দেখা যায়।

এখনকার চিন্তা

ব্যক্তি মালিকানা নিষিদ্ধ করার পর রাশিয়ার লোকদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা এবং ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের স্পৃহায় কি ভাটা পড়েছে ? অন্যকে পেছনে ফেলে নিজে অগ্রসর হওয়ার এই বৈষম্য-চিন্তা কি নিঃশেষ হয়ে গেছে ? যদি গিয়েই থাকে তাহলে সেখানকার ট্রেড ইউনিয়নগুলোর নেতৃবৃন্দ, কারখানাগুলোর পরিচালকমণ্ডলী, উর্ধতন ও বিভাগীয় ব্যবস্থাপক গোষ্ঠীকে কীরূপে নির্বাচন করা হয় ? এবং স্বয়ং কমিউনিষ্ট পার্টির সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় সদস্যদের মধ্যে পার্থক্যই বা কিভাবে নির্ণয় করা হয় ?

ব্যক্তি মালিকানা বৈধ—না অবৈধ এই প্রসংগ বাদ দিয়েও অবশ্যই এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় যে, এটা কি সত্য নয় যে, অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য অর্জনের স্পৃহা মানবীয় প্রকৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংগ ? সমাজতন্ত্র ব্যক্তি মালিকানাকে খতম করেছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও উহা ব্যক্তি মালিকানার অনিবার্য ফসল—বৈশিষ্ট্য অর্জনের এই সর্বাধিক ধ্বংসাত্মক অনিষ্ট থেকে মানব জাতিকে মুক্ত করতে পারেনি। সমাজতন্ত্রের এই ন্যক্কারজনক ব্যর্থতার পর আমরা তাদের চলা পথে কোনক্রমেই চলতে পারি না। তাদের সেই ভ্রান্ত ও পংকিল পথ আমরা অনুসরণ করতে পারি না। যা মানবীয় প্রকৃতির সম্পূর্ণরূপেই

বিরোধী এবং যা এমন লক্ষ্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে যা অর্জন করা কস্মিন-কালেও সম্ভবপর হবে না।

অসার যুক্তি

রাশিয়ায় যে শ্রেণী বৈষম্য বর্তমান সে সম্পর্কে কোন কোন সমাজতন্ত্রীর বক্তব্য হলো, এ বৈষম্য পরিমাণে এত অল্প যে, উহার ফলে সচ্ছল শ্রেণীর লোকেরা যেমন আনন্দ-স্ফূর্তিতে মগ্ন হতে পারে না, তেমনি নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা কখনো বঞ্চনারও শিকার হয় না। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, ব্যক্তি মালিকানাকে পুরোপুরি নির্মূল করার পরেও যদি অবস্থা এরূপ থেকে যায় তাহলে উহার জন্যে এত কষ্ট স্বীকারের কি প্রয়োজন থাকতে পারে? আজ থেকে চৌদ্দ শ' বছর পূর্বে যখন দুনিয়ার কোথাও কমিউনিজমের অস্তিত্ব ছিল না তখন ইসলাম সমগ্র দুনিয়াবাসীর সামনে যে মৌল নীতি পেশ করেছে তার অন্যতম নীতি ছিল, সমাজের সদস্যদের পারস্পরিক পার্থক্যকে ক্রমে ক্রমে শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসা যাতে করে কিছু লোক অন্যদেরকে বৈধ অধিকার থেকে বঞ্চিত করে আনন্দ ও স্ফূর্তির মধ্যে ডুবে থাকতে না পারে। কিন্তু এই উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্যে ইসলাম কেবল আইনের ডাণ্ডাই ব্যবহার করেনি; বরং মানুষের অন্তরে আল্লাহর নেকী এবং মানুষকে ভালোবাসার প্রেরণাকে এমনভাবে জাগ্রত করে দিয়েছে যে, এরপর আইনের আনুগত্যের জন্যে বাইরের কোন শক্তি প্রয়োগের আদৌ কোন প্রয়োজন হয়নি।
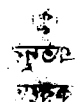
ইসলাম ও শ্রেণীপ্রথা

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ ج

"এবং আল্লাহ রিযকের ক্ষেত্রে তোমাদের কতক লোককে কতক লোকের চেয়ে অধিক মর্যাদা দান করেছেন।"-(সূরা আন নাহল ঃ ৭১)

وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ -

"আর আমরা তাদের কতককে কতকের চেয়ে বিভিন্ন স্তরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।"-(সূরা আয যুখরুফ ঃ ৩২)

সমাজতন্ত্রীদের প্রশ্ন হলো ঃ কুরআনে এরূপ স্পষ্ট বাণী থাকা সত্ত্বেও কোন মুসলমান একথা বলতে পারে কি যে, ইসলামে কোন শ্রেণীপ্রথা নেই ?

শ্রেণীপ্রথার অর্থ

উক্ত প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্যে সর্বপ্রথমেই দেখা যাক, শ্রেণীপ্রথা বলতে কী বুঝায় ? এরপরেই আমরা এ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভংগী কি তা জানতে পারবো এবং ইসলামী আইনে উহা বৈধ কি না তাও অবগত হতে পারবো।

ইউরোপীয় সমাজের তিনটি প্রাচীন শ্রেণী

মধ্য যুগের ইউরোপ স্পষ্টরূপে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, যথা (১) অভিজাত, (২) পাদরী এবং (৩) জনসাধারণ। পাদরীদের বিশেষ নিদর্শন ছিল তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ। শক্তি ও ক্ষমতার দিক থেকে এরা ছিল বড় বড় বাদশাহ বা সম্রাটদের সমকক্ষ। গীর্জাসমূহের অধিনায়ক পোপকে খৃস্টান জগতের সকল রাজা-বাদশাহর নিয়োগ ও বরখাস্তের একচ্ছত্র অধিকারী বলে গণ্য করা হতো। এই অবস্থা রাজা-বাদশাহদের জন্যে কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। এবং ছিল না বলেই তারা গীর্জা ও পোপের আওতা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে সর্বতোভাবে চেষ্টা চালাতো। গীর্জার অর্থনৈতিক অবস্থা এতদূর সচ্ছল ছিল যে, তারা নিজ দায়িত্বে সেনাবাহিনী রাখারও ব্যবস্থা করতে পারতো।

অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা আভিজাত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বাপ-দাদা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করতো। নিজেদের ব্যক্তিগত আমল-আখলাকের সাথে এর কোন সম্পর্ক ছিল না। তাদের মতে অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা জন্মসূত্রে অভিজাত বলে গণ্য হতো। অধিক হতে অধিকতর ঘৃণ্য ও নোংরা কাজ করলেও

তারা অভিজাতই থাকতো ; এতে করে তাদের জন্মগত আভিজাত্য বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ন হতো না।

আইন রচনার একচেটিয়া অধিকার

সামন্ত যুগে এই অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা তাদের জায়গীরে বসবাসকারী লোকদের উপর নিরংকুশ ক্ষমতার মালিক ছিল। বিচার ও পরিচালনার অধিকার একমাত্র তাদের হাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা এবং মুখের কথাই আইনের মর্যাদা লাভ করতো। এই সময়ে এদের ভেতর থেকেই পরিষদ সদস্যরা মনোনীত হতো। ফলে এরা যে আইন রচনা করতো তার লক্ষ্য থাকতো তাদের ব্যক্তিগত লাভ ও সুযোগ-সুবিধার নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। আর এই ব্যবস্থাকে এমন নির্দোষ ও পবিত্র বলে গণ্য করা হতো যে, উহার বিরুদ্ধে কেউ কিছু চিন্তাও করতে পারতো না।

সাধারণ মানুষের করুণ অবস্থা

সাধারণ মানুষ ছিল সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। অধিকার বলতেও তাদের কিছু ছিল না। দারিদ্র, দাসত্ব আর লাঞ্ছনা-গঞ্জনা তারা বাপ-দাদা থেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করতো এবং তাদের সন্তান-সন্ততিরাও জন্মসূত্রে এই বঞ্চনা ও অবমাননার বোঝা বহন করে চলতো।

বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্ম

পরবর্তীকালে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে ইউরোপে বুর্জোয়া শ্রেণীর আবির্ভাব হলো। এবং সম্মান ও আধিপত্যের দিক থেকে তারা অভিজাত শ্রেণীর স্থান দখল করে নিল। এই শ্রেণীর নেতৃত্বেই সাধারণ মানুষ ফরাসী বিপ্লব ঘটাতে সক্ষম হয়। বাহ্যত এই বিপ্লবই শ্রেণীপ্রথার বিলোপ সাধন করে এবং স্বাধীনতার ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের বাণী ঘোষণা করে।

আধুনিক যুগের পুঁজিবাদী

আধুনিক যুগে প্রাচীন অভিজাত শ্রেণীর স্থান পুঁজিবাদীরা দখল করে নিয়েছে। অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও অবচেতনভাবে এই পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং অর্থনৈতিক প্রগতির সাথে সাথে অন্যান্য ক্ষেত্রেও বহু পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। কিন্তু পরিবর্তন-পরিবর্ধন যা-ই ঘটুক না কেন, মৌলিক নীতির ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য ঘটেনি। আজও অর্থ-সম্পদ, শক্তি-ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা পুঁজিবাদী শ্রেণীর হাতে। নিজেদের খেয়াল-খুশী অনুযায়ী তারা সরকার যন্ত্রকে ব্যবহার করছে। গণতান্ত্রিক দেশগুলোর নির্বাচনে বাহ্যত মনে করা হয় যে, জনগণ পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করছে। কিন্তু সেখানেও রয়েছে অনেক চোরা দুয়ার। এর মাধ্যমেই পুঁজিপতিরা সংসদ, সরকার এবং সরকারী অফিসগুলোর কাঁধে সওয়ার হয়ে বৈধ-অবৈধ পন্থায় নিজেদের অসাধু উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে থাকে।

বৃটেন

স্মরণীয় যে, আধুনিক যুগে গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় মোড়ল হচ্ছে বৃটেন। অথচ আজও সেখানে 'হাউস অফ লর্ডস' নামে একটি আপার হাউস বর্তমান। আজও সেখানে প্রাচীন সামন্ত আইন বলবৎ রয়েছে। সে আইনে জ্যেষ্ঠ পুত্রই মৃত ব্যক্তির যাবতীয় সম্পদের উত্তরাধিকারী। অন্যান্য পুত্র-কন্যারা পরিত্যক্ত সম্পদের অধিকার থেকে বঞ্চিত। এ আইনের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো সামন্ত ও সম্পদকে গুটিকতক লোকের হাতে সীমাবদ্ধ করে রাখা। যাতে করে পরিবারের বিত্তসম্পদ অন্য কোথাও বিস্তৃত হয়ে না পড়ে এবং এমনি করে মধ্য যুগে সামন্তবাদীরা যে অর্থনৈতিক মর্যাদা ভোগ করতো সে মর্যাদা নিয়েই পরিবারগুলো চলতে পারে।

শ্রেণীপ্রথার ভিত্তি

এরূপ একটি ভুল ধারণার উপর ভিত্তি করে শ্রেণীপ্রথাকে চালু করা হয়েছে যে; সম্পদই হচ্ছে মূল শক্তি। এ কারণে যে শ্রেণীর হাতে সম্পদ থাকে, অপরিহার্যরূপে সেই শ্রেণীই রাজনৈতিক ক্ষমতারও মালিক হয়ে বসে। দেশের আইন রচনায়ও তারা সক্রিয় হয়ে যায়। এবং মুখ্য বা গৌণভাবে এমন আইন রচনা করে যার লক্ষ্য থাকে তাদের স্বার্থ ও কল্যাণের নিরাপত্তা বিধান করা এবং অন্যান্য শ্রেণীর হক বিনষ্ট করে তাদেরকে অধীন করে রাখা।

শ্রেণী প্রথার এই সংজ্ঞার আলোকে পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথেই বলা যায় যে, ইসলামে এই ধরনের শ্রেণীপ্রথার আদৌ কোন অবকাশ নেই। এবং ইসলামের ইতিহাসে এই প্রথার কোন চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায় না। নিম্নবর্ণিত তথ্যের আলোকে এই সত্যটি একেবারেই পরিস্ফুট হয়ে উঠে ঃ

সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ

গোটা সম্পদ যাতে করে গুটিকতক লোকের হাতে পুঞ্জিভূত হতে পারে এমন কোন আইন ইসলামে নেই। পবিত্র কুরআনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে ঃ

كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ط

–"যাতে করে সম্পদ তোমাদের সম্পদশালীদের মধ্যেই আবর্তিত হতে না পারে।"–(সূরা আল হাশর ঃ ৭)

এ কারণেই ইসলাম যে জীবন বিধান প্রদান করেছে তার লক্ষ্য হলো সম্পদ যেন অব্যাহত গতিতে বন্টিত হতে থাকে। ইসলামের উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার সমস্ত উত্তরাধিকারীর মধ্যে বন্টিত হয়ে যায়—তাদের সংখ্যা যত অধিকই হোক না কেন সে দিকে বিন্দু-মাত্রও লক্ষ্য করা হয় না।

ইসলামে সম্পত্তির উত্তরাধিকার কখনো এক ব্যক্তি হয় না। এর সামান্য ব্যতিক্রম শুধু তখনই হয় যখন মৃত ব্যক্তির ভাই-বোন কিংবা অন্য আত্মীয়-স্বজন কেউই না থাকে। এই ব্যতিক্রমের মধ্যেও ইসলাম চায় ; সমস্ত অর্থ-সম্পদ যেন একই ব্যক্তির হাতে না যায়। বরং তার আত্মীয়দের মধ্যে অন্যান্য হকদাররাও যেন কিছু অংশ অবশ্যই পায়। বর্তমান যুগে যে "উত্তরাধিকার কর" দেখা যায় তা এরই এক প্রাথমিক রূপ মাত্র। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا ○

—"আর যখন (উত্তরাধিকারীদের মধ্যে পরিত্যক্ত সম্পত্তি) বন্টনের সময়ে (দূরের) আত্মীয় থাকবে, থাকবে ইয়াতিম ও দরিদ্র লোক তখন তাদেরকেও এই (পরিত্যক্ত) সম্পত্তির কিছু অংশ প্রদান কর এবং তাদের সাথে সন্তোষজনক কথা বল।"—(সূরা আন নিসা ঃ ৮)

সম্পদ পুঞ্জিভূত হওয়ার ফলে যে সমস্যা দেখা দেয় তার সমাধান ইসলাম দিয়েছে। ইসলামের উত্তরাধিকার আইনে সম্পদ কোন বিশেষ শ্রেণীর হাতে সীমাবদ্ধও হতে পারে না। বরং মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টিত হয়ে যায় এবং তাদের মৃত্যুর পর আবার এই সম্পদই পুনরায় তাদের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টিত হয়। এরূপে পুরুষানুক্রমেই সম্পত্তি বন্টিত হতে থাকে। ইতিহাসও সাক্ষ্য দেয় যে, ইসলামী সমাজে সম্পদ কখনো মুষ্টিমেয় লোকের হাতে জমা হতে পারে না। বরং গোটা সমাজেই উহা অব্যাহত ধারায় ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

আইনগত অগ্রাধিকারের বিলুপ্তি

ইসলামের এই মানসিকতা আমাদেরকে উহার আরেকটি বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাহলো ঃ ইসলামে আইন প্রণয়নের অধিকার নির্দিষ্ট কোন শ্রেণীর হাতে অর্পিত নয়। ইসলামী ব্যবস্থায় কোন ব্যক্তি নিজের খেয়াল-খুশীমত কোন আইন রচনার অধিকার রাখে না। কেননা ইসলাম সকল মানুষকে কেবল এমন একটি 'ইলহামী' আইনের অধীন বানাতে চায়—যা স্বয়ং আল্লাহ মানুষের জন্যে অবতীর্ণ করেছেন এবং যাতে মানুষের মধ্যে পার্থক্য করার বা কারুর উপর কাউকে অগ্রাধিকার দেয়ার কোন অবকাশ নেই।

শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা

ইসলামী সমাজ একটি শ্রেণীহীন সমাজ। কেননা শ্রেণীর অস্তিত্ব ও আইনের অগ্রাধিকার—এ দু'টো ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেখানে আইনের অগ্রাধিকার

নেই এবং নেই বলে কোন শ্রেণীই তাদের মনগড়া আইনের সাহায্যে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্যে আইনের ক্ষতি করতে সক্ষম না হয় সেখানে শ্রেণী প্রথাও চালু হতে পারে না।

কুরআনের আয়াতের সঠিক মর্ম

এখন আসুন, এই অধ্যায়ের প্রথমে যে দু'টি আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে তার সঠিক মর্ম আমরা অনুধাবন করি। কেননা উহার যে নিছক অনুবাদ করা হয়েছে তার বিশ্লেষণ একান্ত প্রয়োজন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ ج

"আর আল্লাহ্ তোমাদের কাউকে কারুর উপর রিযকের ক্ষেত্রে মর্যাদা প্রদান করেছেন।"−(সূরা আন নাহল ঃ ৭১)

وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ ـ

"আর আমরা তাদের কাউকে কারুর উপর বিভিন্ন স্তরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।"−(সূরা আয যুখরূফ ঃ ৩২)

আয়াতে কেবল একটি বাস্তব সত্যেরই বিবরণ দেয়া হয়েছে। সে সত্যটি ইসলামী অনৈসলামিক সকল সমাজেই বর্তমান। ঘটনা শুধু এতটুকুই যে, মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ও মান-মর্যাদার দিক থেকে এক প্রকার পার্থক্য প্রতিনিয়তই বর্তমান। রাশিয়ার কথাই ধরুন। সেখানে কি সকল লোককে একই পরিমাণ পারিশ্রমিক দেয়া হয় ? না কাউকে বেশী দেয়া হয় এবং কাউকে কম দেয়া হয় ? যাদেরকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা হয় তাদের সবাইকে কি একই প্রকার পদ (Rank and Post) দেয়া হয় ?—না কাউকে উচ্চপদে এবং কাউকে নিম্নপদে নিয়োগ করা হয় ? মানগত এই পার্থক্য যদি সেখানেও থাকে, তাহলে উহাকে মানুষের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে ? উপরোক্ত আয়াতসমূহে মানুষের ভেতরকার এই স্বাভাবিক মানগত তারতম্যের কথাই বলা হয়েছে। তারতম্যের কোন কারণের প্রতি ইংগিত করা হয়নি। বলা হয়নি যে, এর ভিত্তি হচ্ছে সম্পদ, সমাজবাদ বা ইস-লাম। এই তারতম্য বা অগ্রাধিকার ইসলামী মানদণ্ডে সুবিচার ভিত্তিক না অ-বিচার ভিত্তিক সে সম্পর্কেও কিছু বলা হয়নি। আয়াতে এ সকল দিকের প্রতি লক্ষ্য না করে, বাস্তবে যা হয় শুধু সেই কথাই বলা হয়েছে যে, মর্যাদা বা মানের এই তারতম্য দুনিয়ার সর্বত্রই বিরাজমান। আর এটা সত্য যে, দুনিয়ায় যা কিছু হয় তা আল্লাহ ভালোরূপেই অবগত আছেন।

গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য

এখন এটা দিবালোকের মত পরিষ্কার যে, ইসলামী সমাজে শ্রেণী প্রথার কোন অস্তিত্ব নেই এবং মানুষে মানুষে তারতম্য করার কোন আইনও বর্তমান

নেই। কেননা পার্থিব সাজ-সরঞ্জাম ও ধন-ঐশ্বর্যের পার্থক্য কোন আইনগত কিংবা ব্যক্তিগত মান-সম্মানের রূপ পরিগ্রহ না করবে সে পর্যন্ত কোন শ্রেণী প্রথা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে না। কেননা আইনের দৃষ্টিতে যদি সকল মানুষ দর্শনের ক্ষেত্রে নয়—বরং বাস্তব কাজের ক্ষেত্রেই সমান বলে স্বীকৃতি পায় তাহলে ধন-দৌলতের এই পার্থক্য কস্মিনকালেও শ্রেণীপ্রথার জন্ম দিতে পারে না।

একথাও স্পষ্ট যে, ইসলামে ব্যক্তিকে ভূমির মালিক হওয়ার যে অধিকার দিয়েছে তার ফলে মালিকরা এমন কোন বিশেষ সুবিধা বা অধিকার লাভ করতে পারে না যার ফলে তারা অন্যকে গোলাম বানাতে বা নিজেদের হীনস্বার্থ উদ্ধারের জন্যে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। সুষ্ঠু ইসলামী ব্যবস্থায় যদি পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সূচিত হতো তাহলে সেখানেও এই একই অবস্থার সৃষ্টি হতো। কেননা ইসলামকে শাসকদের শাসন ক্ষমতা পুঁজিবাদী শ্রেণীর প্রভাব বা দয়া-দাক্ষিণ্যের কোন তোয়াক্কা করে না ; বরং গোটা জাতির সহযোগিতা ও নির্বাচনের মাধ্যমেই শাসকরা ক্ষমতায় আসেন এবং আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করাই তাদের অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। অনস্বীকার্য যে, দুনিয়ায় এমন কোন সমাজ নেই যেখানকার সমস্ত লোকই সম্পদের দিক থেকে পরস্পর সমান। একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজেও এর কোন অস্তিত্ব নেই। এর স্বপক্ষে তারা যে গালভরা বুলি আওড়ায় তা একেবারেই ভিত্তিহীন। তাদের যাবতীয় কীর্তিকলাপের সার হলো এই যে, তারা ছোট ছোট পুঁজিপতিকে খতম করে শাসকদের এমন একটি নতুন শ্রেণীর জন্ম দিয়েছে যা অন্যান্য সকল শ্রেণীকেই নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে।

ইসলাম ও দান

সমাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের মোহে যারা আচ্ছন্ন ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ হলো ঃ ইসলাম জনসাধারণকে ধনীদের দান-খয়রাত নিয়ে বাঁচতে শিখায় ; নিজেদের বাহুবলে বেঁচে থাকার উদ্যমকে নিঃশেষ করে দেয়। একটি ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা এই অপবাদ দিয়ে থাকে। তারা মনে করে যে, যাকাত এমন একটি ঐচ্ছিক দান যা ধনী ব্যক্তিরা নিছক অনুগ্রহ করেই দরিদ্র ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করে দেয়।

যাকাত ও ঐচ্ছিক দানের মধ্যে পার্থক্য

এই অভিযোগের সঠিক মর্ম অনুধাবন করার পূর্বে যাকাত ও ঐচ্ছিক দানের পারস্পরিক পার্থক্য নিরূপণ করা একান্ত প্রয়োজন। দান একটি স্বেচ্ছা-প্রণোদিত ব্যাপার। আইন বা প্রশাসন উহা দেয়ার জন্যে কাউকে বাধ্য করে না। পক্ষান্তরে যাকাত একটি আইনসম্মত বাধ্যতামূলক বিধান। যারা যাকাত দিতে অস্বীকার করে ইসলামী সরকার তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ; এরপরেও যদি তারা যাকাত দিতে অস্বীকার করে তাহলে সরকার তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দিতে বাধ্য হয়। কেননা এরূপ অস্বীকৃতির ফলে তারা আর মুসলমান থাকে না, 'মুরতাদ' (ধর্মত্যাগী বা Apostate) বলে পরিগণিত হয়। বলা বাহুল্য, দানের ক্ষেত্রে ইসলামী সরকার এ ধরনের কোন কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণ করে না ; বরং একে মানুষের কল্যাণ কামনা ও পরার্থপরতার উপর ছেড়ে দেয়।

প্রথম নিয়মিত কর

অর্থনীতির ইতিহাসে যাকাতই হচ্ছে পৃথিবীর সর্বপ্রথম নিয়মিত কর। এর পূর্বে করের জন্যে সুনির্দিষ্ট কোন নিয়ম-কানুনও দুনিয়ায় ছিল না। তখনকার শাসকরা তাদের খেয়াল-খুশি অনুযায়ী কর ধার্য করতো এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ ও দরকার মত তারা আদায় করে নিত। আর এই করের সমস্ত বোঝা ধনীদের নয়—কেবল গরীবদেরকেই বহন করতে হতো। ইসলাম এসে এই কর আদায়ের নির্দিষ্ট নিয়ম-পদ্ধতি চালু করে এবং সাধারণ অবস্থায় সর্বনিম্ন ও শতকরা হারে কর নির্ধারণ করে। আর ইসলামই সর্বপ্রথম গরীবদেরকে বাদ দিয়ে কেবল ধনী এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর কর আরোপ করে।

ইসলামী রাষ্ট্রের কোষাগার

ইসলামী রাষ্ট্রে স্বয়ং সরকারই গরীব ও অভাবীদের মধ্যে যাকাতের অর্থ বন্টন করে দেয়। ধনী লোকেরা নিজেরা এটা করে না। এ যেন এমন এক প্রকার কর যা স্বয়ং সরকার আদায় করে এবং সরকারই উহা সাধারণ লোকদের মধ্যে বিতরণ করে দেয়। ইসলামী রাষ্ট্রের কোষাগারকে সেই সকল দায়িত্বই

পালন করতে হয় যা বর্তমান সরকারগুলোর রাজস্ব মন্ত্রনালয়কে সম্পাদান করতে হয়। উহা এক দিকে বিভিন্ন অর্থ ও কর জনসাধারণের নিকট থেকে আদায় করে এবং অন্য দিকে তাদেরই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও কল্যাণের জন্যে উহার বিলি-বরাদ্দের দায়িত্ব পালন করে। যারা আয়-উপার্জনে অক্ষম, অথবা যাদের আয় অত্যধিক সীমিত বা অপর্যাপ্ত তাদের জীবন-জীবিকার প্রতিও উহাকে লক্ষ্য রাখতে হয়। স্মরণীয় যে, সরকার যে এই শ্রেণীর অক্ষম ও অভাবীদের সাহায্য প্রদান করে তাতে অনুগ্রহ বা এহসানের কোন প্রশ্ন নেই। তাই উহা গ্রহণ করার লাঞ্ছনা বা অবমাননারও অবকাশ নেই। অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী—যারা চাকুরী থেকে অব্যাহতি নেয়ার পরেও সরকারের নিকট পেনশন বা গ্র্যাচুয়িটি গ্রহণ করে— এবং যে সকল কারিগর কল্যাণ তহবিল থেকে বা স্যোস্যাল সিকিউরিটি স্কীমের আওতায় অর্থ সাহায্য লাভ করে তাদের সম্পর্কে তো কেউ এ ধারণা পোষণ করে না যে, তারা খয়রাত গ্রহণ করছে। তাহলে সেই সকল অসহায় শিশু, প্রতিবন্দী যুবক ও অক্ষম বৃদ্ধ লোকদের সম্পর্কে কেমন করে বলা যেতে পারে যে, তারা ভিক্ষা হিসেবে সরকারী সাহায্য পাচ্ছে? সরকার যখন তাদের অক্ষমতার কথা বিবেচনা করে আর্থিক সাহায্য মঞ্জুর করবে তখন তাতে অসম্মানের কী থাকতে পারে? কেননা সরকার তো জনগণের অর্থ জনগণের সেবায় ব্যয় করে মানবিক দায়িত্ব পালন করছে মাত্র।

সামাজিক কল্যাণব্যবস্থা ও ইসলাম

আজকাল কল্যাণ তহবিল প্রতিষ্ঠার যে প্রথা চালু হয়েছে তার পশ্চাতে রয়েছে মানুষের দুঃখ-দুর্দশার তিক্ত অভিজ্ঞতা, রয়েছে সামাজিক বৈষম্য ও বে-ইনসাফীর এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। ইসলামের একচ্ছত্র গৌরবের একটি বড় প্রমাণ এই যে, ইসলাম এই সামাজিক কল্যাণ ব্যবস্থা এমন এক যুগে চালু করেছে যখন গোটা ইউরোপ সামাজিক দিক থেকে ছিল গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত। কিন্তু যারা পাশ্চাত্য বা প্রাচ্যের ধার করা মতাদর্শের প্রশংসায় পঞ্চমুখ তাদের মানসিক গোলামীর বহর এই যে, যদি ইসলাম পূর্ব থেকেই তাদের পসন্দনীয় কোন ব্যবস্থাপনাকে গ্রহণ করে থাকে তবুও ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ বা কুধারণা বিন্দুমাত্রও দূর হয় না। বরং উহাকে তারা বর্বরতা, কুসংস্কার বা প্রতিক্রিয়াশীলতা বলে গণ্য করতে থাকে।

যাকাতের বন্টন ও ইসলাম

ইসলামের প্রাথমিক যুগে বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে যাকাতের হকদার ব্যক্তিরা নিজেরাই যাকাতের অর্থ সংগ্রহ করতো। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, ইসলামের দৃষ্টিতে যাকাত বন্টনের একমাত্র রীতি হলো ঃ যাকাতের হকদাররাই ঘুরে ঘুরে যাকাতের অর্থ গ্রহণ করবে, অন্য কোন পন্থায় যাকাতের লেন-দেন

হতে পারবে না। ইসলামী আইনে এমন কিছু নেই যাতে করে ইহা প্রমাণিত হতে পারে। ইসলামে যাকাতের অর্থ দ্বারা জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান যেমন—শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ইত্যাদি স্থাপন করা যেতে পারে। পারস্পরিক সাহায্যের বিভিন্ন সংস্থা কায়েম করা যেতে পারে, কারখানা ইত্যাদির প্রতিষ্ঠাও হতে পারে, অন্য কথায়, যাকাতের অর্থ সমাজ কল্যাণের যে কোন কার্যেই ব্যয়িত হতে পারে। যাকাতের অর্থ থেকে দ্রব্যে বা নগদ সাহায্য কেবল অসুস্থ, বৃদ্ধ এবং শিশুদেরকে দেয়া হয়। কিন্তু অন্যান্য লোকদের সাহায্য তাদের উপার্জনের ব্যবস্থা করে দেয়ার কিংবা তাদের কল্যাণের জন্যে কোন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে হয়। কেননা ইসলামী সমাজই এমন একটি সমাজ যেখানে শুধু যাকাত দ্বারা জীবিকা নির্বাহের কোন গরীব শ্রেণীর পৃথক অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ইসলামী সমাজের আদর্শ যুগ

হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ (রা)-এর খেলাফাতকালও ইসলামী সমাজের আদর্শ যুগ বলে পরিচিত। সে যুগে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা এতদূর উন্নত হয়েছিল যে, যাকাতের অর্থ আদায় করে যাকাত গ্রহীতাকে ঘুরে ঘুরে তালাশ করা হতো। কিন্তু যাকাত গ্রহণ করতে পারে এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যেত না। হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ (রা)-এর যাকাত বিভাগের কর্মকর্তা হযরত ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ বলেন ঃ

> "হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ (রা) আমাকে যাকাত আদায় করার জন্যে আফ্রিকায় প্রেরণ করেন। আমি যাকাত আদায় করে গরীব ব্যক্তিদের খোঁজ করলাম। আমি কোন গরীব লোক পেলাম না এবং যাকাতের এমন কোন হকদারও পেলাম না যে যাকাত নিতে আসে। কেননা হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ (রা) লোকদের সুখী ও স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী করে দিয়েছিলেন।"

এটা স্বাভাবিক ব্যাপার যে, প্রত্যেক সমাজেই গরীব ও অভাবী লোক থাকবে। সুতরাং তাদের সমস্যার সমাধানের জন্যে যথোপযুক্ত আইনও থাকতে হবে। বিভিন্ন সময়ে ইসলামের সাথে যে সকল জাতি সংযুক্ত হতে থাকে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল বিভিন্ন ধরনের। কাজেই এটাই ছিল একান্ত স্বাভাবিক ও যুক্তিসংগত যে, ইসলাম এমনভাবে আইন রচনা করবে যাতে করে হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ (রা)-এর সময়কার সমাজের ন্যায় আদর্শ সমাজ গঠিত হতে থাকবে।

দানের তাৎপর্য

এতক্ষণ আমরা যাকাত সম্পর্কে আলোচনা করেছি। 'সাদাকাত' বা দান যাকাত থেকে পৃথক একটি জিনিস। এ হচ্ছে এমন এক সম্পদ যা ধনী ও সচ্ছল ব্যক্তিরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ব্যক্তি কল্যাণ বা সমাজসেবার উদ্দেশ্যে প্রদান করে থাকে। ইসলাম 'সাদাকাত'কে শুধু পসন্দই করে না বরং উহাকে উৎসাহিতও করে। ইসলাম এর জন্যে বিভিন্ন পন্থা নির্দেশ করেছে যেমন ঃ পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য করা, সাধারণ অভাবগ্রস্ত লোকদের অভাব মোচন করা। এখানেই শেষ নয়, সৎ ও মহৎ কাজ এবং স্নেহ-মমতা ও সহানুভূতিসূচক কথা-বার্তাও 'সাদাকাত' বলে গণ্য।

দানের মূল প্রেরণা

আমরা যদি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করি কিংবা তাদের সাহায্য করি তাহলে তারা কি মানসিকভাবে আহত হবেন ? তাদের আত্মসম্মানে কি আঘাত লাগবে ?—কখনো না। আত্মীয়-স্বজনদের জন্যে ভালোবাসা। হামদর্দি ও স্নেহ-মমতা থাকলেই কেবল মানুষ এ ধরনের বদান্যতা প্রদর্শন করতে পারে। অনুরূপভাবে কেউ যদি ভাইকে উপহার দেয় কিংবা কোন বন্ধুকে দাওয়াত দেয় তাহলে এতে করে কারুর এমন অমর্যাদা করা হয় না যে, অবশেষে এটাই এক সময়ে ঘৃণা বা শত্রুতার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

নগদ যাকাত

ইসলামের প্রাথমিক যুগে যাকাতের জন্যে যে বিধান ও নিয়ম চালু ছিল দানের অর্থ নগদ দেয়ার ক্ষেত্রেও তা-ই চালু ছিল। তখন এমনই এক পরিবেশ ছিল যে, নগদ হাদিয়া (বা উপহার) হিসেবে অভাবী লোকদের নিকট উহা পৌঁছিয়ে দেয়া হতো। কিন্তু ইসলামের এমন কোন বিধান ছিল না যার ভিত্তিতে একথা বলা চলে যে, দান শুধু ঐরূপ নির্দিষ্ট নিয়তেই সম্পন্ন করতে হবে। বরং সামাজিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে যে সকল প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কাজ করবে সেগুলোর পক্ষ থেকেও এটা আদায় করা যেতে পারবে। অনুরূপভাবে যাকাতের অর্থও ইসলামী রাষ্ট্রকে সমাজকল্যাণমূলক বিভিন্ন 'প্রজেক্ট' ও 'স্কীম' বাস্তবায়নের জন্যে দেয়া যাবে। ইসলামের লক্ষ্যই হলো ঃ যতদিন পর্যন্ত সমাজের কেউ গরীব থাকবে ততদিন পর্যন্ত রাষ্ট্র সকল সম্ভাব্য উপায়ে অধিক হতে অধিকতর আর্থিক সুবিধাদানের ব্যবস্থা করতে থাকবে। তবে ইসলাম এটা কখনো চায় না যে, সমাজে গরীব ও অভাবীদের একটি শ্রেণী সর্বদা বর্তমান থাকুক, বরং চায় সমাজে গরীব বা অভাবী বলতে যেন কেউই না থাকে। বস্তুত ইসলামের আদর্শ সমাজে যাকাত বা দান গ্রহণের জন্যে অভাবী লোক তালাশ করা হয়,

কিন্তু কাউকেই সেখানে খুঁজে পাওয়া যায় না। হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ (রা)-এর আদর্শ যুগেই আমরা দেখতে পাই ঃ যাকাত বা দান গ্রহণ করার মত কোন অভাবী লোক ইসলামী রাষ্ট্রের কোথাও নেই। গোটা সমাজ থেকে দারিদ্র ও অভাব-অনটন যখন নির্মূল হয়ে যায় তখন যাকাত ও দানের অর্থ সমাজসেবার বিভিন্ন কাজে এবং আয়-উপার্জনে অক্ষম সকল প্রকার প্রতিবন্দীদের সম্মানজনক জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হয়।

অনুগ্রহ নয়, অবশ্যকরণীয় কর্তব্য

ইসলাম মুসলমানদেরকে শুধু যাকাত ও দানের অর্থ প্রদান করেই ক্ষ্যান্ত থাকতে শিখায় না। উহা রাষ্ট্রকেই এই দায়িত্ব অর্পণ করে যে, রাষ্ট্রে বসবাসকারী ঐ সকল নাগরিকদের মানবীয় ও সম্মানজনক জীবনযাপনের ব্যবস্থা করবে যারা—যে কোন কারণেই হোক—উপার্জন করতে অক্ষম। অন্য কথায়, এদেরকে সাহায্য করে ইসলামী রাষ্ট্র কোন অনুগ্রহ প্রকাশ করে না, বরং ইসলাম কর্তৃক অর্পিত গুরুদায়িত্ব পালন করে মাত্র।

উপার্জনের পথ ও ইসলামী সরকার

ইসলামী রাষ্ট্রকে আরো একটি গুরুদায়িত্ব পালন করতে হয় যে, যারা উপার্জন করতে সক্ষম তাদের সকলের জন্যেই কাজের সংস্থান করে দিতে হবে। হযরত বিশ্বনবী (সা)-এর একটি হাদীস দ্বারাই ইসলামী রাষ্ট্রের এই দায়িত্ব প্রমাণিত হয়। উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে ঃ "এক ব্যক্তি হযরত (সা)-এর নিকট এসে কিছু সাহায্যের আবেদন করলো। তিনি তাকে একটি কুঠার ও এক গাছা দড়ি দিয়ে বললেন ঃ জংগলে গিয়ে কাঠ সংগ্রহ করবে এবং উহা বিক্রয় করে দিনাতিপাত করবে। তিনি তাকে একথাও বললেন যে, কিছুদিন পরে যেন সে তার অবস্থার কথা তাঁকে জানায়।"

কেউ কেউ হয়ত এই হাদীসকে নিছক একটি ব্যক্তিগত ঘটনা বলে উড়িয়ে দিতে পারে। বর্তমান বিংশ শতাব্দীর সাথে যাদের কোন সম্পর্ক নেই তারাই এরূপ করতে পারে। কেননা এই হাদীসে একটি কুঠার, এক গাছা দড়ি এবং একজন দরিদ্র বেকার মানুষের কথাই বলা হয়েছে—অথচ আধুনিক যুগে আমরা সামনে দেখছি বড় বড় কারখানা, লক্ষ লক্ষ বেকার শ্রমিক, শৃংখলাপূর্ণ সরকার এবং সাজানো-গুছানো কত বিভাগ-উপবিভাগ। সুতরাং মামুলি একটি হাদীসের অবতারণা নিবুর্দ্ধিতা বই কি ? কেননা হযরত বিশ্বনবী (সা)-এর পক্ষে এ কাজ সম্ভবপর ছিল না যে, তিনি সহস্রাধিক বছর পূর্বে দুনিয়ার বুকে যখন কল-কারখানার কোন অসিত্বই ছিল না—বড় বড় শিল্প বা কারখানা সম্বন্ধে কোন কথা বলবেন অথবা ঐগুলোর সংশ্লিষ্ট কোন আইন-কানুন রচনা

করবেন। তিনি যদি এরূপ করতেন তাহলে ঐ সময়ে কোন লোকই এটা বুঝতে সক্ষম হতো না।

এরূপ পদ্ধতি অবলম্বনের পরিবর্তে শরীয়াতের বিধানদাতা কেবল জীবন পদ্ধতির মূল ভিত্তিগুলোরই উপস্থাপিত করেছেন এবং বাস্তব জীবনের সমস্যাগুলোর সমাধান এই মূল ভিত্তির আলোকে বের করার দায়িত্ব ভবিষ্যত প্রজন্মের উপর ছেড়ে দিয়েছেন।

ইসলামী সরকারের কল্যাণকর ভূমিকা

পূর্বে যে হাদীসটির বরাত দেয়া হয়েছে তার মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের নিম্নলিখিত দায়িত্বের উপর আলোকপাত করা হয়েছে ঃ

(১) হযরত বিশ্বনবী (সা) (অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধান) এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন যে, বেকার লোকের কর্মসংস্থানের দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত।

(২) হযরত বিশ্বনবী (সা) অবস্থা ও পরিবেশ অনুযায়ী সেই লোকের কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন।

(৩) হযরত বিশ্বনবী (সা) যখন ঐ ব্যক্তিকে ফিরে আসার এবং তার অবস্থা জানাবার হুকুম দেন তখন সে ব্যক্তিও নবী (সা)-এর দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতন হয়ে যায়।

রাষ্ট্রপ্রধানের এই দায়িত্ব সচেতনতা—যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ইসলাম আজ থেকে চৌদ্দ শ' বছর পূর্বে সমস্ত বিশ্ববাসীর নিকট তুলে ধরেছে—সর্বাধুনিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জশীল।

ইসলামী রাষ্ট্র যদি বেকার নাগরিকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে না পারে তাহলে তাদের অর্থনৈতিক দূরবস্থা দূর না হওয়া পর্যন্ত তাদের জীবন ধারনের যাবতীয় ব্যবস্থা করার দায়িত্ব সরকারী বায়তুলমালের উপর অর্পিত হয়। এর একমাত্র কারণ হলো ঃ মুসলমানগণ তো নিজেদের ব্যাপার হোক কিংবা রাষ্ট্র তথা অন্যান্য নাগরিকদের বিষয় হোক সকলের সাথে মহত্ব ও উদারতা প্রদর্শনের আদর্শই স্থাপন করে এসেছে।

ইসলাম ও নারী

প্রাচ্য জগতে আজ নারীর অধিকার ও পুরুষদের সাথে তাদের সমতার দাবী নিয়ে উত্তপ্ত আলোচনা চলছে। নারীর অধিকার সম্পর্কে তাদের সমর্থকদের মধ্যে যে সকল পুরুষ ও মহিলা অত্যধিক সোচ্চার তারা ইসলাম সম্বন্ধে যে নির্বুদ্ধিতামূলক উক্তি করছে তার কোন তুলনা নেই। তাদের কেউ কেউ তো দূরভিসন্ধিমূলকভাবে বলছে ঃ ইসলাম তো সকল দিক থেকেই নারী ও পুরুষের মধ্যে সাম্যের ব্যবস্থা করেছে। আবার কেউ কেউ নিছক মূর্খের মতই দাবী করছে ঃ ইসলাম হচ্ছে নারীদের শত্রু। কেননা ইসলামের দৃষ্টিতে নারী হচ্ছে অবজ্ঞার পাত্র ; মানসিকতার দিক থেকে তারা নিকৃষ্ট ; সমাজে তাদের অবস্থান এতদূর নিম্নে যে, তাদের এবং অন্যান্য জানোয়ারের মধ্যে কোন পার্থক্যই নেই। তারা শুধু পুরুষদের যৌন স্পৃহা চরিতার্থ করার মাধ্যম এবং সন্তান উৎপাদনের অদ্বিতীয় মেশিন। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর সামাজিক মর্যাদা পুরুষের তুলনায় অনেক নিম্নে ;—এক কথায় পুরুষ হলো নারীর একচ্ছত্র শাসক, জীবনের সকল ক্ষেত্রেই নারীর উপর চলে পুরুষের অবাধ রাজত্ব।

মোটকথা উপরোক্ত উভয় দলই ইসলাম সম্পর্কে একই রূপ মূর্খতার শিকার। দ্বিতীয়ত, এরা জেনে শুনেই মানুষকে ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যে সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করে দেয়—যাতে করে গোটা সমাজে অনাচার ও অশান্তি বিরাজ করে এবং তারই আড়ালে তারা নিজেদের হীন স্বার্থ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

ইউরোপে নারী স্বাধীনতা আন্দোলন

ইসলামে নারীর মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে ইউরোপের নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের (Emancipation Movement) ইতিহাসের প্রতি একবার মোটামুটি দৃষ্টি দেয়া যাক। কেননা আধুনিক পাচ্যে যে চিন্তাধারার বিকৃতি লক্ষ্য করা যায়, এই আন্দোলনই হচ্ছে তার প্রধান উৎস।

প্রাচীন যুগের নারীদের অবস্থা

প্রাচীন ইউরোপ তথা গোটা দুনিয়ায় নারীদের কোন মান বা মর্যাদা বলতে কিছুই ছিল না। প্রাচীন "পণ্ডিত" ও "দার্শনিকরা" সুদীর্ঘ কাল ধরে এ বিষয়ে গবেষণা চালাতে থাকে যে, নারীর মধ্যে প্রাণ বলতে কিছু আছে কি ?—যদি থাকে তাহলে সেটা কি মানুষের, না অন্য কোন প্রাণীর ? যদি মানুষের প্রাণই হয়ে থাকে তাহলে পুরুষদের বিপক্ষে তাদের সঠিক সামাজিক মর্যাদা কি ?

তারা কি জন্মগতভাবেই পুরুষদের গোলাম না গোলামের চেয়ে কিছুটা উন্নত মর্যাদার অধিকারী ?

গ্রীস ও রোম

গ্রীস ও রোমকদের ইতিহাসের এক সংক্ষিপ্ত সময়ে বাহ্যত নারীদের যখন কেন্দ্রীয় মর্যাদা দান করা হয়েছিল তখনও তাদের অবস্থা পূর্বের মত শোচনীয় পর্যায়েই ছিল। কেননা নারীদের তখন যতটুকু মর্যাদা দেয়া হয়েছিল তা নারী হিসেবে দেয়া হয়নি। গোটা নারী জাতির প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তা করা হয়নি। কেননা ঐ নামকাওয়াস্তে মর্যাদাটুকু কেবল বড় বড় শহরে বসবাসকারিণী কিছুসংখ্যক বিশেষ মহিলা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল—যারা নিজেদের কিছু গুণপনার কারণে সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। তারা হয়েছিল বিভ্রান্ত ও ভোগ-বিলাসী পুরুষদের আমোদ-প্রমোদের প্রধান মাধ্যম। তাই এ পুরুষরা তাদের উৎসাহ বর্ধন করতো নানাভাবে। মোটকথা নারীদের প্রতি যে সদাচার দেখানো হতো তা নারী হিসেবে তো নয়ই, এমনকি মানুষ হিসেবেও নয়—বরং তাদেরকে পুরুষদের আনন্দ-স্ফূর্তি ও যথেচ্ছ ভোগ-বিলাসের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার জন্যেই তাদের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন করা হতো।

সামন্তদের যুগে

ইউরোপে নারীদের এই অবস্থা কৃষি দাসত্ব (Serfdom) ও সামন্তদের যুগেও অব্যাহত ছিল। নারীরা তাদের সংকীর্ণ দৃষ্টির কারণে জীবনের চোখ ঝলসানো বাহ্যিক রূপ সৌন্দর্য দ্বারা বারবার প্রতারিত হয়েছে। তারা মনে করেছে ঃ বাস, এই হলো জীবন ! খাওয়া, পান করা, সন্তান উৎপাদন করা এবং জন্তু-জানোয়ারের মত নিরলস......করাই হলো তাদের জীবনের একমাত্র ব্রত।

ইউরোপে যে শিল্প বিপ্লব ঘটে উহা নারীদের জন্যে চরম অভিশাপ ও অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের পয়গাম বয়ে নিয়ে আসে। এখন থেকে তারা যে দুঃখ-দুর্দশার করুণ শিকার হতে থাকে তা তাদের পেছনের রোমাঞ্চকর ইতিহাসকেও ম্লান করে দেয়।

ইউরোপে এখন যে মানসিকতা বর্তমান তা বক্রতা ও নিষ্ঠুরতার এক বীভৎস মূর্তি ছাড়া অন্য কিছুই নয় ; তাতে সৌহার্দ ও মায়া-মমতা বলতে কিছুই নেই। উহা মানুষকে প্রতিটি ক্ষেত্রেই দুঃখ-দুর্দশার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু এর পরিবর্তে মুখ্য বা গৌণ কোন প্রকার কল্যাণই সাধন করতে পারছে না। তবে কৃষি-দাসত্ব ও সামন্তবাদের যুগে এবং প্রচলিত কৃষি ব্যবস্থার আওতায় নারীদের জীবন জীবিকার দায়িত্ব পুরুষরাই বহন করতো। বস্তুত তখনকার

পরিবেশ ও মন-মানসিকতার দিক থেকে ইহা সম্পূর্ণরূপে উপযোগী ছিল। এই সময়েও নারীরা বিভিন্ন কুটির শিল্পে পুরুষের সহযোগিতা করতো। আর এতে করে পুরুষরা নারীদের যে জীবিকা ও অর্থনৈতিক দায়িত্ব বহন করতো তার একটা বিনিময় হয়ে যেত।

শিল্প বিপ্লবের পর

কিন্তু শিল্প বিপ্লবের পর কি শহর কি মফস্বল সর্বত্রই এক আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল। পারিবারিক জীবন সম্পূর্ণরূপেই ধ্বংস হয়ে গেল। পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক ঐক্য ও সংহতির সকল বন্ধনই ছিন্ন হয়ে গেল। কেননা শিল্প বিপ্লবের ফলে যে মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয় তার ফলে নারী এবং শিশুদেরকেও গৃহ ছেড়ে কলে-কারখানার পথ ধরতে হয়—যাতে করে একমাত্র মেহনত করেই দু' মুঠো আহার যোগাড় করা যায়। এতে করে শ্রমিকরা ধীরে ধীরে পল্লী এলাকা পরিত্যাগ করে শহরে আসতে শুরু করে। পল্লী জীবনে পারস্পরিক দায়িত্ববোধ, স্নেহ-মমতা, প্রেম-প্রীতি এবং যৌথভাবে কর্ম-সম্পাদনের স্পৃহা পাওয়া যেত ; কিন্তু শহুরে জীবনে এগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায়। সেখানে কেউই কারুর সংবাদ রাখে না। অন্য লোক তো দূরের কথা, নিকটতম প্রতিবেশীর কথাও কখনো চিন্তা করে না। প্রতিটি ব্যক্তিই সেখানে আত্মকেন্দ্রিক, কেউই কারুর কথা ভাবতে রাজী নয়। কেউ কারুর দায়িত্ব বা বোঝা বহন করতে সম্মত নয়। এ কারণে শহরে নৈতিক শৃংখলা বলতে কিছুই থাকলো না এবং তার পরোয়াও করতো না। ফলে যৌন অরাজকতার সয়লাবে গোটা পরিবেশ বিষাক্ত হয়ে উঠে, যৌন ইচ্ছা চরিতার্থ করার সামান্য সুযোগ পেলেও এর সদ্ব্যবহার করা হতো। এমনি করে নৈতিকতার বন্ধন বলতে কোন কিছুই আর অবশিষ্ট থাকলো না। ফলে বিয়ে করার এবং ঘর-সংসার করার প্রবণতা প্রায় শেষ হয়ে গেল। যার একান্তই ইচ্ছা জাগত সেও চাইতো যে, এ বিপদ (!) যত দেরীতে আসে ততই ভালো।[১]

---

১. এই প্রকার ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করে জড়বাদী ও মার্কসবাদী ধ্বজাধারীরা দাবী করে যে, কেবল অর্থনৈতিক পরিবেশই সামাজিক পরিবেশকে সৃষ্টি করে এবং মানুষের সম্পর্ককে নির্ধারণ করে। মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক গুরুত্ব অবশ্যই স্বীকৃত। কিন্তু এরূপ ধারণা করা ভিত্তিহীন যে, কেবল অর্থনৈতিক কারণই মানুষের চিন্তাধারা ও কর্মতৎপরতাকে নিয়ন্ত্রিত করে। ইউরোপে অর্থনীতির যে গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয় তার মূল কারণ হলো এই যে, ইউরোপবাসীর নিকট কোন মহান জাতীয় লক্ষ্য বর্তমান ছিল না—যা ইসলামী দুনিয়ার ন্যায় ইউরোপকেও আধ্যাত্মিক মহিমার সাথে পরিচিত করাতে পারতো এবং অর্থনৈতিক বন্ধনকে মানবতার ভিত্তিতে সুবিন্যস্ত করতে সাহায্য করতে পারতো। এরূপ হলে শুধু ইউরোপের যাবতীয় সমস্যারই সমাধান হতো না, বরং বহির্বিশ্বের লোকেরাও জুলুমবাজদের ভোগ-বিলাস ও অন্যায় শোষণের (Exploitation) হাত থেকে মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হতো।

নারী নির্যাতন ও বঞ্চনার শিকার

ইউরোপের পূর্ণাংগ ইতিহাসের আমাদের প্রয়োজন নেই। বরং উক্ত ইতিহ-াসের যে অংশটুকু নারীদের ভাগ্য নির্ধারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এখানে শুধু সেটুকুই আলোচনা করছি। পূর্বেই আমরা বলেছি যে, শিল্প বিপ্লবের ফলে শিশু ও নারীদের উপর যে অর্থনৈতিক দায়িত্ব চাপানো হয়েছে তার ফলে পারিবারিক সম্পর্ক শিথিল হয়ে গেছে এবং গোটা সংসার জীবনই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। অনস্বীকার্য যে এই বিপ্লবের ফলে নারীরাই হচ্ছে সর্বাধিক মজলুম—অত্যাচার ও নিপীড়নের নিষ্ঠুরতম শিকার। এখন থেকে তাদের যে পরিশ্রম করতে হতো তার কোন তুলনা অতীত ইতিহাসে বর্তমান নেই। এখন হতেই তাদের সমস্ত ইজ্জত ও সম্ভ্রম ভূলুণ্ঠিত হয়ে যায়। একদিকে তারা যেমন মানসিক শান্তি হারিয়ে ফেলে, অন্যদিকে তেমনি হাজার পরিশ্রম করেও তারা এতটুকু সচ্ছলভাবে জীবনযাপন করতে ব্যর্থ হয়ে যায়। পুরুষরা এমন হৃদয়হীন ও নিষ্ঠুর মানসিকতার শিকার হয় যে, স্ত্রী হোক, কন্যা হোক, বোন হোক, মা হোক—কোন নারীকেই আশ্রয় দিতে অস্বীকার করে এবং যার রুজি তাকে কামাই করে বেঁচে থাকার জন্যে বাধ্য করে। এর পরেও এই নারীরা হতো কল-কারখানার মালিকদের বে-ইনাসাফী ও স্বেচ্ছাচারিতার করুণ শিকার। নারীদেরকে অধিক কাজ করার জন্যে বাধ্য করা হতো। কিন্তু তাদের পারিশ্রমিক ছিল পুরুষদের তুলনায় অনেক কম।

ইউরোপীয় নারীদের নির্যাতিত হওয়ার মূল কারণ

ইউরোপীয় সমাজের মূল ভাবধারার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কার্পণ্য, নিষ্ঠুরতা ও অকৃতজ্ঞতা। এই বৈশিষ্ট্যেকে সামনে রেখে, নারীদের প্রতি তারা যে ব্যবহার করছে তার মূল কারণ অনুধাবন করা মোটেই কঠিন নয়। তারা মানুষকে কখনো মানুষ হিসেবে সম্মান দেয় না। কারুর মাধ্যমে কারুর উপকার হোক এও তারা পসন্দ করে না। তাদের অতীত ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, নিজের ক্ষতির কোন আশংকা না থাকলে সুযোগ হওয়া মাত্রই তারা অন্যের ক্ষতি করবেই। ভবিষ্যতেও তাদের এই স্বভাবের যে কোন পরিবর্তন ঘটবে তার কোন আলামত খুঁজে পাওয়া যায় না। একমাত্র আল্লাহ্ যদি তাদের প্রতি দয়া করেন এবং মহৎ গুণাবলী ও আধ্যাত্মিক পবিত্রতার আলোকে তাদের সঠিক পথে চলার তওফিক দান করেন তাহলেই তাদের স্বভাব পরিবর্তন হতে পারে। যাই হোক, আমরা যে যুগের কথা আলোচনা করছিলাম তখন দুর্বল শিশু ও নারীদের উপর কল-কারখানার জালেম মালিক গোষ্ঠী যে যথেচ্ছ ও অমানুষিক যুলুম করতো তার কোন তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় না।

সমাজ সংস্কারক এবং নারী

সমাজের এই দুর্বল শ্রেণীটির উপর অত্যাচার যখন চরমে উঠে তখন কিছু সংখ্যক হৃদয়বান ব্যক্তি এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠে। তারা কেবল শিশুদের

(হ্যা, শুধু শিশুদের, নারীদের নয়) উপর যাতে করে অত্যাচার না হয় সে জন্যে আন্দোলন শুরু করে। ছোট শিশুদেরকে কারখানায় চাকুরী দেয়ার বিরুদ্ধে তারা মরিয়া হয়ে উঠে। কেননা এতে করে শিশুদের সুকুমার বৃত্তিগুলো নষ্ট হয়ে দৈহিক ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। এছাড়া তাদেরকে যে পারিশ্রমিক দেয়া হতো তাদের কঠিন ও অযৌক্তিক কাজের তুলনায় তা হতো একেবারেই নগণ্য। সামাজিক অবিচারের বিপক্ষে এই আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হয়। ফলে শিশুর ন্যূনতম বয়সের মাত্রা ও পারিশ্রমিক বাড়তে থাকে এবং দৈনিক কাজের সময়সীমা কমতে থাকে।

কিন্তু নারীদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্যে কোন সমাজ সংস্কারকই এগিয়ে এলো না। তারা পূর্বের মতই মজলুম থেকে গেল। তাদের অধিকার সংরক্ষণের জন্যেও কেউ সক্রিয় হলো না। কেননা এতটুকু করার জন্যে যে মানসিকতা ও নৈতিক উৎকর্ষের প্রয়োজন সমগ্র ইউরোপের কোথাও তা ছিল না। কাজেই নারীদের দুঃখ-দুর্দশার কোন পরিসমাপ্তি হলো না। দিনরাত হাড়ভাংগা খাটুনি খেটেই কোন মতে তাদের জঠর জ্বালা নিবারণ করতে হতো। কেননা তাদেরকে যে যৎসামান্য মজুরী দেয়া হতো তা অতটুকু কাজ করে পুরুষরা যে মজুরী পেত তার তুলনায় খুবই কম।

বিশ্বযুদ্ধের পর

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইউরোপ ও আমেরিকার লক্ষ লক্ষ পুরুষ মারা যায় এবং পেছনে রেখে যায় তাদের লক্ষ লক্ষ বিধবা স্ত্রী। এরা হলো সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশার করুণ শিকার। হলো নিরাশ্রয় ও অসহায় ; এমন কোন মহৎ ব্যক্তিও পাওয়া গেল না যার তত্ত্বাবধানে তারা নিরাপদে জীবনযাপন করতে পারে। যারা তাদের আশ্রয়দাতা ছিল তাদের কতক মারা গেল, কতক জীবনের তরে পংগু ও অক্ষম হয়ে গেল, কতক প্রচণ্ড ভীতি, প্যারালাইসিস বা বিষাক্ত গ্যাসের কারণে চিরতরে অকর্মণ্য হয়ে গেল। আবার কতক জেল খাটার পর সমস্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা হারিয়ে যেন অথর্ব প্রাণীতে পরিণত হলো। এ শ্রেণীর লোকেরা বিয়ে-শাদীর স্পৃহা হারিয়ে ফেলল। কেননা দাম্পত্য জীবনের জৈবিক, দৈহিক বা মানসিক ঝামেলা পোহাবার শক্তিই তাদের ছিল না।

নারীদের অসহায় অবস্থা

যুদ্ধের ফলে পুরুষদের সংখ্যা যতদূর হ্রাস পায় তা পূরণ করা জীবিত ব্যক্তিদের পক্ষে কখনো সম্ভবপর ছিল না। পুরুষ ও শ্রমিকদের সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণে কারখানাগুলোর মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয় এবং এ কারণে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ফলে নারীদেরকে বাধ্য হয়েই ঘর থেকে

বের হতে হয় এবং বের হয়ে পুরুষদের স্থলে কাজ করতে হয়। নতুবা তাদের নিজেদেরকে এবং তাদের সংশ্লিষ্ট বৃদ্ধা ও শিশুদেরকেও ক্ষুধার জ্বালায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হতো। কিন্তু কারখানায় গিয়ে কাজ করার ফলে নারীদেরকে নিজ নিজ চরিত্র এবং সতীত্ব উভয়কেই বিসর্জন দিতে হতো। কেননা এই দু'টিকে রক্ষা করতে হলে একদিকে তাদের 'প্রগতি'র পথ রুদ্ধ হয়ে যায় এবং অন্যদিকে স্বাধীনভাবে পয়সা রোজগার করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত, কারখানা মালিকদের অবস্থা এই ছিল যে, শুধু কর্মচারীদের হাতই তাদের কাম্য ছিল না। বরং যৌন পিপসা চরিতার্থ করার অবাধ সুযোগও তারা তালাশ করতো। এই পরিস্থিতিতে শ্রমিক নারীদের সম্ভ্রম লুটে নেয়ার সুবর্ণ সুযোগ তারা লাভ করলো। ফলে নারীদেরকে দ্বিগুণ দায়িত্ব পালন করতে হলো। একদিকে কারখানায় দিনরাত পরিশ্রম করা এবং অন্যদিকে কারখানার কর্ম-কর্তাদের মনোরঞ্জন করা। এখন থেকে নারীদের শুধু জঠর জ্বালা নিবারণ করাই নয়, বরং পুরুষদের যৌন পিপাসা মিটানোও তাদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। যুদ্ধে বহু পুরুষের মৃত্যু হওয়ায় প্রত্যেক নারীর পক্ষে বৈধ পন্থায় যৌন পিপাসা মিটাবার উদ্দেশ্যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াও অসম্ভব হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত, ইউরোপে প্রচলিত তৎকালীন ধর্ম অনুযায়ী ইসলামী আইন অনুসারে জরুরী পরিস্থিতিতে একাধিক বিবাহেরও কোন অবকাশ ছিল না। ফলে অসহায় নারীরা নিজেদের বল্গাহীন কামনা ও প্রবৃত্তির হাতে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো। একদিকে উপার্জনের চিন্তা ও যৌন স্পৃহা চরিতার্থ করার উদগ্র নেশা এবং অন্যদিকে মূল্যবান কাপড়-চোপড় ও মনভোলানো সাজ-সজ্জা (Makeup) করার দুর্বার আকাংখার নিকট পরাভূত হয়ে তারা এক নির্দিষ্ট পথ ধরে চলতে শুরু করে।

মোটকথা এখন থেকে ইউরোপীয় নারীদের একমাত্র কাজ হলো পুরুষদের মনোরঞ্জন করা, কারখানা বা দোকানের চাকুরী করা এবং বৈধ-অবৈধ যে কোন পন্থায় কামরিপু চরিতার্থ করা। তাদের নিকট বিলাসিতা ও সাজ-সজ্জার উপায়-উপাদান যতই বাড়তে থাকে ততই তাদের লোভ-লালসাও বাড়তে থাকে। আর চরিতার্থ করার একমাত্র পন্থা ছিল এই যে, মজুরী বৃদ্ধির জন্যে তারা অধিক হতে অধিকতর সময় ব্যয় করবে। বলা বাহুল্য নারীদের এই দুর্বলতার সুযোগে কারখানার মালিকরা তাদের অমানুষিক জুলুম করতে শুরু করে। মালিকরা একই কাজের বিনিময়ে পুরুষদের চেয়ে অনেক কম পারিশ্রমিক দিয়ে কাজ করাতে থাকে এবং অধিক থেকে অধিকতর মুনাফা অর্জন করতে থাকে।

এর অনিবার্য ফল এই যে, একান্ত স্বাভাবিকভাবেই এমন এক মহাবিপ্লব দেখা দিল যে, জুলুম ও বে-ইনসাফীর ভিত্তিতে গড়ে উঠা শত শত বছরের পুরানো ব্যবস্থা চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

সামাজিক বিপ্লবের পরে

কিন্তু এই বিপ্লবে নারীরা পেল কি ? শারীরিক দিক থেকে তারা হলো অধিকতর করুণ অবস্থার শিকার। যে সম্ভ্রম ও সতীত্ব তারা হারিয়ে ফেলেছিল তা আর ফিরে পাওয়া গেল না। স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিতে ভরা যে মধুর পারিবারিক জীবনে নারীরা যে ব্যক্তিত্ব, সম্মান ও পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারতো তা তো আর পুনর্গঠিত হলো না। তবে এই বিপ্লবে নারীরা পুরুষের সমান পারিশ্রমিক লাভের অধিকারটুকু লাভ করে। আর ইউরোপ এই স্বাভাবিক অধিকারটুকু এখনো নারীদেরকে দিতে পারছে। কিন্তু ইউরোপের পুরুষরা অত সহজে এই অধিকারটুকু দিতে সম্মত হয়নি, বরং এক সুদীর্ঘ ও সুকঠিন দ্বন্দ্ব ও টানা-হেঁচড়ার পরেই এই সমতাটুকু মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। এরূপ একটি সংগ্রামে স্বাভাবিকভাবে যে সকল হাতিয়ার ও উপায়-উপাদান ব্যবহার করা যেতে পারে তার সবটুকুই ব্যবহার করা হয়েছে।

অধিকার আদায়ের এই সংগ্রামে নারীদের হরতালের পর হরতাল করতে হয়েছে, জনসমর্থন লাভের জন্যে রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষোভ ও মিছিল করতে হয়েছে। জনসভা ও পথসভার অনুষ্ঠান করতে হয়েছে। প্রেস ও সাংবাদিকদের সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করতে হয়েছে। এতকিছু করার পরেই অনুভূত হয়েছে যে, এই বিরোধের অবসানের জন্যে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে নারীদেরকেও পুরুষের সমান অংশগ্রহণ করতে হবে। প্রথমে তাদের ভোটাধিকারের দাবী উত্থাপন করা হয়। এই দাবী জোরদার হতে হতে শেষ পর্যন্ত এই শ্লোগান তোলা হয় যে, নারীদেরকে পার্লামেন্ট সদস্য হওয়ার অধিকার দিতে হবে। যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার অধীনে এই সংগ্রাম দানা বেঁধে উঠে তার মৌল জীবন দর্শনে যেহেতু নারী-পুরুষের পার্থক্য বলতে কিছুই নেই সেহেতু দেশ ও রাষ্ট্রের সর্বত্রই নারী-পুরুষের সমান হওয়ার দাবী অব্যাহতভাবে চলতে থাকে।

ইউরোপের নারীরা তাদের অধিকার আদায়ের জন্য যে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় এই হল তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এ হল একটি ধারাবাহিক নিরবচ্ছিন্ন ই-তিহাস। এর সব অংশই একটি কঠিন সূত্রে আবদ্ধ। এই পরিস্থিতি পুরুষদের কাম্য ছিল কি ছিল না তা আমাদের লক্ষণীয় নয়। তবে নারীরা অবিলম্বেই বুঝতে সক্ষম হল যে, যে বিকৃত সমাজের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের পদ থেকে তারা

পুরুষদেরকে সরিয়ে দিয়েছে সেখানে তারা নিজেরাও পুরুষদের মতই নিরুপায় ও অসহায়।[১]

কিন্তু পাঠকবৃন্দ একথা শুনে নিশ্চয়ই আশ্চর্যান্বিত হবেন যে, যে ইংল্যাণ্ড গণতন্ত্রের হোতা বলে বিশ্ববিখ্যাত সে দেশের সরকারের বিভিন্ন বিভাগে নারীদেকে পুরুষদের চেয়ে কম বেতন-ভাতা দেয়া হয় ; অথচ সেখানকার নারী প্রগতির অবস্থা এতদূর তুঙ্গে যে, বেশ কিছুসংখ্যক মহিলাই জাতীয় পার্লামেন্টের আসন অলংকৃত করছে।

এখন আসুন ! ইসলাম নারীদেরকে কি মর্যাদা ও স্থান দিয়েছে তাও আমরা দেখি। ইসলামী সমাজব্যবস্থায় নারীদেরকে যে সম্মানজনক মর্যাদা দেয়া হয়েছে তা লাভ করার পর এমন কোন ঐতিহাসিক, ভৌগলিক, অর্থনৈতিক, তাত্ত্বিক অথবা আইনগত বাধ্যবাধকতা থাকে কি যাতে করে স্বীয় অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে ইউরোপীয় বোনদের ন্যায় নিরুপায় হয়েই সংগ্রামের পর সংগ্রাম করে যেতে হবে ? এরপরই আমরা জানতে পারবো যে, প্রাচ্যের নারী স্বাধীনতার ধ্বজাধারীরা যে হৈহুল্লোড় ও বিক্ষোভ সমাবেশ করে বেড়াচ্ছেন তা কি সত্যিই অর্থবহ, না পাশ্চাত্যের পদলেহনের নির্লজ্জ অভিব্যক্তি মাত্র।

ইসলামের মৌলিক বৈশিষ্ট্য—সাম্য

ইসলামী সমাজব্যবস্থার মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, উহা পুরুষকে যেমন মানবীয় মর্যাদা দান করে। নারীকেও ঠিক তেমনি মানবীয় মর্যাদা দান করে। পুরুষের মধ্যে যেমন রূহ আছে বলে স্বীকার করে। নারীর মধ্যেও ঠিক রূহ আছে বলে বিশ্বাস করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ج

১. এ ধরনের ঘটনাবলীর পটভূমিতে মার্কসবাদীরা দাবী করে যে, মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক কারণই একমাত্র কারণ। (Factor) ইহাই একমাত্র নিয়ামক। ইউরোপীয় নারীদের স্বাধীনতা আন্দোলনই নাকি এর বড় প্রমাণ। আমরা পূর্বেই বলেছি যে, অর্থনৈতিক গুরুত্বকে আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু একথা নিশ্চিত সত্য যে, ইউরোপবাসীদের নিকট যদি ইসলামের ন্যায় কোন মহান লক্ষ্য ও জীবনব্যবস্থা থাকতো—যাতে সর্বাবস্থায় নারীদের জীবন-জীবিকা ও ইজ্জত-সম্ভ্রমের দায়িত্ব পুরুষকেই গ্রহণ করতে হয়, নিরুপায় অবস্থায় কোন নারী রুজির জন্যে কোন কাজ করলে তাকে পুরুষের সমান পারিশ্রমিক দিতে হয় এবং জরুরী পরিস্থিতিতে পুরুষদেরকে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয় যাতে করে নারীরা একদিকে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা লাভ করতে পারে এবং অন্যদিকে যৌন অনাচার ও বিশৃংখলার হাত থেকেও বেঁচে থাকতে সক্ষম হয়—তাহলে সেখানকার নারীদের এরূপ মর্মান্তিক অবস্থার শিকার হতে হতো না।

"হে লোক সকল ! তোমাদের সেই প্রভু পরোয়ারদেগারকে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে একটি জান থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং সেই দু'টি থেকে বহু পুরুষ ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন।"–(সূরা আন নিসা ঃ ১)

মোটকথা, পুরুষ ও নারী জন্ম, অবস্থান এবং শেষ পরিণতির দিক থেকে একজন আর একজনের সমকক্ষ, সমান এবং একইরূপ অধিকারের হকদার। ইসলাম নারীকে একইরূপ জান, ইজ্জত ও সম্পদের অধিকার দান করেছেন ; তাদের ব্যক্তিত্বকে সম্মানীয় বলে ঘোষণা করেছে। ইসলাম কাউকেই এই অধিকার দেয় না যে, সে তাদের দোষ অন্বেষণ করবে কিংবা তাদের পশ্চাতে কোনরূপ নিন্দা করবে ! কাউকে এই সুযোগও দেয় না যে, কেউ তার ওপর মোড়লি করবে কিংবা তাদের নিজেদের দায়িত্ব পালনের জন্যে তাদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে। নারীদের এই অধিকারসমূহ পুরুষদের ন্যায়ই স্বীকৃত। এ ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীদের মধ্যে বিন্দুমাত্রও পার্থক্য নেই। এতদসংক্রান্ত যাবতীয় আইন-কানুনই নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যেই সমভাবে প্রযোজ্য। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَايَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ... وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ط

"হে ঈমানদারগণ ! পুরুষরা যেন পুরুষদেরকে উপহাস না করে ; কেননা হতে পারে সে ব্যক্তি (যাকে উপহাস করা হল) তার চেয়ে (আল্লাহর দৃষ্টিতে) উত্তম। এবং নারীরাও যেন নারীদেরকে উপহাস না করে ! কেননা হতে পারে সে তার চেয়ে ভালো। এবং একে অন্যকে বিদ্রূপ করো না । একে অন্যকে মন্দ খেতাব দিয়ে ডেকো না। ..... একে অন্যের ছিদ্র অন্বেষণ করো না এবং একে অন্যের পশ্চাতে নিন্দা করো না।"

—(সূরা আল হুজরাত ঃ ১১-১২)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ط

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা নিজেদের গৃহব্যতিত অন্যদের গৃহে প্রবেশ কর না।—যতক্ষণ না তোমরা অনুমতি লাভ করবে এবং উহার অধিবাসীদেরকে সালাম প্রদান করবে।"–(সূরা আন নুর ঃ ২৭)

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَعِرْضُهُ وَمَالُهُ

"এক মুসলমানের জন্য অন্য মুসলমানের রক্ত, সম্মান এবং সম্পদ হারাম।"—(বুখারী ও মুসলিম)

অনুরূপভাবে ইসলাম আজর বা ছওয়াবের ক্ষেত্রেও পুরুষ এবং নারীকে সমান হকদার বলে ঘোষণা করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّىْ لَآ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ

"অতপর ঈমানদারদের রব তাদের দোয়া কবুল করেছেন। নারী হোক পুরুষ হোক তিনি কারুর আমল বিনষ্ট করেন না। তোমরা পরস্পর একে অন্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ।"—(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯৫)

স্থাবর সম্পত্তিতে সমঅধিকার

স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিতেও ইসলাম পুরুষ ও নারীদের মধ্যে সমতার প্রতি লক্ষ্য রেখেছে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যে কেউই তার যে কোন ধরনের সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে। বন্ধক রাখতে পারে। পাট্টা দিতে পারে। কাউকে উইল করতে পারে। অধিকতর জমিন বৃদ্ধির মাধ্যম বানাতে পারে, নিজের যে কোন প্রায়োজনে ব্যবহার করতে পারে। এ ধরনের সকল ব্যাপারেই ইসলাম নারী ও পুরুষকে একই রূপ সমান অধিকার প্রদান করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ص وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ -

"পিতামাতা ও ঘনিষ্ট আত্মীয়রা যা রেখে যায় তাতে পুরুষদের অংশ রয়েছে। এবং পিতামাতা ও ঘনিষ্ট আত্মীয়রা যা রেখে যায় তাতে নারীদেরও অংশ রয়েছে।"—(সূরা আন নিসা ঃ ৭)

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ط وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ط

"পুরুষদের জন্যে রয়েছে তাদের আমলের প্রতিদান এবং নারীদের জন্যে রয়েছে তাদের আমলের প্রতিদান।"—(সূরা আন নিসা ঃ ৩২)

ইউরোপ ও স্থাবর সম্পত্তির অধিকার

সম্পত্তিতে নারীর অধিকার এবং উহা ব্যবহারের নিঃশর্ত অধিকার সম্পর্কে দু'টি কথা স্মরণ রাখা একান্ত প্রয়োজন। সভ্য (!) ইউরোপের আইন-কানুনে

বর্তমানকাল পর্যন্ত স্থাবর সম্পত্তিতে নারীদের অধিকার বলতে কিছুই ছিল না। আইনগতভাবে সরাসরি উহা ব্যবহার করার কোন সুযোগও তাদের ছিল না। তারা কোন না কোন পুরুষ—যথা স্বামী, পিতা কিংবা কোন অভিভাবকের মাধ্যমে উহা ব্যবহার করতে পারতো। অন্য কথায় বলা যায় যে, ইসলামের পক্ষ থেকে নারীদেরকে এসব অধিকার প্রদান করার এগার শত বছর পর পর্যন্তও ইউরোপের নারীরা এ অধিকার থেকে বঞ্চিত রয়েছে এবং উহা লাভ করার জন্যে তাদেরকে মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়েছে ; আর তখন লুণ্ঠিত হয়েছে তাদের নারীত্ব ও সতীত্ব, বিপন্ন হয়েছে তাদের ইজ্জত ও সম্ভ্রম। শুধু তাই নয়, সে জন্যে স্বীকার করতে হয়েছে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট, উৎসর্গ করতে হয়েছে অসংখ্য প্রাণ। কিন্তু এত করেও তারা লাভ করলো সামান্য কিছু অধিকার। অথচ ইসলাম বহু পূর্বেই নারীদেরকে দিয়েছে এর চেয়ে বহুগণ এবং বহু কল্যাণকর মৌলিক অধিকার। কিন্তু ইসলাম এ অধিকার দিয়েছে একান্ত স্বেচ্ছায় ; কোন অর্থনৈতিক চাপ, কিংবা শ্রেণী সংগ্রামের কোন প্রভাব এর পশ্চাতে কার্যকরী ছিল না। বরং এর পেছনে ছিল ইসলামের এক মহান উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করা। আর তা ছিল ঃ মানুষের জীবনে যেন দু'টি মৌলিক সত্য—সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায়বিচার—মূর্তিমান ও উদ্ভাসিত হয়ে উঠে—শুধু কল্পনার জগতেই নয়, বাস্তবজগতেই যেন উহা ভাস্বর হয়ে উঠে।

দ্বিতীয়ত, আরো একটি কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, সাধারণভাবে পাশ্চাত্যের এবং বিশেষভাবে সামাজতন্ত্রীদের দৃষ্টিভংগি হলো ঃ মানবীয় জীবন প্রকৃতপক্ষে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থারই নামান্তর। তাদের মতে, নারীদের যতদিন মালিকানা স্বত্ব অর্জিত হয়নি এবং নিজেদের সম্পত্তি ও মালিকানা স্বত্বে স্বাধীন ইচ্ছাকে কার্যকরী করতে পারেনি ততদিন নিশ্চয়ই তারা পুরোপুরি মালিকানা লাভ করতে পারেনি ; স্বাধীন মানবীয় মর্যাদা তারা তখনই লাভ করেছে যখন তারা অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীনতা অর্জন করেছে এবং এতদূর যোগ্যতা হাসিল করতে পেরেছে যে, নিজেদের মালিকানা স্বত্বে অন্য কোন পুরুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই সরাসরি স্বাধীনভাবে নিজেদের ইচ্ছা প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছে এবং নিজ মর্জি অনুযায়ী ব্যবহার করতে সমর্থ হয়েছে।

নারীদের স্বাধীন মর্যাদা

মানুষের জীবন সম্পর্কে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগি আমরা সমর্থন করি না। উহার কারণে মানুষের জীবন পশুর ন্যায় নিকৃষ্টতম অর্থনৈতিক স্তরে নেমে যেতে বাধ্য হয়। তবে তাদের একটি ধারণার সাথে আমরা নীতি-গতভাবে একমত যে, মানব সমাজে মানবীয় চিন্তাধারা ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনের উপর একটি সুষ্ঠু অর্থব্যবস্থার প্রভাব বহুলাংশে পতিত হয়। ইসলাম

এদিক থেকে এক বিশেষ গৌরবের অধিকারী যে, উহা নারীদেরকে স্বাধীন অর্থনৈতিক মর্যাদা প্রদান করেছে এবং তাদেরকে এই অধিকার দিয়েছে যে, কোন প্রকার মাধ্যম ব্যতিরেকেই তারা একেবারে সরাসরিই তাদের যাবতীয় সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করতে পারে। এখানেই শেষ নয়। ইসলাম নারীদেরকে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—বিবাহের ব্যাপারেও সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজেদের ইচ্ছা মাফিক কাজ করার অধিকার দান করেছে এবং এরূপ ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, তাদের ইচ্ছা ব্যতিরেকে তাদের বিবাহ দেয়া যেতে পারে না। বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্যে তাদের স্বাধীন সম্মতি একটি অলংঘনীয় শর্ত। হযরত বিশ্বনবী (সা) বলেন ঃ

> "কোন বিধবা নারীর বিবাহ তার পরামর্শ ব্যতিরেকে হতে পারে না ; এবং কোন কুমারী নারীর বিবাহ তার সম্মতি ছাড়া হতে পারে না। এবং একজন কুমারীর সম্মতি হলো তার চুপ থাকা।"–(বুখারী ও মুসলিম)

বিবাহের ক্ষেত্রে ইসলাম নারীদের সম্মতিকে এতদূর গুরুত্ব দিয়েছে যে, বিবাহের পর কোন নারী যদি বলে যে, তার সম্মতি নিয়ে তাকে বিবাহ দেয়া হয়নি তাহলে সে বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হয়।

বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার অধিকার

ইসলামের পূর্বে যদি কোন স্ত্রী বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাইতো তাহলে তাকে সে অধিকার দেয়া হতো না। তখন তাকে বাধ্য হয়েই অবৈধ ও ভুল পন্থা অবলম্বন করতে হতো। তখন স্বামীই হতো স্ত্রীর সর্বময় ক্ষমতার মালিক। স্ত্রীকে তার মর্জির বাইরে কোন কিছু করার এখতিয়ার ছিল না। কেননা তখন কোন দেশেই আইনগতভাবে তালাকের কোন অবকাশ ছিল না এবং দেশের প্রচলিত নিয়মেও এমন কোন ব্যবস্থার কথা কেউ চিন্তাই করতে পারতো না। ইসলামই সর্বপ্রথম নারীদেরকে এই অধিকার অত্যন্ত স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় দিয়েছে যে, যে কোন নারীই যখনই ইচ্ছা করবে তখনই সে এই অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে।[১] এমনকি আরো এক কদম অগ্রসর হয়ে উহা নারীদেরকে এই ক্ষমতাও দান করেছে যে, তারা নিজেদের ইচ্ছামত যাকে

---

১. পাশ্চাত্যে এখন যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ বর্তমান তার প্রতি তাকালে বাহ্যিকভাবে মনে হয় যে, নারীদের এই অধিকারটুকুর স্বরূপ দৃষ্টিবিভ্রম ছাড়া অন্য কিছুই নয়। কিন্তু পাশ্চাত্যের এই বর্তমান অবস্থা ইসলামের কারণে সৃষ্টি হয়নি ; বরং এটা হলো ইসলাম থেকে সরে যাওয়ার অপরিহার্য পরিণতি। ইসলামের প্রথম যুগে নারীরা এই অধিকার প্রয়োগ করতো। আইন প্রণেতা হিসেবে স্বয়ং বিশ্বনবী (সা) এবং তাঁর পরে তার খলীফাগণ নারীদের এই অধিকার পুরোপুরি সমর্থন দিয়েছেন। আজ আমাদের দাবী শুধু এতটুকুই যে, ঐ সকল ইসলামী আইন প্রবর্তন করা হোক এবং উহার পথের বাধাগুলো অপসারিত করা হোক–চাই উহা পাশ্চাত্যের বর্তমান সামাজিক বা অর্থনৈতিক ফসল হোক কিংবা অনৈসলামিক আচার-আচরণের অন্ধ অনুসরণের কুফল হোক।

ইচ্ছে তাকেই বিবাহ করতে পারবে ; এমনকি নিজের পসন্দনীয় ব্যক্তিকে বিবাহ করার পয়গামও পাঠাতে পারবে। ইসলামের শত শত বছর পর বিগত আঠারো শতকে এসে ইউরোপের নারীরা এই ধরনের কিছু অধিকার হাসিল করেছে ; অথচ একে প্রাচীন রীতির বিরুদ্ধে এক বিরাট বিজয় বলে আখ্যায়িত করছে।

বিদ্যা অর্জনের অধিকার

একমাত্র ইসলামই সর্বপ্রথম সমস্ত মানুষের জন্যে বিদ্যা শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছে, যখন মূর্খতা ও মূঢ়তার গাঢ় অন্ধকারে সমস্ত জগত আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। ইসলাম কেবল শ্রেণী বিশেষকেই বিদ্যা অর্জনের অধিকার দেয়নি। বরং প্রতিটি ব্যক্তির জন্যেই ইহাকে অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব হিসেবে ঘোষণা করেছে। সমস্ত মুসলমানের জন্যেই উহাকে ঈমান ও ইসলামের অপরিহার্য শর্ত বলে গণ্য করেছে। ইসলাম এরূপ একটি একচ্ছত্র গৌরবেরও অধিকারী যে, উহা নারীদেরকে স্বাধীন অস্তিত্ব দান করে তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছে যে, বিদ্যা শিক্ষা ব্যতিরেকে তাদের ব্যক্তিত্ব কখনো পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। বিদ্যা অর্জন করা পুরুষদের জন্যে যেমন ফরয নারীদের জন্যেও ঠিক তেমনিভাবে ফরয। কেননা ইসলাম চায় একটি আদর্শ ও উন্নতমানের জীবন-যাপনের জন্যে নারী জাতি শারীরিক যোগ্যতার সাথে সাথে জ্ঞান ও মানসিক দিক থেকেও উন্নতি লাভ করুক। পক্ষান্তরে ইউরোপ বর্তমানকালের পূর্ব পর্যন্ত নারীদেরকে এই ধরনের কোন অধিকার প্রদান করতে পারেনি। সেখানে এ অধিকার কেবল তখনই দেয়া হয়েছে যখন অর্থনৈতিক চাপের ফলে তাদের সামনে বিকল্প কোন পথ উন্মুক্ত ছিল না।

উপরোক্ত আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ইসলাম বিরোধী চক্র নারীদের ব্যাপারে ইসলামের বিরুদ্ধে যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে তার মূলে আদৌ কোন ভিত্তি নেই। তারা বলে ঃ ইসলাম নারী জাতিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর জীব হিসেবে গণ্য করে, উহা তাদেরকে পুরুষদের অধীন করে রাখতে চায়, উহার দৃষ্টিতে তাদের জীবনের আদৌ কোন মূল্য নেই। এই অভিযোগগুলোর বিন্দুমাত্র মূল্য থাকলেও ইসলাম নারী শিক্ষার প্রতি এতদূর গুরুত্ব কিছুতেই আরোপ করতো না। এরূপ গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে একথা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের দৃষ্টিতে নারী জাতি একদিকে আল্লাহর নিকট এবং অন্যদিকে ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থায় এক সুউচ্চ ও সম্মানীয় আসনের অধিকারী।

নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্যের মাপকাঠি

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ হিসেবে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এবং অধিকারের দিক থেকেও কোন তারতম্য নেই। কিন্তু কাজ-কর্মের প্রকৃতির দিক থেকে স্বাভাবিকভাবেই যে পার্থক্য তাদের মধ্যে বিরাজমান ইস-

লাম তাকে উপেক্ষা করতে পারে না। অসংখ্য মহিলা সংস্থাও তাদের সমর্থক কবি-সাহিত্যিক, সমাজ সংস্কারক ও তরুণ সম্প্রদায় ইসলামের এই দৃষ্টিভংগির বিরুদ্ধে বেসামাল হয়ে উঠেছে। এটা নাকি ইসলামের এক অমার্জনীয় অপরাধ।

পুরুষ ও স্ত্রী জাতির মধ্যে ইসলাম যে সকল ব্যাপারে পার্থক্য নির্দেশ করে তার প্রতি দৃকপাত করার পূর্বে আসুন, শারীরিক, জৈবিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে উভয় শ্রেণীর মধ্যে কী পার্থক্য বিরাজমান তা একবার পর্যালোচনা করি। এরপর ইসলামী দৃষ্টিভংগি নিয়ে আলোচনা করবো।

মূল বিষয়

পুরুষ ও নারী কি একই জাতি ? না দু'টি পৃথক পৃথক জাতি ? জীবনে উভয়ের কাজ কি একই ? না নারী ও পুরুষ হওয়ার কারণে তাদের দায়-দায়িত্বের পরিমণ্ডল আলাদা আলাদা ? এই প্রশ্নগুলো বড়ই জটিল। কিন্তু এগুলোর সমাধানের উপরই নারী-পুরুষের মূল সমস্যার সমাধান নির্ভরশীল। যে সকল নারী ও তাদের সমর্থক লেখক, সাহিত্যিক, সংস্কারক ও তরুণ এই মত পোষণ করে যে, পুরুষ ও নারীর শারীরিক ও মানসিক অবকাঠামোতে তফাৎ বলতে কিছুই নেই এবং সে কারণে জীবনের যাবতীয় কাজ-কর্মও হবে হুবহু একই প্রকৃতির। তাদেরকে কিছু বলার কোন প্রশ্নই উঠে না। তবে যারা পুরুষ ও নারীদের দৈহিক গঠন প্রক্রিয়ায় এবং তাদের কাজ-কর্মে কোন পার্থক্য স্বীকার করে তাদের উদ্দেশ্যে কিছু অর্থবহ আলোচনা হতে পারে।

উভয় শ্রেণীর সমতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আমার লেখা 'আল ইনসানু বাইনাল মাদ্দিয়াতে ওয়াল ইসলাম' নামক পুস্তকে দেখা যেতে পারে। প্রয়োজন অনুসারে উহার কিছু কিছু অংশ নিম্নে তুলে ধরা যাক।

দায়িত্ব ও লক্ষ্যের পার্থক্য

উভয় শ্রেণীর কাজ-কর্ম ও লক্ষ্যের মধ্যেই এই বুনিয়াদী পার্থক্য পরিস্ফুট হয়ে উঠে যে, মন-মেজাজ ও দৈহিক গঠন প্রণালীর দিক থেকে পুরুষ ও নারীর মধ্যে বাস্তবেই এমন তারতম্য দেখা যায় যে, তারা নিজ নিজ কর্ম পরিধির মধ্যেই সুন্দর ও সুশৃংখলভাবে কাজ করতে সক্ষম।

এ কারণেই এখনো আমি বুঝতে অক্ষম যে, নারী ও পুরুষের মধ্যে পরিপূর্ণ সমতা বিধানের যে অন্তসারশূন্য বক্তৃতা করা হয় বাস্তব দুনিয়ায় উহাকে কার্যকরী করা কেমন করে সম্ভবপর ? মানুষ হওয়ার দিক থেকে পুরুষ ও নারীর সমান হওয়া একটি স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক সত্য। মানব সমাজের তারা একই রূপ সদস্য। একই পিতার সন্তান হিসেবেও তারা সমান। কিন্তু বাস্তব জীবনের

দায়-দায়িত্বে ও যাবতীয় কর্মকাণ্ডে তারা কি সমান হতে পারে? পুরুষের স্থানে নারী এবং নারীর স্থানে পুরুষ কি একইভাবে একই কাজ করতে সক্ষম হতে পারে? এ ধরনের সমতা কি বাস্তবে সম্ভবপর'? সারা বিশ্বের নারীও যদি সমস্বরে এরূপ সমতার দাবী জানায়, সভা-সমিতি ও জলসা-জুলুস করে তাদের পক্ষে প্রস্তাবাদি পাশ করে তবুও তাদের এই স্বপ্ন কখনো সফল হওয়ার নয়। সভা-সমিতির প্রস্তাবাদি যেমন পুরুষদের প্রকৃতি বদলাতে পারবে না, তেমনি নারীদের প্রকৃতিতেও কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না। তাদের উভয় শ্রেণীর কর্মকাণ্ডে এমন কিছুও ঘটাতে পারবে না যাতে করে নারীরা পুরুষদের কাজ করা শুরু করবে এবং পুরুষরা নারীদের স্থলে গর্ভধারণ, সন্তান উৎপাদন ও স্তন্য দানের দায়িত্ব পালন করতে থাকবে।

স্বভাবগত ও মনস্তাত্ত্বিক পার্থক্য

নারী জাতিকে তাদের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব—গর্ভধারণ ও স্তন্যদান—আঞ্জাম দেয়ার জন্যে যে ধরনের উৎসাহ-উদ্দীপনা ও মনস্তাত্ত্বিক যোগ্যতার একান্ত প্রয়োজন তা কেবল তাদেরকেই দান করা হয়েছে। এবং সে কারণেই তারা তাদের সুকঠিন দায়িত্বসমূহ পালন করতে সক্ষম হয়।

নারীদের মেজাজ ও প্রকৃতি

এ এক বাস্তব সত্য যে, যে বিশেষ মন-মেজাজ নারীদেরকে তাদের আসল দায়িত্ব পালন—গর্ভধারণ ও দুগ্ধদান করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে তোলে এবং যে কারণে তাদের মনস্তাত্ত্বিক ও মানসিক ব্যবস্থার একটি বিশেষ পরিবেশ রচিত হয় তা বর্তমান না থাকলে মায়ের স্নেহ, আশা-আকাংখা, উন্নত কর্মতৎপরতা, কঠিন মসিবত ও দুঃখ-কষ্টের সময়ে ধৈর্য ও সহনশীলতা এবং সহানুভূতি ও সমবেদনার বহিঃপ্রকাশ কস্মিনকালেও সম্ভবপর হতো না। নারীদের এই মনস্তাত্ত্বিক, মানসিক ও স্বাভাবিক বৈশিষ্টগুলো যে পাশাপাশিই বর্তমান তা-ই নয়, একটি আরেকটির সম্পূরকও বটে। দ্বিতীয়ত, এগুলোর মধ্যে পরিপূর্ণ সাম স্যও বর্তমান। এ কারণে নেহাত কোন ব্যতিক্রম ছাড়া এগুলোর কোন একটির অবর্তমানে অন্য কোনটির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

নারী চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, নারীদের মন জ্ঞান দ্বারা নয় বরং বিশেষ ধরনের আবেগ প্রবণতা দিয়ে গঠিত। তাদের এই আবেগ প্রবণতাই জীবন্ত স্নেহ-মমতার একমাত্র উৎস। কেননা সন্তান লালন-পালনের জন্যে যে যোগ্যতা ও গুণপণার প্রয়োজন তা শুধু জ্ঞান দ্বারা সৃষ্টি হতে পারে না ; বরং তার জন্যে প্রয়োজন প্রচণ্ড আবেগ ও সীমাহীন উদ্যম। এই প্রচণ্ড আবেগই তাদেরকে ঠাণ্ডা মাথায় কোন কিছু করার বা না করার সুযোগও দেয় না, বরং সংগে সংগেই সন্তা... যে কোন প্রয়োজন মেটাবার জন্যে

তাদেরকে উন্মাদ করে তোলে ; বিন্দুমাত্র বিলম্ব বা অলসতা দেখাবার কোন চিন্তাই তারা করতে পারে না।

নারী জীবনের প্রকৃত ব্রত এটাই। নারীদের যাবতীয় তৎপরতায় এই ব্রতই তাদেরকে শক্তি যোগায় এবং এটাই তাদের সৃষ্টি ধর্মী লক্ষ্য অর্জনের পথকে প্রশস্ত করে দেয়।

পুরুষের কাজ

পুরুষদের কাজের প্রকৃতি সম্পূর্ণ অন্য রূপ। এবং সেই কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত যোগ্যতাই—যা নারীদের যোগ্যতার চেয়ে ভিন্নতর—পুরুষদেরকে দান করা হয়েছে। প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়াই তার প্রধান কাজ। তারা বন্য হিংস্র প্রাণীকে বশ মানায়, আসমান-জমিনের প্রাকৃতিক শক্তির বিরুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে, রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করে, সরকার গঠন করে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়াদির আইনও রচনা করে। এই সকল জটিল সমস্যার সমাধানের পর নিজেদের উপার্জনের এবং স্ত্রী ও সন্ততিদের অন্যদের যুলুম ও নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যেও প্রস্তুত থাকতে হয়।

পুরুষদের মানসিকতা

বস্তুত পুরুষদের দায়িত্ব সম্পাদনের জন্যে মহিলাদের ন্যায় প্রচণ্ড আবেগ প্রবণ মানসিকতার কোন প্রয়োজন নেই। পুরুষদের যে ধরনের কাজ করতে হয়, তাতে আবেগ প্রবণতা কোন কল্যাণ বয়ে আনে না। বয়ে আনে ক্ষতি ও অকল্যাণ। কেননা তাদের সে আবেগের বিশ্রাম বা বিরতির স্থান নেই ; প্রতি মুহূর্তেই ঘটে উত্থান-পতন এবং সৃষ্টি হতে থাকে পরস্পর বিরোধী অদ্ভুত মানসিকতার। আবেগের কারণে এমন কোন যোগ্যতারই সৃষ্টি হয় না যাতে করে কোন লোক ধরাবাধা নিয়মে দীর্ঘকাল কাজ করতে পারে। তাদের পসন্দ না পসন্দ হওয়ার কাজটিও পরিবর্তিত হতে থাকে। এরূপ সদা পরিবর্তনশীল মন-মানসিকতা একজন মায়ের জন্যেই সামঞ্জস্যশীল; কিন্তু একজন পুরুষের জন্যে এটা আদৌ কল্যাণকর নয়। কেননা তাদের কাজের ধরনই হচ্ছে এই যে, তাদেরকে স্বাধীন ও সুদৃঢ় মনোভাব ও অদম্য সাহসিকতার সাথে দীর্ঘ সময় ধরে এক একটি কাজ আঞ্জাম দিতে হয়। তাদের বাস্তব জীবনে যেখানে অসংখ্য বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয় সেখানে তাদের আবেগ নয়—বরং একমাত্র জ্ঞানই তাদেরকে সাহায্য করতে পারে। ভবিষ্যত কর্তব্য নির্ধারণ করার জন্যে হোক, বর্তমান পরিস্থিতির সমীক্ষার জন্যে হোক কিংবা কোন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পূর্বে প্রত্যাশিত ফলাফল সম্পর্কে পর্যালোচনার জন্যে হোক একমাত্র বুদ্ধি বা জ্ঞানই তাদেরকে সঠিক দিশা দিতে পারে।

জ্ঞানের গতি ধীর। কিন্তু উহাতে স্থায়ীত্ব ও দৃঢ়তা বর্তমান। হঠাৎ করেই কিছু করা উহার নিকট প্রত্যাশিত নয়। কেননা এগুলো হচ্ছে আবেগ প্রবণতার বৈশিষ্ট্য। ইহা নারীদের নারীত্বকেই আরো শোভনীয় করে তোলে। জ্ঞানের নিকট শুধু ইহাই আশা করা যায় যে, কোন লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে যুক্তিসম্মত পন্থায় কাজ করার জন্যে আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দিবে।—তাই আমরা কোন বন্য প্রাণী শিকার করতে অগ্রসর হই, কোন নতুন হাতিয়ার আবিষ্কার করার জন্যে গবেষণায় লিপ্ত হই, কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করি, কোন রাষ্ট্র বা সরকার গঠন করি। কোন বাইরের রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধ বা সন্ধি স্থাপন করার ঘোষণা দেই। অনস্বীকার্য যে, এই সকল ঝুঁকিপূর্ণ কঠিন দায়িত্ব পালনে একমাত্র বুদ্ধিই আমাদের প্রধান অবলম্বন। এ সকল ক্ষেত্রে বুদ্ধির স্থলে আবেগ দ্বারা পরিচালিত হলে সাফল্যের আশা করা বাতুলতা মাত্র।

সফল পুরুষ ও নারী

একজন পুরুষকে তার জীবনে শুধু তখনই সফল পুরুষ বলে গণ্য করা যায় যখন সে তার আসল কাজ ও মূল কর্তব্যকে যথারীতি সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়। এতে করে পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক পার্থক্যের কারণ যেমন উপলব্ধি করা যায় তেমনি করে ইহাও অবগত হওয়া যায় যে, পুরুষ সেই সকল কাজে কেন সুখ ও তৃপ্তি লাভ করে যাতে তার শারীরিক ও মানসিক শক্তি ব্যবহার করা হয় এবং কেনই বা সে আবেগের জগতে এসে নিজেকে শিশুর মত অসহায় ভাবতে শুরু করে। পক্ষান্তরে এই আবেগের রাজ্যে একজন নারী চরম আনন্দে আপ্লুত হয়ে উঠে। কেননা এই হচ্ছে তার সেই কাঙ্খিত পরিমণ্ডল যেখানে অবস্থান করে সে স্বীয় কর্তব্য-কর্ম সুন্দরভাবে কার্যকরী করতে সক্ষম হয়—যেমন নার্সিং, শিক্ষকতা, ধাত্রীগিরি ইত্যাদি পেশায় তারা আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করে। অনুরূপভাবে দোকানে কাজ করেও তারা পরিতৃপ্ত হয়। কেননা দোকানের মাধ্যমে তারা পুরুষ সাথী খুঁজে নেয়ার অবকাশ পায়। কিন্তু এই সকল কাজই তার মূল কাজের অধীন। একজন স্বামী, ঘর-সংসার বা সন্তানরা তার নিকট স্বাভাবিকভাবে যা দাবী করে এবং যে দাবী তার প্রকৃতিরও মূল দাবী তা ঐ সকল কাজ দ্বারা কখনো পূর্ণ হতে পারে না। কেননা এটা একান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার যে, যখনই সে তার মূল কাজে আত্মনিয়োগ করার সুযোগ লাভ করে তখন চাকুরী বা অন্যান্য কাজ-কর্ম ছেড়ে দিয়ে কেবল গৃহকর্মেই মশগুল হয়ে পড়ে। এবং জরুরী পরিস্থিতি বা টাকা-পয়সার নেহাত প্রয়োজন না হলে গৃহের বাইরে কিছুতেই আসতে চায় না।

আবার নারী ও পুরুষের মধ্যে এমন মৌলিক পার্থক্য অবশ্যই নেই যে, তারা পরস্পর কখনো এক হতে পারবে না। আর উহার অর্থ এ-ও নয় যে,

নারী ও পুরুষ—এই দু'টি শ্রেণীর কোন একটির মধ্যে এমন যোগ্যতা আদৌ থাকতে পারে না যা প্রকৃতির দিক থেকে বিপরীত শ্রেণীর মধ্যে বর্তমান।

পুরুষ ও নারীর সাধারণ কাজ

পুরুষ ও নারী উভয় শ্রেণীই যেন অন্ত্র বা নাড়ীভুঁড়ির মত অংগাংগিভাবে জড়িত। যদি দেখা যায় যে, এমন নারীও আছে যে রাজ্য শাসনের উপযুক্ত গুণের অধিকারী। বিচারকের আসনে সমাসীন, ভারী বোঝা বহন করতে সক্ষম। এমনকি যুদ্ধের ময়দানে লড়াই করতেও পারদর্শী...আর এও যদি দেখা যায় যে, এমন পুরুষও রয়েছে যে, রান্না-বান্না করতে উস্তাদ, গৃহের কাজ-কর্মে পটু, শিশুদের প্রতি মায়ের মতই স্নেহ-মমতা দেখাতে সক্ষম, নারীর মতই আবেগ প্রবণ ও সাজসজ্জায় আগ্রহী এবং এক এক সময়ে এক এক প্রকার মানসিকতা ও মেজাজের অধিকারী তাহলে একথা ভুলে গেলে চলবে না এর সবকিছুই স্বাভাবিক ও প্রকৃতির বিপরীত বলতে এতে কিছুই নেই। এ হচ্ছে এ কথারই যুক্তিসম্মত ফলাফল যে, নারী-পুরুষের প্রতিটি শ্রেণীর মধ্যে অতিরিক্তভাবে অন্য শ্রেণীর বীজানুও বর্তমান থাকে। কিন্তু এর সাহায্যে পথহারা পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ এবং তাদের প্রাচ্যের অনুসারীরা এটা কখনো প্রমাণ করতে পারে না যে, নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র একই হওয়া উচিত। আর এই ব্যতিক্রমধর্মী দৃষ্টান্ত দ্বারা যে প্রশ্নটি হতে পারে তাহলো এই যে, তাহলো একজন নারীর কার্যক্ষেত্র কি পরিবর্তিত হতে পারে? যদি পারে, তাহলে পুরুষের কাজ আঞ্জাম দেয়ার পরে সে কি ঘর সংসার, সন্তান-সন্ততি ও পরিবারের প্রয়োজন অনুভব করবে? তার মনের এই শূন্যতা পূরণ হবে কি? এবং এর পরে নিজের যৌন স্পৃহা চরিতার্থ করার জন্যে কোন পুরুষ সাথীর সন্ধান থেকে বিরত থাকবে কি?

পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক পার্থক্য অনুধাবন করার পর এখন আসুন, সেই বিষয়ও পর্যালোচনা করে দেখি যার ভিত্তিতে ইসলাম পুরুষ ও নারীদের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা নির্ধারণ করে এবং উভয়ের জন্যে পৃথক পৃথক কর্মক্ষেত্রের বিধান দেয়।

স্বাভাবিক জীবন পদ্ধতি

ইসলামের একটি মহান বৈশিষ্ট্য এই যে, উহার জীবন পদ্ধতি পরিপূর্ণ-রূপেই বাস্তবধর্মী। প্রকৃতির বিরুদ্ধে উহার কোন ভূমিকা নেই। উহাতে সংশোধন বা রহিতকরণের যেমন কিছুই নেই। তেমনি উহার প্রতিটি পদক্ষেপেই মানুষের স্বভাব এবং প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল। উহা মানুষকে আধ্যাত্মিক পবিত্রতায় মহিমান্বিত করে তোলে। উহা মানুষকে এতদূর উন্নত করে তুলতে চায় যে, উহার ডাগুও যেন আদর্শিকতার (Idealism) সাথে মিলে

যায়। কিন্তু উন্নত ও পবিত্রতা অর্জনের সমগ্র কর্মকাণ্ডে কোথাও উহা মানুষের প্রকৃতির সাথে গরমিল বা সংঘর্ষের সৃষ্টি করে না। কেননা উহা বিশ্বাস করে ঃ মানুষের প্রকৃতিতে কোন পরিবর্তন কখনো সম্ভবপর নয় এবং এরূপ করা কোন দিক থেকে কল্যাণকরও হতে পারে না। উহা বিশ্বাস করে ঃ মানবতার যথার্থ উন্নতি উহাই যা মানুষ নিজের প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নয় ; বরং উহার দাবী পূর্ণ করে এবং উহাকে এমনভাবে পরিমার্জিত করে হাসিল করবে যাতে করে সে নেকী ও সদানুষ্ঠনের সর্বোচ্চ মঞ্জিলে পৌছতে সক্ষম হয়।—নেকীই হয় যেন তার কাঙ্খিত সম্পদ, আর প্রবৃত্তির দাসত্ব যেন হয় বিষবৎ পরিত্যজ্য।

পার্থক্যের দু'টি ক্ষেত্র

নারী ও পুরুষদের ব্যাপারে ইসলাম যে দৃষ্টিভংগি পোষণ করে তা মানবীয় প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুকূল। অবশ্য যেখানে কোন প্রাকৃতিক ভিত্তি বর্তমান, ইসলাম সেখানে উভয়ের মধ্যে সমতার বিধান দেয়। আর প্রকৃতি যেখানে পার্থক্যের দাবী করে সেখানে উহা পার্থক্যকেই মেনে নেয়। ইসলাম যে সকল ক্ষেত্রে পার্থক্য করে তার মধ্যে দু'টি ক্ষেত্রই অধিকতর উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি হলো পরিত্যক্ত সম্পত্তির বন্টন এবং দ্বিতীয়টি হলো পরিবারের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব পালন।

পরিত্যক্ত সম্পত্তির বন্টন

মৃত ব্যক্তির মীরাস বা পরিত্যক্ত সম্পত্তির বন্টনের ব্যাপারে ইসলামের আইন সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ -

"পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান।"

নিসন্দেহে এই বন্টন সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক এবং ইনসাফ ভিত্তিক। কেননা অর্থনৈতিক সমস্ত ব্যয়ভার একা পুরুষকেই বহন করতে হয়। নারীকে শুধু নিজের বোঝা ছাড়া অন্য কারুর বোঝা বহন করতে হয় না। অবশ্য নারীকে যে ক্ষেত্রে পরিবারের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করতে হয় তখনকার কথা স্বতন্ত্র। তবে এমন ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা ইসলামী সমাজে খুব কমই হয়ে থাকে। কেননা যত দূরবর্তীই হোক না কেন যতক্ষণ পর্যন্ত নারীর কোন ঘনিষ্ট পুরুষ বর্তমান থাকবে ততক্ষণ তাকে রুজি-রোজগারের জন্যে বাইরে যেতে হয় না। নারী স্বাধীনতার ধ্বজাধারীরা এই ব্যবস্থাপনাকে কি নারী নির্যাতন নামে অভিহিত করতে পারে ? তাদের অন্তসারশূন্য শ্লোগান ও সংকীর্ণ মানসিকতার প্রতি না তাকিয়ে যদি বিবেচনা করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, মূল অংকটি একেবারেই সহজ ; আর তাহলো ঃ পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ নারীকে কেবল তার

নিজের জন্যেই দেয়া হয়—যখন অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ দেয়া হয় পুরুষকে শুধু তার একার জন্যে নয়। বরং তার সাথে সাথে তার স্ত্রীকে (অর্থাৎ নারীকে) তার সন্তানকে এবং পরিবারের অন্যান্য জরুরী কাজে খরচের জন্যে। এতে করে মিরাসের বেশীর ভাগ অংশ কাকে দেয়া হয় ? নারীকে, না পুরুষকে ? অবশ্য কোন কোন পুরুষ এমনও হতে পারে যে, নিজের সমস্ত সম্পদ কেবল ব্যক্তিগত আরাম-আয়েশের জন্যেই দু'হাতে লুটিয়ে দেবে এবং বিবাহ করে সংসার পাতাবার জন্যে মোটেই অগ্রসর হবে না। কিন্তু এমন ঘটনা একান্তই বিরল। সচরাচর যেটা হয়ে থাকে তাহলো এই যে, পুরুষই পরিবারের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করার জন্যে অগ্রসর হয়ে থাকে। পুরুষই পরিবারের সমস্ত সদস্যের (নিজের স্ত্রীসহ) যাবতীয় প্রয়োজন মেটায়। কিন্তু এ কাজ সম্পন্ন করে কারুর প্রতি সে অনুগ্রহ দেখায় না, বরং নিজের এক নৈতিক দায়িত্ব (Moral Obligation) পালন করে মাত্র। যদি কোন নারী সম্পত্তির অধিকারী হয়, তাহলে তার স্বামী তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে উহা স্পর্শও করতে পারে না। এখানেই শেষ নয়, স্ত্রী সম্পদশালিনী হলেও তার যাবতীয় ব্যয়ভার স্বামীকেই বহন করতে হয়। স্বামী যদি স্ত্রীকে তার খোরপোষ দিতে অস্বীকার করে কিংবা নিজের আয়ের অনুপাতে স্ত্রীকে কম খরচ প্রদান করে তাহলে সে আদালতে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে খোরপোষ আদায় করে নিতে পারে কিংবা অন্য কারণে প্রয়োজনবোধে সম্পর্কও ছিন্ন করতে পারে। সুতরাং একথা দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, ইসলাম নারীকে পুরুষের অনুপাতে নামমাত্র বা অপর্যাপ্ত সম্পদের অধিকার দেয় বলে যারা অভিযোগ করে তাদের সে অভিযোগ যে কতদূর ভিত্তিহীন তা বলাই বাহুল্য। কেননা ইসলাম পুরুষকে যে অর্থনৈতিক দায়িত্ব অর্পণ করেছে তাতে করে একজন নারীর অনুপাতে একজন পুরুষের দ্বিগুণ সম্পত্তি পাওয়াই যুক্তিসংগত।

ইসলামী দায়ভাগের মূল দৃষ্টিভংগি

পরিত্যক্ত যে কোন সম্পদ ও মাল-আসবাবের ক্ষেত্রে ইসলামের উপরোক্ত বন্টন ব্যবস্থা সমভাবে প্রযোজ্য। এই পর্যায়ে ইসলামের মূল দৃষ্টিভংগি এমন ন্যায়সংগত ও সুবিচারভিত্তিক যে বিশ্বের ইতিহাসে উহার নযীর কেউ স্থাপন করতে পারেনি। সে দৃষ্টিভংগি হলো ঃ لِكُلٍّ حَسَبَ حَاجَتِهِ —"প্রত্যেককে তার প্রয়োজন অনুযায়ী দেয়া হবে।"

মানুষের যে সামাজিক দায়িত্বসমূহ পালন করতে হয় তার প্রেক্ষিতেই এই প্রয়োজনের পরিমাপ নির্ধারণ করা হয়।

কিন্তু অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে ইসলাম পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোন পার্থক্যের বিধান দেয় না। এবং পারিশ্রমিকের ব্যাপারেও কোন তারতম্য স্বীকার করে না। ব্যবসায়ের মুনাফা বন্টন হোক, জমি থেকে কোন আয়ের ব্যাপার হোক

—কাউকেই কোথাও অগ্রাধিকার দেয়া হয় না। কেননা এই সকল ব্যাপারে ইসলাম নারী ও পুরুষের মধ্যে পূর্ণাংগ সাম্যের নীতি অনুসরণ করে এবং তাদের পরিশ্রম অনুযায়ী সমান পারিশ্রমিক দেয়। কাউকে কম বা বেশী দেয়াকে আদৌ সমর্থন করে না। মুসলমানদের মধ্যে কোথাও কোথাও যে নারীকে কম পারিশ্রমিক দেয়ার ঘটনা লক্ষ্য করা তার পেছনে রয়েছে ইসলাম বিরোধী চক্রের ব্যাপক ষড়যন্ত্র ; তারা বুঝতে চায় ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে নারী পুরুষের অর্ধেক বলে তারা অর্ধেক পারিশ্রমিকে হকদার। এই বৈষম্যের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই।

সাক্ষ্যের আইন

ইসলামের বিধান হলো ঃ দু'জন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান। এতে করে ইহা কখনো প্রমাণিত হয় না যে, একজন নারী একজন পুরুষের অর্ধেকের সমান। মূলত এটা হলো একটি বিজ্ঞজনোচিত পদক্ষেপ। এর লক্ষ্য হলো ঃ সমস্ত সম্ভাব্য উপায়ে আইনগত সাক্ষ্যকে দোষমুক্ত করা। চাই সে সাক্ষ্য আসামীর পক্ষে হোক কিংবা ফরিয়াদীর পক্ষে হোক। স্বীয় প্রকৃতির দিক থেকে নারী আবেগপ্রবণ ও সদা প্রতিক্রিয়াশীল। এ কারণে মামলার ঘটনার উপস্থাপনায় তালগোল পাকিয়ে ফেলা তার পক্ষে মোটেই বিচিত্র নয়। তাই সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে আরো একজন নারীকেও তার সংগী করে দেয়া হয়েছে এবং এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰهُمَا الْاُخْرٰى ط

"যদি দু'জন নারীর মধ্যে কোন একজন ভুলে যায় তাহলে দ্বিতীয়জন তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৮২)

কেননা হতে পারে যে, আদালতে যে আসামীর পক্ষে বা বিপক্ষে সে সাক্ষ্য দিচ্ছে সে একজন সুন্দরী মহিলা। তাই জিদ বা জ্বালা-পোড়ার কারণে তার বিপক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে বসবে। অনুরূপভাবে এমনও হতে পারে যে, আসামী একজন সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান যুবক। তাই তার প্রতি দুর্বলতা সৃষ্টি হওয়ার কারণে চেতনার সাথে বা অবচেতনভাবে তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে গিয়ে এমন কিছু বলে বসবে যার পশ্চাতে কোন ভিত্তি নেই। কিন্তু যেখানে দু'জন নারী একই সময়ে আদালতে সাক্ষ্য দিতে থাকবে তখন তাদের উভয়েরই এরূপ ভুল পথে অগ্রসর হওয়া এবং ভুল সাক্ষ্য দেয়াকে স্বাভাবিক বলে গণ্য করা যায় না। এরূপ পরিস্থিতিতে পারিপার্শিক কারণে এটাই স্বাভাবিক যে, তাদের একজন যদি সত্য ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে ভুল করে বসে তাহলে দ্বিতীয়জন তার সংশোধন করে দিতে পারে। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, যদি কোন মহিলা সাক্ষী স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে আদালাতে উপস্থিত হয় তাহলে অন্য আর একজন মহিলা না থাকলেও তার একার সাক্ষ্যই কার্যকরী বলে পরিগণিত হবে।

পরিবারের অভিভাবকত্ব

অভিভাবকত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এর প্রকৃতিই হচ্ছে এই যে, একমাত্র সেই ব্যক্তিই এই দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম যে পরিচালনা কাজে উপযুক্ত এবং পরিবারের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনা সুচারুরূপে আঞ্জাম দিতে সমর্থ। আসলে পরিবার হচ্ছে স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি এবং অন্যান্য নির্ভরশীল ব্যক্তিদের একটি ক্ষুদ্র মিলনস্থল। এদের সকলের গুরুভার বহন করাই হচ্ছে অভিভাবকের প্রধান দায়িত্ব। অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ন্যায় পরিবারের জন্যেও প্রয়োজন এক অভিভাবকের। এই অভিভাবক না থাকলে গোটা পরিবারে নেমে আসে দারুন বিশৃংখলা, সৃষ্টি হয় বিভিন্ন অনাচার, পরিশেষে আসে সর্বাত্মক বিপর্যয়। পরিবারের অভিভাবকত্বের সমস্যা সমাধানের জন্যে তিনটি পন্থার কথা বিবেচিত হতে পারে। প্রথম, পুরুষই হবে পরিবারের শাসক, দ্বিতীয়ত, নারীই হবে উহার পরিচালক, তৃতীয়ত, পুরুষ ও নারী যৌথভাবে এই দায়িত্ব পালন করবে।

তৃতীয় পন্থাটি তো একেবারেই অযৌক্তিক। উহার আলোচনার কোন প্রশ্নই উঠে না। কেননা কে না জানে যে, দু'জন পরিচালক হলে সেখানে একেবারে কোন পরিচালক না থাকার চেয়েও অধিকতর নৈরাজ্য ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। আসমান-জমিনের দু'জন পরিচালক হলে যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয় তার প্রতি ইংগিত করে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلاَّ اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ج

"যদি আসমান বা জমিনে আল্লাহ ছাড়া অন্য মা'বুদ থাকতো তাহলে (আসমান-জমিন) ধ্বংস হয়ে যেত।–(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ২২)

اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ط

"তাহলে প্রত্যেক মা'বুদ নিজ নিজ মাখলুকাতকে পৃথক করে ফেলত এবং একজন আর একজনকে আক্রমণ করতো।"–(সূরা আল মু'মিনুন ঃ ৯১)

কাল্পনিক মা'বুদদের অবস্থা যদি এই হয় তাহলে চিন্তা করে দেখুন, সেই সকল লোকদের অবস্থা কিরূপ হতে পারে যারা বাস্তবেই এতদূর জালেম এবং অবিচারক বলে পরিগণিত হয়েছে ?[১]

---

১. মানবজাতির ইতিহাস একথার সাক্ষ্য দেয় যে, সকল বিভাগে, সকল পরিমণ্ডলে এবং সকল প্রতিষ্ঠানে পরিচালক থাকে মাত্র একজনই। কোন রাষ্ট্রে দু'জন প্রেসিডেন্ট বা দু'জন উজিরে আজমের কথা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। একটি পরিবারের ক্ষেত্রেও একথা সমানভাবে প্রযোজ্য। সর্বাবস্থায় এর অভিভাবক হবে মাত্র একজনই।—[অনুবাদক]

একটি প্রশ্ন

অবশিষ্ট দু'টি পন্থা সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে পাঠকদের কাছে আমাদের একটি প্রশ্ন এই যে, যোগ্যতার দিক থেকে পরিবারের পরিচালক হওয়ার জন্যে নারী ও পুরুষের মধ্যে কে অধিকতর উপযুক্ত ? জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে অধিকতর অগ্রসর পুরুষ কি এই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে সক্ষম, না আবেগ প্রবণতার সাক্ষাত প্রতিমূর্তি নারী এই কাজে অধিকতর পারদর্শী ? যখনই আমরা গভীরভাবে চিন্তা করে দেখবো যে, মেধাগত যোগ্যতা এবং মজবুত দৈহিক কাঠামোর কারণে পুরুষ কি পরিবারের প্রশাসক হবে, না যে নারী প্রকৃতির দিক থেকে দারুন আবেগপ্রবণ, আনুগত্যশীল এবং সুকঠিন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে পুরুষোচিত সাহস ও নির্ভীকতা থেকে একেবারেই বঞ্চিত সেই হবে পরিবারের কর্ণধার, তাহলে আপনা-আপনিই সমস্যাটির সমাধান হয়ে যায়। এমনকি কোন নারী নিজেও এমন পুরুষকে পসন্দ করে না যে তার চেয়ে দুর্বল এবং যাকে সে সহজেই কাবু করতে সক্ষম। এরূপ পুরুষকে স্বভাবতই সে ঘৃণার চোখে দেখে এবং সে কখনো তার উপর নির্ভরশীল হতে চায় না। বিগত কয়েক শ' বছর ধরে যে মানসিকতা পালিত হয়ে মীরাস হিসেবে তার নিকট পৌছেছে এ হচ্ছে তারই একটু ফলশ্রুতি মাত্র। কিন্তু যাই হোক না কেন, এটা একেবারে বাস্তব যে, নারী এখনো সেই পুরুষের প্রতিই আকৃষ্ট হয় যে শারীরিক দিক থেকে স্বাস্থ্যবান, সবল এবং শক্তিশালী। এই সত্যটি আমেরিকার মহিলাদের মধ্যে খুবই সুস্পষ্ট। আমেরিকার একজন মহিলা যেমন পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করে, তেমনি সে স্বাধীন। কিন্তু তবুও সে ঐরূপ পুরুষের অধীনে থেকে বিজিত অবস্থায় থাকতে পসন্দ করে ; তাকেই সে ভালোবেসে তৃপ্তি লাভ করে এবং তাকে খুশী করার জন্যে সর্ব অবস্থায় চেষ্টা করে। সে পুরুষের সুঠাম দেহ এবং প্রশস্ত সিনা দেখে মুগ্ধ হয়। এবং যখন শারীরিক শক্তির দিক থেকে তার চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী ও মজবুত দেহের পুরুষ পায় তখন তার হাতে নিজেকে সমর্পণ করে দেয়।

একজন মহিলার পক্ষে পরিবারের অভিভাবকত্ব করার আগ্রহ কেবল তখন পর্যন্তই থাকতে পারে যতক্ষণ তার কোন সন্তান না হবে এবং তার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের দায়-দায়িত্ব তার উপর অর্পিত না হবে। সন্তান-সন্তুতি বর্তমান থাকতে পরিবারের অভিভাবকত্বের বাড়তি দায়িত্ব পালন করার কোন সুযোগ তার থাকতে পারে না। কেননা মা হিসেবে তার উপর যে নানাবিধ দায়িত্ব অর্পিত হয় তা যেমন কোন দিক থেকেই হালকা নয় তেমনি তাতে সময়ও ব্যয় হয় প্রচুর।

পারিবারিক জীবনের মূল প্রেরণা

উপরোক্ত আলোচনার অর্থ নিশ্চয়ই এই নয় যে, পরিবারে নারী হয়ে থাকবে পুরুষের দাসী এবং পুরুষ হবে তার অত্যাচারী প্রভু। কেননা সংসারের

নেতৃত্ব বলতে বহুবিধ দায়িত্ব ও কর্তব্যের সমষ্টিকে বুঝায়। আর উহা কেবল তখনই সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হতে পারে যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পরিপূর্ণ ভালোবাসা ও সহযোগিতার পরিবেশ বর্তমান থাকে। সংসার জীবনের সাফল্যের জন্যে পারস্পরিক ভাববিনিময়, সৌহার্দ, সহমর্মিতা ও সহানুভূতি একান্ত অপরিহার্য। ইসলাম পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও প্রযোগিতার স্থলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম-প্রীতি, শলা-পরামর্শ ও সহমর্মিতাকে পারিবারিক জীবনের ভিত্তি হিসেবে দেখতে চায়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ج

"এবং সেই নারীদের সাথে সুন্দরভাবে জীবনযাপন কর।"

–(সূরা আন নিসা ঃ ১৯)

এবং বিশ্বনবী (সা) বলেন ঃ

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لاَهْلِهِ -

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে নিজ পরিবারের লোকজনদের নিকট সর্বোত্তম।"—[তিরমিযী]

এখানে বিশ্বনবী (সা) স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার করাকে পুরুষের নৈতিক চরিত্রের মাপকাঠি বলে সাব্যস্ত করেছেন। বস্তুত এই মাপকাঠি একেবারেই নির্ভুল। কেননা কোন ব্যক্তিই তার স্ত্রীর সাথে অসদ্ব্যবহার করতে পারে না যতক্ষণ না সে আত্মিক দিক থেকে পীড়াগ্রস্ত হয় এবং নেকীর উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত হয় কিংবা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে।

যাই হোক পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে যে সকল ভুল ধারণা মানুষের মধ্যে বর্তমান তার সঠিক মর্ম অনুধাবন করা একান্ত প্রয়োজন। বেশীর ভাগ ভুল ধারণা দেখা যায় স্বামীর পক্ষ থেকে আরোপিত স্ত্রীর দায়িত্ব, তালাক বা বিচ্ছেদ এবং স্ত্রীর সংখ্যা সম্পর্কে।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের জটিলতা

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বিবাহের মাধ্যমে যে সম্পর্কের সৃষ্টি হয় উহা মূলত একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক। এবং উভয়ের মধ্যে অন্যান্য যে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন তা এদের ব্যক্তিগত, মনস্তাত্ত্বিক, আত্মিক এবং দৈহিক সামঞ্জস্যতা ও সমঝোতার উপর নির্ভরশীল। আইনের বলে এই সম্পর্ক বা সমঝোতা কোনক্রমেই স্থাপন করা যায় না। এ কারণে যদি কোন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আনন্দঘন পরিবেশ তথা হাসি-খুশী বর্তমান থাকে এবং তাদের জীবনে পুরোপুরি মিল-মহব্বত ও নিশ্চিন্ততা বিরাজিত থাকে তাহলে এর রহস্য যে

দাম্পত্য জীবনের মূলনীতির মধ্যেই প্রচ্ছন্ন অবস্থায় আছে কিনা তা দেখার কোন প্রয়োজন থাকে না। কেননা অনেক সময় দেখা যায় যে, স্বামী-স্ত্রীর ভেতর কঠিন অন্তর্দ্বন্দ্ব তাদের পারস্পরিক গভীর ভালোবাসা ও সুসম্পর্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অনুরূপভাবে যদি কোন দম্পত্তির মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বা মতভেদ দৃষ্টিগোচর হয় তাহলে এতে করে নিশ্চয়ই একথা প্রমাণিত হয় না যে, এর পশ্চাতে স্বামীর কোন ভুল বা স্ত্রীর কোন অবাধ্যতা অবশ্যই রয়েছে। হতে পারে, মানুষ হিসেবে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ই একান্ত ভালো লোক এবং উন্নত চরিত্রের অধিকারী। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের মন-মেজাজ ভিন্ন প্রকৃতির, আর সে কারণে উভয়ের মধ্যে কোন সমঝোতা বা সুসম্পর্ক স্থাপিত হতে পারছে না।

বিবাহ আইনের প্রয়োজনীয়তা

দাম্পত্য সম্পর্কের এই জটিলতার কারণেই আইনে এমন কিছু অবকাশ থাকা দরকার যাতে করে দাম্পত্য জীবনের প্রয়োজনীয় আইন ও নিয়ম-কানুন সেখান থেকে বের করা যেতে পারে। কেননা মানব জীবনের এই স্পর্শকাতর সমস্যার সমাধানের চেষ্টা ছাড়া মানবীয় জীবনব্যবস্থার পূর্ণাংগতার দাবী করা যেতে পারে না। সুতরাং এমন আইনের প্রয়োজন যা ন্যূনকল্পে এমন কিছু সীমারেখা নির্ধারণ করে দেবে যার ভেতরে অবস্থান করে স্বামী-স্ত্রী উভয়ই তাদের বিস্তারিত কর্তব্যসমূহ স্থির করে নেবে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি ভালোবাসা ও স্বস্থির পরিবেশ বর্তমান থাকে তাহলে তাদের অধিকার ও দায়িত্বের হেফাজাতের জন্যে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার কোন প্রয়োজন থাকে না। আদালতে তারা কেবল তখনই যেতে পারে যখন তাদের মধ্যে বনিবনাও না হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি হবে এবং তারা নিজেরা নিজেদের কলহ মীমাংসা করতে অক্ষম হয়ে পড়বে।

দ্বিতীয়ত, সেই আইনকে হতে হবে সুবিচারভিত্তিক। সেখানে অযথা পক্ষপাতিত্বের সুযোগ থাকবে না বিন্দুমাত্রও। এবং সে আইন হবে এমন ব্যাপক ও সর্বাত্মক যে, অধিক হতে অধিক সংখ্যক সমস্যার সমাধান যেন তাতে পাওয়া যায় অনায়াসেই। এই প্রসংগে বলে রাখা ভালো যে, মানবীয় কোন আইন বা নিয়ম এমন হতে পারে না যার আওতায় মানবজীবনের সমস্ত ঘটনাই আসতে পারে এবং কোন আইনের নিরেট ও শাব্দিক প্রয়োগ দ্বারাও কোন সুবিচারের সুষ্ঠু নযীর স্থাপন করা যায় না।

ইসলামী বিবাহ আইন সম্পর্কে কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন

এখন আসুন, স্ত্রীর দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে ইসলামের কি বিধান রয়েছে তাও আমরা আলোচনা করি। কেননা এ নিয়ে ইসলাম বিরোধীদের হৈচৈর অন্ত নেই। ইসলামী আইনে স্ত্রীর দায়িত্ব সম্পর্কে নিম্নরূপ তিনটি কথা স্মরণীয় ঃ

এক ঃ স্ত্রীর উপর দায়িত্ব অর্পণ কি জুলুমের নামান্তর ?

দুই ঃ এই দায়িত্ব কি এক তরফা এবং এর মোকাবিলায় তাকে কি কোন অধিকার দেয়া হয়নি ?

তিন ঃ এই দায়িত্ব কি চিরন্তন যে তার হাত থেকে নারী কখনো নিষ্কৃতি লাভ করতে পারবে না ?

স্ত্রীর দায়িত্ব

স্বামীর পক্ষ থেকে তিনটি বড় দায়িত্ব নিম্নরূপ আরোপ করা হয়েছে ঃ

(১) স্বামী যৌন মিলনের ইচ্ছা ব্যক্ত করলে স্ত্রীকে সংগে সংগেই তার আনুগত্য করতে হবে।

(২) স্ত্রী স্বামী গৃহে এমন কোন লোককে আসা-যাওয়ার সুযোগ দেবে না যার আসা-যাওয়াকে স্বামী পসন্দ করে না।

(৩) স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রীকে তার বিশ্বাসভাজন হতে হবে এবং তার কোন আমানত খেয়ানত করতে পারবে না।

প্রথম দায়িত্ব

স্ত্রীর প্রথম দায়িত্ব কোন ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। এতে যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে তা একেবারেই স্পষ্ট। পুরুষের দৈহিক গঠন এমন এক প্রকৃতির যে তার যৌন আকাংখার পরিতৃপ্তি নারীর চেয়ে বহুগুণে অধিক প্রয়োজনীয়। সে যৌন অস্থিরতা থেকে যতই মুক্ত থাকবে ততই সে স্বীয় কর্মক্ষেত্রে নিজ দায়িত্ব অধিক প্রস্তুতি ও উৎসাহের সাথে আঞ্জাম দিতে সক্ষম হবে। পুরুষ বিশেষ করে যৌবনকালেই কামভাবে অধিকতর উন্মত্ত হয়ে উঠে এবং তখন ইহা চরিতার্থ করার প্রয়োজনীয়তা নারীদের তুলনায় বহুগুণ অধিক হয়ে পড়ে। অথচ নারীর যৌনস্পৃহা পুরুষের তুলনায় অনেক গভীর এবং দৈহিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে পুরুষের প্রতি তার আকর্ষণও অনেক বেশী। কিন্তু সে কারণে তার পক্ষে ইহা অপরিহার্য নয় যে, সে তার যৌন স্পৃহা যৌন ক্রিয়ার মাধ্যমেই ব্যক্ত করবে।

পুরুষের প্রধানত এই প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্যেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়। অবশ্য আধ্যাত্মিক, মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক তাগিদও বিবাহের গুরুত্বপূর্ণ কারণ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এখন প্রশ্ন এই যে, স্বামী যদি যৌন মিলনের উদ্দেশ্যে স্ত্রীর নিকট গমন করে এবং স্ত্রী যদি তখন স্বামীর আনুগত্য না করে তাহলে স্বামীর কি করা কর্তব্য ? সে কি তখন অন্য নারীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করবে ? কোন সভ্য সমাজই এরূপ অবৈধ সম্পর্ককে বরদাশত করতে পারে না। আর কোন নারী নিজেও সহ্য করতে পারে না যে, তার স্বামী দৈহিক বা মানসিক দিক

থেকে তার পরিবর্তে অন্য কোন নারীর সন্ধান করুক। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যতই তিক্ত হোক না কেন কোন স্ত্রীই এরূপ কার্যক্রমকে বরদাশত করতে পারে না।

তিনটি কারণ

স্বামীর আকাংখা সত্বেও স্ত্রীর পক্ষ থেকে যৌন ক্রিয়ায় অসম্মতি জানার কারণ হতে পারে তিনটি। সেগুলো হলো ঃ

(১) স্ত্রী স্বামীকে ঘৃণা করে এবং এ কারণে তার সাথে মিলিত হওয়াকে পসন্দ করে না।

(২) স্বামীকে ভালোবাসে কিন্তু যৌন ক্রিয়াকে পসন্দ করে না। সুতরাং স্বামীর কথা সে অগ্রাহ্য করে। এই ব্যাপারটি অস্বাভাবিক। অথচ বাস্তব জীবনে ইহা ঢের পাওয়া যায়।

(৩) স্ত্রী স্বামীকে অবশ্যই চায় এবং যৌন ক্রিয়াকেও অপসন্দ করে না। কিন্তু বিশেষ সময়ে তার ইচ্ছা জাগ্রত হয় না।

প্রথম কারণটি অত্যন্ত আপত্তিজনক। এটা কোন বিশেষ কাজ বা মেয়াদ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে—এমন কথা জোর করে বলা যায় না। এতে করে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে পারে না। এর সর্বোত্তম প্রতিকার হলো এই যে, স্বামী-স্ত্রীকে পরস্পর পৃথক হয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হবে। আর এ ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে, পুরুষের চেয়ে নারীকেই সুবিধা দেয়া হয়েছে অনেক বেশী।

দ্বিতীয় যে কারণটির কথা বলা হয়েছে তার জন্যে স্বামীর যৌন আকাংখাকে দায়ী করা যায় না। ওটা এক প্রকার ব্যধি। উহার সুচিকিৎসা হওয়া একান্ত প্রয়োজন—যাতে করে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভুল-বুঝাবুঝির কোন অবকাশ না থাকে। বরং পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে তাদের মহব্বত ও ভালোবাসায় কোন ভাটা না পড়ে। স্ত্রীর ইচ্ছা না হলে, সম্ভবপর হলে স্বামী তাকে সময় দিবে, তবে স্বামীর ইচ্ছা পূর্ণ করার সুযোগ দেয়াই হবে স্ত্রীর কর্তব্য। ভালোবাসার দাবী এটাই এবং তালাক থেকে বাঁচার পথও এটাই। স্বামী-স্ত্রী যদি এরূপ কোন সমঝোতায় পৌছতে না পারে, তাহলে ভদ্রতার সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক ছেদ করাই উত্তম। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত তারা দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখবে ততদিন পর্যন্ত ইসলামী আইনের দাবীই হলো এই যে, স্ত্রী স্বামীর যৌনস্পৃহা অবশ্যই মেটাতে থাকবে। কেননা এটাই স্বাভাবিক। স্ত্রীর উপর জোরজবরদস্তি করার প্রশ্ন এখানে উত্থাপিত হতে পারে না। কেননা এখানে ইসলামী আইনের লক্ষ্যই হলো ঃ স্বামী যেন চরিত্রহীনতার পথে না যায় এবং দ্বিতীয় বিবাহ থেকেও তাকে বিরত রাখা যায়। আর একজন নারীর জন্য

অনিচ্ছাকৃত যৌন মিলনের চেয়ে স্বামীর এই পদস্খলন বা দ্বিতীয় বিবাহ যে অধিকতর কষ্টদায়ক তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এরূপ অনাকাংখিত টানা-হেচড়া সবসময়ের জন্যেই চলতে থাকুক—ইসলামী আইন কখনো এটা পসন্দ করে না। আর এতে করে পারিবারিক শান্তি কখনো স্থাপিত হতে পারে না। সুতরাং উভয়ের পৃথক হয়ে যাওয়াই উত্তম।

তৃতীয় কারণ যা বলা হয়েছে তা একটি সাময়িক অবস্থা মাত্র। খুব সহজেই তার প্রতিকার হতে পারে। বিশেষ সময়ে স্ত্রীর এই অবস্থা তার দৈহিক অবসাদের কারণেও হতে পারে কিংবা অত্যধিক পরিশ্রমজনিত কোন মানসিক কারণেও হতে পারে। কিন্তু এই অবস্থা যে একেবারেই সাময়িক তাতে কোন সন্দেহ নেই। স্ত্রী তার দৈহিক ও মানসিক মেজাজের সাহায্যে এ অবস্থার নিরসন করতে পারে। আবার যৌন মিলনের পূর্বে বিশেষ শৃংগারের মাধ্যমেও এ কাজটি হতে পারে। শৃংগারের মাধ্যমে হলে তাদের মিলন পশুত্বের স্তর অতিক্রম করে এক উন্নত মানিসক স্তরে উপনীত হতে পারে। এমনি করে স্ত্রীর সাময়িক অনীহার মূল কারণটিকেও দূর করা যেতে পারে।

অন্যদিকে স্ত্রী যখন স্বামীর সাথে মিলিত হতে চায় তখন স্বামী যদি কোন অস্বাভাবিক কারণে তাতে সাড়া না দেয় (পুরুষদের মধ্যে যদিও এটা খুব কমই দেখা যায়) তাহলে ইসলামী আইনে স্ত্রীকে কখনো অসহায় অবস্থার শিকার হতে হয় না। যে ইসলামী আইন স্বামীর যৌন আকাংখা পূর্ণ করা স্ত্রীর জন্যে অপরিহার্য কর্তব্য বলে ঘোষণা দেয় সেই আইনই এমন ব্যবস্থাও করে দেয় যাতে করে স্ত্রীর বৈধ আকাংখা পূরণ করার পথে কোন বাধার সৃষ্টি না হয়। ইসলামের স্পষ্ট বিধান হলো ঃ স্বামীকে স্ত্রীর আকাংখা অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে, যদি কোন স্বামী-স্ত্রীর যৌন আকাংখা পূর্ণ করতে ব্যর্থ হয় তাহলে তাদের বিবাহকে বাতিল বলে ঘোষণা করতে হবে। ইসলামী আইনে স্বামী-স্ত্রীর অধিকারকে যেমন হরণ করা হয়নি, তেমনি তাদের দায়-দায়িত্বকে শিথিলও করা হয়নি। এ আইনে এমন কোন কথাই নেই যাতে করে স্ত্রীর প্রতি সামান্যতম উপেক্ষা বা অবজ্ঞা প্রমাণিত হতে পারে এবং এমন কিছুও নেই যাতে করে তার প্রতি জবরদস্তি বা স্বৈরাচারী আচরণের কোন অভিযোগ উত্থাপিত হতে পারে।

দ্বিতীয় দায়িত্ব

স্বামীর পক্ষ থেকে আরোপিত স্ত্রীর দ্বিতীয় দায়িত্ব হলো এই যে, সে যেন এমন কোন ব্যক্তিকে ঘরে প্রবেশ করতে না দেয় যার যাতায়াত তার স্বামী পসন্দ করে না। স্ত্রীর ব্যভিচারিণী হওয়ার আশংকার সাথে এই হুকুমের কোন সম্পর্ক নেই। কেননা ব্যভিচারিণী হওয়াকে তো ইসলাম আদৌ বরদাস্ত করে

না ! কোন স্বামী ইহা পসন্দ করলেও স্ত্রী এমন জগণ্য কাজে কখনো লিপ্ত হতে পারে না। স্বামীর উক্ত হুকুমের মধ্যে যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে তা একেবারেই স্পষ্ট। কেননা স্বামী-স্ত্রীর বেশীরভাগ দ্বন্দ্ব-কলহের মূলে থাকে বাইরের লোকের হস্তক্ষেপ। বাইরের লোকেরা কূটনামি বা এখানের কথা সেখানে লাগিয়ে পারিবারিক কলহকে অধিকতর ঘোরালো ও জটিল করে তোলে। এমন অনাকাংক্ষিত ঘটনা থেকে বাঁচার জন্যে স্বামী যদি স্ত্রীকে এরূপ হুকুম দেয় যে, অমুক ব্যক্তিকে গৃহে প্রবেশ করতে নিষেধ করে দেবে এবং স্ত্রী যদি এরূপ করতে অস্বীকার করে তাহলে অবশ্যই তাদের সম্পর্কের অবনতি ঘটবে। ফলে তাদের গৃহ হবে একটি কোন্দলের আখড়া এবং তাদের পারস্পরিক সুধারণা ও সমঝোতার কোন পথই আর অবশিষ্ট থাকবে না। সুতরাং পরিবার ও উহার সন্তান-সন্ততির কল্যাণের জন্যে এটাই করণীয় যে, স্ত্রী স্বামীর এই আদেশ পালন করতে যেন বিন্দুমাত্রও অলসতা না দেখায়। কেননা শিশু সন্তানদের সুষ্ঠু লালন-পালন ভালোবাসা, সহানুভূতি ও হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশেই সম্ভবপর।

প্রসংগত, এরূপ প্রশ্ন হতে পারে যে, আইনের দিক থেকে স্ত্রীর জন্যে যদি এটা বাধ্যতামূলক হয় যে, স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে কাউকে ঘরে প্রবেশ করতে দেবে না। তাহলে স্বামীর জন্যেও এটা বাধ্যতামূলক কেন হবে না যে, সে স্ত্রীর ইচ্ছাকে উপেক্ষা করে কাউকে ঘরে প্রবেশের অনুমতি দেবে না? বস্তুত স্বামী-স্ত্রী যদি ভদ্র হয় এবং হাসি-খুশি ও সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে কালাতিপাত করতে থাকে তাহলে স্ত্রীর পক্ষ থেকে এ ধরনের কোন প্রশ্নই উত্থাপিত হয় না। আর যদি হয়ই, তাহলে স্বামী নিজেই তার সন্তোষজনক উত্তর দিতে সক্ষম হবে। কিন্তু যদি ধরে নেয়া হয় যে, তাতে করে তিক্ততা বেড়েই চলছে এবং একে প্রশমিত করার কোন সম্ভাবনাই না থাকে তাহলে তাদেরকে আদালতের আশ্রয় নিতে হবে। স্ত্রীর যদি এরূপ অধিকার থাকে যে, সে নিজেই কোন ব্যক্তিকে তার স্বামীর গৃহে প্রবেশ করতে না দেয় তাহলে পরিস্থিতি আরো মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। কেননা একথা ভুললে চলবে না যে, অধিকাংশ স্থলেই নারীদের মানসিক প্রতিক্রিয়া যুক্তি বা বুদ্ধির গণ্ডিকে অতিক্রম করে বসে এবং প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার স্থলে স্বকীয় আবেগ প্রবণতা বশীভূত হয়ে পড়ে। এছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে শশুরালয়ের নানাবিধ তিক্ততাও তাকে ভুল পথে পরিচালিত করে। এ কারণে স্ত্রীর মর্জি ব্যতিরেকে স্বামী কাউকে গৃহে প্রবেশের অনুমতি দিতে পারবে না—এরূপ বিধি আরোপ করে স্বামীকে স্ত্রীর অধীন করে দেয়া কোন বিজ্ঞজনোচিত কাজ হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করে এরূপ কোন বিধিকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত চালু রাখাও সম্ভবপর নয়।

অবশ্য একথাও ঠিক নয় যে, স্বামীর কখনো কোন ভুলই হতে পারে না। বরং এরূপ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, কোন কোন সময় সে শিশুর মতও কাজ করে বসতে পারে। অনুরূপভাবে একথাও নির্ভুল নয় যে, ভুল বলতে যা কিছু হয় তা শুধু স্ত্রীর পক্ষ থেকেই হয় এবং স্বামীর কোন ভুলই নেই। কেননা এমনও হতে পারে যে, স্ত্রী একান্ত যুক্তিসংগত কারণেই স্বামীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হতে পারে। আবার এমনও হতে পারে যে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বিনষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রীর আদৌ কোন দোষ নেই। কিন্তু ব্যতিক্রমধর্মী অবস্থার প্রেক্ষিতে কোন আইন রচিত হতে পারে না। বরং সাধারণ অবস্থা এবং সাধারণ মানুষের জন্যেই আইন প্রণীত হয়। যেহেতু পুরুষই নারীর তুলনায় অধিকতর বিজ্ঞতার পরিচয় দেয় সেহেতু নারীর চেয়ে পুরুষের প্রাধান্য অধিক বলে স্বীকার করা হয়। কিন্তু স্ত্রী যদি বুঝে যে, সে স্বামীর সাথে জীবনযাপন করতে পারছে না তাহলে তার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার অধিকার অবশ্য থাকবে।

তৃতীয় দায়িত্ব

স্ত্রীর তৃতীয় দায়িত্ব হলো স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজের সতীত্ব এবং স্বামীর যাবতীয় সম্পদের হেফাজাত করা। এটা তো বিবাহের একটি স্বাভাবিক দাবী এবং সর্বদিক থেকেই যুক্তিসম্মত। এ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলাই বাহুল্য। তবে এ দায়িত্ব এক তরফা নয়, স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই এ দায়িত্ব পালন করতে হবে। তাদেরকে একে অন্যের বিশ্বাসভাজন ও কল্যাণকামী হতে হবে।

ব্যর্থ স্বামী-স্ত্রী

এখন আসুন এমন দম্পত্তি সম্পর্কও আলোচনা করি যারা একে অন্যের উপর জুলুম ও নির্যাতন করতে এতটুকুও পরাঙমুখ হয় না। যেহেতু স্বামীই হচ্ছে পরিবারের অভিভাবক এবং পরিবারের যাবতীয় প্রয়োজন মেটাবার জন্যে দায়ী সে জন্যে পবিত্র কুরআনের বিধান অনুযায়ী অবাধ্য স্ত্রীকে শাসন করার অধিকার তাকে প্রদান করে বলা হয়েছে ঃ

وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ

وَاضْرِبُوْاهُنَّ ج فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلاً ط

"আর যে সকল নারী এমন হবে যে, তোমরা তাদের অবাধ্যতার আশংকা করবে তাদেরকে তোমরা মুখে উপদেশ দাও। তাদের শয়ন-শয্যা পৃথক করে দাও এবং (শেষ পদক্ষেপ হিসেবে) তাদেরকে প্রহার কর। অতপর যদি তারা তোমাদের আনুগত্য করতে শুরু করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে (জুলুম ও নির্যাতন করার জন্যে) কোন বাহানা অনুসন্ধান করো না।"

–(সূরা আন নিসা ঃ ৩৪)

স্ত্রীকে সংশোধন করার ধারাবাহিক পদ্ধতি

পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াতে স্ত্রীর যে সংশোধন পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে তা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া মাত্র। দৈহিক শাস্তির কথা একেবারে সর্বশেষ পর্যায়ে বলা হয়েছে। দেখা যায় যে, কোন কোন পুরুষ তার এ অধিকারের অপপ্রয়োগ করে এবং ধারাবাহিকতার প্রতি লক্ষ্য না করে অপরাধ একটু পেলেই স্ত্রীকে মারধর করতে শুরু করে। কিন্তু এটা কোন দিক থেকেই সংগত নয়। উক্ত অপপ্রয়োগের একমাত্র প্রতিকার হলো ঃ মানুষের আত্মিক ও নৈতিক চরিত্রকে উন্নত করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। বস্তুত এর গুরুত্ব সম্বন্ধে ইসলাম এতটুকুও উদাসীন নয়। পবিত্র কুরআনের পূর্বোক্ত আয়াতে যে নিয়মের প্রতি অংগুলি নির্দেশ করা হয়েছে তার একমাত্র লক্ষ্য হলো পারিবারিক জীবনের হেফাযত এবং উহাকে মজবুতভাবে সংগঠিত করা। কেননা যে কোন আইন হোক, উহা কেবল তখনই কল্যাণকর ও কার্যকরী বলে পরিগণিত হতে পারে যখন উহার পৃষ্ঠপোষকতার এমন কিছু শক্তিও বর্তমান থাকে যা উহার অমান্যকারীদেরকে যথাযথ শাস্তি দিতেও সক্ষম। যদি এরূপ কার্যকরী শক্তি বর্তমান না থাকে তাহলে আইন শুধু একটি অন্তসারশূন্য বুলিতেই রূপান্তরিত হয়। বাস্তব দুনিয়ায় উহার কোন অস্তিত্ব থাকে না।

এই হুকুমের কল্যাণকারিতা

বিবাহের লক্ষ্য হলো স্বামী-স্ত্রীর সর্বাত্মক উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধন করা। এ জন্যে সর্বপ্রথমেই প্রয়োজন পারিবারিক জীবনে ভালোবাসা ও প্রশান্তি স্থাপন করা। এতে করে আইনের সাহায্য ছাড়াই স্বামী-স্ত্রী উভয়ই অধিক হতে অধিকতর পরিমাণে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ করতে সক্ষম হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাদের মধ্যে কলহ ও মতানৈক্য হলে উহার মারাত্মক কুফল শুধু তাদের নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং তাদের সন্তান-সন্তুতি তথা তাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকেও বিনষ্ট করে ফেলে।

আদালত ও গৃহ বিবাদ

গৃহ বিবাহের মূল কারণ যদি স্ত্রী হয় তাহলে প্রশ্ন এই যে, তার সংশোধনের দায়িত্ব কার ? আদালত এ কাজ করতে পারে কি ? বাস্তব ঘটনা এই যে, আদালত তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে সমস্যাটিকে নিসন্দেহে আরো মারাত্মক করে তুলতে পারে কিন্তু সমাধানের পথ প্রশস্ত করতে পারে না। হতে পারে, তাদের মতানৈক্যের বিষয়টি খুবই নগণ্য ও ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু আদালতে গিয়ে বিষয়টি আরো জটিল এবং আশংকাজনক রূপ নিতে পারে। কেননা কোন ঘটনা একবার যখন আদালাতে পৌছে যায় তখন উভয় পক্ষের অহংকার ও জিদ বিষয়টির সুরাহার পথ রুদ্ধ করে দেয়। আদালতে

কেবল কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই নেয়া উচিত এবং কেবল তখনই নেয়া উচিত যখন আদালতের বাইরে উহার নিষ্পত্তি করা সম্পূর্ণরূপেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই যে সকল ছোটখাট ঘটনা অহরহ ঘটে থাকে সেগুলোকে নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হতে পারে না। কেননা এমনটি হলে তো ঘরে ঘরেই আদালত স্থাপন করা দরকার এবং এই সকল আদালতকে কেবল পারিবারিক ঝগড়া-কলহ নিষ্পত্তির জন্যেই মশগুল থাকতে হবে।

পুরুষের কাজ

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, গৃহে এমন একটি চালিকা শক্তি অবশ্যই থাকতে হবে যে, উহা যেন পারিবারিক সমস্যা-গুলোর সমাধান এবং যে কোন দ্বন্দ্ব ও মতানৈক্যের সংশোধন করতে সক্ষম। বস্তুত পরিবারের প্রকৃত অভিভাবক হিসেবে একমাত্র স্বামীই গৃহের এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের আঞ্জাম দিতে পারে। পবিত্র কুরআনের পূর্বোক্ত আয়াতে স্বামীকে এরূপ আদেশ দেয়া হয়েছে যে, সর্বপ্রথমে সে স্ত্রীর মনে কোনরূপ আঘাত না দিয়ে শুধু সদুপদেশের মাধ্যমে তার সংশোধনের চেষ্টা করবে। স্ত্রী যদি এতে করে সংশোধিত হয়ে যায় তা হলেতো বিষয়টি এখানেই সমাপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু যদি সে এতেও তার ভুল স্বীকার করে নিতে সম্মত না হয় তাহলে স্বামীর কর্তব্য হবে স্ত্রীর শয়নের স্থানকে একদম পৃথক করে দেবে। এই শাস্তি প্রথমোক্ত (উপদেশ প্রদানের) শাস্তির চেয়ে কতকটা কঠিন। এতে করে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ইসলাম নারীদের মনস্তাত্ত্বিক বিষয়টির প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য রাখে। এবং এটাও ইসলামের নিকট অবিদিত নয় যে, স্বীয় রূপ লাবণ্য ও আকর্ষণীয় ভাবভংগির কারণে অনেক সময়ে সে এতদূর অহংকারী হয়ে উঠে যে, স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করতে বিন্দুমাত্রও ইতস্তত করে না। এই দিক বিবেচনা করে তার শয়ন-শয্যাকে পৃথক করে দেয়ার অর্থ হবে এই যে, স্বামীকে সে তার সৌন্দর্য ও চিত্তাকর্ষক রূপ লাবণ্য দিয়ে বশ করে রাখার অহমিকায় মত্ত হওয়ার সুযোগ পাবে না। এতে করে তার অহংকারে অবশ্যই ভাটা পড়বে এবং স্বামীর আনুগত্যের প্রতি মনোযোগী হয়ে উঠবে। কিন্তু এরূপ শাস্তি প্রদানের পরেও যদি সে সংশোধিত না হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, সে এতদূর হঠকারী ও গর্বিত যে, দৈহিক শাস্তি প্রয়োগ ছাড়া তাকে আর সুপথে আনা যাবে না। অনাকাংখিত হলেও যদি অবস্থা এমন পর্যায়েই এসে যায় তাহলে সর্বশেষ পন্থা হিসেবে স্বামীকে এরূপ অনুমতি দেয়া হয়েছে যে, স্ত্রীকে সে এ অবস্থায় প্রয়োজানুযায়ী মারপিঠ করতে পারবে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তাকে নিছক কষ্ট দেয়ার জন্যেই মারপিঠ করবে, বরং মারপিটের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে তাকে সংশোধন করা। বস্তুত এ জন্যেই বিধান দেয়া হয়েছে যে, এই প্রহার

হতে হবে খুবই হালকা ধরনের ; মারাত্মক ধরনের মারপিট করার কোন অধিকার স্বামীকে দেয়া হয়নি।

এ পন্থা শুধু সতর্কতামূলক

স্ত্রীর সাথে উপরোক্তরূপ কঠোর ব্যবহার কি তাকে অপমানিত করার কিংবা তার আত্মসম্মানে আঘাতহানার সামিল ? না, এরূপ হওয়ার কোন যুক্তিই নেই। কেননা এ সম্পর্কে কিছু বলার সময়ে আমাদের প্রথমেই স্মরণ রাখতে হবে যে, এই প্রহার হলো নিছক একটি সতর্কতামূলক পদক্ষেপ। আর এ পদক্ষেপ কেবল তখনই গ্রহণ করা হয় যখন সংশোধনের যাবতীয় পন্থাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

শাস্তি—একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজন

দ্বিতীয় কথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, কিছু কিছু মানসিক পীড়া এমন রয়েছে যে, দৈহিক শাস্তি ব্যতিরেকে তার কোন চিকিৎসা হতে পারে না। মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞান আমাদেরকে একথাই বলে যে, স্বাভাবিক অবস্থায় উপরোক্ত পদক্ষেপসমূহ (মৌখিক উপদেশ, শয্যাকে পৃথক করে দেয়া ইত্যাদি) অবশ্যই কার্যকরী। কিন্তু এমন এমন মানসিক ব্যধিও রয়েছে—যেমন পীড়াদান প্রবণতা (Masochism) ইত্যাদি—যা কেবল শারীরিক শাস্তি প্রদানের মাধ্যমেই নিরাময় হতে পারে। এ ধরনের ব্যধিতে পুরুষের চেয়ে নারীরাই অধিক আক্রান্ত হয়ে থাকে। এই শ্রেণীর ব্যধিগ্রস্ত নারীরা অবজ্ঞা ও মারপিটেই এক প্রকার আনন্দ লাভ করে থাকে। [অন্যদিকে পুরুষরা সচরাচর যে মানসিক ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে থাকে তাকে বলা হয় দুঃখদান প্রবণতা (Sadism)। এ শ্রেণীর ব্যধিগ্রস্ত পুরুষরা নির্যাতনের প্রতি এক প্রকার ভালোবাসা অনুভব করে থাকে।]

একথা স্পষ্ট যে, স্ত্রী যদি উপরোক্ত রূপ ব্যধির শিকার হয়ে পড়ে তাহলে তার সংশোধন একমাত্র শারীরিক শাস্তির মাধ্যমেই সম্ভবপর। এতে করে একদিকে তার মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজন পূর্ণ হবে এবং অন্যদিকে তার অন্যায় সম্পর্কেও সচেতন হয়ে উঠবে। বাহ্যিকভাবে বিষয়টি যতই বিস্ময়কর মনে হোক না কেন, এক বাস্তব সত্য যে, উপরোক্ত রূপ ব্যধিগ্রস্ত স্বামী ও স্ত্রী উভয়ই একে অন্যের জন্যে উত্তম জীবনসংগী হতে পারে। অথচ তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি মোটেই উত্তম নয়। অনুরূপভাবে জ্বালাতনময়ী স্বামী এবং নির্যাতনকারী স্ত্রীর দৃষ্টান্তও সমাজে একেবারে বিরল নয়। এবং এ ধরনের স্বামীদের মন-মেজাজ ঐ ধরনের স্ত্রীরাই উত্তমরূপে ঠাণ্ডা করে রাখতে সক্ষম। আর এরা একে অন্যের প্রতি খুশী থেকেই দিনাতিপাত করতে পারে।

মোটকথা মারপিটের প্রয়োজন কেবল তখনই অনুভূত হয় যখন স্বামী বা স্ত্রী সত্যিকার অর্থেই মানসিকভাবে পীড়াগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তার পূর্বে এর কোন

প্রশ্নই উঠে না। যাই হোক ইসলামী আইন স্বামীকে যে শারীরিক শাস্তি প্রদানের অনুমতি দেয় তাকে কেবল একটি সতর্কতামূলক পদক্ষেপ বলেই অভিহিত করা যায়। কোন স্বামীকেই এই অধিকার দেয়া হয়নি যে, ছোটখাট ভুলের জন্যেও স্ত্রীর সাথে যা-তা ব্যবহার করতে পারবে। পবিত্র কুরআনে সংশোধনী পদক্ষেপের যে ধারাবাহিকতা বর্ণনা করা হয়েছে তাতে এই সত্যটিই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। হযরত বিশ্বনবী (সা) স্বামীকে এই অধিকার কেবল তখনই প্রয়োগ করার অনুমতি দিয়েছে যখন সংশোধনের যাবতীয় মাধ্যমই ব্যর্থ হয়ে যায়। তিনি বলেন ঃ

لايجلد احدكم امرأته جلد السعير ثم يجامعها فى اخر اليوم-

"তোমাদের কেউ নিজ স্ত্রীকে দিবাভাগে যেন এমনভাবে প্রহার না করে যেমনভাবে উটকে প্রহার করা হয় এবং পুনরায় রাতে তার সাথে মিলিত হবে।"[বুখারী]

স্বামীর দুর্ব্যবহারের প্রতিকার

যদি স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর প্রতি দুর্ব্যবহার করার আশংকা দেখা দেয় তাহলে ভিন্নরূপ আইনের আশ্রয় নিতে হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ط وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ط

"যদি কোন নারীর স্বামীর পক্ষ থেকে দুর্ব্যবহার বা বেপরোয়া আচরণের আশংকা দেখা দেয় তাহলে তাদের এ কাজে কোন অপরাধ নেই যে, উভয়ই পরস্পর সমঝোতা করে নিবে। আর এই সমঝোতাই সর্বোত্তম।"
—(সূরা আন নিসা ঃ ১২৮)

কিছু লোক এ ব্যাপারেও নারী ও পুরুষের মধ্যে পরিপূর্ণ সমতার দাবী করে থাকে। কিন্তু প্রশ্ন শুধু কাল্পনিক সমতার নয়, বরং এমন বাস্তবভিত্তিক সমতার যা অনুসরণযোগ্য হওয়ার সাথে সাথে মানবীয় প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল বলেও গণ্য হতে পারে। কোন নারীই—চাই সে, 'পশ্চাদমুখী' প্রাচ্যের হোক কিংবা 'সুসভ্য' পাশ্চাত্যের হোক—কখনো এটা চায় না যে, স্বামীর প্রহারের বদলে সেও স্বামীকে প্রহার করুক। এমন স্বামীকে কোন নারী কখনো সম্মানের চোখে দেখতেই পারে না যে, এতদূর দুর্বল যে, তার (স্ত্রীর) হাতে কেবল মারপিটই খেতে থাকে। এ কারণেই এ পর্যন্ত কোন নারী এরূপ দাবী উত্থাপন করে নিয়ে স্বামীর যেমন তাকে মারপিট করার অধিকার রয়েছে ঠিক তেমনি তাকেও এই অধিকার দিতে হবে যে, সেও স্বামীকে প্রহার করতে পারবে।

এ বিষয়ের একটি বিশেষ দিক হলো এই যে, ইসলামের দৃষ্টিতে এটা অপরিহার্য নয় যে, নারী কেবল নীরবে স্বামীর অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করতে থাকবে এবং উহার বিরুদ্ধে 'উহ' শব্দটিও করবে না। বরং এই পরিস্থিতিতে ইসলাম তাকে এই অধিকার দিয়েছে যে, সে ইচ্ছা করলে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারবে।

আলোচনার সারমর্ম

উপরোক্ত আলোচনার মধ্যে নিম্নরূপ কথাগুলো বর্তমান।

১. স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর উপর আরোপিত দায়িত্বসমূহে জবরদস্তি বা শক্তি প্রদর্শনের কিছুই নেই। বরং উহার মূল লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের সমষ্টিগত কল্যাণ। আর সে সমাজের একটি অংগ হচ্ছে নারী।

২. স্ত্রীর অধিকাংশ দায়িত্বের মোকাবিলায় স্বামীর উপরও অনুরূপ দায়িত্ব আরোপ করা হয়েছে। যে সকল মুষ্টিমেয় বিষয়ে পুরুষকে নারীর বিপক্ষে যে কিছু না কিছু শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে তাতে মূলত তাদের দৈহিক ও মানসিক গঠনের স্বাভাবিক তারতম্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এতে নারীর প্রতি অবমাননা বা তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের কোন প্রশ্নই উঠে না।

৩. নারীর উপর পুরুষের যে শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে তার বিপক্ষে নারীকে এরূপ আই-নগত অধিকার দেয়া হয়েছে যে, স্বামী যদি তার সাথে প্রতিনিয়ত দুর্ব্যবহার করতে থাকে তা হলে সে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারবে।

তালাকের তিনটি পদ্ধতি

স্বামী-স্ত্রী তালাক বা বিচ্ছিন্নতার মাধ্যমে বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে দাম্পত্য জীবনের যাবতীয় দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে। এরূপ নিষ্কৃতি-লাভের পদ্ধতি তিনটি যথা ঃ

(১) বিবাহের সময়েই স্ত্রী তার ভাবী স্বামীর নিকট থেকে তালাকের অধিকার অর্জন করে। ইসলামী আইনে স্বামী ইচ্ছা করলে যে তালাকের অধিকার তার নিজের তা স্ত্রীকে অর্পণ করতে পারে। তবে বাস্তবে খুব কম সংখ্যক নারীই এই অধিকার প্রয়োগ করে থাকে। যাই হোক নারী ইচ্ছা করলে এই অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে।

(২) স্ত্রী আদালতে এ কারণে স্বামীর নিকট তালাকের দাবী করতে পারে যে, সে তাকে ঘৃণা করে এবং সে এরূপ স্বামীর সাথে জীবন কাটাতে অনিচ্ছুক। শোনা যায়, কোন কোন আদালত নাকি এরূপ মোকদ্দমায় স্ত্রীর পক্ষে রায় দিতে নারাজ। অথচ এ ব্যাপারে ইসলামী আইনে কোন দ্বিধা-

দ্বন্দ্বের অবকাশ নেই। হযরত বিশ্বনবী (সা)-এর আদর্শও এই আইনের সমর্থন দেয় এবং এ কারণে ইহা ইসলামী আইনের একটি বিশেষ ধারা বলে পরিগণিত। স্ত্রী নিজেই যখন তালাকের দাবী করে তখন ইসলামী আইনে শুধু এরূপ একটি শর্ত আরোপ করে যে, ঐ সময়ের পূর্ব পর্যন্ত স্ত্রী স্বামীর নিকট থেকে 'জেহেয' (বা যৌতুক) স্বরূপ যা কিছু পেয়ে থাকবে তা স্বামীকে ফেরত দিতে হবে। এটাই ইনসাফ। কেননা স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক দেয় তাহলে তালাক পর্যন্ত স্বামীর দেয়া সবকিছুই স্ত্রীকে দিয়ে দিতে হয়। মোটকথা, বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে স্বামী ও স্ত্রীকে একই প্রকার আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে নিতে হবে।

(৩) স্ত্রীর সামনে তৃতীয় আরেকটি পথ উন্মুক্ত রয়েছে যে, আদালতের মাধ্যমে স্বামীর নিকট থেকে তালাক গ্রহণ করার সাথে সাথে জেহেযের মাল-জিনিস এবং খোরপোষও আদায় করতে পারবে। তবে এর জন্যে শর্ত হলো এই যে, জরুরী প্রমাণাদির সাহায্যে আদালতকে নিশ্চিত হতে হবে যে, স্বামী তার সাথে দুর্ব্যবহার করছে এবং বিবাহের সময়ে সে স্ত্রীকে যে খোরপোষ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা সে পালন করেনি। আদালত এ ব্যাপারে নিশ্চিত হলে তাদের বিবাহ বাতিল করার রায় দিতে পারবে।

ইসলাম নারীকে যে এরূপ অধিকার দিয়েছে তা সে প্রয়োজনবোধে কাজে লাগাতে পারে। নারীকে এই অধিকার দেয়ার পর নারী ও পুরুষের অধিকারে এক প্রকার ভারসাম্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়। পুরুষ যখন নারীর উপর কিছু শ্রেষ্ঠত্ব রাখে তখন উহার মোকাবিলায় নারীকেও কিছু অধিকতর অধিকার প্রদান করা হয়েছে।

পারিবারিক বিশৃংখলা

তালাক বা বিচ্ছেদের পর পারিবারিক জীবনে নেমে আসে নানাবিধ বিশৃংখলা। স্ত্রী ও সন্তান-সন্তুতিকে ভোগ করতে হয় দুঃসহ যন্ত্রণা ও বহুবিধ ঝঞ্ঝাট। আর এ কারণে আদালতে চলে মোকদ্দমার পর মোকদ্দমা। অনেক সময়ে দেখা যায়, স্ত্রী তার সন্তান-সন্ততি বা দুগ্ধপোষ্য শিশু নিয়ে আনন্দের সাথে দিন যাপন করছে। এমন সময়ে হঠাৎ করে কোন সংবাদ বাহক তার স্বামীর পক্ষ থেকে একখানি কাগজের টুকরা—তালাকনামা তার হাতে দিয়ে চলে গেল। এমনি করে তার একটি সোনার সংসার ভেংগেচুরে খান খান হয়ে গেল। অথচ হতে পারে, এর পেছনে রয়েছে স্বামীর কোন সাময়িক আবেগ বা আকস্মিক ঝোঁকপ্রবণতা। অথবা এমন কোন মহিলা তার পেছনে লেগেছে যে তার স্ত্রীর চেয়ে অধিকতর রূপসী। কিংবা স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি অতিষ্ঠ হয়ে

উঠেছে এবং একঘেয়েমী দূর করার জন্যে নতুন কাউকে বিয়ে করার স্বপ্ন দেখছে। অনুরূপভাবে স্ত্রীর শৈথিল্য বা নিষ্ক্রিয়তাও এর কারণ হতে পারে। অথবা অতিরিক্ত ক্লান্তি বা দুর্বলতা হেতু স্বামীকে স্ত্রীর পক্ষ থেকে সন্তুষ্ট করার পথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার কারণেও স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে পারে।

এই ধরনের ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে নারী স্বাধীনতার সমর্থকরা প্রশ্ন করে থাকে, তাহলে কি তালাকের এই মারাত্মক অস্ত্র—যা তুলে দেয়া হয়েছে পুরুষের হাতে এবং যা ক্ষণিকের আবেগে কিংবা অন্য কোন হীনস্বার্থে ব্যবহৃত হওয়ার ফলে কত ধৈর্যশীলা ও নিষ্পাপ মহিলার এবং তার মাসুম সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যত জীবন চিরতরে অন্ধকার হয়ে যায়—ছিনিয়ে নেয়া সমীচীন নয় যাতে করে উহার অপপ্রয়োগ করে কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে না পারে ?

রোমান ক্যাথলিক দেশসমূহের দৃষ্টান্ত

অস্বীকার করা যায় না যে, স্ত্রী ও সন্তানদের উপর যে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট নেমে আসে তার একমাত্র কারণ হলো তালাক। কিন্তু প্রশ্ন হলো ঃ এর প্রতিকার কি ? স্বামীর তালাকের অধিকার ছিনিয়ে নিলেই কি এর সমাধান হবে ? যদি বলা হয় ঃ হাঁ, তাহলে ভেবে দেখতে হবে, পুরুষের এই অধিকার ছিনিয়ে নেয়ার পর যে ভয়ানক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে—যার নযীর আমরা দেখতে পাই সেই সকল রোমান ক্যাথলিক দেশে যেখানে তালাক সম্পূর্ণরূপেই নিষিদ্ধ—তার কোন প্রতিকার হবে কি ? বিবাহকে যদি একটি স্থায়ী ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক হিসেবে নির্ধারিত করা হয় তাহলে সেই সকল স্বামী-স্ত্রীর পরিণাম সম্পর্কে একবার চিন্তা করুন যারা একে অন্যকে অন্তর থেকেই ঘৃণা করে এবং প্রতিনিয়তই ঝগড়া-কলহে লিপ্ত থাকে। তাদের নৈতিক অপরাধ কি দিনের পর দিন বেড়ে যাবে না ? স্বামী ও স্ত্রী কি তাদের যৌন স্পৃহা চরিতার্থ করার জন্যে বাইরে যত্রযত্র সংগিনী বা সংগী খুঁজে বেড়াবে না ? আর এরূপ জঘন্য ও কুৎসিত পরিবেশে সন্তান-সন্ততির চরিত্র গঠিত হতে পারে কি ? সচ্চরিত্র ও উপযুক্ত সন্তানের জন্যে তো প্রয়োজন পিতা-মাতার স্নেহ ও মায়া-মমতার এক অনাবিল পরিবেশ। প্রয়োজন তাদের উন্নত ও সুশৃংখল পরিবেশ। এ জন্যেই দেখা যায়। যারা মানসিক অস্থিরতা ও দুরন্ত মনস্তাত্বিক ব্যধির শিকার তাদের অধিকাংশের মূলে থাকে পিতা-মাতার এরূপ নৈতিক অধপতন এবং উচ্ছৃংখল জীবন কিংবা পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহের মারাত্মক অভিশাপ।

আদালত ও পারিবারিক কলহ

কোন কোন মহল এরূপ প্রস্তাব তুলেছে যে, স্বামীর তালাকের অধিকারের উপর বিভিন্ন শর্ত আরোপ করা উচিত, যাতে করে উহার প্রয়োগের অধিকার কেবল স্বামীকে প্রদান না করে আদালতকেও দেয়া যেতে পারে। আদালতের

কর্তব্য হবে উভয় পক্ষের সালিশ উপস্থিত করে বিষয়টির নিষ্পত্তি করে ফেলবে আর নিষ্পত্তি করতে ব্যর্থ হলে তালাকের ডিক্রি জারী করে দেবে। তবে তালাকের ফায়সালা করার পূর্বে সালিশদের কর্তব্য হবে বিষয়টির সর্বাত্মক পর্যালোচনা ও যাচাই-বাছাই করবে এবং স্বামীর মত পরিবর্তন ও স্ত্রীর সমঝোতা মেনে নেয়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করবে। এ ধরনের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পরই তালাকের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আর সে তালাকের ঘোষণা স্বামী নয়, বরং স্বয়ং আদালতই প্রদান করবে।

আমাদের মতে, স্বামী-স্ত্রীর এই সমঝোতার জন্যে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা যায় যার বিরুদ্ধে কেউ কোন প্রশ্নই উত্থাপন করতে পারে না। আমাদের ধারণায়, এরূপ পরিস্থিতিতে আদালতের হস্তক্ষেপ করার কোন প্রয়োজনীয়তাই নেই। কেননা ইসলামী আইনশাস্ত্রে এরূপ সমস্যার যে সমাধান দেয়া হয়েছে তা আমাদের জন্যে অবশ্যই যথেষ্ট। উহা বর্তমান থাকতে অন্য কোন রূপ সমাধানের কোন প্রশ্ন উঠে না। অনস্বীকার্য যে, এর সমাধান বেশীর ভাগই নির্ভর করে স্বয়ং স্বামী-স্ত্রীর উপর। তারা আন্তরিকতার সাথেই যদি সমঝোতা করতে চায় তাহলে আদালতের ন্যায়ই তাদের আত্মীয়-স্বজনরা তাদের উপকার করতে সক্ষম। আর তারা (স্বামী-স্ত্রী) যদি আন্তরিকতার সাথে নিষ্পত্তি না চায় তাহলে দুনিয়ার বড় বড় আদালতও তাদের ফায়সালা করতে পারবে না। এখনো দুনিয়ায় এমন এমন দেশ রয়েছে যেখানে নিজেদের যাবতীয় চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায় তখন আদালতের পক্ষ থেকেই ডিক্রি জারী করে দেয়া হয়। কিন্তু এ সত্ত্বেও সেই সকল দেশে প্রতি বছর হাজার হাজার তালাক সংঘটিত হয়। কেবল এক আমেরিকাতেই বার্ষিক তালাকের হার হচ্ছে ৪০%। দুনিয়াতে এই হলো সর্বোচ্চ হার।

আদালতের হস্তক্ষেপের ক্ষতির দিক

আদালত যখন স্বামীর উপস্থাপিত সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে এ বিষয়ে সুনিশ্চিত হবে যে, সমস্ত অপরাধ একমাত্র স্ত্রীর এবং তার সাথে একত্রে বসবাস করা স্বামীর পক্ষে আর সম্ভবপর নয় তখনই কেবল তালাক দেয়া যেতে পারবে এবং এর সামান্যতম অন্যথা হলেও তালাক দেয়া যাবে না—তালাকের এই পন্থাকে সঠিক বলে মেনে নিলেও যে প্রশ্নটি থেকে যায় তাহলো ঃ এতে করে স্ত্রীর কোন কল্যাণ হবে কি ? তালাকের ভয় হয়ত থাকলো না। কিন্তু সেই সংসারে তার শান্তি হবে কি যেখানে দিনরাত ২৪ ঘন্টা ঝগড়া-ঝাটি লেগেই থাকবে—যেখানে দেখতে হবে স্বামীর অগ্নিমূর্তি। থাকতে হবে তার বোঝা হয়ে ? এমন গৃহে থাকার জন্যে স্ত্রীকে বাধ্য করা সমীচীন হবে কি যেখানে সুযোগ পেলেই স্ত্রী তার স্বামীকে ধোঁকা দিতে সমর্থ হবে ? নিশ্চয়ই কোন

আইন এ ধরনের পরিস্থিতিকে সমর্থন করতে পারে না এবং এটাও বরদাশত করতে পারে না যে, ঘৃণা, অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের এমন এক সংসারে স্বামীর অত্যাচার অবিচার মুখ বুজে একজন স্ত্রী সহ্য করতে থাকুক। কেবল সন্তানদের তালিম ও লালন-পালনের জন্যে কোন স্ত্রী এমন জাহান্নামের আগুনে বসবাস করতে পারে কি ? আর এমন জুলুম ও অমানুষিক নির্যাতনের ভেতরে সে তার সন্তানের শিক্ষা ও লালন-পালনের দায়িত্বই বা কেমন করে আঞ্জাম দিতে পারে ?

সমস্যার একমাত্র সমাধান

বস্তুত এই ধরনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান গোটা সমাজের নৈতিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উপর নির্ভরশীল। এ জন্যে মানসিক পরিচ্ছন্নতা বিধানের এক দীর্ঘ কর্মসূচীর প্রয়োজন। এরূপ কর্মসূচীকে সফল করতে পারলেই নেকী ও কল্যাণের পরিবেশ রচিত হতে পারে এবং সামাজিক জীবনের একটি সুষ্ঠু ভিতও গড়ে উঠতে পারে। এমন একটি সুন্দর ও পবিত্র সমাজেই স্বামীর অন্তরে এরূপ উপলব্ধির সৃষ্টি হতে পারে যে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক একটি পবিত্র ও অনাবিল সম্পর্ক। এ সম্পর্ককে ক্ষণিকের আবেগ বা খেয়াল-খুশীর উপর কখনো ছেড়ে দেয়া যায় না।

জীবনের পুনর্গঠন

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের এই কাজটি যেমন দীর্ঘ তেমনি ধীর গতিসম্পন্ন। এর জন্য প্রয়োজন ইসলামী আইনের আলোকে জাতির সমাজ জীবনকে নতুন করে ঢেলে সাজানো। আর উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্যে প্রয়োজন সমস্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠান যেমন পরিবার। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ফিল্ম, রেডিও, টেলিভিশন, প্রেস, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ জনতার ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা। এ কাজ বড় কঠিন এবং এতে সময়ও লাগে প্রচুর। কিন্তু স্থায়ীভাবে সামাজিক বিপ্লব সাধন করতে হলে এর কোন বিকল্পও নেই। স্থায়ী বিপ্লবের একমাত্র পথ এটাই।

আইনের মৌল লক্ষ্য

স্মরণীয় যে, পারিবারিক আইনের মৌল লক্ষ্য হচ্ছে ন্যায় বিচারের এমন এক ব্যবস্থাপনা কায়েম করা যা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের প্রতিই ইনসাফ করবে এবং বে-ইনসাফীর হাত থেকে তাদেরকে রক্ষা করবে। তালাক এই সামাজিক ইনসাফের বড় একটি দাবীকে পূর্ণ করে দেয়। এটা স্বামী-স্ত্রীর জন্যে এমন একটি সুযোগ সৃষ্টি করে যে, তারা যদি তাদের পারিবারিক জীবন শান্তির সাথে বসবাস করতে ব্যর্থ হয়ে যায় তাহলে তাদের একজন যেন আরেকজন থেকে

বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। এই পর্যায়ে আমাদের ইসলামী আইন শাস্ত্রের এই গুরুত্বপূর্ণ বিধানটিকেও স্মরণ রাখতে হবে যে, "আল্লাহর দৃষ্টিতে সকল বৈধ কাজের মধ্যে তালাকই হচ্ছে সবচেয়ে অপসন্দনীয় জিনিস।"

একটি জরুরী আইন

একাধিক স্ত্রীকে বিবাহ করা সম্পর্কে আমাদেরকে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, এ হলো নিছক একটি জরুরী আইন। এটা কোন মৌলিক আইন নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ج فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً۔

"অতএব নারীদের ভেতর থেকে যাদেরকে তোমরা পসন্দ কর তাদেরকে বিবাহ কর ; দু' দু'জনকে, তিন তিনজনকে এবং চার চারজনকে। যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, তোমরা (তাদের মধ্যে) সুবিচার করতে সক্ষম হবে না তাহলে মাত্র একজন নারীকেই বিবাহ কর।"

-(সূরা আন নিসা ঃ ৩)

উপরোক্ত আয়াতে পরিষ্কারভাবে ইংগিত করা হয়েছে যে, একাধিক বিবাহ করতে হলে স্বামীর জন্যে এরূপ শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, সকল স্ত্রীদের সাথে তার একই রূপ সুবিচারপূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হবে। এই আয়াতে আরো ইংগিত রয়েছে যে, স্বামীর এক বিবাহ করাই সমীচীন। সাধারণ অবস্থার প্রেক্ষিতে ইসলাম একাধিক স্ত্রীর বিপক্ষে স্ত্রীর একজন হওয়াকেই অধিকতর পসন্দ করে। কিন্তু কোন কোন অবস্থায় একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অপরিহার্যতা সুবিচারের পরিবর্তে অবিচারের সামিল হয়ে দাঁড়ায়। সেরূপ অস্বাভাবিক অবস্থার জন্যে ইসলাম একাধিক স্ত্রী গ্রহণের পথকে উন্মুক্ত করে রেখেছে। কেননা যদিও এ অবস্থায় পূর্ণাংগ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর নয় তবুও এরূপ জরুরী অবস্থায় যে সকল অনিষ্ট হতে পারে তা নিশ্চয়ই সেই সকল অনিষ্টের চেয়ে বহুগুণ কম যা একজন স্ত্রী হওয়ার বিষয়টিকে বাধ্যতামূলক করে দেয়ার ক্ষেত্রে সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা বর্তমান।

যুদ্ধের ফলে

উদাহরণ স্বরূপ যুদ্ধের কথাই ধরুন। যুদ্ধে সাধারণত বিরাট অংকের পুরুষ নিহত হয়। ফলে পুরুষ ও নারীদের সংখ্যার ভারসাম্য একেবারেই বিনষ্ট হয়ে যায়। আর এ অবস্থায় একাধিক বিবাহ একটি অপরিহার্য সামাজিক প্রয়োজন হয়ে দেখা দেয়। বস্তুত গোটা সমাজই তখন একাধিক বিবাহের মাধ্যমে যৌন

নৈরাজ্য ও ব্যভিচার থেকে বেঁচে যায়। সাধারণত যুদ্ধের পরপরই এরূপ যৌন ব্যভিচার এক মহামারীর আকার ধারণ করে। কেননা পুরুষের সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণে অসংখ্য নারীর আশ্রয়স্থল বলতে কিছু থাকে না। এরূপ মহিলাদের কোনভাবে রুজির ব্যবস্থাও হয়ে যেতে পারে ; কিন্তু তাদের যৌন স্পৃহা মিটাবার কোন ব্যবস্থা থাকে না। এ পরিস্থিতিতে বেশীর ভাগ যেটা হয়ে থাকে তাহলো এই যে, তারা পুরুষের ঘৃণ্য ও কুৎসিত ব্যভিচারের শিকারে পরিণত হয়। তখন দাম্পত্য জীবনের সুখ শান্তির পথ যেমন রুদ্ধ হয়, তেমনি যে সন্তান-সন্তুতির পরিমণ্ডলে তাদের জীবনে বেহেশতী সুখ নেমে আসে তার আশার প্রদীপও চিরতরে নিভে যায়। আর এ পরিস্থিতিতে তাদের অবশিষ্ট জীবনে দুঃখের পশরা নিয়েই তাদের এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হয়।

ফ্রান্সের শিক্ষামূলক দৃষ্টান্ত

উপরোক্ত জরুরী পরিস্থিতিতে ঐ সকল ছিন্নমূল বিধবা নারীদের জন্যে কী করা উচিত ? এদেরকে কি এমনভাবে ছেড়ে দেয়া সমীচীন যাতে করে তারা সামাজিক নীতি-নৈতিকতার কোন পরোয়া না করে বৈধ-অবৈধ যে কোন পন্থায় যৌন স্পৃহা চরিতার্থ করে বেড়াবে ? ফরাসীরা ঠিক এমনি এক সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল। তখন সামাজিক নিয়ম-নীতি ধূলিসাৎ হয়ে গেল ; ক্রমে ক্রমে তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য ম্লান হয়ে গেল। বস্তুত এরূপ সামাজিক অধপতনের আশংকা থেকে বেঁচে থাকার একমাত্র পথই হলো এই যে, আইনে পুরুষদের জন্যে পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এরূপ অনুমতি থাকতে হবে যে, পুরুষের জন্যে একাধিক বিবাহের ব্যবস্থা থাকবে। তবে তার জন্যে শর্ত থাকবে ঃ স্ত্রীদের মধ্যে সমান ব্যবহার ও ন্যায়বিচার রক্ষা করে চলতে হবে। অবশ্য চরিত্র ও গুণপনার জন্যে কোন স্ত্রীর প্রতি অধিকতর আন্তরিক দুর্বলতা সৃষ্টি হলে সে কথা স্বতন্ত্র। এর উপর কোন শর্তই আরোপ করা যায় না। কেননা এরূপ ক্ষেত্রে সাম্যের চেষ্টা করা বাতুলতা মাত্র।

আরো কিছু জরুরী পরিস্থিতি

অনুরূপভাবে আরো কিছু জরুরী পরিস্থিতিতে পুরুষের জন্য একাধিক বিবাহ করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ঃ কোন কোন পুরুষ অন্যান্য পুরুষদের চেয়ে অধিকতর দৈহিক শক্তির অধিকারী। এরূপ পুরুষদের জন্য একজন স্ত্রী নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কেননা ইচ্ছা করেও সে তার জৈবিক শক্তিকে চেপে রাখতে পারে না। এমন পুরুষদের জন্যে আইনগতভাবেই দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি থাকা বাঞ্ছনীয়। নতুবা বিচিত্র নয় যে, এরা বাধ্য হয়েই ঘরের বাইরে গার্লফ্রেণ্ডদের নিকট গিয়ে যৌন স্পৃহা চরিতার্থ করবে এবং সমাজকে এমন কিছু করাতে বাধ্য করবে যার অনুমতি কোন সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা কোনক্রমেই দিতে পারবে না।

স্ত্রীর সন্তান না হওয়া

এছাড়া আরো কিছু পরিস্থিতি রয়েছে যার সমাধান স্বামীর জন্যে একাধিক বিবাহ ছাড়া অন্য কিছুই হতে পারে না—যেমন স্ত্রীর সন্তান না হওয়া অথবা এমন কোন স্থায়ী ব্যধিতে আক্রান্ত হওয়া যে কারণে স্বামী-স্ত্রীর যৌন মিলনের কোন পন্থাই অবশিষ্ট থাকে না। স্ত্রীর সন্তান না হওয়া এমন কোন অপরাধ নয় যাতে করে তাকে তিরস্কার করা যেতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, স্বামী এ কারণে সন্তান থেকে বঞ্চিত হবে কেন ? সুতরাং এই সমস্যার যুক্তিসংগত সমাধান হলো দ্বিতীয় বিবাহ করা। এ ক্ষেত্রে প্রথমা স্ত্রী ইচ্ছা করলে স্বামী ও তার দ্বিতীয়া স্ত্রীর সাথে বসবাস করতে পারে। নতুবা তালাক নিয়ে পৃথক হয়ে যেতে পারে। আর স্ত্রী স্থায়ীভাবে ব্যধিগ্রস্ত হলে তার সম্পর্কে একথা বলা সংগত হবে না যে, যেহেতু যৌন লালসা একটি নিকৃষ্ট ব্যাপার সেহেতু উহা চরিতার্থ করার সুযোগ না থাকলে একজন নিরপরাধ স্ত্রীর আশা-আকাংখা পদদলিত করে দ্বিতীয় বিবাহ করা কোন মতেই সমীচীন নয়। কেননা এখানে মূল বিবেচ্য বিষয় যৌন স্পৃহা চরিতার্থ করা ভালো, না মন্দ তা নয়। বরং মানুষের বাস্তব প্রয়োজনই হচ্ছে মূল বিষয়। আর বাস্তব প্রয়োজনকে কখনো উপক্ষো করা যায় না। তবে এ ক্ষেত্রে স্বামী যদি নিজ ইচ্ছায় স্ত্রীকে সন্তুষ্ট রাখার উদ্দেশ্যে নিজেকে বঞ্চিত রাখতে প্রস্তুত হয় তাহলে সেটি হবে তার মহত্ব ও উদারতার পরিচায়ক। কিন্তু আল্লাহ কোন মানুষের উপর তার শক্তি ও সামর্থের বাইরে কোন বোঝা অর্পণ করেন না। কেননা সত্যের সম্মুখীন হওয়াই অধিকতর সত্য নিষ্ঠার পরিচায়ক। লোক দেখানো ভদ্রতার চেয়ে ইহা অধিকতর মূল্যবান। এরূপ ভদ্রতার আড়ালে যে কত ধরনের পাপ চলতে থাকে তার সন্ধান পাওয়া যায় ঐ সকল জাতির জীবনে যারা একাধিক বিবাহকে অভদ্রজনোচিত কাজ বলে গর্ব করে বেড়ায়।

এই প্রসংগে সেই সকল পরিস্থিতিকেও স্মরণ রাখতে হবে যে, স্বামী এমনভাবে নিরুপায় হয়ে যায় যে, না সে স্ত্রীকে ভালোবাসতে পারে, না তাকে তালাক দিয়ে স্বাধীন করে দিতে পারে। এই প্রকার সকল পরিস্থিতিতে স্বামীর একাধিক বিবাহই হচ্ছে একমাত্র সমাধান।

সমস্যার বিভিন্ন দিক

স্ত্রীর বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কেও আলোচনা করা প্রয়োজন যাতে করে এ ব্যাপারে কারুর কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকে।

চলাফেরার অধিকার

সর্বপ্রথম চাকুরী করার, শ্রমিক হওয়ার এবং চলাফেরার কথাই ধরা যাক। ইসলাম নারীদেরকে মেহনত, শ্রম এবং চলাফেরার পূর্ণ অধিকার দেয়। ইসলা-

মের প্রথম যুগে যখনই কোন সত্যিকার প্রয়োজন হতো তখন মুসলমান নারীরা ঘরের বাইরে কাজ করতো। এই রূপে ইসলাম নারীদেরকে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানে যেমন মহিলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, নার্সিং এবং মহিলাদের চিকিৎসা কেন্দ্রে কাজ করতে কোন বাধা আরোপ করে না। বরং প্রয়োজন হলে জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্র যেমন পুরুষদের নিকট থেকে নানারূপ সেবা গ্রহণ করে। তেমনি মহিলাদের নিকট থেকেও সেবা গ্রহণ করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে যদি কোন মহিলা একেবারেই আশ্রয়হীন হয় এবং তার সাহায্যের জন্যে কোন পুরুষ না থাকে তাহলে জীবিকা অর্জনের জন্যেও সে গৃহের বাইরে যেতে পারে। তবে একথা নিশ্চয়ই স্মরণ রাখতে হবে যে, ইসলাম নারীকে নিজের গৃহ ছেড়ে বাইরে যাওয়ার অনুমতি কেবল তখনই দিতে পারে যখন বাস্তবিকই কোন প্রয়োজন দেখা দেবে কিংবা এমন কোন বাধ্য-বাধকতা এসে উপস্থিত হবে যে, তাকে বাইরে না গিয়ে কোন উপায়ই নেই।

সচরাচর যখন কোন বিশেষ বাধ্য-বাধ্যকতা দেখা না দেবে তখন ইসলাম ইহা কিছুতেই পসন্দ করে না যে, পাশ্চাত্যের এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর মত মহিলারা খামাখাই গৃহের বাইরে বিচরণ করে বেড়াবে। ইসলামের দৃষ্টিতে ইহা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া অন্য কিছুই নয়। কেননা সামাজিক কর্মতৎপরতায় শরীক হওয়ার উদ্দেশ্যে নারীরা যখন নিজেদের ঘর থেকে বিদায় নেবে তখন তাদের জীবনের মূল তৎপরতা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সে মূল ব্রত একমাত্র গৃহের অভ্যন্তরে থেকেই আঞ্জাম দেয়া সম্ভবপর। এখানেই শেষ নয়, নারীরা যখন বিনা প্রয়োজনে গৃহ পরিত্যাগ করবে তখন সমাজে বহুবিধ মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক এবং নৈতিক বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়বে। তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই।

সর্বাত্মক ক্ষতি

নারী জাতি দৈহিক, মানসিক এবং আত্মিক দিক থেকে জীবনের মূল লক্ষ্য অর্থাৎ মা হওয়ার সর্বাত্মক যোগ্যতা অর্জনে যে পরিপূর্ণরূপেই সফল তাতে কোন সন্দেহ নেই। নারী জাতির জন্যে ইহা এক চরম সত্য। এ সত্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই। সুতরাং যা তাদের জন্যে জরুরী নয় তার প্রতি যদি তারা ঝুঁকে পড়ে সময় ব্যয় করতে শুরু করে এবং নিজেদের মূল কর্তব্য সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়ে তাহলে তার ক্ষতি কেবল পরিবার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং গোটা মানবতাই সে কারণে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এতে করে তারা মা হওয়ার পরিবর্তে পুরুষদের হাতের খেলনা, তাদের আনন্দ-স্ফূর্তির খোরাক এবং আমোদ-প্রমোদ ও ভ্রমণের সংগিতে পরিণত হতে বাধ্য হবে ; তাদের ভোগ-বিলাস এবং কামান্ধতার ভেঁট হয়ে নিজেদের ইজ্জত ও সম্ভ্রম সবকিছু হারিয়ে ফেলবে। ইসলাম নারীত্বের এই অবমাননাকে বিন্দুমাত্রও

বরদাশত করে না। কেননা উহার অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্যই হলো এই যে, গোটা মানবতাকে এমন একটি সুসংবদ্ধ একক বলে বিশ্বাস করে যা কালজয়ী ও অক্ষয়—শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয়।

একটি ভিত্তিহীন চিন্তা

কেউ বলতে পারে যে, শিশুদেরকে আয়ার হাতে সোপর্দ করে কোন নারী যদি ঘরের বাইরে কোন চাকুরী করে তাহলে ক্ষতি কি ? এতে করে একদিকে সে যেমন অর্থ উপার্জন করতে পারবে তেমনি অন্যদিকে মা হিসেবে তার মূল দায়িত্বও পালন করতে পারবে। কিন্তু এই ধারণাটি একেবারেই ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক। কেননা একজন আয়া—সে যতই ভালো হোক এবং শিশুদের দৈহিক, মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিকাশ সাধনের জন্যে যতই চেষ্টা করুক না কেন, একটি ক্ষেত্রে সে পুরোপুরিই ব্যর্থ। সে ক্ষেত্রটি হলো ঃ সে কখনো মা হতে পারে না এবং মায়ের স্থলাভিষিক্তও হতে পারে না। সে শিশুদেরকে কখনো মায়ের সেই অবারিত ও অফুরন্ত স্নেহ-মমতার পিযুষধারা দিতে পারে না, যার অভাবে জীবনের পুষ্পোদ্যান যায় বিরাণ হয়ে—মানবীয় নৈতিকতার পথ যায় চিরতরে রুদ্ধ হয়ে।

যারা পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুসারী কিংবা সমাজতন্ত্রের দিগভ্রান্ত ধ্বজাধারী তাদের অর্থহীন চিৎকারে মানবীয় প্রকৃতিতে কোন পরিবর্তন সাধিত হয় না। এ বাস্তবকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর প্রথম দু' বছরে মায়ের সার্বক্ষণিক ও সর্বাত্মক স্নেহ-যত্ন এবং পরিপূর্ণ মনোনিবেশ ছাড়া কোন শিশুই সুষ্ঠুভাবে লালিত হতে পারে না। এই সময়ে মায়ের পরিবর্তে অন্য কেউই—চাই সে ভাই হোক, বোন হোক বা অন্য কোন আত্মীয় হোক—এমনকি আয়া বা নার্সও শিশুকে মায়ের স্নেহ-যত্ন দিয়ে এ কাজটি করতে সমর্থ হয় না। সাধারণত একজন আয়াকে একই সময়ে দশ দশ কিংবা বিশ বিশটি শিশুর দেখাশুনা করতে হয়। এরূপ ভাড়াটিয়া (বা রাখালিনী সদৃশ) মায়ের আওতায় শিশুরা সর্বদাই দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত থাকে। কখনো একটি শিশুর খেলনা আরেকটি শিশু জোর করে বা না বলে নিয়ে যায়। কখনো বা চিমটি দেয় ইত্যাদি সারাক্ষণই চলতে থাকে। ফলে ধীরে ধীরে এই ঝগড়া-বিবাদ তাদের দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হয়ে যায়। এরপর তারা যতই বড় হতে থাকে ততই স্নেহ-মমতা প্রীতি-ভালোবাসা ও ভক্তি-শ্রদ্ধার সাথে অপরিচিত এবং যাবতীয় সুকুমার বৃত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে মানুষ নামক এক জন্তুতে পরিণত হয়।

মুসলমান স্বামী, বাপ ও ভাইদের নিকট একটি প্রশ্ন

যদি সত্যিকার কোন অপরিহার্য প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে এরূপ কোন আয়ার তত্ত্বাবধানে শিশুদেরকে রাখা যেতে পারে। কিন্তু এরূপ কোন প্রয়োজন

দেখা না দিলে এটা করা কোন বিজ্ঞজনোচিত কাজ নয়। হতে পারে পাশ্চাত্য জগতের লোকেরা নিজেদের ঐতিহাসিক, ভৌগলিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার দুর্বিপাকে নিজেদেরকে অনেকটা নিরুপায় বলে মনে করে। কিন্তু প্রাচ্যের মুসলমানদের জন্যে নিজেদেরকে নিরুপায় মনে করার কোন বৈধ কারণ নেই। আমাদের পুরুষদের সংখ্যা কি সত্যিই এতদূর হ্রাস পেয়েছে যে, গৃহের বাইরের যাবতীয় কাজ-কর্ম চালাবার জন্যেও আমাদের নারীদের সাহায্য নেয়ার প্রয়োজন ?—না মুসলমান পুরুষ, স্বামী, বাপ, ভাই ও অন্যান্য পুরুষ আত্মীয়-স্বজনদের অন্তর থেকে সমস্ত সম্ভ্রমবোধ ও 'গায়রাত' ধুয়ে মুছে শেষ হয়ে গেছে এবং নিজেদের স্ত্রী, কন্যা ও ভগ্নিরা তাদের বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে ? আর এ কারণে এই নিরুপায় ও অসহায় নারীরা নিজেদের বোঝা নিজেরা বহন করার আশায় অফিস-আদালত, কল-কারখানা বা খেত-খামারে গিয়ে গিয়ে চাকুরী করতে বাধ্য হচ্ছে ?

ইসলামী দুনিয়ার দারিদ্র

এ-ও বলা হয় যে, চাকুরীর মাধ্যমে নারীরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। এবং এতে করে তার মূল্য ও সম্ভ্রম বেড়ে যায়। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, ইসলাম নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে কখন অস্বীকার করেছে ? বাস্তব ঘটনা হলো এই যে, ইসলামী দুনিয়ার এখন যে নানাবিধ সমস্যা বর্তমান তা আমাদের জীবনব্যবস্থার কোন ত্রুটির অপরিহার্য ফলশ্রুতি নয় ; বরং এ হচ্ছে সেই ব্যাপক ও সর্বাত্মক দারিদ্রতার ফসল যার কারণে কি পুরুষ, কি নারী সবাইকেই নির্দোষ ও পবিত্র জীবনযাপনের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। এর একমাত্র সমাধান হিসেবে আমাদেরকে উৎপাদন বাড়াতে হবে—যাতে করে গোটাজাতিই সচ্ছল ও দারিদ্র মুক্ত হতে পারে। উৎপাদনের উপায়-উপাদানের মালিকানা নিয়ে নারী ও পুরুষের মধ্যে বর্তমানে যে প্রতিযোগিতা চলছে তা এই সমস্যার আদৌ কোন সমাধান নয়।

চাকুরীর আরেকটি ক্ষতি

নারীদের চাকুরীর পক্ষে আরো একটি দলীল এরূপ পেশ করা হয় যে, একজন নারী চাকুরী করে গোটা পরিবারের আয় বৃদ্ধি করতে পারে। কেননা একথা স্পষ্ট যে, দু'জনের উপার্জন একজনের উপার্জনের চেয়ে অবশ্যই বেশী। কোন কোন সংসারের জন্যে ইহা সঠিক হতে পারে। কিন্তু সমাজের সমস্ত মহিলাই যদি চাকুরী গ্রহণ করে তাহলে গোটা পরিবার ব্যবস্থাই যে ধ্বংসগ্রস্ত হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা এতে করে স্বামী-স্ত্রী অধিক সময় ধরে একে অন্যের নিকট থেকে দূরে থাকার কারণে সমগ্র সমাজ জীবনেই নৈতিক অনাচার ছড়িয়ে পড়বে। অর্থনৈতিক, সামাজিক বা নৈতিক এমন কোন

বাধ্যবাধকতা সত্যিই আছে কি যে কারণে একজন নারীর ঘর ছেড়ে বাইরে গিয়ে নিজের সতীত্বের ন্যায় অমূল্য সম্পদকে বিকিয়ে দিবে ?

এ-ই উচ্চ সম্মান

ইসলাম নারীর প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক দায়িত্ব হিসেবে পূর্ণ একাগ্রচিত্ততা ও নিশ্চিন্ততা সহকারে ভবিষ্যত প্রজন্মের বৃদ্ধি ও লালন-পালনের নির্দেশ প্রদান করেছে। তার সামনে মানবীয় প্রকৃতি ও সমাজ উভয়ের চাহিদাই বর্তমান ছিল। এ কারণেই ইসলাম নারীর অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালনের সমস্ত বোঝা পুরুষের উপর অর্পণ করেছে যাতে করে নারী সকল প্রকার অপ্রয়োজনীয় চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত থাকতে পারে। কিন্তু সাথে সাথেই উহা নারীর সামাজিক মর্যাদা এতদূর উন্নীত করে দেয়া হয়েছে যে, যখন এক ব্যক্তি বিশ্বনবী (সা)-এর নিকট প্রশ্ন করলেন ঃ "আমার নিকট সদ্ব্যবহার লাভের অধিকার সবচেয়ে কার বেশী ? হযরত নবী (সা) উত্তরে বললেন ঃ তোমার মা। সে আবার প্রশ্ন করলো ঃ তারপর কে ? হযরত বললেন ঃ তারপর তোমার মা। ঐ ব্যক্তি পুনরায় প্রশ্ন করলো ঃ তারপর কোন্ ব্যক্তি ? হযরত তখন বললেন ঃ তোমার পিতা।"-(বুখারী ও মুসলিম)

ইসলাম এবং আধুনিক নারী স্বাধীনতা আন্দোলন

ইসলাম নারী জাতিকে যে অধিকার ও মর্যাদা দান করেছে তা দেখে এটা বুঝাই মুস্কিল যে এর পরেও আধুনিক মুসলমান নারীদের অধিকার আদায়ের নামে এত হৈচৈ ও হুর-হাঙ্গামার উদ্দেশ্য কি ? এমন কোন অধিকার অবশিষ্ট আছে কি যা ইসলাম নারীকে প্রদান করেনি যার জন্যে তাদের আন্দোলন করতে হবে,-ভোটাধিকার আদায় এবং পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্ব লাভের ক্ষমতাও অর্জন করতে হবে ? আসুন, তাদের দাবী সম্পর্কেও আলোচনা করা যাক।

মানবীয় সাম্য

আজকের মুসলমান নারীদের একটি দাবী হলো ঃ তাদের একই রূপ সমান মানবীয় মর্যাদা প্রদান করতে হবে। কিন্তু হয়ত তারা জানেই না যে, ইসলাম তাদেরকে এই অধিকার বহুকাল পূর্বেই প্রদান করেছে। শুধু নীতিগতভাবেই নয়,—বাস্তব দিক থেকেও এবং আইনের দিক থেকেও।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতার দাবী

তারা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা চায় এবং সমাজ জীবনে সরাসরি অংশগ্রহণের দাবীদার। অথচ ইসলামই হচ্ছে দুনিয়ার সর্বপ্রথম ধর্ম যা তাদেরকে এই অধিকার বহুকাল পূর্বেই প্রদান করেছে।

শিক্ষালাভের অধিকার

তারা শিক্ষালাভের অধিকার চায়। অথচ ইসলাম তাদেরকে শুধু শিক্ষা হাসিলের অধিকারই দেয়নি, বরং উহাকে তাদের জন্যে অবশ্য কর্তব্য—ফরয বলে গণ্য করেছে।

নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী বিবাহের অধিকার

তারা কি এরূপ অধিকার চায় যে, তাদের অনুমতি ও মর্জি ব্যতিরেকে তাদের বিবাহ হতে পারবে না ? ইসলাম তাদেরকে এই অধিকার প্রদান করেই ক্ষ্যান্ত থাকেনি বরং এরূপ অধিকার প্রদান করেছে যে, তাদের বিবাহের বিষয়টি নিজেরাই চূড়ান্ত করতে পারবে।

ইনসাফ, সম্প্রীতি ও আইনগত সংরক্ষণ

তারা কি চায় যে, গৃহে থেকে যখন তারা তাদের দায়িত্ব পালন করতে থাকবে তখন তাদের সাথে সদয় ও সুবিচারভিত্তিক সদ্ব্যবহার করতে হবে ? স্বামীরা যখন তাদের সাথে দুর্ব্যবহার বা বে-ইনসাফী করবে তখন কি তারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার চায় ? ইসলাম তাদেরকে এই অধিকারসমূহ পুরোপুরি প্রদান করেই ক্ষ্যান্ত হয়নি, বরং পুরুষদের উপর তাদের এই অধিকারসমূহের সংরক্ষণের দায়িত্বও অর্পণ করেছে।

চাকুরীর অধিকার

এছাড়া তারা কি চায় যে, গৃহের বাইরে গিয়েও তারা কাজ-কর্ম ও চাকুরী করবে ? ইসলাম সত্যিকার প্রয়োজনে নারীদেরকে এই অধিকার সহস্রাধিক বছর পূর্বেই প্রদান করে রেখেছে।

একটি ব্যতিক্রম

কিন্তু তারা যদি এই অধিকার চায় যে, সকল নীতি-নৈতিকতাকে বৃদ্ধাংগুষ্ঠি দেখিয়ে যথেচ্ছ চলাফেরা ও অবাধ বিচরণের সুযোগ দিতে হবে এবং তাদের মানবতা বিধ্বংসী কর্মতৎপরতাকে কেউ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না তাহলে ইস-লাম কখনো তাদেরকে এই স্বাধীনতা দান করতে পারে না। কেননা ইসলাম এই ধরনের কাজকে মানবীয় ইজ্জত ও সম্ভ্রমের ঘোর বিরোধী বলে গণ্য করে। উহা কখনো এটা বরদাশত করে না যে, কোন নারী অথবা পুরুষ এই ধরনের কাজে লিপ্ত হয়ে মানবতাকে বিপন্ন করে তুলুক। কিন্তু আজকালকার নারীরা যদি এই ধরনের কিছু চায় তাহলে তাদের পার্লামেন্টের প্রতিনিধিদের আশ্রয় নেয়ার কোন প্রয়োজন নেই ; বরং তাদের জন্য সেইদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করাই উত্তম যেদিন যাবতীয় সামাজিক বন্ধন ও ঐতিহ্য একেবারেই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বে। এরপর তাদের স্বপ্নসাধ এমনিই পূর্ণ হবে এবং কোন রূপ বাধা-বন্ধন ব্যতিরেকেই লীলা-খেলায় মগ্ন হতে পারবে।

কিছু সংখ্যক লোক এমন রয়েছে যারা একথা স্বীকার করে যে, প্রাচ্যের দেশগুলোর অবস্থা ও মূল্যবোধ এবং পাশ্চাত্যের অবস্থা ও মূল্যবোধের মধ্যে আসমান-জমিন ব্যবধান। তবুও তারা বলতে দ্বিধা করে না যে, প্রাচ্যের নারীদের সামাজিক মর্যাদা এতদূর নিম্নে যে, মানুষ তার বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হয়। অন্য দিকে পাশ্চাত্যের নারীরা একদিকে যেমন স্বাধীনতা লাভ করেছে, তেমনি অন্য দিকে যথাযোগ্য সামাজিক মর্যাদাও হাসিল করেছে। সুতরাং প্রাচ্যের নারীরা যদি পাশ্চাত্যের নারীদের অনুসরণ করে তাদের কেড়ে নেয়া অধিকারসমূহ যদি পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয় তাহলে তাতে দোষের কি কারণ থাকতে পারে ?

মুসলমান নারীদের বর্তমান অবস্থা

আমরা স্বীকার করি যে, বর্তমানে মুসলমান দেশগুলোতে নারীরা বহুদিক থেকেই অনুন্নত। সামাজিক মর্যাদা বা সম্ভ্রম বলতে তাদের কিছুই নেই—তারা কেবল পশুর মতই দিন যাপন করছে। সব কথাই ঠিক। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এই অবস্থার জন্যে দায়ী কে ? কোন না কোন দিক থেকে ইসলাম বা ইসলামী শিক্ষাই কি এ জন্যে দায়ী ?

প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে এই যে, আজকাল প্রাচ্যের নারীরা যে করুন অবস্থার শিকার তা হচ্ছে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং মনস্তাত্বিক অবস্থার অনিবার্য ফলশ্রুতি। যদি সত্যিই আমরা সামাজিক জীবনের সুষ্ঠু সংশোধন কামনা করি তাহলে আমাদেরকে উপরোক্ত অবস্থাগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে যাতে করে অধপতনের মূল উৎসও আমরা অবগত হতে পারি।

অধপতনের মূল

প্রাচ্যের নারীদের অধপতনের মূল কারণ হচ্ছে তাদের দারিদ্রতা। বিগত কয়েক পুরুষ থেকেই গোটা প্রাচ্য জগত এই অভিশাপে জর্জরিত। এছাড়া সেই সামাজিক বে-ইনসাফীও এ জন্যে দায়ী যে কারণে সমাজের মুষ্টিমেয় লোক তো সীমাহীন আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসে লিপ্ত এবং অবশিষ্ট লাখো-কোটি বনি আদম তথা সাধারণ মানুষ না সংগ্রহ করতে পারছে তাদের পরনের কাপড়, না জোটাতে পারছে ক্ষুধার জ্বালা নিবারণের জন্যে দু' মুঠো অন্ন। এর মূলে রয়েছে রাষ্ট্রীয় কুশাসন এবং স্বৈরাচারী নির্যাতন। আর এ কারণেই মানুষকে শাসক ও শাসিত—এই দু'টি পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত করে দেয়া হয়েছে। শাসক শ্রেণীর লোকেরা যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা নিজেদের জন্যে নির্দিষ্ট করে নিচ্ছে এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যের বোঝা জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। অধিকারও পাওনা যেটুকু—তার সবটুকুই যেন তাদের ; জনসাধারণকে কোন অধিকার দিতে নারাজ। বর্তমানে প্রাচ্যের সমাজ জীবনের ওপর স্বৈরশাসনের

যে কালো মেঘ ছায়া বিস্তার করেছে তা এই সামাজিক দূরবস্থারই অনিবার্য ফসল। এই সামাজিক অবস্থাই প্রাচ্যের নারীদের বর্তমান শোচনীয় অবস্থা ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনার মূল কারণ।

দারিদ্র ক্লিষ্ট পরিবেশ

আজকের নারীরা পুরুষদের সাথে পারস্পরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়। কিন্তু প্রাচ্যের বর্তমান চরম দারিদ্র ক্লিষ্ট পরিবেশে এরূপ সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব কি ? কেননা এই পরিবেশ পরিস্থিতির নির্মম শিকার শুধু নারীরাই নয়, পুরুষরাও—এর নিষ্ঠুর কষাঘাতে সকলেই জর্জরিত।

সামাজিক নির্যাতনের প্রতিক্রিয়া

পুরুষরা ঘরে নারীদের সাথে যে দুর্ব্যবহার করে—যে অকথ্য জুলুম ও নির্যাতন চালায় তার মূলে রয়েছে তাদের নিজেদের নির্যাতিত হওয়ার প্রতিক্রিয়া। যে পরিবেশ ও পরিমণ্ডলে কাজ করে বা চলাফেরা করে সেখানকার সবাই তাদের উপর কমবেশী নির্যাতন চালায়। সমাজের সবখানেই তাদের লাঞ্ছনা-গঞ্জনার শিকার হতে হয়, কখনো কখনো মোড়ল-মাতুব্বরদের হাতে তাদের অপমাণিত হতে হয়, কখনো কখনো পুলিশ বা কারখানার মালিকরা তাদের আত্মসম্মানে আঘাত দেয়, কখনো আবার রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দের কোপানলে পড়ে তাদের ইজ্জত ও সম্ভ্রম হারাতে হয়। মোটকথা প্রতিটি স্থানে ও প্রতিটি মুহূর্তেই তাদের নানাবিধ অবমাননা ও তিরষ্কারে জর্জরিত হতে হয় ; অথচ কারুর বিরুদ্ধেই তার অভিযোগের বা প্রতিশোধ নেয়ার কোন ক্ষমতা নেই। তাই ঘরে এসেই তার সব রাগ ও আক্রোশ নিজের স্ত্রী, সন্তান বা অন্যান্য ঘনিষ্ঠজনদের উপর ঝাড়তে শুরু করে।

দারিদ্র্যের এই অভিশাপের ফলেই একজন পুরুষ এমন নির্জীব ও হৃদয়হীন হয়ে পড়ে যে, পরিবারের ঘনিষ্ঠ ও আপনজনদের সাথে স্নেহ-ভালোবাসা, সহমর্মিতা বা সহিষ্ণুতাপূর্ণ ব্যবহার করার উপযুক্ততাই হারিয়ে ফেলে। আর এ কারণেই একজন নারী তার স্বামীর পক্ষ থেকে সকল প্রকার জুলুম, নির্যাতন ও দুর্ব্যবহার মুখ বুজে বরদাশত করছে। কেননা সে জানে যে, স্বামী যদি তাকে ঘর থেকে বের করে দেয় তাহলে তাকে অনাহারেই মরতে হবে। এমনকি সে এই ভয়ে নিজের বৈধ অধিকার আদায়ের জন্যেও এতটুকু সাহস করে না। পরিশেষে স্বামী যখন তাকে তালাক দিয়ে দেয় তখন সে একেবারেই নিরুপায় হয়ে পড়ে। তার পিতা-মাতাও এতদূর দরিদ্র যে, তারা তার বোঝা বহন করতে পারে না। স্ত্রী যদি স্বামীগৃহ ত্যাগ করে পিতা-মাতার গৃহে গমন করে তাহলে তারাও তাকে এরূপ উপদেশ দেয় যে, সে তার স্বামীর ঘরে ফিরে যাক এবং যে কোনভাবেই হোক স্বামীর নির্যাতন-নিপীড়ন সহ্য করে চলতে থাকুক।

মোটকথা গোটা প্রাচ্যের নারীদের এই লাঞ্ছনা-অবমাননার মূলে রয়েছে তাদের অভাবনীয় দারিদ্র।

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের অনুপস্থিতি

দারিদ্রের এই নির্মম কষাঘাতের ফলে গোটা প্রাচ্যে আজ জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বলতে যেমন কিছুই নেই, ঠিক তেমনি আত্মপরিচয় লাভের কোন নিদর্শনও খুঁজে পাওয়া যায় না। গোটা এলাকাই মূর্খতার গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। সুউচ্চ মানবীয় মূল্যবোধের ধারণা থেকেও সবাই বঞ্চিত। তবে সব হারিয়েও তারা একটি মাত্র মূল্যবোধকে সমর্থন করে চলেছে যে, শক্তি ও উহার প্রদর্শনীর পূজা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই ; যারা দুর্বল তাদেরকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করাই হবে বুদ্ধিমত্তার কাজ। মোটকথা কারুর দুর্বল হওয়া তার দৃষ্টিতে তাকে হেয় ও অপমানিত করার জন্যে যথেষ্ট।

শক্তির পূজা

শক্তির এই পূজার কারণে পুরুষ একজন নারীকে অত্যন্ত তুচ্ছ করে। দৈহিক শক্তির দিক থেকে দুর্বল নারীকে সম্মান দেয়ার জন্যে যে নৈতিক উৎকর্ষতা ও মহত্বের প্রয়োজন পুরুষ তা থেকে সম্পূর্ণরূপেই বঞ্চিত। এ কারণেই আজকের পুরুষের অন্তরে নারীর মানবতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বলতে কিছুই নেই। এবং নেই বলেই সে নারীকে সম্মান ও মূল্য দিতে পারছে না। অথচ মানুষকে স্বাভাবিক মর্যাদা দেয়াই হচ্ছে মানুষের কাজ। কিন্তু নারী যদি ধন-ঐশ্বর্যের মালিক হয় তাহলে প্রাচ্যের বর্তমান জড়বাদী পরিবেশে সে অতি সহজেই সম্মান ও পদমর্যাদা লাভ করতে সক্ষম।

অধপতিত সমাজ

এরূপ অধপতিত ও অনুন্নত সমাজে—যার একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে আমাদের প্রাচ্যের সমাজ—মানুষ এত দূর নিম্নস্তরে নেমে যায় যে, পুরোপুরি পশুর স্তর কিংবা তার একেবারে নিকটবর্তী পর্যায়ে পৌছে যায়। এমন সমাজে মানবতার কোন রাজত্ব চলে না। রাজত্ব চলে কেবল যৌন স্পৃহার। জীবন সম্পর্কে তাদের যাবতীয় চিন্তা ও কর্মে এই যৌন ভাবধারারই প্রতিফলন ঘটে। এর রং ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। বস্তুত এই ধরনের সমাজ ব্যবস্থায় নারী হয় শুধু পুরুষের ভোগের সামগ্রী, সে হয় তার কামরিপু চরিতার্থ করার একমাত্র হাতিয়ার। মানুষ হিসেবে সে কোন সম্মান বা মূল্য লাভ করতে পারে না। কেননা মনস্তাত্বিক, মানসিক ও আত্মিক দিক থেকে তাকে পুরুষের চাইতে এতদূর নিম্নস্তরের মনে করা হয় যে, না তাকে কোন সম্মানের হকদার বলে গণ্য করা হয়। আর না সে জন্যে কোন দাবী উত্থাপন করা যেতে পারে। এর অনিবার্য ফল হয় এই যে, নারী ও পুরুষের দৈহিক সম্পর্ক নিছক পশুসুলভ সম্পর্কেই পরিণত হয়। আর

এতে করে পুরুষের নিকট কেবল বস্তুগত লাভ কখনো প্রাধান্য লাভ করে না। সুতরাং স্বার্থসিদ্ধির পরে সে বস্তু নিয়ে আর মাথা ঘামায় না।

মূর্খতা ও ক্ষুধা

একটি অধপতিত সমাজে মূর্খতা ও ক্ষুধা সর্বদাই লেগে থাকে। সুতরাং তাদের কাছে না এত পরিমাণ সময় আছে, না এতদূর শক্তি আছে যে, তারা নৈতিকতা ও নিয়ম-শৃংখলার দিক থেকে উন্নতি লাভ করতে পারে। অথচ এই সকল গুণ ব্যতিরেকে কোন সমাজই উন্নতমানের সমাজ হওয়ার গৌরব অর্জন করতে পারে না এবং পশু স্তর থেকে উত্তীর্ণও হতে পারে না। সমাজে এই প্রকার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শৃংখলার অভাব কিংবা উহার কোন বিকৃত রূপের উপস্থিতির ফলে দেখা যায় যে, মানব জীবন নিছক অর্থনৈতিক জীবনে পরিণত হয়। শক্তি ও ক্ষমতার পূজা একান্ত হয়ে উঠে এবং জীবনকে শুধু পাশবিক ও জৈবিক লালসা বা ভোগ স্পৃহা দিয়েই পরিমাপ করা হয়।

মায়ের ভুল পথ অবলম্বন

এরূপ অনুন্নত সমাজে মা হিসেবে নারীরা এক ভুল পথ অবলম্বন করে বসেও এবং নিজেদের অজ্ঞাতসারেই নারী জাতি সম্বন্ধে পুরুষদের দৃষ্টিতে যাবতীয় অনিষ্টের কারণ বলে পরিগণিত হয়। তারা নিজেদের ছোট্ট একটি শিশুকেও এমন এক শাসনকর্তা বানিয়ে দেয় যে, সে তাদেরকে হুকুম করতে এবং আনুগত্য করাতে অভ্যস্ত হয়। তাদের স্নেহ ও বাৎসল্য এতদূর অন্ধ হয়ে উঠে যে, তারা তার অযথা দাবী ও অন্যায় আকাংখার বিরুদ্ধেও কোন টু শব্দটি করতে অগ্রসর হয় না ; বরং তার প্রতিটি বাজে ও অযৌক্তিক দাবী পূরণ করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এরূপ লাগামহীন স্নেহের অনিবার্য ফল হয় এই যে, এই শিশু যখন যুবক হয়ে যায় তখন সে প্রবৃত্তির গোলাম হয়ে বসে এবং কামনা করে যে, অন্য লোকেরা মুখ বুজে তার প্রত্যেকটি হুকুমই তামিল করতে থাকবে। কিন্তু বাস্তব জীবনে যখনই প্রতিবাদের সম্মুখীন হয় তখন সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে এবং সমস্ত ক্ষিপ্ততার প্রতিশোধ সে তার ঘনিষ্ট লোকজন—পুরুষ, নারী ও শিশুদের থেকে নিতে বাধ্য হয়। গোটা মুসলিম জাহান আজ যে উদ্বেগ ও অস্থিরতার করুণ শিকার তার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ সম্পর্কে এতক্ষণ আলোচনা করা গেল। প্রাচ্যের নারীদের বর্তমান দুঃখ-দুর্দশা ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনার মূল কারণও এর মধ্যে নিহিত। কিন্তু একথা স্পষ্ট যে, এই কারণসমূহ ইসলাম কখনো সৃষ্টি করেনি এবং নির্ভুল ইসলামী ভাবধারার সাথে এর কোন সামঞ্জস্যও নেই।

ইসলাম এবং প্রাচ্যের বর্তমান দারিদ্রতা

গোটা প্রাচ্যে আজ যে নিঃস্বতা ও দারিদ্র বর্তমান উহার মূল কারণ কি ইসলাম ?—নিশ্চয়ই নয়। কেননা ইসলাম তো উহার আদর্শ যুগে—হযরত

উমর ইবনে আবদুল আজীজের যুগে—সমাজ ও রাষ্ট্রকে এতদূর উন্নত করে তুলেছিল যে, ঘরে ঘরে গিয়ে অভাবী ও নিঃস্ব লোকের সন্ধান করা হতো কিন্তু দান বা অর্থ সাহায্য গ্রহণ করার মত কাউকে খুঁজে পাওয়া যেত না। ইসলাম জীবনের একটি বাস্তব বা আমলী (Practical) জীবনব্যবস্থা। উহা বাস্তব জগতেই এরূপ শক্তিশালী অর্থব্যবস্থার অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করেছে। এই ইসলামকেই—এই জীবনব্যবস্থাকেই আমরা দুনিয়ায় পুনপ্রতিষ্ঠিত করতে চাই ? একটি জীবনব্যবস্থা হিসেবেই ইসলামের কামনা হলো ঃ জাতির সমস্ত ধন-দৌলত সকল নাগরিকদের মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে বন্টন করা হোক। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كَىْ لَايَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ط

"যাতে করে সম্পদ কেবল তোমাদের ধনীদের মধ্যে আবর্তিত না হতে থাকে।"–(সূরা আল হাশর ঃ ৭)

ইসলাম দরিদ্রতাকে উত্তম বলেও মনে করে না এবং পসন্দনীয় জিনিস বলেও গণ্য করে না। ইসলাম চায় ঃ দুনিয়ার বুক থেকে উহার অস্তিত্বই মুছে যাক। ইসলাম অনুরূপভাবে কাউকে আড়ম্বরতা, ভোগ-বিলাস বা মাতলামি করার অনুমতি দিতেও নারাজ। আধুনিক প্রাচ্যের নারীদের দুঃখ-দুর্দশার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে দরিদ্রতা। এর পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারলেই তাদের বেশীর ভাগ সমস্যার সমাধান আপনা আপনিই হয়ে যেতে পারে। সাথে সাথে তাদের হারানো সম্ভ্রম ও মর্যাদাও ফিরে আসবে। এবং এ উদ্দেশ্যে তাদেরকে গৃহের বাইরে গিয়ে চাকুরী অনুসন্ধান করার কোন প্রয়োজনীয়তাও দেখা দেবে না। (যদিও চাকুরীর অধিকার তাদের তখনও বহাল থাকবে।) কেননা এ অবস্থায় তারা জাতীয় সচ্ছলতা এবং সম্পদে উত্তরাধিকারের মাধ্যমে নিজেদের বৈধ অংশ লাভ করতে সমর্থ হবে। তারা নিজেদের আরাম-আয়েশের জন্যে নিজেদের সম্পদ ব্যয় করতে পারবে। এরূপে নারীরা যখন বস্তুগত দিক থেকে সচ্ছল হয়ে উঠবে তখন পুরুষরাও তাদেরকে সম্মান দিতে শুরু করবে এবং তারা দরিদ্রতার ভয়-ভীতি থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ণ সৎসাহসের সাথে নিজেদের যাবতীয় বৈধ অধিকার ভোগ করতে সক্ষম হবে।

রাজনৈতিক জুলুম ও ইসলাম

বলুন তো, আধুনিক প্রাচ্যে আজকাল যে রাজনৈতিক জুলুম দৃষ্টিগোচর হয় এবং যার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ পুরুষ গৃহে এসে স্ত্রী ও সন্তানদের উপর রাগ ঝাড়তে শুরু করে—এটা কি ইসলামের সৃষ্টি ?

ইসলামকে এই রাজনৈতিক জুলুমের জন্যে বিন্দুমাত্রও দায়ী করা যায় না। কেননা উহা মানুষকে জুলুম ও বে-ইনসাফীর সামনে মাথা নত করতে শিক্ষা

দেয় না। বরং অবিচলভাবে উহার মোকাবিলা করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করে। উহা শাসক ও শাসিতের পারস্পরিক সম্পর্ককে এমন ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে নির্ধারিত করে যে, একবার ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা) লোকদেরকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ "শোন এবং আনুগত্য কর।" তখন সংগে সংগেই এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে উত্তর দিল ঃ "আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার কথা শুনবো না এবং আনুগত্য করবো না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি এর কৈফিয়ত না দেবেন যে, আপনি যে চাদর পরিধান করেছেন তা আপনি কোথায় পেয়েছেন ? এই জবাব শুনে হযরত উমর (রা) প্রথমেই রাগে লাল হননি ; বরং তিনি লোকটির সৎসাহসের প্রশংসা করলেন এবং সকলের সামনে চাদরের ঘটনাটি খুলে বললেন। তখন ঐ ব্যক্তি পুনরায় দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো ঃ এখন আপনি বলতে থাকুন, আমরা আপনার আনুগত্যের জন্যে হাজির আছি। আজ আমরা এরূপ রাষ্ট্রব্যবস্থা পুনপ্রতিষ্ঠা করার জন্যে চেষ্টা করছি—যাতে করে কোন শাসক যেন জনগণকে তার স্বৈরাচারের লক্ষ্যে পরিণত করতে না পারে এবং জনগণের মধ্যে এমন সৎসাহস বর্তমান থাকে যে, সম্পূর্ণ নির্ভিকভাবেই তারা শাসকদের সামনেই ইচ্ছা অনুযায়ী কথা বলতে পারে এবং নিজ নিজ গৃহে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের সাথে স্নেহ-মমতা, প্রেম-প্রীতি এবং ভালোবাসা প্রদর্শন করে শান্তি ও সমৃদ্ধির সাথে জীবনযাপন করতে পারে।

উন্নত মানবীয় মূল্যবোধ ও ইনসাফ

উন্নত মানবীয় মূল্যবোধের অধপতনের জন্যেও কি ইসলাম দায়ী ? কিছুতেই নয়। উন্নত মানবীয় মূল্যবোধের পতনের জন্যে ইসলামকে কিছুতেই দায়ী করা যায় না। কেননা উহা তো মানুষকে সুউচ্চ আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের সাথে পরিচিত করিয়ে তাকে উত্তম মানুষ রূপে গড়ে তোলে। উহাইতো মানুষকে সর্বপ্রথম এই শিক্ষা দিয়েছে যে, সম্পদ বা শক্তি ইজ্জত বা শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নয়, বরং উহার আসল মাপকাঠি হচ্ছে তাকওয়া এবং সৎকাজ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰكُمْ ط

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সে-ই সবচেয়ে সম্মানীয় যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মুত্তাকী।"–(সূরা আল হুজুরাত ঃ ১৩)

ইসলাম প্রদত্ত এই সুউচ্চ মূল্যবোধ একবার যখন সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তখন নারীকে আর এ জন্যে অবজ্ঞার পাত্রী বলে গণ্য করা হবে না যে, সে দৈহিক দিক থেকে অনেক দুর্বল। বরং ইসলামী সমাজে স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার করাকেই মানুষের আভিজাত্য ও মনুষ্যত্বের মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করা হয়। যেমন হযরত বিশ্বনবী (সা) এরশাদ করেন ঃ

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهٖ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِىْ -

"তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই সর্বোত্তম যার ব্যবহার হবে গৃহের লোকজনদের সাথে সবচেয়ে সুন্দর। এবং নিজ গৃহের লোকদের সাথে ব্যবহারের দিক থেকে আমিই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম।"

এই হাদীস দ্বারা শুধু মানুষের সেই গভীর চেতনা ও উপলব্ধির কথাই অবগত হওয়া যায় না, বরং এই সত্যও আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, কোন স্বামী তার স্ত্রীর সাথে কেবল তখনই দুর্ব্যবহার করতে পারে যখন সে নিজে কোন মনস্তাত্ত্বিক বা মানসিক পীড়ায় আক্রান্ত হবে কিংবা মানবতার স্তর থেকে নীচে নেমে যাবে।

মানুষের বর্তমান অধপতন এবং তাদের জীবনে যে পশুত্বের দাপট গোচরীভূত হয় তার জন্যেও কি ইসলাম দায়ী ?—নিশ্চয়ই নয়। কেননা ইসলামতো এটা কখনো বরদাশত করে না যে, মানুষ এত নিম্নস্তরে গিয়ে পশুর মত জীবনযাপন করতে থাকবে। বরং ইসলাম মানুষকে আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে এতদূর উন্নত করে তুলতে চায় যে, সে যেন আর প্রবৃত্তির গোলাম হতে না পারে এবং পশুসুলভ দৃষ্টিভংগি থেকে সে যেন আত্মরক্ষা করে চলতে পারে। ইসলামের দৃষ্টিতে পুরুষ ও নারীর যৌন সম্পর্ক কোন পশুসুলভ সম্পর্ক নয়। বরং এটা তাদের স্বাভাবিক প্রয়োজনের অভিব্যক্তি মাত্র। এ কারণেই উহা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে বৈধতার সনদ প্রদান করে, যাতে করে তারা যৌন ব্যভিচার ও যথেচ্ছ লীলা-খেলায় মত্ত না হয়ে জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে তাদের গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে পরিপূর্ণ মনোযোগ দিয়ে অগ্রসর হতে পারে। কেননা উহা ভালো রূপেই জানে যে, যৌন স্পৃহা চরিতার্থ করার এই বৈধ দরজাও যদি বন্ধ করে দেয়া হয় তাহলে নারী-পুরুষ উভয়ের পদস্খলনই অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে। এ জন্যেই ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর যৌন সম্পর্ককে খারাপ মনে করে না, কিন্তু এতে সীমাতিরিক্ত বাড়াবাড়িকেও পসন্দ করে না। কেননা উহা চায় যে, মানুষ তার সকল শক্তিসামর্থ জীবনের মহান উদ্দেশ্যসমূহ হাসিল করার জন্যেই ব্যয় করুক ; পুরুষরা আল্লাহর পথে তার দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে সর্বদা জিহাদে[১] ব্যস্ত থাকুক এবং নারীরা গৃহে থেকে সন্তানদের লালন-পালন এবং সাংসারিক কাজ-কর্মের তত্ত্বাবধান করুক। ইসলাম এরূপ পুরুষ এবং নারী উভয়কেই জীবনের সর্বোচ্চ ও পবিত্রতম লক্ষ্য নির্ধারিত করে দিয়েছে এবং তাদেরকে প্রকৃত মানবীয় মর্যাদা নিয়েই বাঁচতে শিখিয়েছে।

১. হক প্রতিষ্ঠার জন্যে বাতিলের বিরুদ্ধে যে চূড়ান্ত পর্যায়ের সংগ্রাম করা হয় তাকেই বলা হয় জিহাদ।–(অনুবাদক)

নৈতিক মূল্যবোধের বর্তমান বিপর্যয় ও নৈরাজ্যও ইসলাম সৃষ্টি করেছে ? —কিছুতেই নয়। পবিত্র কুরআন এবং হযরত বিশ্বনবী (সা)-এর সর্বোত্তম আদর্শ মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক পবিত্রতা আনয়ন করে এবং তাদেরকে অন্যদের সাথে যাবতীয় কাজ-কর্মে ঐরূপ আত্মসংযম, সুবিচার এবং মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার শিক্ষা দেয় যেরূপ তারা অন্যদের নিকট থেকে ঐগুলো পাওয়ার প্রত্যাশায় করে।

আমাদের সামাজিক ঐতিহ্য

তাহলে কি আমাদের সামাজিক ঐতিহ্য প্রাচ্যের নারীদের অধপতনের জন্যে দায়ী ? অতীতের ঘটনাবলীই কি—যেমন কোন কোন লেখক বলেছে —তাদেরকে অপদার্থ, সংকীর্ণমনা ও মূর্খ বানিয়ে রেখেছে ?—না, এমনটিও নয়। কেননা আমাদের ঐতিহ্য না কাউকে জ্ঞান অন্বেষণ করতে বাধা দেয়, না মেহনত করতে বা চাকুরী করতে নিষেধ করে।—না সামাজিক কার্যকলাপে অন্যদের সাথে সম্পর্ক ও সহযোগিতার পথে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। তবে ইসলামের একমাত্র শর্ত হলো ঃ সকল কর্মতৎপরতার লক্ষ্য হবে মানবতার কল্যাণ এবং সামাজিক অবক্ষয়ের কোন পথ যেন খুলে দেয়া না হয়।

আমাদের ঐতিহ্য[১] যে জিনিস পসন্দ করে না তাহলো কতকগুলো ক্ষতিকর ও নির্বুদ্ধিতামূলক চাল-চলন ; যেমন বিনা প্রয়োজনে নারীদের ঘর থেকে বের হওয়া, রাস্তায় রাস্তায় গাড়ী হাকানো কিংবা পার্কে পার্কে ঘুরে বেড়ানো। এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত যে, কোন লোকই একথা অস্বীকার করতে পারে না যে, কোন নারীই গৃহের বাইরের এই সকল কর্মকাণ্ডে সময় নষ্ট করে তার সত্যিকার নারীসুলভ যোগ্যতাকে কখনো কাজে লাগাতে পারে। এবং এতে করে সমাজে তার সম্মান ও মূল্যও কখনো বাড়ে না। নারীরা যদি এই পথে চলতে শুরু করে তাহলে—যেমন পাশ্চাত্যের সুসভ্য (!) এবং উন্নতমনা 'সোসাইটি গার্লস'-এর অভিজ্ঞতায় দেখা যায়—তারা খুব সহজেই পুরুষদের ভোগের সামগ্রীতে পরিণত হয়ে বসবে। বস্তুত যারা প্রাচীন ঐতিহ্যের বিরোধী তাদের বিরোধিতার মূল কারণ হলো এটাই যে, এতে করে তাদের সেই যৌন যথেচ্ছাচার, ভোগ-বিলাস ও মাতলামির পথ রুদ্ধ হয়ে যায় যাতে তারা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে।

অসংলগ্ন প্রলাপ

মিসরের একজন লেখক—যে ফাঁক পেলেই ইসলামের উপর আঘাত হানতে এক মুহূর্তেও দেরী করেনা—তার একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকার মাধ্যমে

১. এখানে সত্যিকার ইসলামী ঐতিহ্যের কথা বলা হয়েছে। বিজাতীয় ঐতিহ্যকে বুঝানো হয়নি। এ দু'টিকে মিশ্রিত করে দেয়া আপত্তিজনক।

মুসলমান মহিলাদেরকে বার বার উৎসাহ প্রদান করে বলতো ঃ "পুরানো পচা ঐতিহ্যকে ভেংগে দাও, ঘর থেকে বাইরে আস, বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে পুরুষদের সাথে সাথে অফিস ও কারখানায় চাকুরী গ্রহণ করো। এগুলো তোমরা এ জন্যে করবে না যে, এগুলো করার সত্যিই কোন প্রয়োজন আছে। বরং মানব প্রজন্মের 'মা' হিসেবে তোমাদের উপর যে নানাবিধ দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তা থেকে বেঁচে থাকার জন্যেই তোমরা এগুলো করবে। এ ব্যক্তি[১] নারীদেরকে এরূপ উপদেশও দেয় যে, রাস্তায় চলার সময়ে যে মহিলা নীচের দিকে দৃষ্টি দিয়ে চলে সে প্রকৃতপক্ষে সাহস ও আত্মবিশ্বাস থেকে বঞ্চিত। এবং এতে করে এও প্রমাণিত হয় যে, সে পুরুষদের ভয়ে সর্বদাই ভীতু। কিন্তু ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে যখন সে উন্নতমনা হয়ে উঠবে তখন তার ভয় আপনা আপনি দূর হয়ে যাবে এবং সাহসিকতার সাথে পুরুষদের মোকাবিলা করতে শুরু করবে।" কিন্তু একথা বলার সময়ে উক্ত লেখক সেই ইতিহাসের কথা একদম ভুলে গেছে যা অধ্যয়ন করলে সে জানতে পারতো যে, হযরত আয়েশা (রা)—যিনি তদানিন্তন যুগে রাজনীতিতে পুরোপুরিই অংশগ্রহণ করেছেন এবং যুদ্ধেও সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করেছেন তিনিও পুরুষদের থেকে পর্দা করেছেন। তার একথাও স্মরণ থাকেনি যে, দৃষ্টি অবনত করা শুধু নারীদেরই বৈশিষ্ট্য নয়। কেননা ইতিহাসে এ সাক্ষ্যও বর্তমান যে, হযরত বিশ্বনবী (সা) কুমারীদের চেয়েও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। এতে কি প্রমাণিত হয় যে, তিনি লজ্জাশীল ছিলেন বলেই তাঁর আত্মবিশ্বাস বলতে কিছু ছিল না? অথবা তাঁর এটা জানাই ছিল না যে, তিনি আল্লাহর রাসূল? না জানি ইসলা-মের শত্রুরা আরো কতকাল এরূপ অসংলগ্ন ও নির্বুদ্ধিতামূলক কথা বলতে থাকবে?

আজকাল নারীরা অধপতনের শেষ সীমায় পৌছে যেভাবে লাঞ্ছিত হচ্ছে তা এক বাস্তব সত্য। এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কিন্তু এর প্রতিকার তো সেটা হতে পারে না। যা প্রতীচ্যের নারীরা অবলম্বন করেছে। কেননা তাদেরকে যে পরিবেশ-পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হচ্ছে তার ধরন ছিল সম্পূর্ণরূপেই স্বতন্ত্র। এবং দুর্দশা দূর করার জন্যে যে পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করা হয়েছে তাও সেই পরিস্থিতির স্বাভাবিক ফসল।

প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্রের প্রয়োজন

নারীদের সমস্যা হোক কিংবা পুরুষদের, ইসলাম এবং একমাত্র ইসলামই সেই সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম। এ জন্যে আমাদের পুরুষ, নারী, বৃদ্ধ, নওজোয়ান সকলের অবশ্য কর্তব্য হলো একতাবদ্ধ হয়ে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

১. এই লেখকের নাম সালামা মূসা। তার সমস্ত লেখাই ইসলাম বিদ্বেষে ভরপুর। এ শ্রেণীর আরেকজন খৃষ্টান লেখকের নাম জুরজী জায়দান। ইসলামের শত্রুদের মধ্যে এরা উভয়ই শীর্ষস্থানীয়।

করা এবং নিজ নিজ জীবনকে ইসলামী বিধান অনুযায়ী গড়ে তোলা। আমরা যখন এ কাজ সম্পন্ন করতে পারবো তখন এই বাস্তব দুনিয়ায় আমরা আমাদের আকীদা ও মতাদর্শকেও বিজয়ী করতে সক্ষম হবো। আমাদের সামগ্রিক জীবনে ভারসাম্য স্থাপন করার জন্যে এই হচ্ছে একমাত্র পথ। এই আদর্শই যাবতীয় বে-ইনসাফী, অত্যাচার-উৎপীড়ন, বলপ্রয়োগ ও স্বৈরাচারের অভিশাপ থেকে সম্পূর্ণরূপেই মুক্ত।

ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ ও শাস্তি

আলোকপ্রাপ্ত দৃষ্টিভংগির নতুন যুক্তি

"আজকের উন্নত যুগে সেই পাশবিক ও বর্বরোচিত শাস্তির বিধান কেমন করে সম্ভবপর যা প্রাচীন যুগের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও বর্বর লোকদের জন্যে রচনা করা হয়েছিল ? কয়েকটা টাকার জন্যেই কি একটা চোরের হাত কাটা সংগত হতে পারে ? অথচ একজন অপরাধী—সে চোর হোক কিংবা ডাকাত হোক —আধুনিক চিন্তাধারা অনুযায়ী সামাজিক অবিচার ও উৎপীড়নের এক করুন শিকার, সে শাস্তি যোগ্য নয় ; বরং সহানুভূতিপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসার হকদার।"—ইসলামী আইন-কানুন প্রসংগে আধুনিক যুগের আলোকপ্রাপ্ত চিন্তাধারার দাবীদারদের মুখে এই যুক্তি (Logic) প্রায়ই শোনা যায়। কিন্তু আশ্চার্যের কথা এই যে, বিশ শতকের এই আলোকপ্রাপ্ত চিন্তাবিদরা উত্তর আফ্রিকার চল্লিশ হাজার নিরপরাধ মানুষকে পাইকারীভাবে জবাই করা হচ্ছে দেখেও নিজেদের অন্তরে সামান্যতম দুঃখ অনুভব করে না অথচ একজন অপরাধীর আইনগত শাস্তি সম্পর্কে এতদূর অস্থির ও পেরেশান যে তা ভাষায় প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। আফসোস ! মানুষ কিছু চটকদার বুলি শুনেই প্রতারিত হয় এবং প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে তারা অজ্ঞই থেকে যায়। যাই হোক বিশ শতকের সভ্যতা ও উহার ব্যধিগুলোর প্রতি না তাকিয়ে, শাস্তি সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভংগির কথা প্রথমেই আলোচনা করা যাক।

অপরাধ ও সমাজ

অপরাধের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয় ঃ সমাজের বিপক্ষে কোনরূপ সীমালংঘনই অপরাধ। এ কারণে অপরাধ ও শাস্তির ধারণা এবং ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সমাজের সমষ্টিগত দৃষ্টিভংগিই সর্বাধিক কার্যকরী বিষয়।

পুঁজিবাদী দেশসমূহে

পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী ও জোটনিরপেক্ষ দেশসমূহে ব্যক্তি সম্মানের পক্ষে বহু ঢাক-ঢোল পিটানো হয় এবং উহাকেই গোটা সমাজ জীবনের একমাত্র কেন্দ্র হিসেবে গণ্য করা হয়। এই সকল দেশে ব্যক্তির আজাদী সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হয় এবং রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে দারুণভাবে সীমিত করে দেয়া হয়। তাদের এই দৃষ্টিভংগির পরিচয় তাদের রাষ্ট্রের অপরাধ ও শাস্তি সংক্রান্ত আইন-কানুনেও প্রতিফলিত হয়। তারা অপরাধী ব্যক্তিকে সহানুভূতি লাভের উপযুক্ত বলে মনে করে। কেননা তাদের ধারণায় একজন অপরাধী বিপর্যস্ত পরিবেশ, মানসিক

বিভ্রান্তি ও দলীয় কোন্দলের নিষ্ঠুর শিকার এবং উহার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার শক্তি তার নেই। এ কারণেই ঐ সকল দেশে যে কোন অপরাধের—বিশেষ করে নৈতিক অপরাধের শাস্তি যথাসম্ভব কম করে দেয়ার প্রবণতা বিরাজমান। এমনকি কোন কোন অপরাধকে তো শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলেই গণ্য করা হয় না।

আধুনিক মনস্তত্ত্ব ও অপরাধ

এই পর্যায়ে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ (Psycho Analysis)-এর কথাই প্রথমে ধরা যাক। অপরাধ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই চিন্তাধারার যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, ফ্রয়েড (Freud) হচ্ছে এই ঐতিহাসিক বিপ্লবের একজন খ্যাতনামা পথিকৃত। তার দাবী ছিল ঃ একজন অপরাধী মূলত যৌন বিভ্রান্তির শিকার। যখন সমাজ, ধর্ম, নৈতিকতা ও বিভিন্ন ঐতিহ্য মানুষের স্বভাবকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করে তখনই সে এরূপ শিকারে পরিণত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সাথে সম্পর্কিত সকল পণ্ডিতই ফ্রয়েডের অনুসরণ করতে শুরু করে। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই যৌনতা (Sex)-ই হচ্ছে জীবনের কেন্দ্রবিন্দু'—এই মতকে সমর্থন করতে পারেনি। তারা অপরাধীকে কেবল ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিবেশ ও ঘটনাবলীর নিরুপায় শিকার বলে গণ্য করেছে। এরা সকলেই 'মনস্তাত্ত্বিক বাধ্যবাধকতা' (Psychological Determinism)-এর সমর্থক। তাদের ধারণায়, মনস্তাত্ত্বিক শক্তির সীমারেখার মধ্যে কোন মানুষ যেমন কামস্পৃহা থেকে রেহাই পেতে পারে না। তেমনি কাজের উর্ধেও সে অবস্থান করতে পারে না। বরং উহার বিপক্ষে সে একেবারেই নিরুপায় ও অসহায় জীব মাত্র। কোনরূপ হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে এক বাঁধাধরা নিয়মের অধীনে তাকে প্রতিনিয়তই কাজ করে যেতে হচ্ছে।

সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে

সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের মতে, সমাজ ও সমষ্টিগত জীবন একটি অখণ্ড স্বত্তা। এর বিরুদ্ধে 'টু' শব্দটি করার অধিকার কোন ব্যক্তির নেই। এই সকল রাষ্ট্রে যদি কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাহলে তাকে চরম পর্যায়ের শাস্তি ভোগ করতে হয়। মৃত্যুদণ্ড থেকে শুরু করে নানা প্রকার নির্যাতন এই শাস্তির অন্তর্ভুক্ত। সমাজতন্ত্রী ফ্রয়েড ও তার সমমনা মনস্তত্ত্ব বিশারদরা অপরাধের মূল কারণ মনস্তাত্ত্বিক পর্যায়ের অনুসন্ধান না করে কেবল অর্থব্যবস্থার মধ্যেই খোঁজ করে থাকে। সমাজতান্ত্রিক দর্শনে যে সমাজ অর্থনৈতিক দূরবস্থায় পতিত হয় তাতে কল্যাণকর বলে কিছুই থাকতে পারে না। সুতরাং এরূপ সমাজে অপরাধীদের কোন শাস্তি হওয়া উচিত

নয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, যে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় অর্থনৈতিক দূরবস্থা থাকার কথা নয় এবং যেখানে পূর্ণাঙ্গ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সেখানে অপরাধ সংঘটিত হয় কেন? সেখানে জেল-জরিমানা বা আদালতেরই বা প্রয়োজন কেন?

ভুলের প্রকৃত কারণ

ব্যক্তিবাদ (Individualism) বা সমাজতন্ত্রের দর্শনকে একটি নির্দিষ্ট পরিসরে নির্ভুল বলা যায়। একথা ঠিক যে, একটি ব্যক্তি তার পরিবেশ দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত হয় এবং এই পরিবেশের চাপে কোন কোন সময়ে সে অপরাধও করে বসে। কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতির বিপক্ষে মানুষ কোন অসহায় জীব নয়। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণবাদীদের ভুলের প্রকৃত কারণ হলো এই যে, তারা মানুষের গতি-শক্তির (Dynamic Energy) উপর এত অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে যে, মানুষের স্বভাবগত নিয়ন্ত্রণ শক্তিকে (Controlling Energy) আদৌ কোন মূল্য দেয়া হয়নি। যে শক্তির বলে একটি শিশু তার লালাগ্রন্থি (Secretive Glands) নিয়ন্ত্রণ করে, বড় হলে বিছানায় মলমূত্র ত্যাগ বন্ধ করতে সক্ষম হয়। সেই শক্তির সাহায্যেই সে নিজের চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে এবং যাবতীয় উত্তেজনা-উন্মাদনা ও কামনা-বাসনাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে শেখে।

অর্থনৈতিক অবস্থা ও অপরাধ

অধিকন্তু একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, অর্থনৈতিক পরিবেশের কারণে মানুষের চিন্তা ও কাজ উভয়ই প্রভাবিত হয় এবং একথাও ঠিক যে, ক্ষুধা মানুষের নৈতিক অনাচার ও সামাজিক বিতৃষ্ণার মূল কারণ হয়ে কোন কোন সময়ে অপরাধ ও নৈতিক বিপর্যয়ের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু কেবল অর্থনৈতিক অবস্থাকেই মানুষের যাবতীয় কার্যকলাপের একমাত্র মূল কারণ বলে অভিহিত করা কোনক্রমেই সংগত নয়।—কেবল এক নির্ধারিত সীমার মধ্যেই উহাকে আংশিকভাবে সংগত মনে করা যায়। খোদ সোভিয়েত রাশিয়ার সামাজিক অবস্থা ও বাস্তব ঘটনাবলী এই দাবীর প্রতিবাদ করার জন্যে যথেষ্ট। অথচ রাশিয়া দাবী করেছিল যে, তারা তাদের দেশ থেকে ক্ষুধা ও দরিদ্রতাকে চিরতরেই নির্মূল করে দিয়েছে।

অপরাধ করার ক্ষেত্রে অপরাধীর দায়িত্ব

একজন অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার কিংবা না দেয়ার ফায়সালা করার পূর্বে অপরাধ করার ক্ষেত্রে তার দায়িত্বের নির্ভুল সীমারেখা নির্ধারণ করা একান্ত

প্রয়োজন। কেননা অপরাধ ও উহার শাস্তির সাথে যা কিছু সংশ্লিষ্ট তার কোনটিকেই ইসলাম বিন্দুমাত্রও উপেক্ষা করে না।

ইসলামের কর্মপদ্ধতি

ইসলাম অন্ধের মত কোন শাস্তির ব্যবস্থা করে না এবং কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা না করে উহাকে প্রবর্তন করতেও অগ্রসর হয় না। ইসলামী দর্শনে ব্যক্তিবাদ (Individualism) ও সমাজতান্ত্রিক (Socialism) দর্শনের সকল কল্যাণকর দিকই বর্তমান। ঐ দু'টির খারাপ বা অকল্যাণকর কোন কিছুর সাথেই ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। ইসলাম সঠিক অর্থেই সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে ; উহা চায়, অপরাধের শাস্তি দেয়ার পূর্বে উহার সাথে যে সকল কারণ ও অবস্থাবলীর যোগসূত্র বর্তমান তারও সঠিক বিশ্লেষণ হোক। অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার সময় ইসলাম একই সময়ে দু'টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখে। প্রথমটি হলো অপরাধীর দৃষ্টিভংগি এবং দ্বিতীয়টি হলো যে সমাজের বিপক্ষে অপরাধটি সংঘটিত হয়েছে তার দৃষ্টিকোণ। এই দু'টি বিষয়ের স্পষ্ট আলোকে ইসলাম যথাযথ শাস্তির বিধান দেয়। বস্তুত এই বিধানই বুদ্ধি ও যুক্তি উভয়ের সাথে সামঞ্জস্যশীল এবং ব্যক্তিবাদ ও সমাজতন্ত্রের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপেই মুক্ত।

ইসলামের দৈহিক শাস্তি

ইসলামের কিছু দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিকে আপাত দৃষ্টিতে অমানুষিক ও অশোভনীয় বলে মনে হতে পারে। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে, এই শাস্তি অমানুষিকও নয় এবং অশোভনীয়ও নয়। কেননা ইসলাম এই শাস্তির ব্যবস্থা ঠিক তখনই দেয় যখন এ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, অপরাধীর পেছনে বিন্দুমাত্রও কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না এবং উহা করার পক্ষে কোন যুক্তিসংগত কারণও বর্তমান ছিল না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইসলাম চোরের হাত কাটার বিধান দেয়। কিন্তু যেখানে সামান্য মাত্রও সন্দেহ থাকবে যে, একমাত্র ক্ষুধার কারণেই চুরি করতে বাধ্য হয়েছে সেখানে চোরকে হাত কাটার শাস্তি দেয়া হয় না।

একইরূপে ইসলাম ব্যভিচারী পুরুষ এবং ব্যভিচারিণী নারীকে পাথর মেরে হত্যা করার বিধান দিয়েছে। কিন্তু এই শাস্তি কেবল বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিতা নারীর জন্যেই নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এবং এটাও শুধু তখনই দেয়া হয় যখন চারজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী ব্যভিচার করতে দেখবে। বলা বাহুল্য ইস-লাম অন্যান্য শাস্তির ক্ষেত্রেও একই রূপ সতর্কতা অবলম্বন করেছে।

হযরত উমর (রা)-এর পদ্ধতি

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা)-এর—যিনি ইসলামের শীর্ষস্থানীয় আইনবিদদের অন্যতম ছিলেন—বর্ণিত একটি নীতির মাধ্যমেও উপরোক্ত সত্যটি পরিস্ফুট হয়ে উঠে। ইসলামী আইন কার্যকরী করার ক্ষেত্রে হযরত উমরের কঠোরতা একটি সর্বজনবিদিত ব্যাপার। এ কারণে তাঁর গৃহীত নীতিকে ইসলামী আইনের ব্যাখ্যায় কোনরূপ শিথিলযোগ্য বলেও গণ্য করা যায় না। হযরত উমরের সময়ে একবার যখন দুর্ভিক্ষ শুরু হয় তখন তিনি চুরির অপরাধে হাত কাটার শাস্তি স্থগিত করে রাখেন। এর কারণ ছিল, কেউ হয়ত ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হয়ে চুরি করতে পারে। নিম্নলিখিত ঘটনাটিও ইসলামী আইনের এই মূলনীতিটির উপর আলোকপাত করছে।

একটি ঐতিহাসিক ঘটনা

হযরত উমর (রা)-কে জানানো হলো যে, হাতেম ইবনে আবি বালতার কয়েকজন গোলাম মুজনা গোত্রের এক ব্যক্তির উটনী চুরি করেছে। হযরত উমর জিজ্ঞেসাবাদ করায় তারা চুরির কথা স্বীকার করলো এবং তিনি তাদের হাত কাটার আদেশ প্রদান করলেন। কিন্তু পরে কিছুক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করে বললেন ঃ আল্লাহর শপথ ! যদি আমি একথা জানতে না পারতাম যে, ঐ সকল গোলামকে কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করার পরে তুমি তাদেরকে খাবার না দেয়ায় তারা হারাম খেতে বাধ্য হয়ে যেত তাহলে আমি অবশ্যই তাদের হাত কেটে দিতাম। এই বলে তিনি তাদের হাত কাটার শাস্তি মওকুফ করে দেন। অতপর তিনি তাদের মুনিব হাতেম ইবনে আবি বালতাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ "আল্লাহর কসম ! আমি তাদের হাত তো কাটাইনি, কিন্তু তোমার জরিমানা হবে অত্যন্ত ভারী, কষ্ট করেই তোমাকে উহা পরিশোধ করতে হবে।" এই বলে তিনি হুকুম দিলেন যে তাকে উটনীর মালিককে দু'টি উটনীর মূল্য প্রদান করতে হবে।

ইসলামী আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি

এই ঘটনায় ইসলামী আইনের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি পরিস্ফুট হয়ে উঠে। সে নীতিটি হলো ঃ কোন অপরাধীকে আইনগত শাস্তি এমন অবস্থায় দেয়া যায় না যখন পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয়ে উক্ত অপরাধ করতে হয়। এই মূলনীতির সমর্থনে হযরত বিশ্বনবী (সা)-এর এই বাণীও প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেন ঃ

ادرأوا الحدود بالشبهات

"সন্দেহপূর্ণ অবস্থায় দণ্ড কার্যকর করো না।"

ইসলামী দৈহিক শাস্তি ও সমাজ সংস্কার

শাস্তি সম্পর্কে ইসলামের নীতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ইসলাম সর্বপ্রথম যে অবস্থা ও পরিবেশ বিরাজমান থাকলে মানুষ অপরাধ করতে অগ্রসর হয় তার হাত থেকে সমাজকে মুক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এর পরেও যারা অপরাধ করবে তাদেরকে শিক্ষামূলক ও ইনসাফভিত্তিক শাস্তির বিধান দেয়। কিন্তু অপরাধের কারণ যদি বর্তমান থাকে এবং অপরাধী সম্পর্কে সামান্য মাত্র সন্দেহও হয় যে, পরিস্থিতির কারণে বাধ্য হয়েই সে উক্ত অপরাধ করেছে তাহলে নির্দিষ্ট শাস্তি তাকে দেয়া হবে না। বরং অপরাধের সাথে সংগতি রেখে হয় তাকে লঘু শাস্তি দেয়া হবে নতুবা একেবারে শাস্তি না দিয়েই খালাস দেয়া হবে।

অপরাধের কারণসমূহের মূলোৎপাটন

যে সকল কারণে অপরাধ সংঘটিত হতে পারে সেগুলোকে নির্মূল করার জন্যে সম্ভাব্য সকল উপায়ই ইসলাম অবলম্বন করেছে। এবং সাথে সাথে যাবতীয় সম্পদের সুষ্ঠু বন্টনের প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। এর অনিবার্য ফল স্বরূপ আমরা দেখতে পাই ঃ হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজের সময়ে (বিশ্বের অর্ধেক এলাকা ব্যাপী) ইসলামী রাষ্ট্রের কোথাও দারিদ্রতা বলতে কিছুই নেই। ইসলামী রাষ্ট্র সমস্ত নাগরিকের মৌলিক প্রয়োজন মিটাবার দায়িত্ব গ্রহণ করে। আর এ ক্ষেত্রে জাতি-ধর্ম, বর্ণ-গোত্র, ভাষা ও পেশার কোন পার্থক্যকে বিন্দুমাত্রও স্বীকার করে না। অনুরূপভাবে এই রাষ্ট্রই নাগরিকদের প্রয়োজনীয় রুজি-রোজগারের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। রাষ্ট্র যদি এ ক্ষেত্রে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয় কিংবা কোন নাগরিক উপার্জন করতে অক্ষম হয় তাহলে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়।

যৌন স্পৃহা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভংগি

ইসলাম যৌন স্পৃহার গুরুত্বকে কখনো অস্বীকার করে না ; বরং উহা চরিতার্থ করার জন্য আইনগত বৈধ মাধ্যম—বিবাহের দরযা উন্মুক্ত করে দেয়। এ কারণেই ইসলাম কম বয়সে বিবাহ করার জন্যে উৎসাহ দেয়। আর যারা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বিবাহ করতে অপারগ তাদেরকে সরকারী কোষাগর থেকে সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা করে। কিন্তু এরই সাথে যে সকল কারণ যৌবনসুলভ উত্তেজনা ও উদ্দীপনাকে সীমার বাইরে ঠেলে দিতে চায় সেগুলোকে নির্মূল করে সমাজকে পবিত্র করে তুলতে চায়। ইসলাম মানুষের নিকট এমন এক মহান ও পবিত্র লক্ষ্য উপস্থাপিত করে যে, উহা গ্রহণ করলে তার যাবতীয় শক্তিই সমাজের সমষ্টিগত কল্যাণের উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হতে পারে। ইহা মানুষকে

তার অবসর সময়ে আল্লাহর নৈকট্যলাভের জন্যে সাধনা করতে শিক্ষা দেয়। যে সকল উপাদান অপরাধ বিস্তারের কারণ হয়ে দাঁড়ায় ইসলাম সেগুলোকে প্রথমেই নির্মূল করে দেয়। কিন্তু এ সত্ত্বেও ইসলাম কোন পাপিষ্ঠকে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন শাস্তি দেয় না যতক্ষণ না সে সমাজের যাবতীয় মূলবোধকে পদদলিত করে পশুত্বের নিম্নতম স্তরে গিয়ে পতিত হয় এবং এতদূর প্রকাশ্যে উক্ত অপরাধটি করে বসে যে, ন্যূনকল্পে চারজন সাক্ষী উহা স্বচক্ষে দেখে ফেলে।

প্রশ্ন হতে পারে যে, বর্তমান অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক পরিস্থিতিতে যুবকদের পক্ষে বিবাহ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এ কারণেই তারা যৌন অপরাধ করতে বাধ্য হয়। বিষয়টি সত্য বটে, কিন্তু যখন আমরা সত্যিকার অর্থে ইসলাম অনুসরণ করে চলব তখন নোংরা ও অশালীন চিন্তাধারার উত্তেজক এবং তরুণদের চরিত্র বিধ্বংসী জঘন্য ও উলংগ ফিল্ম, পত্র-পত্রিকা এবং যৌন আবেদন সৃষ্টিকারী সংগীত বলতে কিছুই থাকবে না ; তরুণদের যৌন চিন্তার উদ্রেককারী সকল কারণকেই নির্মূল করে দেয়া হবে। সমাজের বুক থেকে সেই দারিদ্রতাকেও চিরতরে খতম করে দেয়া হবে যে কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কেউ বিবাহ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। এরূপে যে সমাজ থেকে অন্যায় কাজের কারণগুলোকে বিলুপ্ত করে দেয়া হবে সে সমাজের নিকট ইসলাম স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাশা করবে যে, সবাই সৎ মানুষ হিসেবে বসবাস করবে। কিন্তু এরপরেও যদি কেউ অন্যায় কাজ করে তাহলে তাকে শাস্তি না দিয়ে কোন উপায় থাকে না। কেননা এ অবস্থায় কোন শাস্তির বিধান না করলে সে সমাজে কস্মিনকালেও শান্তি স্থাপিত হতে পারে না।

ইসলামী দৈহিক শাস্তির বৈশিষ্ট্য

যে সকল বৈশিষ্ট্যের কারণে ইসলাম অন্যান্য জীবন পদ্ধতি বা মতাদর্শের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত তা শুধু এতটুকুই নয় যে, শাস্তি কার্যকরী করার পূর্বে উহা মানুষের অপরাধ করার যাবতীয় কারণ ও উপায়-উপাদানসমূহকে দূরীভূত করে দেয়। বরং সে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যটি হলো ঃ অপরাধের কারণ দূরীভূত করার পরেও কোন অপরাধীর ব্যাপারে সামান্যমাত্র সন্দেহও দেখা দেয় যে, হয়ত পরিবেশের চাপে বাধ্য হয়েই সে অপরাধটি করে ফেলেছে তাহলে তাকে নির্ধারিত শাস্তি দেয়া যাবে না। সমগ্র দুনিয়ায় এমন কোন জীবন পদ্ধতি আছে কি যা ইসলামের এই ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের সমকক্ষ হতে পারে ?

ইউরোপবাসীদের বিভ্রান্তির মূলভিত্তি

অপরাধ ও শাস্তি সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভংগি না জানার কারণে কিছু সংখ্যক ইউরোপীয় গ্রন্থকার ইসলামের বিধিবদ্ধ শাস্তিকে বর্বরোচিত ও

মানহানিকর বলে মন্তব্য করে থাকে। কেননা ভুল করে তারা বুঝে বসেছেন যে, তাদের ইউরোপীয় দৈহিক শাস্তি বিধানের ন্যায় ইসলামী শাস্তি প্রদানও খুব ঘন ঘন অহরহ ঘটতে থাকবে। অন্য কথায় তাদের ধারণায় ইসলামী সমাজে কোরা (বা বেত্রাঘাত) হাত কাটা বা পাথর মারার শাস্তি মুহূর্মুহু চলতেই থাকবে। অথচ বাস্তব ঘটনা এই যে, ইসলামী সমাজে এরূপ শিক্ষামূলক শাস্তি ধারণাতীতরূপে খুব অল্পই হয়ে থাকে। ইসলামী ইতিহাসের দীর্ঘ চারশ' বছরের মধ্যে চুরির অপরাধে মাত্র ছ'জন লোকের হাত কাটা হয়েছে। সুতরাং স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের উদ্দেশ্য চোরের হাত কাটা নয়, বরং উদ্দেশ্য হলো চুরিকেই সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়া। আর এ কারণেই ইসলাম শাস্তির পূর্বে অপরাধকেই নির্মূল করার চেষ্টা করে। ইসলামী শাস্তি প্রবর্তনের যে ঘটনাগুলো আমরা দেখতে পাই তা সত্যিকার সুবিচার প্রতিষ্ঠায় জ্বলন্ত উদাহরণ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

জানি না ইউরোপের কিছু সংখ্যক লেখক ইসলামী আইনের বাস্তবায়নকে কেন এতদূর ভয় করে। চোর স্বভাবগতভাবেই চুরি করুক কিংবা কোন কারণ বা বাধ্যতামূলক ব্যতিরেকেই অপরাধ হতে থাকুক—এর জন্যে যদি তারা ব্যস্ত হয়ে থাকেন তাহলে তারা যে অবশ্যই ভীত হবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শাস্তির কল্যাণকর দিক

অনেকেই ধারণা করেন যে, বাস্তবে এই ধরনের শাস্তির মধ্যে কোন কল্যাণকর দিক নেই। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণরূপেই ভিত্তিহীন। ইসলামী শাস্তি কেবল তাদেরই ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলে, যারা যুক্তিসংগত কারণ ছাড়াই অপরাধ করার নেশায় মেতে উঠে। তাদের সংশোধনের জন্যে এই শাস্তি একান্তই যুক্তিসংগত। কেননা তাদের অপরাধ প্রবণতা যতই প্রচণ্ড হোক না কেন, অপরাধ করার পূর্বে শাস্তির এই ব্যবস্থা নিসন্দেহে তাদেরকে শংকিত করে তুলবে। অনস্বীকার্য যে, কিছু সংখ্যক তরুণ যৌন অতৃপ্তির শিকার হতে বাধ্য হবে। কিন্তু যে সমাজব্যবস্থা উহার সকল সদস্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্যে তৎপর উহার এ অধিকার অবশ্যই রয়েছে যে, সকলের জান-মালের পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান করবে—যাতে করে কেউ কারুর জান-মালকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে না পারে।

অন্যদিকে যারা কোন বিশেষ কারণ ছাড়াই অপরাধ করে তাদেরকে (শুধু বিচার করেই) ছেড়ে দেয় না। বরং সকল সম্ভাব্য পন্থায় তার প্রতিকার করতে অগ্রসর হয়—একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ও যুক্তিসম্মত জীবনের দিকে ফিরিয়ে আনার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়।

বড়ই মর্মান্তিক

কিন্তু বড়ই দুঃখজনক যে, আধুনিক যুগের কিছু সভ্য তরুণ ও আইনজীবী ইসলামী আইনের সমালোচনা নিছক এ কারণেই করে থাকে যে, ইউরোপের লোকেরা একে বর্বরোচিত বলে বিদ্রূপ করে থাকে। কিন্তু আমরা সুনিশ্চিত যে, তারা যদি ইসলামী আইনের হেকমত ও গূঢ় উদ্দেশ্য নিরপেক্ষ ও খোলা মন নিয়ে অধ্যয়ন করতো তাহলে অবশ্যই তাদের যাবতীয় ভুল ধারণার নিরসন হতো।

ইসলাম ও সভ্যতা

ইসলাম বিরোধীদের প্রশ্ন

"তোমরা কি চাও যে, আমরা আজ থেকে হাজার হাজার বছরের পুরানো তাবুতে বসবাসকারী যাযাবরদের ন্যায় জীবনযাপন করি ? মরুবাসী বর্বর বেদুইনদের জন্যে ইসলাম ছিল সম্পূর্ণ উপযুক্ত ; তাদের অভাব ও প্রয়োজনের তুলনায় উহাই ছিল যথেষ্ট। উহার সরলতায় তাদের জন্যে আকর্ষণও ছিল প্রচুর। কিন্তু আধুনিক যুগে যেখানে শব্দের চেয়েও অধিক দ্রুতগতিসম্পন্ন উড়োজাহাজ, মহা ধ্বংসাত্মক হাইড্রোজেন বোমা এবং চিত্তাকর্ষক চলচ্চিত্রের জয় জয়কার চলছে সেখানে এমন কোন সভ্যতার কথা কল্পনা করা যায় কি যার ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহর স্বীকৃতি এবং তার প্রতি ঈমান আনার উপর এবং এ যুগের সভ্যতার মাপকাঠিতে যা উত্তীর্ণ হতে সক্ষম নয় ? কেননা সেটি হচ্ছে স্থবির, সময়ের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে একেবারেই অক্ষম। সুতরাং উহার বন্ধন থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এ যুগের উন্নত ও সুসভ্য জাতিগুলোর কাতারে আমরা দাঁড়াতে পারবো না।"

কিছুকাল পূর্বে একজন শিক্ষিত ইংরেজের সাথে আলোচনা কালে এই সকল প্রশ্নের সাথে আমি পরিচিত হই। এই ব্যক্তি ইউ. এন. ও. এর-একটি বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে বিগত দু' বছর ধরে মিসরে অবস্থান করছিলেন।[১] এই প্রতিনিধি দলের উদ্দেশ্য ছিল মিসরীয় কিষাণদের জীবন-যাপনের মান উন্নত করার কাজে মিসর সরকারকে সাহায্য ও দিকনির্দেশনা প্রদান করা। কিন্তু এলাকার লোকদের আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও যেহেতু প্রতিনিধি দলে এমন কেউ ছিলেন না যিনি মিসরীয়দের ভাষা বুঝতে সক্ষম। এ কারণে মিসর সরকার স্থানীয় কিষাণদের এবং প্রতিনিধি দলের মধ্যে দোভাষীর কাজ সম্পাদন করার দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করেন। উপরোক্ত ইংরেজ ব্যক্তির সাথে আমার এই সূত্রেই পরিচয় ঘটে।

প্রথমবার সাক্ষাতের সময়েই আমি উক্ত ইংরেজকে বুঝিয়ে দিলাম ঃ মিসরের লোকেরা ইংরেজদেরকে ঘৃণা করে এবং ততদিনই ঘৃণা করতে থাকবে যতদিন তারা প্রাচ্যের একটি দেশেও তাদের অত্যাচার ও আক্রমণমূলক কর্ম-তৎপরতা অব্যাহত রাখবে। আমি তাকে একথাও জানিয়ে দিলাম যে, তাদের মিত্র দেশগুলো (যেমন আমেরিকা) সম্পর্কেও আমরা একই ধারণা পোষণ করি। কেননা তারা মিসর, ফিলিস্তিন ও অন্যান্য সমস্যার ক্ষেত্রে মুসলমানদের

১. প্রকাশ থাকে যে, মূল আরবী পুস্তক ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে মিসরে মুদ্রিত হয়।

বিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। আমার একথা শুনে সে হতবাক হয়ে গেল এবং কয়েক মুহূর্ত পরেই আমাকে প্রশ্ন করলো : "তুমি কি একজন কমিউনিষ্ট ?"

তার প্রশ্নের উত্তরে আমি বললাম : আমি কমিউনিষ্ট নই, একজন মুসলমান। ইসলাম নামে আমার নিকট এমন একটি সংস্কৃতি ও জীবন পদ্ধতি বর্তমান যা সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ উভয়টির চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। কেননা জীবনের সকল দিক ও বিভাগের সমাধানই এর মধ্যে বর্তমান এবং প্রত্যেকটি বিভাগই অন্য বিভাগের সাথে সামঞ্জস্যশীল।

দীর্ঘ ৩ ঘন্টা পর্যন্ত আলোচনার পর সে বলতে শুরু করলো : ইসলাম সম্পর্কে আপনি যা বললেন তা হয়ত সবই ঠিক। কিন্তু আমার সাথে যতটুকু সম্পর্ক বর্তমান তাতে একথা না বলে পারছি না যে, আধুনিক সভ্যতার সুফল থেকে আমি বঞ্চিত থাকতে পারি না। আমি উড়োজাহাজে ভ্রমণ করা বন্ধ করতে পারি না। রেডিওর মনমাতানো সংগীতকে বর্জন করতে পারি না এবং আরাম-আয়েশ ও বিলাস-ব্যসনের উপায়-উপাদানকেও ত্যাগ করতে পারি না।

তার উত্তর শুনে আমি অস্থির হয়ে গেলাম। পর মুহূর্তেই আমি তাকে বললাম : "কেউ তো আপনাকে এগুলো বন্ধ করতে বলছে না।"

সে বলল : "তাহলে ইসলাম গ্রহণ করার অর্থ কি যাযাবর ও বেদুইন জীবনে ফিরে যাওয়া নয় ?"

ভিত্তিহীন প্রশ্নাবলী

ইসলামের বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপনকারীরা সাধারণত উপরোক্ত রূপ প্রশ্নই করে থাকে। কিন্তু যারা বিভিন্ন ধর্ম ও মতাদর্শের অধ্যয়ন করে থাকেন তারা অবশ্যই অবগত আছেন যে, এই সকল সংশয় ও প্রশ্নের আঁদৌ কোন ভিত্তি নেই। কেননা ইসলামে এমন একটি মুহূর্তও নেই যখন উহা মানুষের প্রগতি ও সভ্যতার পথে কোন বাধার সৃষ্টি করেছে।

ইসলাম প্রথম যাদের নিকট এসেছে তাদের বেশীর ভাগই ছিল বেদুইন। তারা সভ্যতা থেকে এতখানি দূরবর্তী ও পাষাণ হৃদয় ছিল যে, স্বয়ং আল্লাহ পাক তাদের সম্পর্কে এরশাদ করেন :

اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّنِفَاقًا ـ

"এই আরব বেদুইনরা আল্লাহদ্রোহিতা ও কপটতায় বড় কঠিন ছিল।"

–(সূরা আত তাওবা : ৯৭)

ইসলামের মহা অলৌকিক শক্তি

ইসলামের একটি বড় অলৌকিক ব্যাপার (Miracle) হলো আরবের বর্বর ও কট্টর বেদুইনদেরকে একটি অখণ্ড জাতিতে পরিণত করে দিয়েছে। পশুত্বের স্তর থেকে মুক্ত করে তাদেরকে মানসিকতার মহান ও উন্নত মূল্যবোধের সাথে পরিচিত করে দিয়েছে। শুধু তা-ই নয়, ইসলাম তাদেরকে অন্যদের পথপ্রদর্শক এবং আল্লাহর দ্বীনের আহবায়ক হওয়ার অনন্য গৌরবেও ভূষিত করেছে। ইসলাম মানুষকে যে সভ্য, সংস্কৃতিবান ও পবিত্র করে তুলতে সক্ষম তাহলো এরই সুস্পষ্ট উদাহরণ।

ইসলামী সভ্যতা এবং আধ্যাত্মিক ও বাস্তব জীবন

মানুষের আত্মাকে পবিত্র করে তোলা নিসন্দেহে এক মহান লক্ষ্য। মানুষের যাবতীয় চেষ্টা ও সাধনার চূড়ান্ত লক্ষ্য এটাই। মানবীয় সভ্যতার প্রকৃত উদ্দেশ্যও এর চেয়ে ভিন্নতর কিছুই নয়। কিন্তু ইসলাম শুধু আত্মার সংশোধনকেই যথেষ্ট মনে করে না, বরং সাথে সাথে সভ্যতার সেই সকল আচার-অনুষ্ঠানকেও অব্যাহত রাখে যেগুলোকে বর্তমান যুগে জীবনের প্রকৃত আনন্দ বলে মনে করে। এ কারণেই ইসলাম বিজিত দেশসমূহের যে সকল আচার-অনুষ্ঠান তাওহীদ বা ইসলাম বিরোধী নয় সেগুলোকে শুধু চালু রাখার অনুমতিই দেয়নি, বরং যথারীতি উহার পৃষ্ঠপোষকতা করেছে।

প্রাচীন গ্রীস ও ইসলাম

ইসলাম প্রাচীন গ্রীসের নিকট থেকে পাওয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের শুধু সংরক্ষণই করেনি, উহার পৃষ্ঠপোষতাও করেছে। চিকিৎসা শাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, অংকশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন বিজ্ঞান এবং দর্শনশাস্ত্র এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইসলাম এই জ্ঞানভাণ্ডারের শুধু হেফাজাতই করেনি, বরং উহাকে আরো পরিবর্তিত করেছে। মুসলমানগণ এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও গবেষণা কার্যে কতদূর উৎসাহী তা এর দ্বারাই প্রমাণিত হয়। বস্তুত ইউরোপের পুনর্জাগৃতি আন্দোলন (Renaissance) এবং বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক প্রগতির মূলভিত্তি হচ্ছে স্পেনীয় মুসলমানদের বৈজ্ঞানিক অবদান। মোটকথা ইসলামী ইতিহাসের কোন যুগেই কেউ সভ্যতার পথে বাধার সৃষ্টি করেনি।

আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্বন্ধে ইসলামের দৃষ্টিভংগি

পূর্ববর্তী সভ্যতা সম্পর্কে ইসলামের যে দৃষ্টিভংগি ছিল আধুনিক যুগের পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কেও ইসলাম সেই একই রূপ দৃষ্টিভংগি পোষণ করে। ইসলাম উহার কল্যাণকর দিকগুলোকে কখনো অস্বীকার করে না কিন্তু উহার

ধ্বংসাত্মক ও মানবতাবিরোধী আচার-আচরণকে কখনো গ্রহণ করে না। ইসলাম উহার অনুসারীগণকে বৈজ্ঞানিক বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বল্গাহীনভাবে আজাদ করে দেয়ার পক্ষপাতী নয়। অন্যান্য সভ্যতার সাথে ইসলামী সভ্যতার দ্বন্দ্বের মাঝে ব্যক্তিগত বা গোত্রীয় পক্ষপাতিত্বের কোন স্থান নেই। কেননা ইস-লাম সমগ্র বনি আদমের ঐক্য ও অখণ্ডতার পতাকাবাহী। গোত্র-বর্ণ, ভাষা-পেশা ও স্থান-কাল নির্বিশেষে সকল মানুষকে একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করাই উহার কাম্য।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও ইসলাম

ইসলামী আন্দোলন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বিরোধী নয় এবং মুসলমানরাও চায় না যে, বিভিন্ন হাতিয়ার ও অস্ত্র-শস্ত্রের উপর 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখিত থাকতে হবে। এও তাদের ইচ্ছা নয় যে, তাদের আবাসগৃহে, খেত-খামারে বা কল-কারখানায় ওগুলোকে ব্যবহার করবে না। কেননা এগুলোতো নিষ্প্রাণ হাতিয়ার মাত্র ; এগুলোর না আছে ধর্ম, না আছে দেশ। তবে এগুলোর ভুল বা নির্ভুল ব্যবহারের কারণে যে সারা বিশ্বের মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত বা উপকৃত হয় তাতে কোন সন্দেহ নেই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি তোপের কথাই ধরুন। উহার না আছে ধর্ম, না আছে বর্ণ, আর না আছে কোন দেশ। কিন্তু ইসলামের মতে, উহাকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করে উহার সাহায্যে কারুর উপর জুলুম করা কোনক্রমেই বৈধ নয় ; কোন মুসলমানেরই এরূপ করার অধিকার নেই। বরং তার কাজ হলো এই যে, মানুষকে জালেমদের নির্যাতন থেকে বাঁচাবার জন্যে তোপ ব্যবহার করবে কিংবা আল্লাহর দুনিয়ায় আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে উহার সাহায্য গ্রহণ করবে।

অনুরূপভাবে ফিল্ম বা চলচ্চিত্রও একটি আধুনিক আবিষ্কার। ইসলাম উহারও বিরোধী নয়। একজন মুসলমানের নিকট ইসলাম শুধু এতটুকুই দাবী করে যে, সে ফিল্মকে পবিত্র ধ্যান-ধারণা, সৎকর্ম এবং মানব সমাজের হক ও বাতিলের দ্বন্দ্বকে তুলে ধরার জন্যে ব্যবহার করুক। নির্লজ্জতা, নগ্নতা (Nudity) ও ঘৃণ্য চিন্তাধারার প্রকাশ ও প্রচারের মাধ্যম হিসেবে উহাকে গ্রহণ করার অধিকার কোন মুসলমানের নেই। নৈতিক, মানসিক অধপতনের ফলে সমাজে যে জঘন্য কার্যকলাপের সয়লাব চলছে তার প্রতিফলনকে ইসলাম সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। উহার মতে এই প্রকার ফিল্ম মানবতা বিধ্বংসী ও ন্যক্কারজনক। উহার মধ্যে মানবতার জন্যে কল্যাণকর কিছুই নেই। উহা মানুষের আদিম ও পাশবিক বৃত্তিগুলোকেই জাগ্রত করে দেয়। সুতরাং অনস্বীকার্য যে, এই শ্রেণীর ফিল্ম মানুষের আত্মিক ও মানসিক উন্নতির জন্যে কখনো সহায়ক হতে পারে না। বরং তার জন্যে চূড়ান্ত পর্যায়ের ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক বলে প্রমাণিত হয়।

ইসলাম মানুষের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহের কখনো বিরোধিতা করে না। উহা মুসলমানদেরকে শিক্ষা দেয়, বিজ্ঞানের কল্যাণকর অবদানসমূহকে নিজেদের মহান লক্ষ্য হাসিলের জন্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। হযরত বিশ্বনবী (সা) এরশাদ করেন ঃ

"জ্ঞান আহরণ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য।"

সম্ভবত এ ব্যাখ্যা এখানে নিষ্প্রয়োজন যে, জ্ঞান বলতে সর্ববিধ জ্ঞানকেই বুঝায়। হযরত বিশ্বনবী (সা) যেন বলতে চেয়েছেন যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত দিক ও বিভাগেই মুসলমানদের অগ্রসর হওয়া কর্তব্য।

মোটকথা যে সংস্কৃতি ও সভ্যতা সত্যিকার মানব সেবায় নিয়োজিত ইসলাম তার বিরোধিতা করে না। কিন্তু কোন সভ্যতা যদি মদ্যপান, জুয়া, বেশ্যাবৃত্তি, ব্যভিচার, নৈতিক বিপর্যয়, উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, স্নায়ু যুদ্ধের অপকৌশল ও নানাবিধ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এক একটি জনগোষ্ঠীকে দাসত্বের নিগড়ে ধ্বংস করে দিতে তৎপর হয়, ইসলাম তাকে কোনক্রমেই সমর্থন করে না। বরং ইসলাম তাদের বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে—যাতে করে বিশ্ববাসী তাদের যাবতীয় ব্যধি ও ধ্বংসলীলা থেকে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়।

ইসলাম ও পশ্চাদমুখিতা

কিছু সংখ্যক ভুলদর্শী ইসলাম বিরোধীকে বলতে শোনা যায়, ইসলামী জীবনব্যবস্থা আধুনিক যুগের প্রয়োজন ও চাহিদা মেটানোর জন্যে আদৌ যথেষ্ট নয়। এবং নয় বলেই এ যুগের লোকদের নিকট উহা গ্রহণযোগ্য হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। তাদের মতে ইসলামের আইন-কানুন কেবল সেই অতীতকালের জন্যেই প্রযোজ্য ছিল। এ যুগে উহার যে শুধু কার্যকারিতাই শেষ হয়ে গেছে তা-ই নয়, বরং উহা উন্নতি ও প্রগতির পথে দস্তুরমত বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা বলে ঃ

০ "তোমরা কি আজও সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার পক্ষপাতী ? (-অথচ আধুনিক যুগের অর্থনীতির জন্য উহার প্রয়োজন অপরিহার্য।)"

০ "তোমরা কি আজও এটা চাও যে, যাকাতের অর্থ যে এলাকা থেকে সংগ্রহ করা হবে সেই এলাকার লোকদের কল্যাণের জন্যেই উহা ব্যয় করা হবে ? প্রথমত, যাকাত একটি অনুন্নত পন্থা এবং উহা আধুনিক সরকারের কোন প্রয়োজন মেটায় না। দ্বিতীয়ত, কোন নগর বা এলাকার গরীব লোকদের মধ্যে যখন সে এলাকার ধনী লোকদের যাকাতের অর্থ বিতরণ করে দেয়া হয় তখন মানসিকভাবে তারা অত্যন্ত আহত হয়। কেননা তাদের জন্যে এই অর্থ ভিক্ষার চেয়ে উন্নতমানের কিছুই নয়।"

০ "তোমরা কি মদ, জুয়া, নারী-পুরুষের অবাধ মেলাশেমা, নাচ-গান, আনন্দ-স্ফূর্তি ও মিতালীর বিরুদ্ধেও বিধি-নিষেধ আরোপ করতে চাও—অথচ এর প্রত্যেকটিই বর্তমান সামাজিক জীবনের জন্যে অপরিহার্য ?"

অর্থনীতির জন্যে সুদকে অপরিহার্য বলা ভিত্তিহীন

ইসলাম সুদকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছে একথা ঠিক। কিন্তু এ ধারণা একেবারেই ভিত্তিহীন যে, অর্থনীতির জন্যে সুদ অপরিহার্য। বর্তমান যুগেও দু'টি জীবনব্যবস্থায়—ইসলাম ও সমাজতন্ত্রে সুদকে অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা বলে স্বীকার করে না। এ দু'টির মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, সমাজতন্ত্র স্বীয় চিন্তাধারা অনুযায়ী আমল করার এবং জনগণকেও সে অনুযায়ী জীবনযাপন করতে বাধ্য করার প্রয়োজনীয় শক্তি ও ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিক এবং ইসলামের হাতে এরূপ কোন ক্ষমতা নেই। ইসলাম যদি এই ক্ষমতার অধিকারী হতো তাহলে উহা দেখিয়ে দিত ঃ ইসলামী অর্থনীতির বাস্তবায়নে সুদের কোন প্রয়োজনীয়তাই নেই। সুদের ভিত্তিতে উহাকে রচনাই করা হয়নি। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার অর্থনৈতিক কাটামোকে যেমন করে সুদের উপর ভিত্তি

করে গড়ে তোলা হয়নি, তেমনি করে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবেই ইসলামী অর্থনৈতিক কাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে।

অর্থনীতি বিশারদদের সাক্ষ্য

সুদকে কোনক্রমেই আধুনিক যুগের অর্থনীতির অপরিহার্য অংগ বলে সাব্যস্ত করা যায় না। এর অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা শুধু সেই সকল পুঁজিপতিদের জন্যে যারা একে বাদ দিয়ে পুঁজিপতিই হতে পারে না। পাশ্চাত্যের শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতি বিশেষজ্ঞরা এই সুদের বিরোধী। তারা আমাদেরকে এই মর্মে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, সুদের বিরুদ্ধে বিধি-নিষেধ আরোপ করা না হলে ক্রমেক্রমে দেশের সমস্ত সম্পদই গুটিকতক ব্যক্তির হাতে কুক্ষিগত হয়ে পড়বে এবং দরিদ্র জনসাধারণ অর্থনৈতিকভাবে ধ্বংসগ্রস্ত হয়ে পুঁজিপতিদের অধীন ও অসহায় দাসে পরিণত হবে। পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদের ইতিহাসে এরূপ অসংখ্য ঘটনা বর্তমান যাতে করে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের উপরোক্ত আশংকা সম্পূর্ণরূপেই নির্ভুল। ইসলাম সুদ ও ইজারাদারীকে—যা পুঁজিবাদের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। আজ থেকে প্রায় দু' হাজার বছর পূর্বে যখন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কোথাও কোন অস্তিত্ব ছিল না, সম্পূর্ণরূপেই নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। ইসলামী জীবনব্যবস্থার উপস্থাপক আল্লাহ সর্বশক্তিমান ও অন্তর্যামী, যিনি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষের যাবতীয় অবস্থা ও কর্মতৎপরতার প্রতি সর্বক্ষণ দৃষ্টি রাখছেন এবং তিনি জানেন, সুদে কি কি অনিষ্টতা বিরাজমান। সুদের মাধ্যমে কি কি অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হওয়া সম্ভবপর।

অপমানকর বাধ্যবাধকতা

যে দেশ বা জাতির অর্থনীতি ভিন দেশের অর্থ সাহায্যের উপর নির্ভরশীল তার জন্যে সুদ একটি অপমানকর বাধ্যবাধকতা বলে গণ্য হতে পারে, কিন্তু ইসলামী অর্থনীতি সম্পূর্ণরূপেই নিরপেক্ষ ও স্বাধীন। স্বাধীন ও স্থায়ী ভিত্তির উপর উহাকে নির্মাণ করা হয়েছে। অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে উহার যাবতীয় সম্পর্ক নিছক সাম্যের ভিত্তিতে নির্ণয় করা হয়—আনুগত্য বা গোলামীর নীতির ভিত্তিতে নির্ণয় করা হয় না। অনুরূপভাবে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের দিক-নিদের্শনা ইসলামের সেই বিধান ও নীতির আলোকেই গ্রহণ করা হয় যার ভিত্তিতে সুদকে সম্পূর্ণরূপেই হারাম বলে গণ্য করা হয়েছে। এই নীতির আলোকে স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ইসলামী অর্থনীতির যে রূপরেখার সৃষ্টি করা হয়েছে তা সমগ্র দুনিয়ায় উন্নতি ও শ্রেষ্ঠত্বলাভের অনন্য মাধ্যম ছাড়া আর কিছুই নয়।

যাকাতের নির্ভুল অবস্থান

যাকাতের সম্পর্ক যতদূর বর্তমান সে সম্পর্কে আমরা পূর্বেই বলেছি যে, উহা গরীবের প্রাপ্য। দান-খয়রাত বা ভিক্ষা নয় ; বরং এ হচ্ছে আল্লাহর স্পষ্ট

বিধান। (সামাজিক কল্যাণ বিধানে) এ হচ্ছে এমন এক অধিকার যার হেফাযতের জন্যে স্বয়ং রাষ্ট্রকেই দায়িত্ব পালন করতে হয়।

এখানে আমরা যাকাতের স্থানীয় নীতি অর্থাৎ যে এলাকা থেকে যাকাত আদায় করা হবে তা সেই এলাকার লোকদের মধ্যেই বিতরণ করার নীতি সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন।

বড়ই পরিতাপের বিষয়, আমাদের এখানকার বহু বিজ্ঞজন পাশ্চাত্য জগত থেকে আমদানী করা প্রতিটি ব্যবস্থা ও পদ্ধতিকে সভ্যতার চরম উৎকর্ষ মনে করে উহার ভক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু ঐ জিনিসকেই যখন ইসলাম তাদের নিকট উপস্থাপিত করে তখন তারা উহাকে পশ্চাদমুখিতা ও মূঢ়তা বলে আখ্যায়িত করে।

আমেরিকার দৃষ্টান্ত

এই সকল বিজ্ঞজনকে একথা স্মরণ করিয়ে দেয়া বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (United States of America) পরিচালনা ব্যবস্থা পূর্ণাংগ বিকেন্দ্রীকরণ নীতির (Dicentralisation) উপর প্রতিষ্ঠিত। যে রাষ্ট্রগুলো নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়েছে ঐগুলোর সাধারণ ব্যবস্থাপনায় উহার প্রতিটি গ্রাম ও প্রতিটি মহল্লা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক দিক থেকে এক একটি অখণ্ড পূর্ণাংগ ও স্বাধীন এলাকা বলে বিবেচিত। এগুলোর মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলই স্ব স্ব এলাকায় বসবাসকারী লোকদের উপর কর ধার্য করে, যথারীতি আদায় করে এবং পরে উহাকে উক্ত গ্রাম ও মহল্লার শিক্ষা, চিকিৎসা, যোগাযোগ এবং অন্যান্য সামাজিক প্রয়োজন মেটাবার কাজে ব্যয় করে। বিভিন্ন খাতে ব্যয় করার পরে কোন অর্থ উদ্বৃত্ত থাকলে উহাকে নগর বা রাষ্ট্রের উপরস্থ শাসকদের হাতে অর্পণ করা হয়। অন্যদিকে গ্রাম ও মহল্লার খাতওয়ারী ব্যয় যদি আয়ের চেয়ে বেশী হয়ে যায়, তাহলে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এ অর্থ পূরণ করে দেয়া হয়। নিসন্দেহে এটা একটি সুন্দর ব্যবস্থাপনা। এতে বিভিন্ন মানবীয় প্রচেষ্টাকে এমনভাবে সুশৃংখলিত করা হয় যে, ব্যয়ের সমস্ত বোঝাকেই ভাগ করে দেয়া হয়। একা কেন্দ্রীয় সরকারকে ইহা বহন করতে হয় না। অধিকন্তু, যেহেতু স্থানীয় লোকদের হাতেই ব্যয়-বন্টন করা হয় সেহেতু তাদের প্রয়োজনের প্রতিও পুরোপুরি লক্ষ্য রাখা হয়। কেননা স্থানীয় লোকেরা এলাকার প্রয়োজনের কথা কেন্দ্রের চেয়েও সুন্দরভাবে অবগত থাকে।

তের শ' বছর পূর্বে

আমাদের এখানকার বিজ্ঞজনেরা আমেরিকার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। অথচ তারা ভুলে যান যে, ইসলাম তাদের গৃহীত ব্যবস্থাপনাকে আজ থেকে তের শ'

বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রতিটি এলাকার শাসকবৃন্দ নিজ নিজ এলাকার কর সংগ্রহ করতেন এবং উহা দ্বারা স্থানীয় লোকদের যাবতীয় অভাব ও প্রয়োজন পূরণ করতেন। আয় ও ব্যয়ের পার্থক্য দেখা দিলে, হয়ত কেন্দ্রীয় কোষাগারে জমা করা হতো, নতুবা ঋণ আকারে প্রদান করা হতো।

যাকাত বন্টন সম্পর্কে কথা হলো ঃ ইসলামী আইনে এমন কোন ধারা নেই যে, যাকাত অপরিহার্য রূপেই নগদ অর্থ বা সম্পদ আকারে লোকদের মধ্যে বিতরণ করে দিতে হবে। যাকাতের অর্থ গরীবদের শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদির ন্যায় সামাজিক প্রয়োজন মেটাবার জন্যেও ব্যয়িত হতে পারে এবং বার্ধক্য, দুর্বলতা ও শৈশবের কারণে যারা কাজ করতে অক্ষম তাদেরকে নগদ অর্থ প্রদান করেও সাহায্য করা যেতে পারে।

আজ যদি আমরা আমাদের বর্তমান সমাজে ইসলামী অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত করতে চাই তাহলে আমাদের এতটুকু করলেই চলবে যে, আমাদের দেশে এমন ছোট ছোট স্বতন্ত্র ও একক ব্যবস্থাপনার সৃষ্টি করতে হবে যা রাষ্ট্র, মুসলিম জাহান এবং গোটা বিশ্বের ব্যবস্থাপনার ভেতরে অবস্থান করেই স্থানীয় সমস্যাগুলোর সুষ্ঠু সমাধান দিবে এবং স্থানীয় সকল মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন মেটাবার দায়িত্ব পালন করবে।

ইসলাম ও সামাজিক বিপর্যয়

তথাকথিত "উন্নতিকামীরা" মদ্যপান, জুয়া, নর-নারীর অবাদ মেলামেশা ইত্যাদি নিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করে। ইসলাম এর প্রত্যেকটিরই ঘোর বিরোধী।

মদ্যপান ঃ মদ্যপান প্রকৃতপক্ষে কোন না কোন সামাজিক বা ব্যক্তিগত বিপর্যয়ের স্পষ্ট নিদর্শন। মদ এবং অন্যান্য নেশাকর জিনিসের প্রয়োজন কেবলমাত্র একটি রুগ্ন ও বিপর্যস্ত সমাজের জন্যেই হতে পারে। যে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মাঝে এতখানি দুস্তর ব্যবধান যে, একদিকে কিছু সংখ্যক লোক আরাম-আয়েশ ও বিলাস-ব্যসনে এতদূর ডুবে যায় যে, তাদের যাবতীয় মানবীয় অনুভূতি বিনষ্ট হয়ে যায়। আর অন্যদিকে দেশের আপামর জনতা বঞ্চিত ও অসহায় অবস্থায় ধুকে ধুকে মরতে থাকে। বস্তুত এই অসহায় জনগোষ্ঠীরই সত্য থেকে পলায়নের পথ অনুসন্ধান করে এক নেশার জগতে আশ্রয় নিতে চায়। এ কারণেই ঐ সকল সমাজে মদ ও অন্যান্য নেশার ব্যবহার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে যেখানে মানবীয় চিন্তার উপর নানা প্রকার বিধি-নিষেধ আরোপ করে উহার স্বাভাবিক গতিকে রুদ্ধ করে দেয়া হয় এবং যেখানে লোকেরা তাদের জীবন-জীবিকার প্রশ্নে এমনভাবে মশগুল হতে বাধ্য

হয় যে, অন্য কোন বিষয়ের প্রতি তাদের কোন লক্ষ্যই থাকে না। অনুরূপভাবে ঐ সকল দেশেও এই মাদকাসক্তি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে যেখানে আধুনিক কল-কারখানা থাকার কারণে অনর্থক হুর-হাঙ্গামা ও হৈচৈর সৃষ্টি হতে থাকে।

ব্যধির আলামত, বৈধ হওয়ার কারণ নয়

কিন্তু সামাজিক কারণ যতই থাকুক না কেন, মদ্যপান বৈধ হওয়ার পক্ষে উহা কোন কারণ বলে স্বীকৃত হতে পারে না। অবশ্য যেহেতু মদপান হচ্ছে ব্যধির আলামত সে কারণে উহাকে নিষিদ্ধ করার পূর্বে উক্ত সমাজের সেই বিপর্যয়ের সংশোধন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। যে কারণে এই ব্যধিটির সৃষ্টি হয়েছে। ইসলাম উহাকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার জন্যে এই সুষ্ঠু কর্মসূচীই গ্রহণ করেছে। উহা সর্বপ্রথম যে সকল অন্যায় ও পাপাচার মদ পানের জন্যে দায়ী ছিল তার সবগুলোকেই নির্মূল করে দেয়। এবং এদিক থেকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হওয়ার পরেই মদ পানকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করে। আধুনিক সভ্যতার ধ্বজাধারীরা ইসলামের প্রতি কটাক্ষ করার পরিবর্তে যদি উহার নিকট থেকে নিজেদের সামাজিক, রাজনৈতিক, মানসিক ও নৈতিক অবস্থা উন্নয়নের এবং মানুষের আত্মিক ব্যধিসমূহের চিকিৎসা পদ্ধতি শেখার জন্যে অগ্রসর হতো তাহলে এটা তাদের জন্যে অধিক কল্যাণকর হতো এবং তারাও ইসলামের নিকট থেকে অনেক উপকৃত হতো।

জুয়া সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। কেননা একমাত্র নির্বোধ ও বেআকুফ ব্যক্তিরাই একে পসন্দ করতে পারে।

নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা ও ইসলাম

নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশাকে কেন্দ্র করে আজকাল বড্ড উত্তপ্ত আলোচনা চলছে। আসুন, এই বিষয়টির প্রতি আমরাও দৃকপাত করি ঃ

অনেক স্থূলদর্শী ইসলামকে শুধু এ জন্যেই প্রতিক্রিয়াশীল ধর্ম বলে মনে করে যে, উহা নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশার উপর অযথা বিধি-নিষেধ আরোপ করে। এই লোকেরা ফরাসী সভ্যতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সেখানে আশেক-মাশুক তথা প্রেমিক-প্রেমাস্পদের জুটিরা প্রকাশ্য জনপথে শত শত লোকের উপস্থিতিতে চুম্বন ও যৌন কেলিতে মেতে উঠতে পারে ; কোন ব্যক্তিই কোন বাধার সৃষ্টি করতে পারে না। বরং পুলিশ যদি এদেরকে যৌন কেলিতে বেহুশ অবস্থায় দেখতে পায় তাহলে পথচারীরা যাতে তাদেরকে বিরক্ত করতে না পারে সে জন্যে যথারীতি পাহারা দিতে থাকে। আর যারা এসব দৃশ্য দেখতে নারাজ তাদের প্রতি কেউ ভ্রুক্ষেপই করে না।

কিছু লোক এমন রয়েছে যারা আমেরিকার জীবন পদ্ধতিকে মনে প্রাণে ভালোবাসে। কেননা সেখানকার লোকেরা নিজেদেরকে কখনো ধোঁকা দেয় না।

যৌন স্পৃহা চরিতার্থ করাকে তারা জীবনের জন্যে অপরিহার্য বলে মনে করে। সুতরাং এই প্রয়োজন মেটাবার যাবতীয় ব্যবস্থার প্রতিও তারা লক্ষ্য রাখে। বস্তুত এ কারণেই সেখানে প্রতিটি মেয়ের জন্যে থাকে বয় ফ্রেণ্ড (Boy Friend) এবং ছেলের জন্যে থাকে গার্ল ফ্রেণ্ড (Girls Friend)। সেখানকার লোকেরা তাদের বেশীর ভাগ সময়ই ব্যয় করে বাইরের লোকদের সাথে মিলেমিশে। জনবসতির বাইরে তারা ব্যবস্থা করে বর্ণাঢ্য বনভোজনের। সেখানে তারা আদি কামরসে টুইটুম্বুর হয়ে খোলামেলাভাবেই যৌন কেলিতে ডুবে যায়। এভাবে বনভোজন (Picnic) থেকে তারা এমন পরিতৃপ্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করে যে, এরপর পরিপূর্ণ মনোযোগের সাথে তারা পড়াশুনা বা অন্যান্য কাজ করতে থাকে। আর এতে করে দেশের ফসল ও উৎপাদন বহুগুণে বেড়ে যায় এবং গোটা জাতির উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়ে যায়।

নৈতিক দেউলিয়াপনার মোহ

কিন্তু এই স্থূলদর্শী ব্যক্তিরা—যারা পাশ্চাত্যের নৈতিক দেউলিয়াপনার মোহে একেবারেই আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে—একথা ভুলে যান যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে জার্মানী যখন ফ্রান্স আক্রমণ করে তখন ফ্রান্স সামান্যতম প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে না পেরে সংগে সংগেই আত্মসমর্পণ করে। ফ্রান্সের এই অপমানকর পরাজয়ের কারণ সেনাবাহিনীর ত্রুটিপূর্ণ প্রশিক্ষিণ বা অস্ত্রশস্ত্রের অল্পতা ছিল না। বরং এর মূল কারণ ছিল ঃ ফরাসীরা জৈবিক আনন্দ-উল্লাস, যৌন ব্যভিচার এবং নৈতিক অবক্ষয়ের করুণ শিকার হয়ে জাতীয় প্রেরণা একেবারেই হারিয়ে ফেলে এবং ভেতর থেকেই অন্তসারশূন্য হয়ে পড়ে। তখন তারা এই ভেবে শংকিত হয়ে উঠে যে, যুদ্ধ অব্যাহত থাকলে প্যারিসের আকাশ চুম্বি অট্টালিকা, সাধের প্রেক্ষাগৃহ ও মনোরম পার্কসমূহ বোমার আঘাতে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। পশ্চিমা সভ্যতার মোহমুগ্ধ বিজ্ঞজনেরা তাদের এলাকায়ও কি এই নাটকের পুনরাবৃত্তি করতে চায়?

আমেরিকার বিভ্রান্তিকর জীবনের আভ্যন্তরীণ অবস্থা জানার জন্যে স্বয়ং আমেরিকা সরকারের পরিসংখ্যানই যথেষ্ট। তাতে দেখা যায়, মাধ্যমিক স্কুলগুলোর শতকরা আটত্রিশজন অবিবাহিত মেয়েই গর্ভবতী। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিচের স্তরসমূহের যে প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে সেখানে ছাত্রীদের মধ্যে গর্ভবতী হওয়ার এই অনুপাত অনেকটা কম। কেননা জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণের ক্ষেত্রে তারা স্কুল ছাত্রীদের চেয়ে অধিকতর অভিজ্ঞ ও পারদর্শী।

শুভ উদ্দেশ্য, সুন্দর মাধ্যম

যৌন স্পৃহা চরিতার্থ করার সুযোগ লাভ নিসন্দেহে একটি নির্দোষ ও শুভ উদ্দেশ্য। ইসলাম এ জন্যেই এই বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে।

কেননা ইহা অবগত আছে যে, মানুষ যখন যৌন দিক থেকে অতৃপ্ত থেকে যায় তখন সে এমন এক অস্থিরতায় ভুগতে থাকে যে, অন্য কোন কাজের প্রতি লক্ষ্য দেয়ার যোগ্যতাই তার থাকে না। ফলে জাতীয় উন্নতি ও উৎপাদন সামগ্রিক-ভাবেই ব্যাহত হয়। কিন্তু এ সত্যকে কখনো অস্বীকার করা যায় না যে, শুভ উদ্দেশ্য অর্জন করার জন্যে মাধ্যমকেও হতে হয় সুন্দর। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্যে গোটা সমাজের নৈতিকতাকে বিনষ্ট করা কিংবা যুবক-যুবতীদেরকে জন্তু-জানোয়ারের মত একে অন্যের পেছনে ছুটে চলার স্বাধীনতা দেয়া নিশ্চয়ই কোন নির্দোষ পদ্ধতি নয়।

আমেরিকান জীবনের বাহ্যিক চাকচিক্য

কিছু সংখ্যক ভ্রান্তদর্শী বিজ্ঞজনদের ধারণা হলো ঃ আমেরিকার যাবতীয় বিস্ময়কর উৎপাদন ও উন্নতির মূলে রয়েছে তাদের যৌন পিপাসা চরিতার্থ করার বল্গাহীন স্বাধীনতা। কিন্তু তাদের জানা উচিত যে, আমেরিকা আজ পর্যন্ত সমস্ত দুনিয়াকে যে উৎপন্ন দ্রব্যাদি দিয়েছে তা শুধু বস্তুগত উৎপাদন ছাড়া অন্য কিছুই নয়। এ উৎপাদনের হার যদি বর্তমান গতিতেই চলতে থাকে তাহলে অতি শীঘ্রই মানুষের পরিবর্তে শুধু নিষ্প্রাণ মেশিনগুলোকেই কাজ করতে দেখা যাবে। বস্তুত এ কারণেই বস্তুগত উন্নতি সত্ত্বেও মানসিক ও মানবিক দিক থেকে আমেরিকা আজ এতদূর পেছনে যে, আজও সেখানে সে দেশেরই স্বাধীন নাগরিক হাবশীরা দাসদের চেয়েও ঘৃণিত অবস্থায় জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। শ্বেতাংগরা তাদের উপর যে পাশবিক জুলুম করছে তারও কোন নযীর দুনিয়ায় নেই। এ হচ্ছে তাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা। বহির্বিশ্বে তারা আজ উপনিবেশবাদের নির্লজ্জ পৃষ্ঠপোষক ও সহায়ক বলে পরিচিত। মোটকথা, আমেরিকানদের এই বল্গাহীন যৌন ব্যভিচার, উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের পৈশাচিক উন্মাদনা এবং হাবশীদের গোলাম করে রাখার অমানুষিক জেদ তাদের মানসিক ও আত্মিক অধপতনের এমন এক অভিব্যক্তি যার কোন তুলনা সভ্য দুনিয়ার কোথাও নেই।

যৌন উচ্ছৃংখলতার পরিণাম

আজকাল পুরুষেরা সাধারণত সেই সকল নারীদের সাথে প্রকাশ্যভাবে মেলামেশা করতে আগ্রহী যারা (উর্বশীর ন্যায়) সাজসজ্জা (Makeup) করে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়। এর একমাত্র করণ হলো ঃ তারা তাদের বৈধ অধিকার নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার পরিবর্তে সব জায়গার স্বাদ গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। এটা মানুষের এক স্বাভাবিক দুর্বলতা বটে ; কিন্তু প্রশ্ন এই যে, মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি শুধু কামপিপাসা চরিতার্থ করা এবং জৈবিক আনন্দ-উল্লাসে মত্ত হওয়া ? কামপিপাসা চরিতার্থ করার যে আনন্দ পাওয়া যায় তা

কেউ অস্বীকার করতে পারে না। বিশ শতকের জন্যে এ কোন নতুন প্রশ্নও নয়। আজ থেকে হাজার হাজার বছর পূর্বে গ্রীস, রোম ও ইরানের লোকেরাও একথা জানত এবং তারা আপাদমস্তক এর মধ্যে ডুবে গিয়েছিল। কিন্তু এই সীমাতিরিক্ত কামান্ধতা ও আনন্দ-স্ফূর্তি এই জাতিগুলোকে তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে একেবারেই উদাসীন করে দিয়েছিল। ফলে ধীরে ধীরে তারা সরকার, ক্ষমতা ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং একদিন তাদের সভ্যতার শেষ চিহ্নটুকুও মুছে গিয়েছে।

আধুনিক পাশ্চাত্য জগত ও আমরা

আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের নিকট জীবনের বস্তুগত উপায় অবলম্বন বহুল পরিমাণে বর্তমান। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার, অপরিমেয় উৎপাদন এবং কাজ-কর্মের অসংখ্য উপায় তাদের হাতের মুঠোয়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও জৈবিক ও পাশবিক প্রবৃত্তির দাসত্বের কারণে তাদের আংশিক পতনের সূত্রপাত ঘটেছে। কিন্তু আমরা—যারা বিগত দু' শতক ধরে প্রতিকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে পাশ্চাত্য জগতের বিপক্ষে সীমাহীন দূরবস্থার ভেতর দিয়ে কালাতিপাত করছি। সভ্যতা ও প্রগতির নামে কিংবা প্রতিক্রিয়াশীল বলে ঠাট্টা-বিদ্রূপের ভয়ে ভীত হয়ে জৈবিক ও পাশবিক আনন্দে বিভোর হই, তাহলে পরিশেষে আমরা কি লাভ করবো ? এর পরিণতি শুধু এই হবে যে, আমাদের অবস্থা অধিক হতে অধিকতর শোচনীয় হয়ে পড়বে, তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। উহাকে কখনো আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবো না। আলোকপ্রাপ্ত চিন্তার দাবীদাররা চায় যে, আমরা আমাদের ঐতিহাসিক সুখ্যাতি ও ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই। তারা মূলত উপনিবেশবাদী সাম্রাজ্যবাদের একনিষ্ঠ এজেন্ট ছাড়া অন্য কিছুই নয়। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদীরা "আলোকপ্রাপ্ত" সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদদেরকে নানাভাবে 'সাবাস' দিয়েই চলেছে। কেননা সাম্রাজ্যবাদীরা ভালোরূপেই অবগত আছে যে, তারা নিজেদের জাতীয় চরিত্রে অবক্ষয় ঘটাতে এবং তরুণদের পাশবিক নেশায় উন্মাদ করে তুলতে পারলে তাদের ঘৃণ্য উদ্দেশ্যসমূহ অতি সহজেই সফল হতে পারবে।

পাশ্চাত্য নারীদের অভিজ্ঞতা—একটি প্রশ্ন

প্রতারিত ব্যক্তিদের অনেকেই বলেন ঃ "পাশ্চাত্য সমাজের নারীদের অবস্থা দেখুন। তারা কত উন্নত ? সকল সামাজিক অধিকারই তারা পুরোপুরি ভোগ করছে। সেখানকার সমাজ জীবনে তারা গভীরভাবে জড়িত।" নিসন্দেহে পাশ্চাত্য জগতে মহিলারা যথারীতি চাকুরী করছে এবং পুরুষদের সাথে অবাধ মেশার মাধ্যমে তারা যে ব্যাপক অভিজ্ঞতা লাভ করছে তা তারা গৃহের চার দেয়ালের ভেতরে থেকে সন্তানদের লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে

কিছুতেই লাভ করতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, গৃহের বাইরে নারীরা এই যে অভিজ্ঞতা লাভ করছে তার সাথে তাদের নারীত্বের সম্পর্ক কতটুকু ? এতে করে তাদের নারীত্বের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে কি ? নতুন করে কোন কল্যাণ সাধিত হয়েছে কি ? না, এতে করে নারীত্বের কোন অবমাননা হয়েছে ?

আমরা দ্বিতীয়বার এই প্রশ্ন এভাবেও করতে পারি যে, নারীদের এই বাইরের অভিজ্ঞতার ফলে মানবীয় জীবনের সত্যিকার কোন লাভ হয়েছে কি ? এতে করে মানবীয় জীবনের কোন শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে কি ? না, এ কারণে পূর্ববর্তী কোন ভালো দিকের অবসান হয়েছে ?

পাশ্চাত্য সমাজের সমীক্ষা

পাশ্চাত্য জগতে নারীরা আজ পুরুষের অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে উঠেছে। তারা তাদের মনোরঞ্জন করে যৌন স্পৃহা চরিতার্থ করে—এমনকি বহু ব্যাপারেই তারা তাদের সমান অংশীদার হিসেবে কাজ করে।—কিন্তু না তারা আদর্শ স্ত্রী হতে পারছে। না আদর্শ মা হতে পারছে। একথার বাস্তব প্রমাণ আমরা এখানেই পাই যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তালাক বা দাম্পত্য বিচ্ছেদের সংখ্যা শতকরা চল্লিশে গিয়ে পৌছেছে। ইউরোপে তালাকের সংখ্যা এর চেয়ে সামান্য কম। কিন্তু সেখানে বিবাহিত দম্পতিদের জন্যে উপপত্নী রাখা এবং অন্য নারী-পুরুষের সাথে 'এশক' ও ভালোবাসার লীলা বা যৌন কেলিতে মত্ত হওয়া দোষের কিছু নয়। পাশ্চাত্যের নারীরা যদি আদর্শ স্ত্রী হতো এবং নিজ নিজ গৃহের কল্যাণের জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে পারতো তাহলে এতবড় বিরাট অংকের দাম্পত্য বিচ্ছেদ কখনো সংঘটিত হতো না এবং গৃহকে 'বয়কট' করে চলার এই মানসিককতাও কোনদিন ব্যাপক হয়ে দেখা দিতো না। একথাও এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আদর্শ মা হওয়ার জন্যে যে অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার প্রয়োজন, চাকুরীরতা নারীরা তার কিছুই অর্জন করতে পারে না। আদর্শ মায়ের দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার জন্যে তাদের হাতে সময়ও নেই এবং সেই প্রেক্ষিতে প্রস্তুত হওয়ার মত মানসিকতাও নেই।

বিপদের ঘন্টা ধ্বনি

অনস্বীকার্য যে, নারী-পুরুষের এই অবাধ ও বল্গাহীন মেলামেশার ফলে যৌন পিপাসার সাময়িক নিবৃত্তি ছাড়া মানবতার অনুকূলে আজ পর্যন্ত কোন কল্যাণ সাধিত হয়নি, বলা বাহুল্য, কিছু সংখ্যক নারীকে পার্লামেন্টের সদস্য-মন্ত্রী কিংবা কোন বিভাগের প্রধান কর্মকর্তার দায়িত্বে নিয়োগ করলেই দুনিয়ার যাবতীয় সমস্যার সমাধান হতে পারে না। এবং হাজার হাজার বা লাখ লাখ নারীকে কারখানা, দোকান বা শোরুমের শোভা বর্ধনের জন্যে ব্যবহার করলেও

কোন কল্যাণ সাধিত হতে পারে না। কোন সমাজে নারীদের কার্যকরী প্রভাব শুধুই কি পার্লামেন্টে লম্বা-চওড়া বক্তৃতা দান এবং বিভিন্ন বিভাগের প্রধানদের নামে দিক নির্দেশনা পাঠানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ? কিছুতেই নয়। কেননা কোন বিবেকবান ব্যক্তিই মা হিসেবে নারীর শ্রেষ্ঠতম মর্যাদাকে অস্বীকার করতে পারে না ; তাদের লালন-পালনের মাধ্যমেই সমস্ত দুনিয়া আদর্শ নাগরিক লাভ করতে পারে। হতে পারে কোন কোন নারী মুহূর্মুহ করতালি বা "ধন্য ! ধন্য !!" আওয়াজের মধ্যে এই সত্যকে ভুলে যেতে পারে। কিন্তু এ সত্ত্বেও এই সত্যের অপলাপ করা কখনো সম্ভব নয় যে, মাতৃ স্নেহ বঞ্চিত মানবীয় প্রজন্ম যে স্নেহ ব্যতিরেকে মানুষ শৈশব থেকেই অপরাধ প্রবণ হয়ে উঠে—গোটা মানবজাতির মধ্যে মহাবিপদের ঘন্টা ধ্বনিতে পরিণত হয় ; আর উহার বিপক্ষে শ্রুতিমধুর শ্লোগানসমূহের কোন মূল্যই থাকে না। বস্তুত গোটা দুনিয়ার মানুষই মায়ের এই অনুপম স্নেহ কেবল মায়ের কোলেই লাভ করতে পারে যে তার সন্তানের কল্যাণের জন্যে দুনিয়ার সবকিছুই বিসর্জন দিতে সক্ষম।

সত্য অনুধাবনের তাগিদ

একথা ঠিক যে, নারীদের উপর এতখানি বোঝা চাপানোও সংগত নয় যে, যাবতীয় খুশী ও আনন্দ থেকে তারা পুরোপুরি বঞ্চিত হতে বাধ্য হবে এবং তার স্বকীয় ব্যক্তিত্ব বা মর্যাদা বলতে কিছুই থাকবে না। আবার নারী-পুরুষ কাউকেই মনগড়াভাবে জীবনযাপনের কোন অধিকারও দেয়া যাবে না। মোটকথা, আমরা যথেচ্ছভাবে যেমন জীবনযাপন করতে পারি না, তেমনি যা-ই ভালো লাগবে তার অনুসরণও করতে পারি না।

চিন্তার মুহূর্ত

চিন্তা করে দেখুন, দুনিয়ার সকল মানু . যদি এই স্বার্থ প্রসূত চিন্তায় মেতে উঠে এবং পাশবিক আনন্দ ও জৈবিক লালসা চরিতার্থ করার পথে কোন অন্তরায়কে বরদাশত করতে না চায় তাহলে তার পরিণাম কি হবে। একটি পরিণাম তো এই হবে যে, আমাদের স্বার্থপরতা ও পদস্খলনের শাস্তি আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম নানাবিধ মসিবত ও দুঃখ-দুর্দশার আকারে অবশ্যই পেতে থাকবে। আর একথা অনস্বীকার্য যে, নারীরা স্বকীয় কল্যাণের জন্যেও এটা কামনা করে না যে, ভবিষ্যত প্রজন্মের নারীরা শুধু এ কারণেই চিরকালের জন্যে দুঃখ ভোগ করতে থাকবে যে, একটি বিশেষ যুগের নারীরা যৌন আনন্দ ও জৈবিক লালসা চরিতার্থ করার জন্যে উন্মাদ হয়ে উঠেছিল।

ইসলাম যে জীবনব্যবস্থা দিয়েছে তা বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের সকল মানুষের জন্যেই। এটা এক প্রজন্মকে আরেক প্রজন্মের উপর প্রাধান্য দেয় না।

কেননা উহার দৃষ্টিতে সকল মানুষই একটি একক ও অখণ্ড স্বত্বা। সকল প্রজন্মের সকল মানুষ নিয়েই এটা গঠিত। ইসলামের এই বৈশিষ্ট্যের জন্যে কখনো এটাকে অভিযুক্ত করা যায় না। অবশ্য ইসলাম যদি মানুষের প্রাকৃতিক চাহিদার বরখেলাফ হতো কিংবা উহা পাইকারীভাবে সকল খুশী ও আনন্দকে নিষিদ্ধ বলে গণ্য করতো তাহলে উহার বিপক্ষে প্রশ্ন তোলা সংগত হতো। কিন্তু বিষয়টি কখনো এরূপ নয়।

ইসলাম ও যৌন সমস্যা

পাপ সংক্রান্ত চিরন্তন ধারণা

পাশ্চাত্যের মনস্তাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞরা ধর্মের বিরুদ্ধে একটি অপবাদ দিয়ে থাকে যে, উহা মানুষের জীবনীশক্তিকে নির্মূল করার শিক্ষা দেয় এবং পরিশেষে তাকে চিরন্তন পাপবোধের এমন গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত করে দেয় যে, যেখানে থেকে সে প্রতিটি কাজকেই পাপের কাজ বলে মনে করতে থাকে। আর তখন তার সামনে প্রায়শ্চিত্তের একটি মাত্র পথই খোলা থাকে—সে পথটি হলো জীবনের সকল আনন্দ ও খুশীকে সম্পূর্ণরূপেই বর্জন করা। তাদের এ দাবীর সমর্থনে তারা এ-ও বলে থাকে যে, ইউরোপ যতদিন ধর্মের অক্টোপাসে বন্দী হয়ে রয়েছে ততদিন মূঢ়তার গভীর অন্ধকার চতুর্দিক থেকেই তাদেরকে বেষ্টন করে রেখেছিল। কিন্তু যখন তারা ধর্মীয় স্বৈরাচারের হাত থেকে মুক্তিলাভ করে তখন তাদের আশা-আকাংখায় উন্নত চিন্তাধারার অবরুদ্ধ সয়লাব পুনপ্রবাহিত হতে শুরু করে এবং শুষ্কভূমিতে আবার বসন্তের আবির্ভাব ঘটে।

ধর্মের বিরুদ্ধে প্রশ্ন

মনস্তাত্ত্বিক পণ্ডিতরা বেশীর ভাগ সময়ে প্রশ্ন করে বসে ঃ তোমরা কি আমাদেরকে ধর্মের দিকে ফিরে যেতে বল ? তোমরা কি আমাদের প্রগতির পথে পুনরায় ধর্মীয় বিশ্বাসের পাহাড় রচনা করতে চাও ? তোমরা কি কামনা কর যে, আমাদের প্রতিশ্রুতিশীল প্রজন্মকে পদে পদে বাধা দিয়ে নির্জীব পাষাণ করে তুলবো ? নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে পাশ্চাত্যের লোকদের এই হলো মৌলিক প্রশ্ন। কিন্তু যেহেতু এখানে ধর্ম সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, বরং একমাত্র ইসলামই আমাদের আলোচ্য বিষয়। সেহেতু আমরা তাদের ধারণা সঠিক, না ভুল সে সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না। বরং যৌন সমস্যা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভংগি কি সে সম্বন্ধে আলোচনা করার পূর্বে দেখব, ইসলাম যৌন প্রেরণাকে নির্মূল করার শিক্ষা দেয় কি ? এবং এ-ও দেখব, যৌন স্পৃহার দমন (Sexual Repression) বলতেই বা কি বুঝায় ? কেননা দেখা যায়, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেই এর ভুল অর্থ করে এবং বিভিন্ন অবস্থায় একে খাপ খাইয়ে নেয়ার ব্যাপারেও ভুল পথ অনুসরণ করে।

যৌন স্পৃহা দমনের সঠিক মর্ম

যৌন স্পৃহা দমন (Sexual Repression) যৌন ক্রিয়া থেকে বিরত থাকার নাম নয়। বরং যৌন ক্রিয়াকে জঘন্য ও চরম ঘৃণার্হ কাজ বলে মনে করাই হচ্ছে এর সঠিক অর্থ।—এতদূর জঘন্য ও ঘৃণার্হ বলে মনে করা যে,

কোন সভ্য বা ভদ্র ব্যক্তিই এর কল্পনা করাকেও পাপ বলে বিশ্বাস করে। এই অর্থে যৌন স্পৃহা দমন মানুষের অজ্ঞাতসারে এক প্রকার উপলব্ধি হিসেবে বিরাজ করতে থাকে ; যৌন ক্রিয়ার বারবার পুনরাবৃত্তিও উহাকে নির্মূল করতে পারে না। যে ব্যক্তি যৌন স্পৃহা দমনের শিকার হয় সে প্রকৃতির হাতে বন্দী হয়ে যৌন ক্রিয়ায় তো অবশ্যই লিপ্ত হয়। তবে উহাকে অপবিত্র ও লজ্জাকর মনে করেই লিপ্ত হয়। এমন ব্যক্তি যদি প্রতিদিন বিশ বারও এই ক্রিয়ায় লিপ্ত তবুও সে যৌন রোগী বলে সাব্যস্ত হবে। এবং যখনই সে এই ক্রিয়ায় লিপ্ত হবে তখন তার মনে এই দ্বন্দ্ব উপস্থিত হবে যে, তার করণীয় কি ছিল এবং সে কী করে ফেলেছে। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সংঘটিত এই মানসিক দ্বন্দ্বের ফলে বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক বিভ্রাট ও ব্যধি সৃষ্টি হতে থাকে।

ফ্রয়েডের সাক্ষ্য

কেউ যেন এরূপ ধারণা না করে যে, যৌন স্পৃহা দমন কিংবা উহাকে বর্জন করার এই সংজ্ঞা গ্রন্থকার নিজেই মনগড়াভাবে উপস্থাপিত করেছেন। এরূপ ধারণা সঠিক নয়। কেননা যৌন স্পৃহা দমনের এই সংজ্ঞা ও অর্থ ফ্রয়েডের নিকট থেকেই গ্রহণ করেছি—যে সারা জীবন ধর্মকে এই বলে বিদ্রূপ করেছে যে, উহা মানুষের কর্মশক্তিকে নির্মূল করে দেয় এবং যাবতীয় কাজ ও কর্ম-চাঞ্চল্য থেকে মানুষকে বঞ্চিত করে দেয়। সে তার 'Three contributions to sexual Theory' নামক গ্রন্থের ৮২ পৃষ্ঠায় বলেছে ঃ "যৌন স্পৃহা দমন ও যৌন ক্রিয়া থেকে বিরত থাকার মধ্যে—যাকে এ কাজের অস্থায়ী বিরতি বলা চলে—পার্থক্য করা প্রয়োজন।"

ইসলামের দৃষ্টিভংগি

যৌন স্পৃহার দমন যৌন ক্রিয়াকে অত্যন্ত ঘৃণার্হ মনে করার অনিবার্য ফল ; এর সাথে যৌন ক্রিয়ার অস্থায়ী বিরতির কোন দূরতম সম্পর্কও বর্তমান নেই।—একথা শোনার পর এখন আসুন, এ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভংগি কি তাও আমরা যাচাই করে দেখি।

ইসলাম মানুষের প্রকৃতিকে সমর্থন করে

একমাত্র ইসলাম ছাড়া দুনিয়ায় এমন কোন ধর্মকেই যা মানুষের প্রাকৃতিক প্রেরণা ও সহজাত প্রবৃত্তিকে পবিত্র বলে সাব্যস্ত করে এবং উহার যথার্থ পৃষ্ঠপোষকতা করতে অগ্রসর হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন ঃ

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ

مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ط

"মানুষের জন্যে চিত্তাকর্ষক নারী, সন্তান-সন্ততি, সোনা-রূপার স্তুপ, চিহ্নিত অশ্ব, চতুষ্পদ জন্তু এবং চাষযোগ্য ভূমিকে অত্যন্ত আনন্দদায়ক বস্তুতে পরিণত করা হয়েছে।"—(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪)

আল্লাহর এই বাণী মানুষের মনের আনন্দদায়ক সবকিছুকে উল্লেখ করে উহার বাস্তবতাকে সম্পূর্ণরূপেই সমর্থন করছে। এই আয়াতে না উহার কোনটির বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা হয়েছে, না মানুষের প্রবৃত্তি ও প্রেরণাকে ভর্ৎসনা করা হয়েছে।

প্রবৃত্তির দাসত্বের প্রতি ভর্ৎসনা

একথা ঠিক যে, ইসলাম প্রবৃত্তির দাসত্বকে কখনো পসন্দ করে না এবং মানুষ এ ব্যাপারে অত্যধিক ঝুঁকে পড়ুক—এটাও ইসলামের কাম্য নয়। কেননা এরূপ হলে জীবনের সমস্ত নিয়ম-কানুনই ব্যর্থ হতে বাধ্য। মানুষের লক্ষ্য হলো সার্বক্ষণিক প্রগতি ও কল্যাণ। কিন্তু মানবতার উপর কুপ্রবৃত্তি ও জৈবিক লালসার শাসন যতদিন অব্যাহত থাকবে ততদিন এই কল্যাণের আশা করা নিছক বাতুলতা মাত্র। কেননা এটা মানবীয় শক্তিসমূহের উৎসকেই ধ্বংস করে দেয় এবং মানুষকে পশুত্বের সর্বনিম্ন স্তরে নামিয়ে দেয়।

প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ ও যৌন স্পৃহা দমনের মধ্যে পার্থক্য

ইসলাম কখনো চায় না যে, মানুষ অধপতনের শেষ সীমায় পৌঁছুক এবং পাশবিকতার শিকারে পরিণত হোক। কিন্তু এই মহান উদ্দেশ্য ও যৌন স্পৃহা দমন তথা জৈবিক প্রেরণাকে নির্মূল করার মধ্যে আসমান-জমিনের পার্থক্য বর্তমান। যৌন স্পৃহা দমনের নামে যৌন স্পৃহা এবং উহার সংশ্লিষ্ট প্রবৃত্তির লালসা ও জৈবিক প্রেরণাকে ঘৃণিত ও অপবিত্র মনে করে চিরপ্রচলিত পবিত্রতা ও আত্মিক উন্নতির মূলে যে কুঠারাঘাত করা হচ্ছে তা ইসলাম কখনো সমর্থন করে না।

সামাজিক কল্যাণ ও প্রবৃত্তি

মানুষের আত্মিক পবিত্রতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ইসলাম নীতিগতভাবেই মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিগুলোকে সমর্থন করে। অজ্ঞাতসারে উহাকে নির্মূল করার শিক্ষা ইসলাম কখনো দেয় না ; বরং বাস্তব জীবনে উহার কার্যকারিতাকে পুরোপুরিই সমর্থন করে যাতে করে এক যুক্তিসম্মত গণ্ডির মধ্যে মানুষ আনন্দ ভোগ করতে পারে অথচ অন্য কোন ব্যক্তি বা সমাজ তার কারণে দুঃখিত বা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। বস্তুত এ সত্য কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে, যে ব্যক্তি সদাসর্বদা কামরিপু চরিতার্থ করার পেছনে লেগে থাকে তার যাবতীয়

দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতা অনেক আগেই নিশেষ হয়ে যায়। জৈবিক লালসার রঙীন বেষ্টনীতে আবদ্ধ হয়ে সে অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। প্রবৃত্তি লালসা ছাড়া অন্য কিছু সে চিন্তাই করতে পারে না।

যখন কোন সমাজের সকল মানুষের যোগ্যতা ও শক্তি-সামর্থ এই জৈবিক লালসা চরিতার্থ করার পেছনে ব্যয়িত হতে থাকে তখন সেই সমাজটিই ব্যধিগ্রস্ত ও দুর্বল হয়ে পড়ে। কেননা আল্লাহ প্রদত্ত আইন-কানুনের বিরোধিতা করে এই নির্বোধ ব্যক্তিরা নিজেদের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করে সমস্ত বিভাগ গঠন করার পরিবর্তে কেবলমাত্র একটি তুচ্ছ বিভাগের জন্যেই উহাকে নষ্ট করে দিচ্ছে। ফলে পারিবারিক সম্পর্ক বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং সমাজ জীবনে নেমে আসছে দারুণ অস্থিরতা ও বিপর্যয়। অতপর সমাজ জীবনের যে অবস্থা ঘটে সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ط

"তুমি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ ধারণা করছো অথচ তাদের মন বিভিন্নমুখী।"

—(সূরা আল হাশর ঃ ১৪)

এই অবস্থা একটি জাতির ঠিক তখনই উপলব্ধি করা যায় যখন অন্য কোন জাতি তাদেরকে আক্রমণ করে জগতের বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করতে উদ্যত হয়। আধুনিক ফ্রান্সের ইতিহাস দ্বারা ইহা অকাট্যরূপে প্রমাণিত হয়।

ইসলাম মানুষকে আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে না

ইসলাম মানুষের ব্যক্তি জীবনে যে কিছু সংখ্যক শর্ত আরোপ করেছে তার উদ্দেশ্য হলো ঃ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যেন অন্য কোন ব্যক্তি, পরিবার বা সমাজের কোন প্রকার ক্ষতিসাধন না করেই জীবনের সকল প্রকার আনন্দ উপভোগ করতে পারে। শুধু এখানেই শেষ নয়, ইসলাম অত্যন্ত স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মানুষকে আনন্দ লাভ করার জন্যে আহবান জানাতেও দ্বিধা করেনি। কিছু সংখ্যক আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করুন ঃ

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ط

"(হে মুহাম্মাদ !) তাদেরকে বলুন, আল্লাহর সেই সৌন্দর্যকে কে হারাম করে দিল যা তিনি তার বান্দাদের জন্যে বের করে দিয়েছেন এবং আল্লাহর দেয়া পবিত্র জিনিসগুলোকেই বা কে নিষিদ্ধ করেছিল ?"

–(সূরা আল আ'রাফ ঃ ৩২)

وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ـ

"এবং দুনিয়া থেকে তোমার নিজের অংশ ভুলে যেয়ো না।"

–(সূরা আল কাসাস ঃ ৭৭)

كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ط

"আমি তোমাদেরকে যে পবিত্র বস্তু দিয়েছি তা আহার কর।"

–(সূরা আল আ'রাফ ঃ ১৬০)

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ع

"আহার কর, পান কর এবং সীমালংঘন করো না।"

–(সূরা আল আ'রাফ ঃ ৩১)

যৌন স্পৃহার গুরুত্ব

ইসলাম এতদূর স্পষ্ট ভাষায় যৌন সম্পর্কের গুরুত্বকে স্বীকার করে যে, বিশ্বনবী (সা) এরশাদ করেন ঃ

حُبِّبَ اِلَىَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ الطِّيْبُ وَالنِّسَاءُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِىْ فِى الصَّلٰوةِ

"তোমাদের দুনিয়ায় আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় হলো সুগন্ধি ও স্ত্রী জাতি, আর আমার চোখের জন্যে শীতলকারক হচ্ছে নামায।" [তাফসীরে ইবনে কাসীর]

এই হাদীসে স্ত্রী জাতিকে দুনিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধির সমান মর্যাদা দেয়া হয়েছে। অধিকন্তু যে নামায আল্লাহর নৈকট্যলাভের সবচেয়ে বড় মাধ্যম তার সাথে সাথেই এই স্ত্রী জাতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

আরেকটি উপলক্ষে হযরত বিশ্বনবী (সা) যখন বলেছিলেন ঃ "স্ত্রীর সাথে মিলিত হলেও মানুষকে সওয়াব দেয়া হয়।" তখন মুসলমানগণ বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন ঃ "কামরিপু চরিতার্থ করলেও কি মানুষ সওয়াব পায়?" হযরত বিশ্বনবী (সা) তখন উত্তরে বলেছিলেন ঃ তোমরা কি এটা দেখ না যে, কেউ যদি অবৈধ পন্থায় এই কামরিপু চরিতার্থ করে তাহলে তার পাপ হয়, তাইতো যখন সে বৈধ পন্থায় উহা চরিতার্থ করে তখন তার সওয়াব হয়।"[১]

মোটকথা, ইসলামী বিধান অনুযায়ী 'যৌন স্পৃহা দমন' নামে কোন প্রকার দমনই থাকতে পারে না। তারুণ্যের উচ্ছলতায় যখন যৌন স্পৃহা পুরোমাত্রায় জাগ্রত হয় তখনও উহাকে নিকৃষ্ট বলার কোন কারণ থাকতে পারে না। আর এমন কোন প্রয়োজনও নেই যে, যৌন স্পৃহা চরিতার্থ করাকে ঘৃণিত কাজ বলে মনে করবে এবং উহাকে দুর্বল বা নির্মূল করার জন্যে সচেষ্ট হবে।

১. আল মুসলিম।

তরুণদের নিকট ইসলামের দাবী

ইসলাম তরুণদের নিকট একটি মাত্র দাবী করে। আর সেটি হলো ঃ নিজ নিজ যৌন স্পৃহাকে গলাটিপে মারার পরিবর্তে উহাকে লাগাম পরিয়ে দিতে হবে, নিজের ইচ্ছা ও মননশক্তির সাহায্যে উহাকে সুনিয়ন্ত্রিত করে কাজে লাগাতে হবে। অন্য কথায়, যৌন স্পৃহাকে নির্মূল বা দমন করে রাখার পরিবর্তে উহাকে চরিতার্থ করার যথোপযুক্ত ও যুক্তিসম্মত সুযোগ না হওয়া পর্যন্ত উহাকে স্থগিত করে রাখতে হবে। এই প্রকার সাময়িক বিরতি ফ্রয়েডের মতেও 'যৌন স্পৃহা দমনের' সমার্থক নয়। এতে করে যৌন স্পৃহা দমনের ফলশ্রুতি স্বরূপ যে দৈহিক ও মানসিক ক্ষতি সাধিত হয় তার কোন সম্ভাবনা থাকে না। দৈহিক ক্ষতির দিক হলো শিরা-উপশিরায় বিভিন্ন অসুবিধার সৃষ্টি হওয়া এবং মানসিক ক্ষতির দিক হলো নানা প্রকার মনস্তাত্বিক বিকার ও ব্যধির সূত্রপাত হওয়া।

প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার মূল লক্ষ্য

ইসলাম প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার যে দাবী করছে তা নিছক কোন প্রশাসনিক ফরমান নয় ; বরং তার পেছনে রয়েছে গভীর প্রজ্ঞা ও প্রভূত কল্যাণ। উহার লক্ষ্য জীবনের আনন্দ ও স্ফূর্তি থেকে মানুষকে বঞ্চিত করা নয়। বরং সুষ্ঠুভাবে জীবনযাপনের জন্যে মানুষকে উপযুক্তরূপে গড়ে তোলা। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, যে জনগোষ্ঠী কুপ্রবৃত্তি ও জৈবিক লালসাকে নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে এবং প্রয়োজনের মুহূর্তেও আমোদ-প্রমোদ ও জৈবিক ভোগ-বিলাস বর্জন করতে ব্যর্থ হয়ে যায় সে জনগোষ্ঠীর নিকট থেকে নেতৃত্ব কেড়ে নেয়া হয়। অনুরূপভাবে বিশ্বের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সাফল্য ও নেতৃত্ব কেবল সেই জাতিই লাভ করে যারা যাবতীয় বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্ট হাসিমুখে সহ্য করার ক্ষমতা রাখে এবং দরকারবোধে আমোদ-প্রমোদ ও আনন্দ-উল্লাসকে শুধু ঘন্টা বা দিন নয় বরং বছরের পর বছর ধরে বর্জন করে চলতে পারে। ইসলামে রোযার বিধান এ জন্যে করা হয়েছে।

বিভ্রান্তির শিকার ও ইসলাম

কিছু সংখ্যক "স্বাধীনচেতা" লেখক-লেখিকা রোযা সম্পর্কে এমন ভংগিতে কথা বলে যে, মনে হয় তারা গভীর কোন তত্ত্ব বা রহস্য আবিষ্কার করে ফেলেছে। এরা বলে ঃ "রোযা–কি যে এক ধোঁকা ! কিছু অর্থহীন হুকুমের অজুহাতে মানুষকে পানাহার থেকে বঞ্চিত রাখার অর্থ কি ? বিশেষ করে যখন সে হুকুমের মধ্যে যুক্তির কোন বালাই নেই এবং উহার অনুসরণে কোন কল্যাণকর উদ্দেশ্যও সাধিত হওয়ার কোন পথ নেই।"

বিভ্রান্তির চরম প্রেমিক এই সকল ব্যক্তির নিকট আমাদের নিবেদন ঃ তারাই বা কেমন লোক যারা কোন মহান উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্যে মাত্র

কয়েকটি ঘন্টার জন্যেও নিজেদের জৈবিক লালসার মুখে লাগাম পরাতে পারে না। প্রবৃত্তির এই সকল দাসানুদাস কস্মিনকালেও মানবতার কোন কল্যাণ করতে পারে না। যারা নিজেদের আনন্দ-স্ফূর্তিকে ক্ষণিকের জন্যে বর্জন করতে অপারগ তারা কখনো হকের সহযোগিতা ও বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্যেও অদম্য সাহস, সহিষ্ণুতার প্রয়োজন তা দেখাতে পারে না। এবং পারে না বলেই ধ্বংস তাদের জন্যে অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

সমাজতন্ত্রীদের তেলেসমাতি

রাশিয়ার সমাজতন্ত্রীরা যদি নিজেদের লক্ষ্য অর্জনের জন্যে প্রাণান্তকর বিপদ ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার উপযুক্ততা অর্জন করতে না পারতো তাহলে স্টেলিন গ্রাডে কখনো একযোগে লড়াই করতে সক্ষম হতো না। কিন্তু একথা জানা সত্ত্বেও ইসলামী দুনিয়ায় যে সকল সমাজতন্ত্রী অত্যধিক সোচ্চার তারা রোযা এবং অন্যান্য ইসলামী অনুষ্ঠান নিয়ে উপহাস করে থাকে। যার একমাত্র লক্ষ্য হলো প্রবৃত্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত করা। এ কোন আজব কাণ্ড যে, সমাজতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা তাদের রাষ্ট্রে অর্থাৎ তাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শাসনক্ষমতার জন্যে প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করার জন্যে সচেষ্ট ; অথচ যখন রাষ্ট্র ও সমস্ত প্রাণীজগতের স্রষ্টা আল্লাহর নামে উক্ত প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করার দাবী করা হয় তখন তারা একেবারে অস্থির ও মতিচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং বেশ হৈচৈ শুরু করে দেয়।

অনুগ্রহ ও ক্ষমার দ্বীন

একথাও বলা হয় যে, ধর্ম তার অনুসারীদের মনে চিরন্তন গোনাহগার হয়ে থাকার ধারণাকে বদ্ধমূল করত তাদের জীবনকে নিরানন্দ ও তিক্ততায় ভরে দেয়। আর এই গোনাহর ধারণা একটি শক্তিশালী ভূত হয়ে তাদের মন ও মস্তিষ্কের উপর সওয়ার হয়ে বসে। কোন কোন ধর্মের ক্ষেত্রে কথাটি সঠিকও হতে পারে ; কিন্তু ইসলামের ক্ষেত্রে কথাটি আদৌ প্রযোজ্য নয়। কেননা ইস-লাম এমন একটি দ্বীন যাতে শাস্তি ও জাহান্নামের চেয়ে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতি জোর দেয়া হয়েছে অনেক বেশী।

পাপের সঠিক ধারণা

ইসলামের মতে পাপ এমন কোন ভূত নয় যা সর্বদা মানুষের স্কন্ধে সওয়ার হয়ে থাকবে। এবং এমন কোন চিরন্তন ছায়া বা অন্ধকারও নয় যার গণ্ডিতে মানুষ সারা জীবন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ঘুরতে থাকবে এবং বাইরে বেরুবার কোন পথই খুঁজে পাবে না। হযরত আদম (আ)-এর যে ত্রুটিটুকু হয়েছিল তা উন্মুক্ত তরবারির ন্যায় মানুষের মাথার উপর ঝুলন্ত অবস্থায় নেই এবং উহার

প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার জন্যে আমাদের অতিরিক্ত কোন প্রায়শ্চিত্তেরও প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَّبِّهِ كَلِمَٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ط

"তখন আদম তাঁর প্রভু পরোয়ারদেগারের নিকট থেকে কিছু কথা শিক্ষা করে তাওবা করে এবং তিনি উহা কবুল করেন।"

—(সূরা আল বাকারা ঃ ৩৭)

অর্থাৎ স্বীয় ত্রুটি মার্জনার জন্যে হযরত আদম (আ)-কে কঠিন রসম-রেওয়াজের কোন স্তর অতিক্রম করতে হয়নি ; বরং এদিকে তিনি সর্বান্তকরণে তাওবা করলেন এবং ঐদিকে আল্লাহ্ তা মঞ্জুর করে নিলেন।

আল্লাহর অনুগ্রহ ও বনি আদম

আদি পিতা হযরত আদম (আ)-এর ন্যায় তাঁর সন্তান-সন্ততিদের উপরও আল্লাহর অনুগ্রহ চিরন্তনভাবেই বর্তমান। হযরত আদম (আ) যেমন তার ত্রুটির পরেও আল্লাহর অনুগ্রহ্ থেকে বঞ্চিত হননি তেমনি তার সন্তান-সন্ততিরাও গোনাহ্ করে বসলে তাঁর অনুগ্রহ্ থেকে বঞ্চিত হয় না। কেননা আল্লাহ্ পাক তাদের স্বাভাবিক দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং এ কারণে তিনি তাদের উপর ততটুকু বোঝা অর্পণ করেন যতটুকু তারা সহজেই বহন করতে সক্ষম। আল্লাহ্ এরশাদ করেন ঃ

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ط

"আল্লাহ্ কোন প্রাণীর উপর তার ক্ষমতার চেয়ে অধিক দায়িত্বভার অর্পণ করেন না।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৮৬)

হযরত বিশ্বনবী (সা) বলেন ঃ

كُلُّ بَنِيْ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ-

"সকল মানুষ (বনি আদম) ভুলকারী। এবং ভুলকারীদের মধ্যে তারাই সর্বোত্তম যারা (তাদের পাপের কারণে লজ্জিত হয়ে) তাঁর নিকট তাওবা করে।"—[তিরমিযী]

আল্লাহর অনুগ্রহের ব্যাপকতা

পবিত্র কুরআনে আল্লাহর অপরিসীম অনুগ্রহ ও ক্ষমা সম্পর্কে অসংখ্য আয়াত বর্তমান। আমরা এখানে একটি মাত্র উদাহরণ পেশ করছি ঃ

وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ

أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكٰظِمِيْنَ

الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ اِذَا

فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوْا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ

وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اللّٰهُ ۝ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَافَعَلُوْا وَهُمْ

يَعْلَمُوْنَ ۝ اُوْلٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ

تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ۝

"আর তোমরা দৌড়ে চল সেই পথে যে পথ যাচ্ছে তোমাদের প্রভু পরোয়ারদেগারের ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে—যার প্রশস্ততা হচ্ছে জমিন এবং সমস্ত আসমানের ন্যায় ; আর যা তৈরী করে রাখা হয়েছে সেই সকল মুত্তাকীদের জন্যে যারা তাদের সম্পদ ব্যয় করে সুখে-দুঃখে সর্ব অবস্থায়, যারা গোস্বা হজম করে এবং মানুষের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়। আল্লাহ এই সকল নেক লোকদেরকে ভালোবাসেন। আর যাদের অবস্থা এই যে, কেউ কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোন গোনাহ্ করে নিজেদের উপর জুলুম করলে সংগে সংগেই তাদের আল্লাহর কথা স্মরণ হয় এবং তাঁর নিকট তাদের অপরাধের জন্যে ক্ষমা চায় ; কেননা আল্লাহ ছাড়া আর কে আছে যে তাদের অপরাধ ক্ষমা করতে পারে এবং তারা জেনেশুনে তাদের কৃতকর্মকে অব্যাহত রাখে না।—এই সকল লোকের প্রতিদান তাদের রবের নিকট এই যে, তিনি তাদের ক্ষমা করে দেবেন এবং এমন এমন উদ্যানে তাদের প্রবেশ করাবেন যার নিম্নদেশ থেকে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে এবং সেখানে তারা অনন্তকাল বসবাস করবে। সৎলোকদের জন্যে কতই না সুন্দর এই পুরস্কার।"

—(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৩-১৩৬)

এই আয়াত দ্বারা পরিষ্কারভাবে অবগত হওয়া যায় যে, আল্লাহর অনুগ্রহ কত ব্যাপক, তার রহমত কত অপরিসীম। তিনি বান্দার শুধু তাওবাই কবুল করেন না, বরং তিনি গোনাহর সামান্যতম স্পর্শ থেকেও বান্দাকে পাক-পবিত্র করে একান্ত নিজ অনুগ্রহে মুত্তাকী ও নেক্‌কারদের মনোনীত দলের অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

আল্লাহর অনুগ্রহের এক বিস্ময়কর দিক

প্রশ্ন এই যে, এমন দয়ালু ও স্নেহশীল আল্লাহর অনুগ্রহ ও ক্ষমা সম্পর্কে কারুর অন্তরে বিন্দু-বিসর্গ পরিমাণ সন্দেহ থাকতে পারে কি ? আল্লাহর এই

সীমাহীন অনুগ্রহে যে বিশ্বাসী তার কোন মানসিক হতাশা বা নৈরাশ্য থাকতে পারে না। এই বিশ্বাসই তাকে বলে দেয় ঃ সে কোন চিরন্তন গোনাহগার নয়। তার প্রভুর অনুগ্রহে যে কোন মুহূর্তেই সে গোনাহমুক্ত হয়ে পবিত্র হতে পারে। (দাগী আসামীর মত মোহরাঙ্কিত পাপী হয়ে তাকে থাকতে হয় না।) যখনই সে গোনাহর জন্যে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় তখনই আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন এবং তার অনুগ্রহের ছায়ায় স্থান দান করেন। এই ক্ষমা ও অনুগ্রহলাভের জন্যে প্রকৃত অনুতাপ ও লজ্জা ছাড়া অন্য কোন শর্ত নেই। এ কথাটি এতদূর স্পষ্ট যে, এর সমর্থনে কোন সাক্ষ্যের প্রয়োজন নেই ; তবুও আমরা এই প্রসংগে বিশ্বনবী (সা)-এর একটি মূল্যবান হাদীস এখানে উল্লেখ করছি ঃ

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوْا لَذَهَبَ اللّٰهُ بِكُمْ وَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُوْنَ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ فَيَغْفِرُوْنَ لَهُمْ (مسلم)

"যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ করে বলছি ঃ তোমরা যদি গোনাহ না করতে তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতেন এবং তোমাদের স্থলে এমন লোকদেরকে আনতেন যারা গোনাহ করার পর ক্ষমাপ্রার্থী হতো, আর তাদেরকে মাফ করে দিতেন।"—[মুসলিম]

মনে হয়, মানুষের গোনাহখাতা মাফ করাই যেন আল্লাহ পাকের একান্ত কাম্য। পবিত্র কুরআনের একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়াতও এই প্রসংগে প্রণিধানযোগ্যঃ

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ ط وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا

"আল্লাহর এমন কি প্রয়োজন পড়েছে যে, তিনি তোমাদের শাস্তি দেবেন—যদি তোমরা কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে কালযাপন কর এবং ঈমান অনুসারে চল ? আল্লাহ বড় মূল্যায়ণকারী এবং সকলের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।"—(সূরা আন নিসা ঃ ১৪৭)

এটা নিশ্চিত যে, আল্লাহ মানুষকে কখনো দুঃখ-কষ্টে পতিত অবস্থায় দেখতে চান না ;—চান মানুষকে তার সীমাহীন রহমত ও মাগফেরাতের পরশে সৌভাগ্যবান করে তুলতে।

ইসলাম ও চিন্তার স্বাধীনতা

আলোচনার ফাঁকে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো : "তুমি দেখছি ভীষণ সংকীর্ণমনা ও একজন মাছিমারা কেরানী !"

—কেন ?—আমি প্রশ্ন করলাম।

—তুমি কি আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস কর ?

—অবশ্যই।

—তার ইবাদাত কর এবং রোযা রাখ ?

—নিশ্চয়ই।

—তাহলে তো আমার কথাই ঠিক যে, তুমি একজন সংকীর্ণমনা এবং একজন মাছিমারা কেরানী।"

আমি তাকে প্রশ্ন করলাম : "তুমি কেমন করে আমাকে বলতে পারলে যে, আমি একজন সংকীর্ণমনা এবং মাছিমারা কেরানী ?"

কেননা তুমি যে জিনিসগুলোকে বিশ্বাস কর উহা একেবারেই বাজে ও ভিত্তিহীন, উহার তাৎপর্য বা অস্তিত্ব বলতে কিছুই নেই।—সে স্পষ্ট ভাষায় জবাব দিল।

"আর তুমি ? তুমি কোন জিনিসকে বিশ্বাস কর ? তুমি কি জান যে, সমগ্র বিশ্বচরাচর কে সৃষ্টি করেছে এবং কে আমাদের জীবনকে অস্তিত্ব দান করেছে ? —আমি প্রশ্ন করলাম।

—প্রকৃতি।

—কিন্তু প্রকৃতি কি ?

—প্রকৃতি হলো এমন এক প্রচ্ছন্ন ও অসীম শক্তি যা আমরা পঞ্চইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বুঝতে পারি না।"

আমি তখন বললাম : "তুমি যা কিছু বললে তার দ্বারা আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, তুমি আমাকে এক অজ্ঞাত শক্তি (আল্লাহর) নির্দেশ মেনে চলার পরিবর্তে অন্য আর একটি একইরূপ অজ্ঞাত শক্তি (প্রকৃতির) অনুগত বানাতে চাও। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, নির্ভুল মাবুদকে বাদ দিয়ে যার নিকট আমি সকল প্রকার দৈহিক ও মানসিক শান্তি লাভ করি—তোমার সেই ছোট মাবুদ তথা প্রকৃতির আনুগত্য কেন করব—যে আমার ডাক শোনার ক্ষমতা রাখে না এবং আমার অভাব পূরণেরও কোন শক্তি রাখে না ?"

চিন্তার স্বাধীনতার সর্বাধুনিক ধারণা

চিন্তার স্বাধীনতার উন্নতিকামীরা কী ধরনের স্বাধীনতা চান তার একটি মোটামুটি ধারণা উপরোক্ত বক্তব্য থেকে আমরা লাভ করতে পারি। তাদের

ধারণায়, চিন্তার স্বাধীনতার মানে হচ্ছে, প্রকৃত মাবুদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া। কিন্তু এ হচ্ছে স্পষ্ট নাস্তিকতা। কস্মিনকালেও একে চিন্তার স্বাধীনতা বলা যায় না। এরা ইসলাম নিয়ে নিছক এ জন্যেই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে যে, উহা মানুষকে সেই চিন্তার স্বাধীনতা দেয় না যা তাকে আল্লাহদ্রোহিতা ও নাস্তিক্যবাদের দিকে ঠেলে দেয়। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, আল্লাহদ্রোহিতা ও চিন্তার স্বাধীনতার অর্থ কি একই ?

উন্নতিকামিদের প্রকৃত ভুল

উন্নতিকামিদের প্রকৃত ভুল হচ্ছে এই যে, তারা ইউরোপের চিন্তার স্বাধীনতা (Liberation) সম্পর্কে অধ্যয়নের সময়ে এই সত্যটি ভুলে যায় যে, যদি ইউরোপের কিছু নির্দিষ্ট অবস্থা ও ঘটনাবলীর কারণে সেখানে কুফর ও নাস্তিক্যবাদ ছড়িয়ে পড়ে তার দ্বারা এটা কখনো প্রমাণিত হয় না যে, দুনিয়ার অন্যান্য স্থলেও এই একই রূপ অবস্থার সৃষ্টি হবে এবং একইরূপ নাস্তিক্যবাদ ছড়িয়ে পড়বে।

ইউরোপবাসীদের ধর্ম ত্যাগের কারণ

ইউরোপবাসীদের সামনে পোপ ও পাদ্রীরা খৃষ্টান ধর্মের যে চিত্র তুলে ধরেছে, যেরূপে তারা অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক সত্যকে মিথ্যা বলে সাব্যস্ত করেছে। বিজ্ঞানীদের উপর অমানুষিক জুলুম ও নির্যাতন চালিয়েছে। মিথ্যা, অলীক কল্পনা ও পচা গল্পকে আল্লাহর ধর্ম নামে আখ্যায়িত করেছে তারই অনিবার্য ফল এই হয়েছে যে, মুক্ত চিন্তার অধিকারী ইউরোপীয় চিন্তাবিদরা কুফর ও নাস্তিক্যবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। কেননা তাদের সামনে যে দু'টি বিপরীতমুখী চিন্তাধারা বর্তমান ছিল তার মধ্যে যে কোন একটিকে গ্রহণ করা ছাড়া তাদের কোন উপায় ছিল না। এ কারণেই তারা আল্লাহর উপর স্বাভাবিক ঈমান আনার পথ পরিহার করে বিজ্ঞানও উহার প্রদত্ত দর্শনকেই সত্য বলা গ্রহণ করেছে। পাদ্রীরা গোটা ইউরোপকে যে আবর্তে নিক্ষেপ করেছিল তা থেকে আংশিক নাজাত লাভের জন্যেও তাদের ভিতরকার জ্ঞানীদের বিবেচনায় কেবল এই একটি মাত্র পথই উন্মুক্ত ছিল। এক কথায় বলা চলে যে, তারা প্রকাশ্যে ও খোলাখুলিভাবে চার্চের যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে ঘোষণা করতে বাধ্য হল, "আমরা এমন খোদাকে ত্যাগ করতে বাধ্য হলাম যার নামে তোমরা আমাদেরকে গোলাম বানাতে চাও। আমাদের উপর আমাদের সাধ্যাতীত বোঝার পাহাড় চাপাও এবং জুলুম ও সৈরাচারের ষ্টিমরোলার চালিয়ে আমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে চাও। তোমাদের খোদার উপর ঈমান রাখার অর্থ হলো আমরা সবাই বনবাসে যাই ! এই জগত থেকে মুখ ফিরিয়ে বিজনা অরণ্যে হারিয়ে যাই। এমন খোদা এবং এমন আল্লাহর আমাদের কোন প্রয়োজন

নেই। এখন থেকে আমরা আমাদের এমন একজন নতুন খোদা স্থির করব যার মধ্যে তোমাদের খোদার গুণাবলী বর্তমান থাকবেই তদুপরি তার সামনে আমাদেরকে গোলাম করে রাখার কোন পাদ্রী পুরোহিত বর্তমান থাকবে না এবং তারা আমাদের উপর তোমাদের খোদার ন্যায় নৈতিক আধ্যাত্মিক ও দৈহিক শর্তাদিও আরোপ করবে না"।

ইসলাম—একটি সরল ও সত্যিকার দ্বীন

সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট যে, ইউরোপে ধর্মের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে সেটা ছিল সেখানকার চার্চ ব্যবস্থাপনার যাবতীয় কুকীর্তির স্বাভাবিক প্রতিফল। কিন্তু ইসলামে এ ধরনের কোন ব্যবস্থার অস্তিত্ব নেই এবং উহাতে খৃস্টান ধর্মের ন্যায় এমন কোন অলীক কাহিনীও খুঁজে পাওয়া যায় না যাতে করে মানুষ ধর্ম থেকে দূরে সরে যায় এবং ধর্মদ্রোহিতা ও নাস্তিক্যবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ইসলামে কোন চার্চ নেই। আছেন শুধু এক লা-শরীক আল্লাহ যিনি বিশ্বজাহানের একমাত্র স্রষ্টা, মৃত্যুর পর সকল মানুষকে একমাত্র তার দরবারেই উপস্থিত করা হবে। এটা এমন একটি পরিষ্কার বিশ্বাস যে, কোন প্রকৃতি পূজারী কিংবা নাস্তিকও যদি একে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে চায় তবুও সহজভাবে একে উড়িয়ে দিতে সক্ষম হবে না।

ধর্মীয় ইজারাদারির পরিসমাপ্তি

ইসলামে পোপ-প্রাদ্রীদের ন্যায় কোন শ্রেণীর অস্তিত্ব নেই। কোন বিশেষ শ্রেণী বা ব্যক্তির দ্বীন নিয়ে কোন ইজারাদারী বা এজেন্সীগিরিরও কোন অবকাশ নেই। বরং এর সবকিছুই মানুষের যৌথ উত্তরাধিকার। প্রতিটি ব্যক্তিই নিজের স্বাভাবিক, আধ্যাত্মিক ও মেধাগত যোগ্যতা অনুযায়ী এর মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার সমান হকদার। ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষই পরস্পর সমান। তাদের মধ্যে পার্থক্য করার যে দিকটি রয়েছে তাহচ্ছে তাদের চরিত্র ও আমল। ইজ্জত ও মর্যাদার প্রকৃত হকদার কেবল তারাই যারা আল্লাহভীরু ও মুত্তাকী—চাই পেশার দিক থেকে তারা প্রকৌশলী হোক, শিক্ষক হোক, সাধারণ শ্রমিক হোক বা কারিগর। কিন্তু ধর্ম এরূপ বিভিন্ন পেশার মধ্যে কোন একটি পেশাও নয়। এবং পেশাদার ধর্মীয় লোকদের কোন শ্রেণীও ইসলামে নেই। এ কারণেই ইসলামে ইবাদাত করার জন্যে কোন পাদ্রীর প্রয়োজন হয় না। অবশ্য ইসলামী সমাজে সামাজিক আইন-কানুন ও নিয়মনীতির বিশেষজ্ঞ-পণ্ডিতদের প্রয়োজন অপরিহার্য। কিন্তু ইসলামী ফিক্‌হা আইন বিশেষজ্ঞদের জন্যে ইসলামী সমাজে ততদূর মর্যাদাই প্রদান করা হয় যতদূর মর্যাদা অন্যান্য আইন বিশেষজ্ঞরা তাদের দেশে লাভ করে থাকে। অন্যান্যদের বিপক্ষে তারা কোন বিশেষ মর্যাদা লাভ করে না। এবং কোন বিশেষ ধরনের সুবিধা সুযোগও ভোগ

করে না। আইন বিশেষজ্ঞ হিসেবে তারা শুধু প্রয়োজনের মুহূর্তে আইনের পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করে থাকে। এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো মিসরের 'জামেয়ায়ে আজহার' নামক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। কিন্তু ইউরোপীয় চার্চের ন্যায় ইহা কখনো এই অধিকার ভোগ করে না যে, বিরুদ্ধবাদীদেরকে জ্যান্ত অবস্থায় পুড়িয়ে মারবে কিংবা অত্যাচারের ষ্টীমরোলার চালিয়ে তাদেরকে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। উহার দায়িত্ব শুধু এতটুকু যে, মানুষের দ্বীন সংক্রান্ত জ্ঞান ও ধ্যান-ধারণার সঠিক বিশ্লেষণ করবে এবং তাদের মধ্যে যে দুর্বলতা দেখা যাবে তা দলীল সহকারে পরিস্ফুট করে তুলবে। কিন্তু অন্যদিকে জনসাধারণেরও এই অধিকার আছে যে, তারা জামেয়ায়ে আজহারের ধর্মীয় ভূমিকা ও চিন্তা-ভাবনার সমীক্ষা করে যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে উহার ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি অংগুলি নির্দেশ করবে। কেননা ইসলাম নিয়ে কোন ব্যক্তি বা শ্রেণীর কোনরূপ ইজারাদারির অধিকার নেই। বরং দ্বীনী বিষয়ে কেবল সেই সকল ব্যক্তিদেরই কিছু বলার অথরিটি রয়েছে যারা দ্বীন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের অধিকারী এবং সাথে সাথে এই দিক থেকেও উপযুক্ত যে, ব্যক্তিগত ভালো-মন্দের প্রতি না তাকিয়ে জীবনের বাস্তব সমস্যার সমাধানে দ্বীনী হুকুম-আহকামের সুষ্ঠু প্রয়োগ করতে সক্ষম।

ইসলামী জীবনব্যবস্থার সঠিক ধারণা

ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অর্থ এই নয় যে, উলামায়েকেরাম অর্থাৎ ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞরাই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হবেন এবং তারাই উহার বড় বড় পদে বহাল হবেন। ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হবে তাহলো এই যে, সরকারী ব্যবস্থাপনার মূলভিত্তি থাকবে শরীয়াত তথা আল্লাহর আইন-কানুন। এছাড়া অন্য কোথাও কোন মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয় না। ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার পূর্বের মতই তাদের দায়িত্ব পালন করতে থাকে ; অর্থনীতি বিশারদরাও তাদের কর্মসূচী অনুযায়ী নিজস্ব পরিমণ্ডলে কর্মরত থাকে। হ্যাঁ, এতটুকু পার্থক্য তো অবশ্যই হয় যে, তাদের কর্মকাণ্ডের মূল রূপরেখা ইসলামী অর্থনীতির আলোকে নির্ধারিত হবে এবং উহারই সাহায্যে ইসলামী অর্থনীতির সামগ্রিক কাঠামো রচনা করা হবে।

ইসলামী বিশ্বাস ও বিজ্ঞান

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় ঃ ইসলামী বিশ্বাস ও ইসলামী সরকার এবং বিজ্ঞান ও উহার আবিষ্কৃত সত্যের মধ্যে সমন্বয় বিধানে আজ পর্যন্ত কোন বাধার সৃষ্টি হয়নি। ইসলামী ইতিহাসে কখনো কোন বিজ্ঞানীকে তার কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বা কোন তথ্য উদ্‌ঘাটনের অপরাধে জীবিত অবস্থায় পুড়িয়ে মারা

হয়নি। কখনো কাউকে এই প্রকার "অপরাধের" দায়ে অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে তিলে তিলে নিঃশেষ করে দেয়া হয়নি। ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস হলো ঃ আল্লাহই হচ্ছেন সমগ্র বিশ্বজাহানের একমাত্র স্রষ্টা। এই বিশ্বাস এবং বিজ্ঞানের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কোনদিক থেকেই একটি আরেকটির বিরোধী নয়। এ কারণেই ইসলাম মানুষকে আসমান-জমিনের অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণ করার জন্যে বারবার আহবান জানায়, যাতে করে তারা নিজেদের এবং সমস্ত বিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে নিজ প্রভু আল্লাহকে পেতে পারে। বস্তুত এরূপ চিন্তা-ভাবনার ফলেই পাশ্চাত্যের বহু বৈজ্ঞানিক এখন আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করা শুরু করেছে। যারা প্রথম দিকে আল্লাহর অস্তিত্বকে আদৌ স্বীকার করেনি।

নাস্তিক্যবাদের অন্ধ প্রচারক

পূর্বেই বলা হয়েছে ঃ ইসলামে ইউরোপীয় চার্চের মত এমন কোন ব্যবস্থাপনা নেই যা তার অনুসারীদেরকে আল্লাহদ্রোহী বা নাস্তিক হতে বাধ্য করে। কিন্তু এ সত্ত্বেও যখন মুসলিম দেশগুলোতে আমরা কিছু লোককে আল্লাহদ্রোহিতা বা নাস্তিক্যবাদের প্রতি আহবান জানাতে দেখি তখন আমাদের মনে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, এরা আসলে কী চায় ? বাস্তব ঘটনা এই যে, এরা তাদের সাবেক সাম্রাজ্যবাদী বা উপনিবেশবাদী প্রভুদের অন্ধ অনুসারী এবং প্রভুদেরকে খুশী করার জন্যেই এরা চায়, দ্বীন ও দ্বীনী ইবাদাত ও হুকুম-আহকামের উল্টা-পাল্টা সমালোচনা করে মুসলমানদেরকে "মুরতাদ (তথা ধর্মত্যাগী)" বানাবার জন্যে একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হোক। আর এই ধ্বংসাত্মক কাজটির তারা একটি সুন্দর নাম দিয়েছে "চিন্তার স্বাধীনতা।" ইউরোপবাসীরা এ জন্যে তাদের ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে—যাতে করে তারা চার্চের ধর্মীয় শোষণ, অলীক কাহিনী ও উদ্ভট গল্পের হাত থেকে নিষ্কৃতিলাভ করে সত্যিকার অর্থেই চিন্তার স্বাধীনতা পেতে পারে। এভাবে একদিকে তো তারা সত্যের প্রতি অগ্রসর হয়েছে এবং বাধ্য হয়েই তারা অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু ইসলামে তো চার্চের মত কোন শোষক প্রতিষ্ঠান নেই এবং অলীক কাহিনী বা উদ্ভট কিচ্ছারও কোন অবকাশ নেই। ইসলাম তো নিজে অগ্রসর হয়েই সকল প্রকার স্বাধীনতা প্রদান করে—যা নিয়ে প্রখ্যাত ও আলোকপ্রাপ্ত নেতারা হৈচৈ করে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলছে। কিন্তু এই হৈচৈ করার মূল রহস্য কোথায় ? এবং ইসলামের উপর তারা এত রুষ্টই বা কেন ?

চিন্তার স্বাধীনতার শ্লোগান কেন ?

মূল বিষয় হলো এই যে, চিন্তার স্বাধীনতার এই ধ্বজাধারীরা প্রকৃত চিন্তার স্বাধীনতা নিয়ে আদৌ ভাবেন না। তাদের আসল মতলব হচ্ছে এই

শ্লোগানের আড়ালে গোটা সমাজকে নৈতিক উচ্ছৃংখলতা ও যৌন ব্যভিচারের গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত করা ; তাদের কুৎসিত উদ্দেশ্যকে ঢেকে রাখার জন্যেই তারা এই পর্দাটি ব্যবহার করছে। ধর্ম ও নৈতিকতার বিরুদ্ধে তারা যে যুদ্ধ পরিচালনা করছে তাতে চিন্তার স্বাধীনতার এই শ্লোগানটির লক্ষ্য মানুষকে ধোঁকা দেয়া ছাড়া অন্য কিছুই নয়। তাদের ইসলাম বিরোধিতার কারণ এই যে, ইসলাম মানুষের চিন্তাকে নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমিত করে দেয়, বরং তাদের এই ধর্মদ্রোহিতার মূল কারণ হচ্ছে এই যে, একমাত্র ইসলামই গোটা মানবজাতিকে মানবেতর চিন্তা-ভাবনা ও নিকৃষ্টতম ধ্যান-ধারণার গোলামী থেকে মুক্তি দেয় ; অথচ ব্যভিচার বিলাসী উচ্ছৃংখল ধাপ্পাবাজদের নিকট এটা আদৌ পসন্দনীয় নয়।

ইসলামের বিরুদ্ধে স্বৈরচারের অভিযোগ

চিন্তার স্বাধীনতার এই প্রবক্তরা এই অভিযোগও উত্থাপন করে যে, ইসলা-মের রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে একটি স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্র হচ্ছে প্রভূত ক্ষমতার মালিক এবং একমাত্র ধর্মের নাম দিয়ে সরকার এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে। আর মানুষ ধর্মীয় পাগলামীতে মত্ত হয়ে কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা না করেই উহার জোরজবরদস্তিমূলক আইন-কানুনের হাতে নিজেদেরকে সোপর্দ করে দেয়। ইসলামী রাষ্ট্রের হাতে এই পুঞ্জিভূত ক্ষমতা থেকেই স্বৈরাচারের জন্ম হয় এবং এমন একটি মজবুত ব্যবস্থা গড়ে উঠে যেখানে জনসাধারণের অবস্থা গোলামের চেয়ে অধিক কিছুই নয় — যেখানে এই জনসাধারণ তাদের ভালো-মন্দ বোঝায় এবং তদনুযায়ী কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার কোন অধিকারই লাভ করতে পারে না। অন্য কথায় তাদের স্বাধীনতাকে চিরদিনের জন্যেই ছিনিয়ে নেয়া হয়। এরপর শাসকদের অত্যাচার-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে কিছু বলার কোন সাহসই তারা পায় না। আর যদি কোন দুর্ভাগা তেমন কিছু বলার হিম্মত করেই বসে, তাহলে তাকে ধর্মের এবং আল্লাহর বিদ্রোহী বলে সাব্যস্ত করে স্তব্ধ করে দেয়া হয়।

অভিযোগের স্বরূপ

এই অমূলক ও মাথা মুণ্ডহীন অভিযোগের সর্বোত্তম জবাব হচ্ছে পবিত্র কুরআন। এক স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ط

"তাদের প্রত্যেকটি কাজ পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করা হয়।"-(সূরা আশ শুরা ঃ ৩৮)

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ط

"আর যখন তোমরা মানুষের মাঝে ফায়সালা করবে তখন ন্যায় পরায়ণতার সাথে ফায়সালা করবে।"−(সূরা আন নিসা ঃ ৫৮)

ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) বলেন ঃ

فَاِنْ عَصَيْتُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَلاَ طَاعَةَ لِىْ عَلَيْكُمْ ـ

"আর যদি আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করি তাহলে তোমরা আমার আনুগত্য করবে না।"

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা) যখন বলেছিলেন ঃ "যদি তোমরা আমার মধ্যে কোন ত্রুটি দেখতে পাও তাহলে আমাকে সংশোধন করবে।" তখন এক ব্যক্তি বলল ঃ

وَاللّٰهِ لَوْ وَجَدْنَا اَعْرَجَاجًا لَقَوَّمْنَا بِجَدِّ السَّيْفِ

"আল্লাহর কসম ! যদি আমরা তোমার মধ্যে কোন ত্রুটি পেতাম তাহলে আমাদের তলোয়ার দিয়েই তার সংশোধন করে দিতাম।"

ইসলামের এই মহান শিক্ষা এবং উহার অনুসারীদের এই উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের মধ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগের কোন জবাব নেই কি ?

ধর্ম ও স্বৈরাচার

অনস্বীকার্য যে, ইতিহাসে ধর্মের নামে বহুবার মানুষ অত্যাচার ও স্বৈরাচারের নির্মম শিকারে পরিণত হয়েছে। এবং আজও বহু দেশে ধর্মের নামে এসব তাণ্ডবলীলা চলছে। কিন্তু উৎপীড়ন ও স্বৈরাচার কি শুধু ধর্মের নামেই চলেছে ? হিটলারের স্বৈরাচারী শাসন কি কেবল ধর্মের ভিত্তিতেই চালু ছিল ? আজ রাশিয়ায় তো প্রকাশ্যভাবেই স্বীকার করা হচ্ছে যে, স্টালিন একজন জালেম ও নিষ্ঠুর স্বৈরাচারী শাসক ছিল, তার রাষ্ট্র ছিল একটি পুলিশী রাষ্ট্র (Police State)। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, স্ট্যালিনের সরকার কি ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল ? সকল স্বৈরাচারী শাসক—মাও সেতুং হোক কিংবা ফ্রাংকো, দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যালান হোক অথবা জাতীয়বাদী চিয়াং কাই হোক—কি ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠন করেছিল ? প্রকৃত ঘটনা এই যে, বিশ শতকের লোকেরা তথাকথিত ধর্মের যাঁতাকলে ও স্বৈরাচারী চরিত্র থেকে তো নিষ্কৃতি লাভ করেছে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় স্বৈরাচার ও ডিক্টেটরশীপের কুৎসিত ও ভয়ংকর রূপ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারেনি। এক সময়ে ধর্মের ভয়ানক চেহারাকে ঢেকে রাখার জন্যে যেমন পবিত্রতার পোশাক পরিয়ে দেয়া হতো।

আজকাল ঠিক তেমনি রাষ্ট্রীয় স্বৈরাচারের ন্যক্কারজনক চিত্রকে আড়াল করার জন্যে বিভিন্ন নামের আকর্ষণীয় লেবেল এঁটে দেয়া হচ্ছে।

অপরাধ কার ?

কোন বুদ্ধিমান বা হুঁশিয়ার ব্যক্তিই স্বৈরাচারকে সমর্থন করতে পারে না এবং উহাকে সংগত বলেও রায় দিতে পারে না। কিন্তু একথা ঠিক যে, অধিক হতে অধিকতর সুন্দর নীতিকেও নিষ্ক্রিয় করে উহাকে ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে করে দেখা যায় ঃ অপরাধ কোন নীতির নয়, বরং এ অপরাধ সেই স্বার্থপর লোকদের যারা তাদের হীন-স্বার্থকে আড়াল করার জন্যে উক্ত নীতির নাম ব্যবহার করছে। ফরাসী বিপ্লবের সময়ে স্বাধীনতার নামে যে সর্বাধিক জঘন্য ও পাশবিক নির্যাতন চালানো হয়েছিল তার কোন তুলনা নেই। কিন্তু এটা কখনো সম্ভবপর নয় যে, উক্ত নির্যাতনের দোহাই দিয়ে আমরা সর্বপ্রকার স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা শুরু করবো। অনুরূপভাবে ইতিহাসে বহুবার আইন ও নীতির নামে শত সহস্র নিষ্প্রাণ ও নিরপরাধ মানুষকে জেল দেয়া হয়েছে। নানারূপ নির্যাতন করা হয়েছে এবং দুনিয়ার বুক থেকেও নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এর পরেও কি বলা যায় যে, আইন-কানুন ও নিয়ম-নীতিকে বেকার ও নিষ্প্রয়োজনীয় সাব্যস্ত করে উহাকে খতম করে দেয়াই সমীচীন ? ঠিক এমনি করে কিছু সংখ্যক দেশে যদি ধর্মের নামে অমানবিক নির্যাতন ও স্বৈরাচারী শাসন চালানো হয় তাহলে কি নিছক এ কারণেই ধর্মকে আমাদের জীবন থেকে বাদ দিতে হবে ? তবে হ্যাঁ, কোন ধর্মই যদি অত্যাচার-উৎপীড়ন ও বে-ইনসাফীর ভিত্তিতে গড়ে উঠে তাহলে সে ধর্মকে অবশ্যই বর্জন করতে হবে। কিন্তু ইসলামের ন্যায় যে ধর্ম ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম, যাবতীয় জুলুম ও অত্যাচার নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর, তার বিরোধিতা করার কি কারণ থাকতে পারে ? ইসলাম শুধু মুসলমানদের মধ্যেই ইনসাফ ও ন্যায় বিচারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেনি। বরং মুসলমান এবং তাদের নিকৃষ্টতম দুশমনদের মধ্যেও সুবিচারের এমন আদর্শ স্থাপন করেছে যার নযীর বিশ্ব ইতিহাসের কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

জুলুম ও স্বৈরাচারের প্রতিকার

জুলুম ও স্বৈরাচার বন্ধ করার সবচেয়ে কার্যকরী পন্থা হলো ঃ মানুষের অন্তরে আল্লাহর বিশ্বাসকে বদ্ধমূল করে দেয়া এবং অন্যের সেই অধিকারের প্রতি মানুষকে শ্রদ্ধাশীল করে তোলা যার হেফাযতের দায়িত্ব ধর্মই তাদেরকে অর্পণ করেছে। এরূপ আল্লাহভীরু সমাজের সদস্যরা তাদের শাসকদের কখনো এমন সুযোগ দিতে পারে না যে, তারা আইনের সীমালংঘন করে অন্যের উপর

জুলুম করতে সক্ষম হবে। ইসলাম যেরূপ সুবিচার ভিত্তিক জীবনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা এবং জুলুম স্বৈরাচার নির্মূল করার প্রতি জোর দেয় তার কোন নযীর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। ইসলামের বিধান অনুযায়ী জনসাধারণের অবশ্য কর্তব্য হলো ঃ যদি তাদের শাসকরা জুলুম ও উৎপীড়ন করতে শুরু করে তাহলে তাদের সংশোধনের জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। এই প্রসংগে হযরত বিশ্বনবী (সা) বলেন ঃ

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ

"তোমাদের কেউ যদি অন্যায় কাজ দেখে তাহলে তার সংশোধন করে দেবে।"—[বুখারী ও মুসলিম]

তিনি আরেক স্থানে বলেন ঃ

اِنَّ مِنْ اَعْظَمِ الْجِهَادِ عِنْدَ اللّٰهِ كَلِمَةَ عَدْلٍ عِنْدَ اِمَامٍ جَائِرٍ ـ

"আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় জিহাদ হচ্ছে জালেম শাসকের সামনে হক কথা বলা।"—[আবু দাউদ ও তিরমিযী]

ইসলামী জীবনব্যবস্থার এই মৌলিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই লোকেরা যখন বুঝতে পারে যে, ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান গনী (রা) ইসলামের সরল পথ থেকে কিছুটা বিচ্যুত হয়েছেন তখন তারা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তোলেন—যদিও তা বিপ্লবের রূপ নিয়ে পরিস্থিতিকে আরো অবনতির দিকে নিয়ে যায়।

উন্নতিকামীদের সমীপে

পরিশেষে আমরা "উন্নতিকামী" ভাইদের নিকট বলতে চাই ঃ প্রকৃত চিন্তার স্বাধীনতা দ্বীন বর্জন করার মধ্যে নিহিত নয়। বরং জনসাধারণের মনে এমন এক বৈপ্লবিক প্রেরণা সৃষ্টির মধ্যে সমাহিত যা কোন বে-ইনসাফী ও জুলুম বরদাশত করে না। যদি কোন অনিষ্ট তাদের দৃষ্টিগোচর হয় তাহলে তারা তার সংশোধনের জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। এই বৈপ্লবিক প্রেরণাই হবে ইসলামের ভাস্কর বৈশিষ্ট্য।

ইসলাম কি জনসাধারণের আফিম ?

"ধর্ম জনসাধারণের আফিম"—কার্লমার্কসের এ প্রসিদ্ধ উক্তিটি সমাজতন্ত্রের প্রচারকরা সকল মুসলিম দেশে চোখ বুজে প্রচার করে চলেছে। এমনকি বর্তমানে ইসলামও এর আক্রমণ থেকে রেহাই পাচ্ছে না।

কার্লমার্কস এবং সমাজতন্ত্রের প্রাথমিক যুগের নেতারা ইউরোপের যে পরিবেশে কাজ শুরু করে তাতে এমন কিছু কারণ ও অবস্থা বর্তমান ছিল যাতে করে তারা গীর্জা ও ধর্মযাজকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। ঐ সময়ে ইউরোপে—বিশেষ করে রাশিয়ায় চরম পর্যায়ের পাশবিক ও দমনমূলক সামন্তবাদ চালু ছিল। তখন লক্ষ লক্ষ মানুষ অনাহারে ও ঠাণ্ডায় মারা যেত, অবশিষ্টদের অধিকাংশই গনোরিয়া, যক্ষা এবং এ ধরনের মারাত্মক রোগের শিকার হতো। কিন্তু হায় ! তাদের এই দুঃখের দিনে একটুখানি সমবেদনা জানাবারও কোন প্রাণী খুঁজে পাওয়া যেত না। সামন্তদের যে শ্রেণীটি অসহায় গরীবদের রক্ত চুষে চুষে নিজেদের আরাম-আয়েশ ও বিলাস-ব্যসনের ব্যবস্থা করতো তাদের অন্তরাত্মা এতটুকুও শিউরে উঠতো না।

ধার্মিকদের কীর্তি

এরপর "মরার উপর খাঁড়ার ঘা" হিসেবে নেমে আসতো ধর্ম নেতাদের অমানুষিক জুলুম। গরীব ও মেহনতী লোকেরা যদি কখনো সামাজিক বৈষম্য ও বে-ইনসাফীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতো তাহলে ধার্মিক গোষ্ঠী তথা পাদ্রীরা তাদেরকে ধরাশায়ী করে ফেলতো। মেহনতী ও মজলুম জনতাকে সাহায্য করার পরিবর্তে তারা তাদেরকে ধৈর্যধারণ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উপদেশ দিয়ে বলতো ঃ "কেউ তোমাদের ডান গালে চড় মারলে তার দিকে বাম গালটি ফিরিয়ে দাও। আর কেউ যদি নালিশ করে তোমাদের জামা নিতে চায় তাহলে তোমাদের চোগাও তাকে নিতে দাও।" তারা আরো বলতো যে, যারা এই দুনিয়ায় জুলুম ও বে-ইনসাফীর শিকার হয় তাদেরকে এর প্রতিদানে পারলৌকিক জগতে জান্নাত এবং শান্তিপূর্ণ চিরস্থায়ী জীবন দান করা হবে। এ জন্যে তাদের ধৈর্যধারণ করা উচিত। এবং নিজেদের অধিকার ও দাবী-দাওয়া সম্পর্কে কোন আন্দোলন না করা সমীচীন। এমনি করে তারা মজলুম জনতাকে অবুঝ শিশুর মত প্রবোধ দিয়ে তাদের দাবী আদায়ের প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করে দিত এবং কোন বিপ্লব বা আন্দোলনের পথকে রুদ্ধ করে দিত।

প্রবোধ ও ধমকীর পথ

পারলৌকিক শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি লাভের পরেও যখন ঐ উৎপীড়িত জনতা তাদের অধিকার আদায়ের জন্যে সচেষ্ট হতো তখন এই পাদরীরা

নানারূপ ধমকী দিয়ে তাদের কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেয়ার চেষ্টা করতো। তারা বলতো ঃ যে ব্যক্তি তার সামন্ত প্রভুর আদেশ অমান্য করবে তারা হবে আল্লাহ, গীর্জা ও পাদরীদেরও মহাশত্রু এবং চরম বিদ্রোহী। স্মরণীয় যে, ঐ যুগে খোদ গীর্জাই ছিল বড় ধরনের সামন্ত। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ছিল তাদের মজদুর। এ কারণে নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই যখন মেহনতী মানুষ ও সামন্তদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় তখন এই পাদরীরা রাশিয়ার রাজপরিবার এবং তাদের সহযোগী সামন্তদের সাথে আঁতাত স্থাপন করে। কেননা মূলত তারা সবাই ছিল একই থলির বিভিন্ন খেলনার গুটি মাত্র। তারা একথাও ভালো করে জানতো যে, জনগণ যদি কোন সময় বিপ্লব সৃষ্টি করে তখন সামন্তরা যেমন বাঁচতে পারবে না তেমনি পাদরীরাও কোনরূপ নিষ্কৃতি পাবে না। এ কারণে পারলৌকিক শান্তির প্রতিশ্রুতি ও ধমকী যেখানে ব্যর্থ হয় সেখানে ডাণ্ডা দিয়েই এই সকল আল্লাহদ্রোহী ও ধর্ম বিরোধীদেরকে ঠাণ্ডা করে দেয়া হতো। এ ব্যাপারে সামন্তরা পাদরীদের পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করতো। পাদরীদের এহেন কার্যকলাপের ফলেই ইউরোপের লোকেরা ক্রমে ক্রমে বুঝতে শুরু করে যে, ধর্মই হলো মানুষের প্রকৃত দুশমন, "ধর্ম মানুষের আফিম"—কার্লমার্কসের এই বাণীর মধ্যে এই ঐতিহাসিক সত্যের ইংগিত বর্তমান।

শাসকদের সাথী

সমাজতন্ত্রীরা ধার্মিক শ্রেণী সম্পর্কে এও বলে থাকে যে, অরা শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সর্বদা শাসকদের সহযোগিতা করে এবং জান্নাতের আশায় সকল প্রকার অবমাননা ও বে-ইনসাফীকে বরদাশত করার উপদেশ দেয় —যাতে করে তাদের প্রতিবাদী কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে যায় এবং অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠী তাদের রক্ত অবাধে চোষণ করতে সক্ষম হয়।

জামেয়ায়ে আজহারের দৃষ্টান্ত

এই পর্যায়ে তারা জামেয়ায়ে আজহার (মিসরের আজহার বিশ্ববিদ্যালয়)-এর কিছু সংখ্যক পণ্ডিতের বরাত দিয়ে থাকে। এই পণ্ডিতেরা রাজা-বাদশাহদের হাত চুমা দিত এবং তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কুরআনের অপব্যাখ্যা করে ইসলামকে বিকৃত করতো। এর একমাত্র লক্ষ্য ছিল শাসকদের রাজত্বকে স্থায়ী করে তোলা এবং জনগণ যাতে করে শাসকদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে না উঠে সেজন্যে তাদেরকে নানাভাবে বিরত রাখা। তারা বলতো যদি তারা শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কিংবা তাদের কোন আদেশ অমান্য করে তাহলে তারা পাপী ও আল্লাহদ্রোহী বলে সাব্যস্ত হবে।

আসল প্রশ্ন

উপরোক্ত কথাগুলো অমূলক নাও হতে পারে, কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এই সকল পেশাদার ধর্মীয় নেতা যা কিছু করছে তা কি তারা ধর্মীয় বিধান অনুসারে করছে, না নিজেদের হীনস্বার্থ উদ্ধার করার জন্যে করছে ?

স্বার্থান্বেসী আলেমদের দৃষ্টান্ত

অনস্বীকার্য যে, মুসলিম জাতির ইতিহাসে যে সকল স্বার্থান্বেসী আলেমদের উল্লেখ দেখা যায় তাদের কর্মতৎপরতা ছিল ইসলামের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তারা ছিল এ যুগের বিভ্রান্ত কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের মত—যারা ঘৃণ্য স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে বড় বড় অপরাধ করতেও এতটুকু কুণ্ঠিত হয় না। তবে এই ধর্ম নেতাদের অপরাধ যে ঐ সকল কবি-সাহিত্যিকদের চেয়ে সহস্রগুণ মারাত্মক ও সুদূরপ্রসারী তা না বললেই চলে। কেননা ধর্মের অনুসারী তথা ধারক ও বাহক রূপে তাদের নিকট এটাই প্রত্যাশা করা হয় যে, তারাই হবে ধর্মের সংরক্ষণকারী ও পৃষ্ঠপোষক। আল্লাহর ধর্মকে বিকৃত করে তারা যে ন্যক্কারজনক অপরাধে লিপ্ত হচ্ছে তা তারা নিশ্চিতরূপেই অবগত ছিল।

পেশাদার ধার্মিক শ্রেণী ও ইসলাম

আরো সামনে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে এ সম্পর্কে আমাদের পরিষ্কার ও নিশ্চিত ধারণা থাকা উচিত যে, ইসলামে প্রথমত, পেশাদার ধার্মিক শ্রেণীর কোন অস্তিত্বই নেই ; দ্বিতীয়ত, ধর্মীয় নেতারা যা কিছু বলবে তা-ই যে ইসলাম সংগত হবে তার কোন কারণ নেই। বস্তুত মুসলমানদের এই দুর্ভাগ্যের একমাত্র কারণ হলো নিজেদের দ্বীন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাব এবং উহাকে তোয়াক্কা না করার জঘন্য মানসিকতা।

ইসলাম একটি অপ্রতিরোধ্য স্বাধীনতা আন্দোলন

ইসলামের বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ উত্থাপন করা হয় যে, উহা মেহনতী জনতাকে জুলুম ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা আন্দোলন করার অধিকার দেয় না। এ অভিযোগ একেবারেই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। এর সবচেয়ে বড় ও অকাট্য প্রমাণ হচ্ছে মুসলমানদের ইতিহাস। যে অপ্রতিরোধ্য আন্দোলনের মাধ্যমে মিসরের প্রাক্তন স্বৈরাচারী বাদশাহর হাত থেকে মিসরবাসীরা মুক্তি লাভ করে তার মূলে ছিল একটি ইসলামী আন্দোলন। শুধু এখানেই শেষ নয়, মুসলিম দেশসমূহে যতগুলো স্বাধীনতা আন্দোলন হয়েছে তার সবগুলোই ছিল ইসলাম প্রদত্ত স্বাধীনতা স্পৃহার অনিবার্য ফসল। ফরাসীদের বিরুদ্ধে মিসরীয়রা যখন সোচ্চার হয়ে উঠে তখন তার পুরোভাগে ছিলেন মুসলিম আলেম সম্প্রদায়। মুহাম্মাদ আলীর বে-ইনসাফীর বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদের ঝড় প্রবাহিত

হয় তারও নেতৃত্বে ছিলেন এই আলেম সমাজ। সুদানে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরু হয় তার নেতৃত্ব দিয়েছেন আল মাহদী নামক একজন প্রসিদ্ধ আলেম। এমনি করে লিবিয়ায় ইটালীয় এবং মরক্কোতে ফরাসীদের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে জোর প্রচেষ্টা চালানো হয় তার মূলেও রয়েছে ইসল-ামপন্থীদের অবদান। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কাশানীর যে বৈপ্লবিক আন্দোলন শুরু হয় তার পশ্চাতেও সক্রিয় ছিল এই ইসলাম। এই সকল আন্দোলন এ কথাই প্রমাণ করে যে, ইসলাম এমন একটি শক্তিধর স্বাধীনতা আন্দোলন যা সকল প্রকার সামাজিক বে-ইনসাফী, অজ্ঞতা ও বৈষম্য চিরতরে উৎখাত করার জন্যে পরিচালিত হয়।

কুরআন থেকে সমাজতন্ত্রীদের ভুল দলীল প্রদান

সমাজতন্ত্রের প্রচারকরা কুরআন পাকের দু'টি আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রায়ই একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, ইসলাম মানুষকে সকল প্রকার বে-ইনসাফী ও অবমাননাকে সহনশীলতা ও কৃতজ্ঞতার সাথে বরদাশত করার শিক্ষা দেয়। আয়াত দু'টি হলো ঃ

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ط

"এবং তোমরা এমন কোন জিনিসের আকাংখা করো না যাতে আল্লাহ কারুর চেয়ে কাউকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।"—(সূরা আন নিসা ঃ ৩২)

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا لا لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ط وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۝

"আর কখনো আপনি সেই সকল জিনিসের প্রতি তাকাবেন না যার মাধ্যমে আমি কাফেরদের বিভিন্ন দলকে পরীক্ষার জন্যে প্রদান করেছি। ঐগুলো নিছক পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য। এবং আপনার প্রতিপালকের দান (যা পরকালে পাওয়া যাবে।) বহুগুণে শ্রেষ্ঠ এবং চিরস্থায়ী।"
—(সূরা আত ত্বা-হা ঃ ১৩১)

কুরআনের নির্ভুল অর্থ

প্রথম আয়াত নাযিল হওয়ার পটভূমি সম্পর্কে তাফসীরবিদগণ বলেন ঃ পুরুষদের জন্যে জিহাদ যখন অবশ্য কর্তব্য বলে ঘোষণা করা হয় তখন জনৈকা স্ত্রীলোক হযরত বিশ্বনবী (সা)-এর নিকট প্রশ্ন করলেন ঃ আল্লাহর পথে জিহাদ করার সৌভাগ্য থেকে মহিলাদেরকে বঞ্চিত করা হলো কেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে উপরোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ করা হয়।

তাফসীরবিদগণ উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার আরো একটি পটভূমির কথা উল্লেখ করেছেন। সেটিই অধিকতর পরিচিত। সেটি হলো ঃ মানুষকে নিছক আশা-আকাংখার কল্পনা জগতে বসবাস না করার জন্য সতর্ক করে দেয়া হয়েছে এবং খেয়ালীপোলাউ পাকাবার ব্যধি থেকে নিষ্কৃতিলাভের জন্যে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে। কেননা এতে করে মানুষের কর্মশক্তি অন্তসারশূন্য হয়ে যায় এবং ঈর্ষা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতার ন্যায় ঘৃণিত ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। ফলে পার্থিব জীবনে তারা নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য হয়। মোটকথা এই অকল্যাণকর দিক থেকে বাঁচার জন্যে এবং যে কাজে তার সুষ্ঠু যোগ্যতার কারণে সত্যিকার মর্যাদা ও সম্ভ্রম অর্জিত হয় সেই কাজে উৎসাহ দেয়ার জন্যে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় আয়াতে মানুষকে বস্তুগত স্বাভাবিক মান থেকে আধ্যাত্মিক জগতের উন্নত মানে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যে আহ্বান জানানো হয়েছে। তাকে বলা হয়েছে; দুনিয়ার মাল-আসবাব ও সাজ-সরঞ্জাম দ্বারা কারুর মহত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না। এই প্রকার লোক—যাদের কাছে বস্তুগত স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়া কোন সৎগুণই বর্তমান নেই—একদিকে যেমন ঈর্ষার কারণ নয়, তেমনি কারুর অনুসরণ-যোগ্যও নয়। এই আয়াতে সর্বপ্রথম সম্বোধন করা হয়েছে স্বয়ং বিশ্বনবী (সা)-কে। এখানে তাকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া হযেছে যে, আল্লাহর নিকট ধনী ও সচ্ছল কাফেরদের কোন মূল্য নেই। কেননা তারা ঈমান রূপ মহান সম্পদ থেকে একেবারেই বঞ্চিত। বরং মূল্য যেটুকু আছে তা একমাত্র বিশ্বনবী (সা)-এরই প্রাপ্য। হক ও সততার তিনি ছিলেন পরম ও পূর্ণাংগ আদর্শ। তাই সত্যিকার সম্ভ্রম ও সম্মানের একমাত্র হকদার তিনিই।

ধৈর্য ও তুষ্টির পরিচয় ও স্থান

প্রশ্নকারীদের কথিত মতে যদি ধরে নেয়া হয় যে, উপরোক্ত আয়াতে মানুষকে ধৈর্য ধারণের এবং অল্পে তুষ্ট থাকার উপদেশ দেয়া হয়েছে এবং যারা আল্লাহর নেয়ামতরাজির মধ্যে ডুবে আছে তাদের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাহলেও প্রশ্ন উঠে, এই বিধি-নিষেধের ক্ষেত্র কোথায়? কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে এ আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে হবে?

চিত্রের দু'টি দিক

উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর জানার পূর্বে প্রথমেই আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, ইসলাম একটি পূর্ণাংগ জীবনব্যবস্থা। এবং উহার অনুসরণ ও অনুকরণের লক্ষ্য কেবল তখনই অর্জিত হতে পারে যখন সকল শাখা-প্রশাখা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ গোটা জীবনব্যবস্থাকেই অবশ্য পালনীয় সত্য হিসেবে গ্রহণ করবে।

এবং তখনই উহার সত্যিকার রূহ উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। এদিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, ব্যাপারটি শুধু এখানেই শেষ নয় যে, ইসলাম গরীব ও বঞ্চিত মানুষকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও ধৈর্য অবলম্বনের উপদেশ দেয় এবং তাদের চেয়ে ধনী ব্যক্তিদের ধন-ঐশ্বর্যের জন্যে বিদ্বেষ পোষণ করতে নিষেধ করে বরং এই সংগে অন্যদিকে ধনী ও সচ্ছল ব্যক্তিদেরকে এরূপ নির্দেশ দেয় যে, স্বার্থপরতা থেকে তাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে এবং আল্লাহর দেয়া ধন-ঐশর্য তাঁর পথে অধিক হতে অধিক পরিমাণে ব্যয় করতে হবে—কেননা এই হচ্ছে তাদের নাজাতের পথ। নতুবা আখেরাতে তাদেরকে ভীষণ শাস্তি ভোগ করতে হবে। চিত্রের এই দু'টি দিকে লক্ষ্য রাখলে একথা সহজেই অনুমান করা যাবে যে, ইসলাম যে পথ অবলম্বন করেছে। প্রকৃতপক্ষে তাই হচ্ছে সুবিচারভিত্তিক ভারসাম্যপূর্ণ একমাত্র পথ।

ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতি

ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতি হলো ঃ উহা একদিকে মানুষকে আত্ম-কেন্দ্রিকতা ও স্বার্থপরতা থেকে ঊর্ধে উঠে মানুষের কল্যাণে নিজের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করে এবং অন্যদিকে তাকে ঈর্ষা ও কুটিলতা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেয়। আর এর একমাত্র লক্ষ্য থাকে যেন সে নিজে অর্থের কাঙাল হিসেবে অপরের দ্বারস্থ হতে বাধ্য না হয়। ইসলাম এরূপ গোটা সমাজে মানসিক শান্তি স্থাপন করতে সমর্থ হয়। বলা বাহুল্য, অর্থনৈতিক ইনসাফ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যবস্তুও এটাই। কেননা উহা সমস্ত সম্পদে সমাজের সকল ব্যক্তির মধ্যে এমনভাবে বন্টন করতে চায় যে, কেউ যেন অধিক সম্পদের মালিক হয়ে বিলাস-ব্যসন ও ভোগ-লালসার সাগরে ডুবে না যায়, আবার কেউ যেন দারিদ্র ও বঞ্চনার শিকার হয়ে মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য না হয়।

ইসলামী সমাজের বৈশিষ্ট্য

যখন কোন সমাজকে ইসলামের বিধি-নির্দেশ অনুযায়ী ঢেলে সাজান হয় তখন বঞ্চনা এবং নির্যাতন-নিপীড়নের যাবতীয় পন্থাকেই নির্মূল করে দেয়া হয়। অথচ একটি অনৈসলামিক সমাজব্যবস্থায় ধনাঢ্য জালিম এবং বঞ্চিত মজলুমের সুখ-দুঃখ জীবনের অপরিহার্য অংগ বলে পরিগণিত হয়। শোষণ ও বন্ধনমুক্ত পরিবেশ কেবল সেই সমাজেই পাওয়া যেতে পারে যেখানে ধনী ও সচ্ছল ব্যক্তিরা নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন এবং সে দায়িত্ব পালনে সদা তৎপর। কেননা ধনী ও সচ্ছল ব্যক্তিরা যদি কর্তব্য সচেতন না হয় এবং জনস্বার্থে ও আল্লাহর পথে নিজেদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় না করে তাহলে দরিদ্র ও মজলুম জনসাধারণকে বঞ্চনা ও নির্যাতনের মুখে ধৈর্য অবলম্বনের উপদেশ কেমন করে দেয়া যেতে পারে? এবং জুলুম ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার না

হওয়ার জন্যেই বা কেমন করে বলা যেতে পারে ? নিশ্চয়ই এটা কোন ইসলামী নীতি নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে ঐ সমস্ত কাপুরুষ যারা বে-ইনসাফী ও জুলুমের বিরুদ্ধে অস্ত্র পরিত্যাগ করে এবং কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে না তারা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতেই কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ط قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِى الْاَرْضِ ط قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ط فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ط وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ۝ اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا ۝ فَاُولٰٓئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا ۝

—"যারা নিজেদের উপর জুলুম করছিল তাদের রূহগুলো যখন ফেরেশতারা কবজা করে তখন তারা তাদের প্রশ্ন করে ঃ তোমরা কোন্ অবস্থায় ছিলে ? উত্তরে তারা বলে ঃ দুনিয়ার বুকে আমরা বড় দুর্বল ও নিরুপায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলে ঃ আল্লাহর দুনিয়া কি এতদূর প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা হিজরত করতে পারতে ? বস্তুত এই সমস্ত লোকের ঠিকানা হলো জাহান্নাম। আর সে ঠিকানা হলো বড়ই খারাপ।—হ্যাঁ, যে সকল নারী-পুরুষ ও শিশু সত্যই অসহায় এবং যাদের বের হওয়ার কোন পন্থা নেই, হয়ত আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল ও মার্জনাকারী।"—(সূরা আন নিসা ঃ ৯৭-৯৯)

একটি অমার্জনীয় অপরাধ

পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিতে নিছক দুর্বলতার কারণে বে-ইনসাফী ও জুলুমকে বরদাশত করা একটি অমার্জনীয় অপরাধ। পবিত্র কুরআন এদেরকে 'জালেমী আনফুসিহিম' অর্থাৎ 'নিজেদের উপর জুলুমকারী' বলে আখ্যায়িত করেছে। কেননা এরা মানবীয় ইজ্জত ও সম্ভ্রমের সেই সুউচ্চ মঞ্জিল থেকে যে মঞ্জিলকে আল্লাহ পাক মানবতার জন্যে নির্ধারিত করে দিয়েছেন—নীচে নেমে এসে অধপতন নিয়েই তৃপ্তিলাভ করছে। মানুষের জন্যে অবশ্য কর্তব্য হলো উক্ত সুউচ্চ মঞ্জিলে আরোহণ করার জন্যে তারা চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রচেষ্টা চালাবে।

ইসলামের দৃষ্টিতে বে-ইনসাফী ও জুলুম

মুসলমানদেরকে যখন হিজরত করার নির্দেশ দেয়া হয় তখন তারা একদিকে ছিল কাফের দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং অন্যদিকে ছিল তাদের জুলুম ও নির্যাতনের নিষ্ঠুর শিকার। কাফেরদের ধর্মীয় নেশাগ্রস্ততা ও চরম অসহযোগ তাদের জীবনযাপনকে দুর্বিসহ করে তুলেছিল। এরূপ শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় তাদেরকে হিজরত করার হুকুম দেয়া হলো। কিন্তু হিজরত ছিল জুলুম ও নির্যতানের বিপক্ষে একটি মাত্র ব্যবস্থা বা মাধ্যম। এছাড়াও একাধিক পন্থায় এর মোকাবিলা করা যেত। সে যাই হোক এখানে পাঠকবৃন্দের দৃষ্টি আমরা এদিকে আকৃষ্ট করতে চাই যে, ইসলাম বে-ইনসাফী ও জুলুমকে চুপচাপ বরদাশত করাকে একটি চূড়ান্ত পর্যায়ের মারাত্মক অপরাধ বলে গণ্য করে এবং বিষয়টির প্রতি এতদূর গুরুত্ব আরোপ করে যে, মুসলমানদের মধ্যে যারা সত্যসত্যই দুর্বল, অসহায় ও মজলুম ছিল এবং জুলুম ও জালেমদের বিরুদ্ধে লড়াই করার কোন শক্তিই যাদের ছিল না তাদের জন্যেও উপরোক্ত আয়াতে কেবল ক্ষমার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু অবশ্যই যে ক্ষমা করা হবে তা বলা হয়নি। অথচ তাদের অক্ষমতা যুক্তিসম্মত এবং একান্তই বাস্তব, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং ঐ আয়াতে প্রকৃতপক্ষে যে বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তাহলো এই যে, বে-ইনসাফী ও জুলুমের মোকাবিলা করার বিন্দুমাত্রও শক্তিও যদি বর্তমান থাকে তাহলে তাদের পক্ষে কস্মিনকালেও এটা বৈধ হবে না যে, উহাকে বরদাশত করবে এবং উহাকে খতম করার জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ না করবে।

আর দুর্বল, অসহায় ও মজলুম মুসলমানদের জন্যে স্পষ্ট বিধান হলো : ইসলাম তাদের ব্যাপারে এতটুকুও উদাসীন নয় ; বরং তাদের হেফাজত ও সঠিক সহযোগিতার জন্যে গোটা মুসলিম উম্মতকেই সরাসরি নির্দেশ দেয় এবং এই উদ্দেশ্যে সমস্ত জালেমের বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রাম ও সশস্ত্র যুদ্ধের আহ্বান জানায় :

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۙ وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ۝

"আর কী কারণ থাকতে পারে যে, তোমরা আল্লাহর পথে অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশুদের জন্যে যুদ্ধ করছো না, যাদেরকে দুর্বল পেয়ে দাবিয়ে রাখা হয়েছে এবং যারা এরূপ ফরিয়াদ করছে যে, প্রভু হে, তুমি আমাদেরকে

এই বসতি থেকে উদ্ধার করো যার অধিবাসীরা জালেম এবং তুমি নিজ পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে সাহায্যকারী বানাও।"

–(সূরা আন নিসা ঃ ৭৫)

এই আয়াতে একথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্ তা'আলা জুলুম ও বে-ইনসাফীর সামনে মাথা নতকারী লোকদেরকে বিন্দুমাত্রও পসন্দ করেন না ; বরং যারাই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে তাদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ হলো ঃ তারা হকপন্থী ও তাওহীদী জনতার সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জুলুম ও বে-ইনসাফীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে যাতে করে মজলুম জনতা জালেম গোষ্ঠীর হাত থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে।

একটি ভুল ধারণার অবসান

কারুর কারুর এরূপ ধারণা হতে পারে যে, উপরোক্ত আয়াত কেবল দ্বীন ও ঈমান সংক্রান্ত ব্যাপারেই প্রযোজ্য। ইসলামের দুশমনদের হাতে মুসলমানরা যখন নিগৃহীত হতে থাকে—তথা কাফেরদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকার কারণে স্বাধীনভাবে কোন দ্বীনী বা ধর্মীয় কাজ আঞ্জাম দিতে অক্ষম হয়ে পড়ে কেবল তখনকার জন্যে উক্ত আয়াত নাযিল করা হয়েছে। কিন্তু এই ধারণা একেবারেই ভুল। কেননা একটি পূর্ণাংগ জীবন পদ্ধতি হিসেবে ইসলাম (নামায-রোযার ন্যায়) ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন এবং সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের যাবতীয় তৎপরতাকে একই রূপে গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করে এবং ঐগুলোর মধ্যে বিন্দুমাত্রও পার্থক্য করে না। কেননা ঐগুলোর প্রত্যেকটির ভিত্তিই হচ্ছে ইসলামী আকীদা। উক্ত ভিত্তিমূল থেকেই সকল শাখা প্রশাখা উৎসারিত হয়। বাস্তব ! ইসলামের দৃষ্টিতে ইসলামী ইবাদত অনুষ্ঠানে বাধার সৃষ্টি করা হোক। কিংবা ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথে কোন অন্তরায় সৃষ্টি করা হোক—সবকিছুই একই পর্যায়ভুক্ত। এই বাধা দানকারীরা চাই কার্যে ও নামে কাফের হোক কিংবা নামেও মুসলমান কিন্তু কাজের দিক থেকে আল্লাহদ্রোহী ও কাফের হোক তাতে কিছুই আসে যায় না। পবিত্র কুরআনের ফায়সালা ইহাই। আল্লাহ তা'আলা বলেন !

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ○

"আর যারা আল্লাহর নাযিলকৃত আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারা কাফের।"–(সূরা আল মায়েদা ঃ ৪৪)

মোটকথা ইসলাম চায় ! সম্পদ যেন কোন অবস্থাতেই মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সীমাবদ্ধ না থাকে, বরং সমাজের সর্বত্রই যেন উহা আবর্তিত হতে থাকে। এবং সংগে সংগে ইসলামী রাষ্ট্রেরও দায়িত্ব হল এটা যে উহার আওতাধীন

সকল নাগরিকের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। রুজী রোজগারের সম্ভাব্য সকল পন্থা উন্মুক্ত করে দিতে হবে। রাষ্ট্র যদি এই ব্যবস্থা অবলম্বন না করে কিংবা কোন নাগরিক যদি দৈহিক অক্ষমতা বা দুর্বলতার কারণে উপার্জন করতে সক্ষম না হয় তাহলে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তাদের অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে। অধিকন্তু বিশ্বনবী (সা)-এর নির্দেশ[১] অনুযায়ী ইসলামী রাষ্ট্রকে রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের জন্যেও প্রাইভেট বা পাবলিক প্রতিষ্ঠানে যে সকল কর্মচারী বা কর্মকতা কাজ করে তাদের সুযোগ-সুবিধার প্রতিও এরূপ লক্ষ্য রাখার দায়িত্ব উহার কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই পালন করতে হবে। কেননা জনজীবনের সমস্ত দিক ও বিভাগই ইসলামী ব্যবস্থার শাখা-প্রশাখা ও অবিচ্ছেদ্য অংগ-প্রত্যংগ বলে পরিগণিত। যে ব্যক্তি জনগোষ্ঠী এর কোন একটি দিক ও বিভাগের কোথাও আল্লাহর বিধানের প্রতি উদাসীনতা দেখাবে সে কখনো সত্যিকার মুসলমান হতে পারে না। ঈমানের দাবীতে সে কেবল তখনই সত্যনিষ্ঠ হতে পারে যখন সে আল্লাহর জমিনে একমাত্র আল্লাহর আইন জারী করার উদ্দেশ্যে প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালাবে। এ কারণেই যারা ইসলামের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থাকে বিজয়ী করার জন্যে কোনরূপ চেষ্টা চালায় না আল্লাহ তাদেরকে স্বেচ্ছায় বে-ইনসাফী, জুলুম ও স্বৈরাচারের সাথে আপোষ করার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করে 'জালেমী আনফুসাহুম' (নিজেদের প্রতি জুলুমকারী) বলে আখ্যায়িত করেন।

'কুরআন থেকে সমাজতন্ত্রীদের ভুল দলীল প্রদান' শীর্ষক অনুচ্ছেদে উল্লিখিত আয়াত দ্বারা যারা এটা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, ইসলাম মানুষকে জুলুম ও নির্যাতনকে মুখ বুজে বরদাশত করার শিক্ষা দেয়। তাদের এ ভুল ধারণাকে ক্ষণিকের জন্যে নির্ভুল বলে ধরে নিলেও উহার পরিণাম দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, তাদের ধারণা সম্পূর্ণরূপেই ভুল। কেননা উহার পরিণাম হলো ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত। ঐ সকল প্রতিবাদী মনে করেছিল যে, প্রথম আয়াতের পরিণাম হবে এই যে, সম্পদ শুধু মুষ্টিমেয় লোকের হাতেই সঞ্চিত হবে এবং অন্যান্য লোকেরা উহার সুফল ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে (যেমন হয়েছিল সামন্ত প্রথা ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়)। কিন্তু এরূপ হওয়া ছিল আল্লাহর ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা কুরআন পাকের স্পষ্ট হুকুম হলো ঃ

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ (الحشر :٧)

---

১. গ্রন্থকার যে হাদীসের প্রতি ইংগিত করেছেন তাহলো, বিশ্বনবী (স) বলেন ঃ "যে ব্যক্তি আমাদের (ইসলামী রাষ্ট্রের) কর্মকর্তা হিসেবে কোন দয়িত্বে নিয়োজিত থাকবে তার স্ত্রী না থাকলে তাকে বিবাহ করাতে হবে, ঘর না থাকলে ঘরের ব্যবস্থা করতে হবে। খাদেম না থাকলে খাদেমের ব্যবস্থা করতে হবে।"

"যাতে করে সম্পদ ধনীদের মধ্যে আবর্তিত হতে না থাকে।"
–(সূরা আল হাশর ঃ ৭)

দ্বিতীয় পরিণাম সম্পর্কে তারা বলেছিল ঃ সম্পদশালীরা সাপ হয়ে তাদের সম্পদ পাহারা দিতে থাকবে—খরচ করলেও করবে তাদের ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশের জন্যে। এরূপ লোকদের সম্বন্ধেই পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ○ (التوبة : ٣٤)

"সেই সকল লোককে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও যারা সোনা-রূপা জমা করে রাখে এবং আল্লাহর পথে উহা ব্যয় করে না।"
–(সূরা আত তাওবা ঃ ৩৪)

এতে করে স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর নিকট এরূপ সঞ্চয় নেহাৎ ঘৃণিত ও অপসন্দনীয়। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশের কঠোর সমালোচনা করে বলা হয়েছে ঃ

وَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ○ (سبا : ٣٤)

"আর আমরা কোন জনবসতিতে কোন ভীতি প্রদর্শনকারী (পয়গাম্বর) প্রেরণ করিনি, যেখানকার সচ্ছল ব্যক্তিরা একথা বলেনি যে, তোমরা যে বিধি-নির্দেশ নিয়ে প্রেরিত হয়েছ আমরা তা স্বীকার করি না।"
–(সূরা সাবা ঃ ৩৪)

وَاِذَآ اَرَدْنَآ اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيْرًا ○ (بنى اسراءيل : ١٦)

"যখন আমরা কোন জনবসতিকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি তখন আমরা সেখানকার স্বচ্ছল লোকদেরকে হুকুম করি। আর তারা তথায় নাফরমানি করতে শুরু করে ; তখন উক্ত বসতির জন্যে আযাবের ফায়সালা হয়ে যায় এবং আমরা উহাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেই।"
–(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১৬)

وَاَصْحٰبُ الشِّمَالِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الشِّمَالِ ○ فِيْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ ○ لا وَّظِلٍّ

مِّنْ يَّحْمُوْمٍ لَّا بَارِدٍ وَّلَا كَرِيْمٍ ۝ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ ۝

"এবং বামপন্থী ; বামপন্থীরা কতই নিকৃষ্ট ! আগুনের মধ্যে থাকবে এবং উথলানো পানির মধ্যে এবং কালো ধোয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে—যা ঠাণ্ডাও নয় এবং আনন্দদায়কও নয়। এই লোকেরা এর পূর্বে দুনিয়ায় বড় সচ্ছলতার মধ্যে দিনাতিপাত করতো।"–(সূরা আল ওয়াকিয়া ঃ ৪১-৪৫)

মোটকথা লোকেরা যদি সামাজিক জুলুম ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে তাহলে সর্বাত্মক ধ্বংস ছাড়া কোনই ফল হবে না। ইসলাম মানুষকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে সামাজিক জুলুম ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার না হওয়ার উপদেশ দেয়—এই অভিযোগ যে কতবড় মিথ্যা ও ভিত্তিহীন তা ভাষায় প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিতে সামাজিক অন্যায়কে চুপচাপ দেখতে থাকা এবং উহাকে বন্ধ করার জন্যে চেষ্টিত না হওয়া আল্লাহদ্রোহিতার স্পষ্ট নিদর্শন ছাড়া অন্য কিছুই নয়। এতে করে আল্লাহর গযব নেমে আসে এবং এমনি করেই এক একটি জাতি আল্লাহর অভিশাপ ও শাস্তির উপযুক্ত বলে গণ্য হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۭ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ۝ كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ۭ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۝

"বনী ইসরাঈলদের মধ্যে যারা আল্লাহদ্রোহিতার পথ অনুসরণ করে তাদের উপর দাউদ এবং ঈসা ইবনে মারইয়ামের ভাষায় অভিশাপ দেয়া হয়েছে। কেননা তারা নাফরমানী করেছিল এবং সীমালংঘন করে চলছিল। তারা একে অন্যকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখা পরিত্যাগ করেছিল। তারা যা করছিল তা ছিল বড়ই নিকৃষ্ট।"–(সূরা আল মায়েদা ঃ ৭৮-৭৯)

হযরত বিশ্বনবী (সা) বলেন ঃ

مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ

"তোমাদের যে কেউ অন্যায় কাজ করতে দেখবে সে যেন তা নির্মূল করার প্রচেষ্টা চালায়।"

اَفْضَلُ الْجِهَادِ عِنْدَ اللّٰهِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ اِمَامٍ جَائِرٍ ـ

"আল্লাহর দৃষ্টিতে সর্বোত্তম জেহাদ হলো জালেম শাসকের সামনে হক কথা বলা।"

পবিত্র কুরআনের আয়াতের সাথে হযরত বিশ্বনবী (সা)-এর এই নির্দেশের মাধ্যমে এই সত্য পরিস্ফুট হয়ে উঠে যে, সামাজিক বে-ইনসাফী ও অন্যায়-অনাচার একটি সমাজে কেবল তখনই মাথা চাড়া দিয়ে উঠে, যখন সেখানকার শাসকগোষ্ঠী ইনসাফ ও কল্যাণের পথ বর্জন করে চলে। ইসলামের দৃষ্টিতে এমন শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্যই ফরয। এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের পথ একমাত্র এটাই। কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে, ঐ সকল লোক কতবড় অপদার্থ যারা ইসলামকে এই বলে বিদ্রূপ করে যে, উহা মানুষকে চরম মিনতির সাথে যাবতীয় বে-ইনসাফী ও জুলুম বরদাশত করার উপদেশ দেয়। বস্তুত এ ধরনের উক্তি কেবল তারাই করতে পারে যারা ধর্ম-বিরোধিতায় একেবারেই অন্ধ, অথবা কুপ্রবৃত্তির আবর্তে সম্পূর্ণরূপেই দিশেহারা এবং ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যার বেসাতি করতে সর্বদাই বদ্ধপরিকর।

কুরআনের আয়াতের একটি প্রণিধানযোগ্য দিক

পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াতে মানুষকে যে আকাশ কুসুম রচনা করতে নিষেধ করা হয়েছে তার সর্বাধিক কল্যাণকর দিক হচ্ছে এই যে, মানুষ এভাবে যতই খেয়ালী পোলাও পাকাতে থাকবে ততই তার কর্মক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকবে। কেননা তাতে সত্যিকার গঠনমূলক প্রচেষ্টা বলতে কিছুই নেই। এই আয়াতের আরো একটি দিক প্রণিধানযোগ্য ; তাহলো ঃ রাষ্ট্র, সমাজ ও জাতির অস্তিত্ব একটি বাস্তব ও প্রাকৃতিক সত্য। মানুষ ইচ্ছা করলেই এগুলোকে খতম করতে পারে না। এ কারণে তার জন্যে সর্বোত্তম পন্থা হলো এই যে, এগুলোর অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়ে পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজের কর্মপদ্ধতিকে নির্ধারিত করে নিবে।

আকাশ কুসুম কল্পনার ধ্বংসকারিতা

আকাশ কুসুম আশা-আকাংখার পেছনে যতই ঘুরে মরুক না কেন তাতে অকল্যাণ ও অপকারিতা ছাড়া অন্য কিছুই অর্জিত হয় না। কেননা দুনিয়াতে কিছু লোক আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ যোগ্যতা নিয়েই আগমন করে যারা সে কারণে জগতে খ্যাতিমান পুরুষ হিসেবে পরিচিত হয় এবং সকল দিক থেকে মহাসম্মানের পাত্র হয়ে উঠে। আবার কিছু লোক এমনও জন্মগ্রহণ করে যাদের অন্তরে থাকে খ্যাতি ও প্রসিদ্ধিলাভের উৎকট কামনা। কিন্তু সে পর্যন্ত পৌঁছার জন্যে যে যোগ্যতা ও গুণপনার প্রয়োজন তা থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে তারা ব্যর্থ হয় যেমন পদে পদে তেমনি উহার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না কস্মিনকালেও। এদের অলীক আশা-আকাংখা পূরণের ক্ষমতা রাষ্ট্রের নেই।

আর তাদের ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা, ক্ষমতার মোহ, পরনিন্দা ইত্যাদি ব্যধি-গুলোকেও কেউ রোধ করতে পারে না। কেননা যে গুণাবলী ও যোগ্যতা থেকে তারা বঞ্চিত তা কোন স্থান থেকে কেউ সংগ্রহ করে দিতে পারে না।

সুখ ও সৌন্দর্যের সমতা

দু'জন মহিলার কথা ধরুন, একজন হচ্ছে রূপ-সৌন্দর্যে অতুলনীয়, হুর-পরীকেও সে হার মানায়। আর একজন হচ্ছে কুশ্রী, কালো ও কুৎসিত। কিন্তু কুশ্রী হলেও সে চায়, মানুষ তাকে সুন্দরী বলুক, তার রূপ-সৌন্দর্য বর্ণনায় মানুষ পঞ্চমুখ থাকুক। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, রূপ-সৌন্দর্য ও মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের ক্ষেত্রে এই উভয় মহিলাকে সমান করা যায় কি ? অনুরূপভাবে দু'টি দম্পতির কথা ধরুন। একটি দম্পতি পারস্পরিক ভালোবাসা, প্রেম-প্রীতি, আস্থা ও নির্ভরতার দিক থেকে বেশ সুখেই দিন যাপন করছে ; সন্তান-সন্ততির কল-কাকলীতেও তাদের সংসার যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠছে। কিন্তু এরই পাশে আর একটি দম্পতি যাবতীয় আনন্দ ও সুখ থেকে বঞ্চিত। সকল প্রকার চিকিৎসা ও প্রতিকারের চেষ্টা সত্ত্বেও সন্তানলাভের সৌভাগ্য থেকে তারা বঞ্চিত। প্রশ্ন এই যে, দুনিয়ার সমস্ত শক্তি একত্র হয়েও কি এদের দাম্পত্য জীবনকে সুখী ও সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হবে ?

একমাত্র পথ

মোটকথা মানব জীবনের এমন অসংখ্য বিষয় বর্তমান যার সমাধান যেমন অর্থনীতি দিতে পারে না, তেমনি কোন সমাজ বা রাষ্ট্রও দিতে পারে না। এই প্রকার যাবতীয় বিষয়ে মানুষের জন্যে যুক্তিসংগত পথ মাত্র একটিই বর্তমান। আর তাহলো এই যে, আল্লাহর ইচ্ছার উপরেই তাদের ধৈর্যধারণ করতে হবে এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে হবে ; অল্পে তুষ্টিই তাদের একমাত্র নীতি ; তারা বিশ্বাস করবে, দুনিয়ার মানুষ যা কিছু পায় তার সাথে তার দ্বীনী কাজের সামঞ্জস্যতা অপরিহার্য নয়। দুনিয়ার ব্যর্থতা ও প্রবঞ্চনাকে পারলৌকিক সুখ ও সমৃদ্ধি দিয়ে পুষিয়ে দেয়া হবে।

রাশিয়ার দাবীর অন্তরালে

নিরেট অর্থনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিতে বিচার করে কে বলতে পারে যে, এই দুনিয়াতেই পূর্ণাংগ সাম্য সম্ভবপর ? সমস্ত দুনিয়ার এমন একটি দেশের কথাও কল্পনা করা যায় না যেখানের লোকেরা পারিশ্রমিক ও পদের দিক থেকে একজন আর একজনের সমান। সোভিয়েট রাশিয়ার দাবী ছিল এই যে, সে দেশে পরিপূর্ণ সাম্য স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু সেখানকার সমাজে উঁচু-নীচু

বলতে কি কিছুই নেই ? ধরুন রাশিয়ার একজন কারিগর পদ ও বেতন উভয় ক্ষেত্রেই উন্নতি করার জন্যে বড়ই উদগ্রীব। একজন ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার জন্য তার বড় আকাংখা। কিন্তু তার মেধা অপেক্ষাকৃত কম হওয়ার কারণে যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা দেয়া সত্ত্বেও সে তার লক্ষ্য অর্জন করতে পারছে না। কিন্তু বলুন তো, এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র তার কোন সাহায্য করতে পারে কি ? অনুরূপভাবে কোন শ্রমিক যদি শারীরিক দুর্বলতার কারণে নির্ধারিত সময়ের বাইরে অতিরিক্ত সময়ে (Over Time) কাজ করতে অক্ষম হয়। অথচ সে অতিরিক্ত সময়ে কাজ করার আশা করে—যা কেবল একজন সবল শ্রমিকের পক্ষেই সম্ভবপর —তাহলে রাষ্ট্র তার এই আশা পূরণ করতে পারে কি ? বলা বাহুল্য এই ধরনের ব্যাপারে রাষ্ট্র কোন কিছুই করতে পারে না। সুতরাং এই ধরনের লোকেরা যদি আশায় বঞ্চিত হওয়ার পরেও আশা একদিন পূর্ণ হবে—এরূপ কল্পনা নিয়ে ঘুরতে থাকে এবং কার্যত কেবল বঞ্চিতই হতে থাকে তাহলে তার পরিণতি এছাড়া আর কি হতে পারে যে, তাদের সমগ্র জীবনই নিছক কল্পনা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে থাকবে ; নোংরা চিন্তা-চেতনা, ঈর্সা-বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতার অক্টোপাসে আবদ্ধ হয়ে থাকবে ; এ থেকে মুক্তিলাভের কোন পথ তারা খুঁজে পাবে না। যারা এরূপ মানসিক ব্যধিতে আক্রান্ত—যারা এরূপ অলীক চিন্তায় অস্থির তারা নিজেদের কোন দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে অক্ষম হয় পড়ে। কেননা ক্ষমতার লিপ্সায় এবং উঁচু স্কেল লাভের লোভ তাদেরকে সুস্থভাবে থাকতে দেয় না। লোভ-লালসার এই মারাত্মক ব্যধিকে শক্তি ও ভয়-ভীতির মাধ্যমে দূর করা ভালো, না তাদের মনোরাজ্যে একটি বিপ্লব সৃষ্টি করে উহাকে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করার অভ্যাস সৃষ্টি করার পদক্ষেপ নেয়া ভালো ? বস্তুত এই শেষোক্ত পন্থার প্রতি ইংগিত করেই পূর্বোক্ত আয়াতে সবর ও কৃতজ্ঞতার পথ অবলম্বন করার উপদেশ দেয়া হয়েছে।

আলোচনার সারমর্ম

এই হলো ইসলামী দাওয়াতের সারমর্ম। ইসলাম মানুষের সকল প্রকার বৈধ আশা-আকাংখা ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখে এবং উহা পূর্ণ করার পথ রচনা করে দেয়। কিন্তু সাথে সাথে ঐ সকল সত্যকেও সমর্থন করে যার পরিবর্তন-পরিবর্ধন মানবীয় শক্তির অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে যেখানে জুলুম ও বে-ইনসাফী দেখা যাবে সেখানে প্রতিকার করা সম্ভবপর হলে ঈমান এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের দাবী হবে এই যে, উক্ত বে-ইনসাফী ও জুলুম খতম করার জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَنْ يُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا

"অতপর যে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে এবং নিহত হবে কিংবা জয়লাভ করবে তাকে অবশ্যই আমি মহাপুরস্কার দান করবো।"

–(সূরা আন নিসা : ৭৪)

যাইহোক, দুনিয়াতে যদি এমন কোন ধর্ম থাকে তাহলে নিশ্চয়ই তা ইসলাম ধর্ম নয়। কেননা উহা সর্বপ্রকার বে-ইনসাফী ও জুলুমের মারাত্মক বিরোধী। এমনকি উহার সাথে আপোষকারীদেরকেও উহা ভয়ানক শাস্তির উপযুক্ত বলে গণ্য করে।

ইসলাম ও অমুসলিম সংখ্যালঘু

কতক লোকের মতে ইসলামী সরকার অমুসলিম সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে যে মূলনীতি অনুসরণ করে থাকে তা একটি বিশেষ স্পর্শকাতর বিষয়। সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলেই নাকি জটিলতার আশংকা দেখা দেয়। কেননা তাতে করে মুসলমান এবং অমুসলমানদের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। এ কারণে তারা এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে অগ্রসর হয় না।

সংখ্যালঘুদের অমূলক ভীতি

আমরা প্রাচ্যের খৃস্টান পণ্ডিতদের সাথে এ সম্বন্ধে খোলাখুলি আলোচনা করতে চাই। তাদের নিকট আমাদের প্রশ্ন ঃ ইসলামী সরকার সম্পর্কে তাদের এ ভীতির কারণ কি ?—তারা কি ইসলামী আইন-কানুনকে ভয় করে, না বাস্তব জীবনে উহার প্রয়োগকে ভয়ের চোখে দেখে ?

পবিত্র কুরআন ও সংখ্যালঘু

ঐ সকল ভীত ব্যক্তিগণকে আমরা পবিত্র কুরআনের নিম্ন আয়াতগুলো অনুধাবন করতে অনুরোধ করি ঃ

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

"আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে সেই সকল লোকদের প্রতি এহসান ও ইনসাফ করতে নিষেধ করেন না যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করেনি। আল্লাহ্ ইনসাফকারীদেরকে ভালোবাসেন।"–(সূরা আল মুমতাহিনা ঃ ৮)

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ط وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ص وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ز وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ ـ(المائده : ٥)

"আজ তোমাদের জন্যে পবিত্র জিনিসগুলোকে হালাল করে দেয়া হলো ঃ আর কিতাবীদের জবাই করা জন্তু তোমাদের জন্যে হালাল এবং তোমাদের জবাইকৃত জন্তু তাদের জন্যে হালাল। এবং ঐ সকল সতী মহিলাও

তোমাদের জন্যে হালাল যারা মুসলমান এবং ঐ সকল সতী মহিলাও যাদেরকে তোমাদের পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল।"

ইসলামী আইনশাস্ত্রের একটি নীতি

এই প্রসংগে ইসলামী আইন শাস্ত্রের এই নীতির প্রতি পাঠকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, অমুসলমানদের জন্য ঠিক তেমনি দায়িত্ব ও কর্তব্য আরোপ করা হয়েছে যেমনটি করা হয়েছে আমাদের মুসলমানদের জন্য।

পবিত্র কুরআন মুসলমানদের প্রতি এরূপ নির্দেশ দেয় যে, তারা অমুসলমানদের সাথে সৌহার্দমূলক ও সুবিচারভিত্তিক ব্যবহার করুক। ইবাদাতের ক্ষেত্রে তারা মুসলমানদের মতই স্বাধীন। শুধু তাই নয়, ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে সামাজিক অধিকার ও দায়িত্বের দিক থেকেও মুসলমানদের ন্যায় সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে। অধিকন্তু ইসলাম মুসলমান ও অমুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ককে সুন্দর ও শক্তিশালী করার জন্যেও সচেষ্ট। এ কারণে উহা মুসলমানদেরকে অমুসলমানদের বাড়িতে যাওয়ার এবং বন্ধুর ন্যায় পানাহারের অনুমতিও প্রদান করে। এমনকি উহা মুসলমানদেরকে কিতাবী হলে অমুসলমানদের বিয়ে শাদীর অনুমতি দিতেও কুণ্ঠিত নয়।

আরনল্ডের সাক্ষ্য

উপরোক্ত নীতির বাস্তবায়নে নিজেদের পক্ষ থেকে কিছু বলার পরিবর্তে ইউরোপের খৃষ্টান লেখকদের বরাত দেয়াই সংগত বলে মনে হয়। কেননা এতে করে কারুর সন্দেহই থাকবে না যে, আমরা বোধ হয় খামাখাই ইসলামের পক্ষে কথা বলছি। স্যার আরনল্ড তার বিখ্যাত গ্রন্থ (The Preaching of Islam-এ বলেন :

> "তারা যে শক্তি প্রয়োগ বা জবরদস্তির ফলে ইসলাম গ্রহণ করেনি —একথা তাদের সেই সৌহার্দমূলক সম্পর্ক দ্বারাই প্রমাণিত হয় যা খনকার যুগে খৃষ্টান এবং মুসলমানদের মধ্যে বর্তমান ছিল। স্বয়ং মুহাম্মাদ (সা) কতিপয় খৃষ্টান গোত্রের সাথে এই মর্মে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন যে, তিনি তাদের হেফাজতের দায়িত্ব পালন করবেন এবং তারা তাদের ধর্ম-কর্ম সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সম্পাদন করবে। তাদের ধর্মীয় নেতাদের যাবতীয় অধিকার ও ক্ষমতা—যা ইসলামের পূর্ব থেকেই তাদের জন্যে নির্ধারিত ছিল—বহাল থাকবে।"[পৃষ্ঠা : ৪৮]

"হিজরী ১ম শতকের মুসলিম বিজেতারা আরবে জন্মগ্রহণকারী খৃষ্টানদের সাথে যে সৌহার্দমূলক আচরণ করেছে এবং পরবর্তী নেতারা যা অব্যাহত

রেখেছে তা দেখে প্রত্যয়ের সাথেই বলা যায়, যে সকল খৃস্টান ইসলাম গ্রহণ করেছে তারা তা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই করেছে।" [পৃষ্ঠা ঃ ৫১]

"যখন মুসলমান সৈন্যরা জর্দানে পৌছে এবং হযরত আবু উবাইদা (রা) ফাহেল নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন তখন স্থানীয় খৃস্টান অধিবাসিরা তাকে লিখে জানাল ঃ মুসলমান ভাইসব ! আমরা তোমাদেরকে বাই-জান্টাইনদের চেয়ে অগ্রাধিকার দিচ্ছি—যদিও তারা আমাদের একই ধর্মের অনুসারী। কেননা তোমরা আমাদের সাথে সুষ্ঠুভাবে চুক্তি পালন করেছ। তোমরা আমাদের প্রতি অধিকতর অনুগ্রহশীল। আমাদের উপর তোমাদের হুকুমাত তাদের হুকুমাতের চেয়ে উৎকৃষ্ট। কেননা তারা আমাদের অনেক ঘরবাড়ি ও সম্পদ সামগ্রী লুন্ঠন করে নিয়েছে।" [পৃষ্ঠা ঃ ৫৫]

স্যার আরনল্ড আরো বলেন ঃ

"এটাই ছিল সিরিয়ার জনগণের মানসিক অবস্থা—৬৩৩ হতে ৬৩৯ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে আরবরা যখন রোমকদেরকে ক্রম পর্যায়ে সিরিয়া থেকে বের করে দিয়েছিল। ৬৩৭ খৃস্টাব্দে দামেস্কের অধিবাসীরা আরবদের সাথে কিছু শর্তে সন্ধি স্থাপন করে এবং এর ফলে শুধু যে পরাজয় থেকে রক্ষা পেল তাই নয়, বরং কিছু সুযোগ-সুবিধাও তারা লাভ করলো। এরপর অনতিবিলম্বেই সিরিয়ার অন্যান্য বহু শহরই তাদের পথ অনুসরণ করে। হেমাস (Emessa), আর্থুজা (Arthusa), আরিথুসা (Arethusa), হিরোপলস (Hieropolis) এবং অন্যান্য শহর এক একটি করে আরবদের সাথে চুক্তিসম্পাদন করে তাদের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। পরিশেষে জেরুজালেমের সম্মানীয় পাদরীও (Patriarch) একই প্রকার শর্তে শহরটিকে মুসলমানদের হাতে তুলে দেন। বেঈমান শাহানশার ধর্মীয় জুলুম ও নির্যাতনের কারণে তিনি রোম সাম্রাজ্য এবং তার খৃস্টান শাসনের বিপক্ষে মুসলমানদের ধর্মীয় সদাচরণ ও সৌহার্দমূলক ব্যবহারে অত্যধিক প্রীত হন। আক্রমণকারী সেনাবাহিনীর প্রাথমিক ভয় অতিবাহিত হওয়ার পর সেখানকার অধিবাসীদের মনে আরব বিজেতাদের জন্য গভীর ভালোবাসার সৃষ্টি হয়।" [পৃষ্ঠা ঃ ৫৫]

ইসলামী হুকুমাত সম্পর্কে এই হলো একজন খৃস্টান পণ্ডিতের সাক্ষ্য। এরপর ইসলামী ব্যবস্থা সম্পর্কে খৃস্টানদের ভীত হওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে কি ? ধর্মীয় উন্মত্ততার শিকার—মুসলমান, না অমুসলমান ? হতে পারে খৃস্টানরা মুসলমানদের "ধর্মীয় উন্মত্ততার" ভয়ে ভীত। এ কারণ যদি সত্যই হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, "ধর্মীয় উন্মত্ততার" অর্থই তারা জানে না। এর অর্থ জানতে হলে তাদের নিম্ন ঘটনাবলীর প্রতি অবশ্যই তাকাতে হবে ঃ

ধর্মীয় বিচারালয়

খৃস্টান ধর্ম যাজকরা যে ধর্মীয় বিচারালয় (Inquisition Courts) স্থাপন করে তার মূল লক্ষ্য ছিল স্পেনের মুসলমানদেরকে চিরতরে নির্মূল করে দেয়া। এই বিচারালয়সমূহে মুসলমানদেরকে ভয়ানক শাস্তি দেয়া হতো। তাদের উপর নির্যাতন চালাবার জন্যে এমন এমন লোমহর্ষক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল যার কোন নযীর ইতোপূর্বে বিশ্বের কোথাও ছিল না। তারা মুসলমানদেরকে জীবন্ত অবস্থায় আগুনে ফেলে পুড়িয়ে ভস্ম করে ফেলত, তাদের নখগুলোকে টেনে খুলে ফেলতো এবং গোশত থেকে পৃথক করে দিত। চোখগুলো উঠিয়ে ফেলতো এবং শরীর অংগ-প্রত্যংগগুলোকে গোশতের মত টুকরা টুকরা করে ফেলতো। আর এই সকল হিংস্র ও পাশবিক নির্যাতনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ইসলামী দ্বীনকে বর্জন করিয়ে খৃস্টান ধর্মে দীক্ষিত করা।

প্রশ্ন এই যে, পাশ্চাতের কোন মুসলিম দেশে বসবাসকারী খৃস্টানরা মুসলমানদের নিকট থেকে এরূপ ব্যবহার পেয়েছে কি?

পাইকারীভাবে মুসলমানদের হত্যা

আজও উগ্র জাতীয়তাবাদের অন্ধ দাসানুদাস যুগোশ্লাভিয়া আল বেনিয়া, রাশিয়া এবং ইউরোপের শাসনাধীন উত্তর আফ্রিকা, সোমালিল্যাণ্ড, কেনিয়া ও জাঞ্জিবার এবং ভারত ও মালয়য়ে কোন সময়ে শান্তি ও নিরাপত্তার নামে আবার কখনো জাতীয় শুদ্ধির নামে পাইকারীভাবে মুসলমানদেরকে হত্যা করা হচ্ছে।

ইথিওপিয়া—ধর্মীয় উন্মত্ততা ও গোড়ামির একটি দৃষ্টান্ত

ধর্মীয় উন্মত্ততার আর একটি দৃষ্টান্ত হলো ইথিওপিয়া।—এই দেশটি প্রাচীনকাল থেকেই ঐতিহাসিক, ভৌগলিক, সাংস্কৃকিত এবং ধর্মীয় দিক থেকে মিসরের সাথে ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট। এখানে মুসলমান ও খৃস্টানরা প্রথম থেকে বসবাস করে আসছে। মুসলমান হচ্ছে মোট জনসংখ্যার ৩৫% থেকে ৪০%। কিন্তু এ সত্ত্বেও এ দেশে এমন একটি বিদ্যালয় খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে ইসলামী শিক্ষা বা আরবী পড়বার সুযোগ বর্তমান। মুসলমানরা একান্ত নিজেদের চেষ্টায় যে দু'একটা মাদ্রাসা স্থাপন করছে তার উপর যে ভারী ট্যাক্স আরোপ করা হচ্ছে এবং পদে পদে বাধার সৃষ্টি করা হচ্ছে তাতে করে একদিকে যেমন এ ধরনের প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তেমনি অন্য দিকে নতুন করে স্থাপনের উৎসাহও বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মোটকথা সরকারের পক্ষ থেকে এমন সব পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে যাতে করে ইসলামী শিক্ষা কোন মতেই প্রসারিত হতে না পারে এবং শিক্ষকরাও পুরানো শিক্ষ্যব্যবস্থার অক্টোপাস থেকে মুক্তি লাভ করতে না পারে।

মুসলমানদের করুণ অবস্থা

ইটালীয় আক্রমণের পূর্বে ইথিওপিয়ার অবস্থা এরূপ ছিল যে, যদি কোন মুসলমান খৃস্টান ঋণদাতার নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করতো এবং সময় মত পরিশোধ করতে ব্যর্থ হতো তাহলে সেই ঋণদাতা ঋণগ্রস্ত মুসলমানকে গোলাম বানিয়ে ফেলতো। আর খৃস্টান সরকারের চোখের সামনেই এই গোলামের বেচা-কেনা চলতো এবং এই গোলামদের উপর আরো নানা প্রকার জুলুম-নির্যাতন চালানো হতো।

মুসলমানগণ ইথিওপিয়ার এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও তাদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে না ক্যাবিনেটে তাদের কোন মন্ত্রী আছেন, না আছে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে কোন অফিসার।

প্রশ্ন এই যে, কোন ইসলামী দেশে খৃস্টানদের সাথে এরূপ ব্যবহার করা হয়েছে কি ? আজ তাদের স্বধর্মের লোকেরা মুসলমানদের সাথে যে ব্যবহার করছে তারা মুসলিম দেশে তাদের সাথে সেইরূপ ব্যবহার পসন্দ করে কি ? —যাই হোক ধর্মীয় উন্মত্ততার এই হলো সঠিক পরিচয়।

সংখ্যালঘু এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা

কমিউনিষ্ট বা সমাজতন্ত্রীদের মতে মানব জীবন অর্থনৈতিক স্বাধীনতারই নামান্তর। যদি কিছুক্ষণের জন্যে এই অলীক ধারণাকে সঠিক বলে ধরে নেয়া হয় তাহলে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী খৃস্টানরা কি কখনো জীবনের এই যথার্থ মূল্য থেকে বঞ্চিত রয়েছে ? ইসলামী হুকুমাত কি কখনো তাদেরকে সম্পত্তির মালিক হতে, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় করতে কিংবা সঞ্চয় করতে নিষেধ করেছে ? কেবল বিধর্মী হওয়ার অজুহাতে তাদেরকে শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং হুকুমাতের দায়িত্বপূর্ণ পদ থেকে কি কখনো বঞ্চিত করা হয়েছে ?

ইংরেজদের চক্রান্ত

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে এ এক বাস্তব সত্য যে, মুসলিম দেশসমূহে খৃস্টানরা কোনদিন জুলুম বা ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হয়নি। আধুনিক যুগে যে দু'একটি ঘটনার কথা শোনা যায় উহার মূলে রয়েছে ইংরেজদের ষড়যন্ত্র। তারা জেনেশুনেই সুপরিকল্পিতভাবে খৃস্টানদেরকে উৎসাহ যুগিয়ে বিভেধ ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে চলেছে।

জিযিয়া ও উহার সঠিক মর্ম

ইসলাম বিরোধীরা জিযিয়ার প্রসংগ উত্থাপন করে এরূপ অভিযোগ করে থাকে যে, মুসলমান ধর্মীয় শত্রুতা সাধন করার জন্যেই অমুসলমানদের নিকট

থেকে এই কর আদায় করে থাকে। এর সবচেয়ে যুক্তিপূর্ণ উত্তর দিয়েছেন স্যার আরনল্ড তার The Preaching of Islam নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে। তিনি বলেন ঃ

"পক্ষান্তরে মিসরের কৃষকদের মধ্যে যারা মুসলমান ছিল তাদের যখন সামরিক দায়িত্ব থেকে মুক্ত রাখা হতো তখন উহার বিনিময়ে তাদের উপর ঐরূপ করই আরোপ করা হতো যেরূপ আরোপ করা হতো খৃস্টানদের উপর।"[পৃষ্ঠা ঃ ৬৩]

স্যার আরনল্ড আরো বলেন ঃ

"পূর্বেই বলা হয়েছে যে, জিযিয়া কেবল স্বাস্থ্যবান পুরুষদের নিকট থেকেই তাদের সামরিক দায়িত্ব পালনের বিনিময়ে আদায় করা হতো—যা তাদেরকে মুসলমান হলে প্রদান করতে হতো। আর এটাও উল্লেখযোগ্য যে, যখন কোন খৃস্টান মুসলিম সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে সামরিক দায়িত্ব পালন করতো তখন তাকে এই জিযিয়া কর দিতে হতো না। আন্তাকিয়ার (Antioch) নিকটবর্তী এলাকা আল জুরাইজিমার খৃস্টান গোত্র মুসলমানদের সাথে এই মর্মে সন্ধি স্থাপন করে যে, তারা তাদের মিত্রগোত্র হিসেবে বসবাস করবে, যুদ্ধে তাদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করবে এবং এর বিনিময়ে তাদেরকে কোন জিযিয়া কর দিতে হবে না, বরং যুদ্ধলব্ধ (গনীমাতের) মালেরও নির্ধারিত অংশ লাভ করবে।" [পৃষ্ঠা ঃ ৬২]

এতে করে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, ধর্মীয় অসহনশীলতা জিযিয়া করের মূল কারণ নয়। আসলে এটা ছিল এমন একটি কর যা মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে ঐ সকল লোকের নিকট থেকে আদায় করা হতো যারা কোন সামরিক দায়িত্ব থেকে মুক্ত থাকতে চাইতো।

পবিত্র কুরআনে জিযিয়ার হুকুম

এই প্রসংগে পবিত্র কুরআনের বলা হয়েছে ঃ

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ـ

"কিতাবীদের সেই সকল লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাও যারা আল্লাহ এবং আখেরাত দিবসের উপর ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যাকে নিষিদ্ধ করেছে তাকে নিষিদ্ধ বলে গণ্য করে না এবং সত্য দ্বীনকে

নিজেদের দ্বীন বলে গ্রহণ করে না যে পর্যন্ত না তারা নিজ হাতে জিযিয়া কর প্রদান করে এবং (তোমাদের নিকট) নতি স্বীকার করে।"

—(সূরা আত তাওবা ঃ ২৯)

এই আয়াতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, যারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় কেবল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মুসলিম শাসনাধীনে বসবাসকারী অমুসলমানদের সাথে এ আয়াতের কোন সম্পর্ক নেই।

বিভেদের জন্যে দায়ী কে ?

পরিশেষে আমরা বলতে চাই ঃ উপনিবেশিকতাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও কমিউনিজমের চরেরাই মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে বিভেদ ও বৈষম্য সৃষ্টি করে থাকে।

কমিউনিষ্টদের ষড়যন্ত্র

কমিউনিষ্টদের ষড়যন্ত্রের মূল কথাই হলো 'অবস্থা বুঝে কথা বলা।' মজুর ও শ্রমিকদের কাছে তারা বলে ঃ "তোমরা যদি সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে শরীক হও তাহলে কল-কারখানা তোমাদেরকে দিয়ে দেয়া হবে।" কৃষকদের কাছে গিয়ে বলে ঃ "তোমরাই হবে সমস্ত জমি-জমার মালিক।" বেকার গ্রাজুয়েট বা শিক্ষিত লোকদের নিকট তারা বলে ঃ "তোমরা যদি সমাজতন্ত্র গ্রহণ কর তাহলে তোমাদের সবাইকেই যোগ্যতা অনুসারে চাকুরী দেয়া হবে।" যৌন ব্যভিচার পরায়ণ যুব সমাজকে তারা প্রতিশ্রুতি দেয়, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে তারা যেমন খুশী তেমন ভোগ-বিলাসে মশগুল হতে পারবে ; রাষ্ট্র, আইন বা প্রচলিত নীতিবোধ তাদের যৌন লালসা চরিতার্থ করার পথে কোন অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারবে না।

অন্যদিকে খৃষ্টানদেরকে তারা বুঝায়। যদি তোমরা সমাজতন্ত্র গ্রহণ কর তাহলে আমরা ইসলামকে—অর্থাৎ সেই ধর্মকে যা মানুষের মধ্যে বিভেদ ও বৈষম্যের সৃষ্টি করে তাকে—চিরতরে ধ্বংস করে দেব। এ সকল প্রচারনার বিপক্ষে আমরা পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটিই যথেষ্ট বলে মনে করি ঃ

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ط إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ○

"তাদের মুখ থেকে যে কথা বেরিয়ে আসে তা কতই না নিকৃষ্ট ! তারা শুধু মিথ্যা কথাই বলে।"–(সূরা আল কাহ্ফ ঃ ৫)

ইসলামের প্রতি মিথ্যা আরোপ

মোটকথা এর চেয়ে জ্বলজ্যান্ত মিথ্যা আর কিছুই হতে পারে না যে, উহা কেবল ধর্মের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করে। কেননা ইসলাম তো ধর্ম ও প্রত্যয় নির্বিশেষে সকল মানুষকেই মৌলিক মানবীয় অধিকারসমূহ দান করে ; উহা মানুষকে নির্ভেজাল মানবতার ভিত্তিতেই ঐকবদ্ধ্য করে তোলে। এবং স্ব স্ব পসন্দ অনুযায়ী যে কোন ধর্ম গ্রহণ করার এবং সে অনুযায়ী আমল করার পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করে।

সুতরাং আমরা সহজেই আশা করতে পারি যে মুসলমানদের ন্যায় মুসলিম দেশের খৃস্টান অধিবাসীরা পরিপূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করতে এবং ইসলামের সাথে তাদের ঐতিহাসিক সম্পর্কের ভিত্তিতে উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে পরাঙ্মুখ হবে না। দ্বিতীয়ত, আমরা এ আশাও করতে পারি যে, তারা সাম্রাজ্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক বিভ্রান্তিকর প্রচারনায় কখনো কর্ণপাত করবেন না।

ইসলাম ও সমাজতন্ত্র

"মানব জীবনের যা কিছু সুন্দর ও মহৎ, যে মূল্যবোধ সুষ্ঠু ও কল্যাণকর তারই নাম ইসলাম। এটা এক শাশ্বত জীবন পদ্ধতি ; সকল প্রজন্মের ও সকল সমাজের এক আদর্শ পথনির্দেশ। কিন্তু বিগত চারশ' বছর ধরে ইসলামী সমাজব্যবস্থা এক ধারাবাহিক অস্থিরতার শিকার হওয়ায় ইসলামের অর্থনৈতিক বিধানসমূহ কার্যত বেকার হয়ে পড়েছে এবং উহার ধারাবাহিক উন্নতির পথ একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে। সুতরাং আমরা যদি আধ্যাত্মিক ও মানসিক পবিত্রতার জন্যে ইসলামকে মৌলিক আকীদা হিসেবে গ্রহণ করি এবং অর্থনৈতিক সমস্যাদির সমাধান হিসেবে সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করি তাহলে তাতে দোষ কি ? কেননা এতে করে আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান তো অবশ্যই হবে, অথচ আমাদের সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে ও কাজ-কর্মে কোন পরিবর্তন সূচিত হবে না। মোটকথা এভাবে আমরা একদিকে যেমন সামাজিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ অক্ষুণ্ন রাখতে পারবো, তেমনি বর্তমান যুগের আধুনিকতম অর্থনৈতিক মতাদর্শের সংস্পর্শে এসে অধিকতর উপকৃত হতে সক্ষম হবে।"

এই বক্তব্য কোন ইসলামী চিন্তাবিদের নয়। বরং ইসলামের চরম শত্রুদের বিভ্রান্তিকর প্রচারনার এ এক অভিনব নমুনা।

সমাজতন্ত্রীদের কৌশল

উপরোক্ত যুক্তি সমাজতন্ত্রী পণ্ডিতদের এক অভিনব কৌশল। এই অদ্ভুত শয়তানী খেলা তারা দীর্ঘকাল ধরেই খেলে আসছে। প্রথম দিকেও তারা ইসলামের বিরুদ্ধে খোলাখুলিভাবেই আক্রমণ চালাত এবং নানাবিধ প্রশ্ন উত্থাপন করে ইসলামকে হেয় ও নিষ্ক্রিয় বলে গণ্য করার চেষ্টা করতো। কিন্তু যখন তারা দেখল যে, এই বিরোধিতার কারণে মুসলমানদের ইসলাম প্রিয়তা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে তখন তারা নিজেদের কর্মসূচী পরিবর্তন করে ধোঁকাবাজির আশ্রয় নিয়ে মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করতে শুরু করে। এ সময় তারা যে যুক্তির আশ্রয় নেয় তা ছিল ঃ "সমাজতন্ত্র কারুর ইসলামকে হস্তক্ষেপ করে না ; কেননা মৌলিকতার দিক থেকে সমাজতন্ত্র সামাজিক সুবিচারেরই নামান্তর। এবং রাষ্ট্র নাগরিকদের যে মৌলিক প্রয়োজন পূর্ণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করে সমাজতন্ত্র তো তারই সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। সুতরাং ইসলামকে সমাজতন্ত্রের বিরোধী বলে গণ্য করে তোমরা কি মুসলিম জাহানকে বুঝাতে চাও যে, ইসলাম সামাজিক সুবিচারের বিরোধী ? নিশ্চয়ই ইসলাম সামাজিক

সুবিচারের বিরোধী নয় এবং উহা এমন কোন মতবাদের বিরোধিতা করতে পারে না যা সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর।"

পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদীদের অনুসরণ

সমাজতন্ত্রীদের এই শয়তানী যুক্তি পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদীদের যুক্তি থেকে মোটেই ভিন্নতর নয়। সমাজতন্ত্রীদের ন্যায় সাম্রাজ্যবাদীরাও প্রথম দিকে খোলাখুলিভাবেই ইসলামের কঠোর সমালোচনা করতো। কিন্তু যখন তারা বুঝতে পারলো যে, এতে করে মুসলিমরা ইসলাম সম্পর্কে আরো সতর্ক হয়ে উঠে তখন তারা তাদের 'টেকনিক' পরিবর্তন করে ফেলে এবং বলতে শুরু করে ঃ পাশ্চাত্য জগত তো শুধু এতটুকুই চায় যে, প্রাচ্যের অধিবাসীরা তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হয়ে উঠুক। ইসলাম—যেহেতু সমস্ত সভ্যতার মূল উৎস সেহেতু উক্ত সভ্যতার বিরোধী হতে পারে না। তারা মুসলমানদেরকে আশ্বাস দিল যে, তারা নিজেদের নামায-রোযা এবং সুফীসুলভ আমল-অনুষ্ঠান বর্জন না করেই এই আধুনিক সভ্যতাকে গ্রহণ করতে পারে। অথচ তারা ভালো রূপেই জানত যে, একবার তাদের সভ্যতার শিকার হয়ে যাওয়ার পর মুসলমানদের মধ্যে এই যোগ্যতাই আর অবশিষ্ট থাকবে না যে, তারা তাদের ইসলামী ভাবধারা ও আচার-অনুষ্ঠানকে জীবন্ত রাখতে সক্ষম হবে ; বরং কয়েকটি প্রজন্মের পর পুরোপুরি এবং চিরকালের জন্যেই তাদের সভ্যতার দাসানুদাসে পরিণত হবে। বস্তুত তাদের এ ধারণা ছিল একেবারেই নির্ভুল। কেননা মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্যের এই আধুনিক সভ্যতা প্রবেশের ফলে এমন এমন ব্যক্তির সৃষ্টি হয়েছে—যারা হয়েছে ইসলাম সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। এমনকি কোন যুক্তিসম্মত কারণ বা জ্ঞান ছাড়াই অনেকেই ছড়াচ্ছে ইসলামের প্রতি দারুণ বিদ্বেষ বা অপরিসীম ঘৃণা।

সমাজতন্ত্রীদের আসল লক্ষ্য

ঠিক এরূপ খেলাই সমাজতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা মুসলিম দেশগুলোতে অব্যাহত রেখেছে। তারা মুসলমানদেরকে বলছে ঃ "সমাজতন্ত্রকে একটি অর্থব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করার পরেও তোমরা মুসলমানই থাকবে ; তোমাদের নামায, রোযা ও সুফীসুলভ আমল-আখলাকের উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা হবে না। কেননা সমাজতন্ত্র তো নিছক একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এটা মানুষের ধর্মীয় ব্যাপারে কোনরূপ নাক গলায় না। সুতরাং মুসলমানদের পক্ষে সমাজতন্ত্র গ্রহণ না করার কোন কারণই থাকতে পারে না। কিন্তু তারা এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, মুসলমানরা একবার যদি সমাজতন্ত্রকে স্বাগত জানায় তাহলে তাদের পক্ষে মুসলমান হিসেবে বেঁচে থাকা কখনো আর সম্ভবপর হবে না ; সমাজতন্ত্রীরা কিছুকালের মধ্যেই তাদের মস্তিষ্ক ধোলাই করে তাদের

মতাদর্শের অনুসারী করে ফেলবে। ইসলামের সামান্য মাত্র নিদর্শনও তাদের এবং তাদের সন্তান-সন্ততিদের জীবনে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কেননা বর্তমান যুগ চরম দ্রুতগতির যুগ। এ যুগে বহু দূরপ্রসারী পরিবর্তনও অধিক হতে অধিকতর সংক্ষিপ্ত সময়ে খুব সহজেই আনয়ন করা যায়। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, পরিস্থিতি এরূপ হওয়া সত্ত্বেও অসংখ্য মুসলমান সমাজতন্ত্রীদের আপাত মধুর বাক্যে মুগ্ধ হয়ে তাদের শিকার হয়ে যাচ্ছে। কেননা এতে করে তারা নিরানন্দ ও শুষ্ক ইসলামী দায়িত্ব পালন থেকে বেঁচে যায় এবং পথ চলার জন্যে যে স্বাভাবিক চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন তার হাত থেকেই নিষ্কৃতি পায়। এ ছাড়া গঠনমূলক কাজ-কর্মে যে সীমাহীন পরিশ্রম করতে হয় তা থেকেও মুক্তিলাভ করতে সক্ষম হয়। তারা তো মনে প্রাণে এটাই চায় যে, কোন কাজ-কর্মের ঝামেলা না থাকুক এবং নেশাগ্রস্তদের মত শুধু খাবের পর খাব দেখতে থাকুক; কোন সমস্যা নিয়েই যেন তাদের চিন্তা করতে না হয় ; বরং অন্যেরা তাদের সমাধান বের করে দিক আর তারা আরমসে চোখ বুজে তাদের অনুসরণ করতে থাকুক।

ইসলাম সমাজতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত

স্মরণীয় যে, যে মতাদর্শ বা ব্যবস্থাপনা মৌল নীতির দিক থেকে ইসলামের সাথে সংঘর্ষশীল নয় ইসলাম তার বিরোধিতা করে না। কিন্তু সমাজতন্ত্র সম্পর্কে মনে রাখতে হবে যে, উহা মূলনীতি ও উপাদানের দিক থেকে ইসলা-মের সম্পূর্ণ বিরোধী। এ কারণে বাহ্যিকভাবে কোথাও কোথাও মিল থাকলেও একটি আরেকটির চেয়ে ভিন্নতর এবং পৃথক। তাই মুসলমানগণ ইসলাম প্রদত্ত শ্রেষ্ঠতম জীবনব্যবস্থা বর্জন করে কমিউনিজম, পুঁজিবাদ কিংবা জড়বাদী সমাজতন্ত্রকে কোনক্রমেই গ্রহণ করতে পারে না। কেননা ইসলামের সাথে উহার কোনটিরই কোন সম্পর্ক নেই। বরং বাহ্যিকভাবে কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য থাকলেও মৌলিকভাবে ইসলাম এবং উহার যে কোন একটির মধ্যে আসমান-জমিন ব্যবধান। আল্লাহ্ তা'আলা তার পবিত্র গ্রন্থে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন :

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ○

"আর যারা আল্লাহর নাযিলকৃত কানুন অনুসারে হুকুম দেয় না তারা পুরোপুরিই কাফের।"—(সূরা আল মায়েদা : ৪৪)

সুতরাং সমাজতন্ত্র গ্রহণ করার পর আমরা মুসলমান থাকতে পারি কি ? —কিছুতেই না। কেননা সমাজতন্ত্র শুধু অর্থনৈতিক সংস্কারের কোন কর্মসূচী নয়। যারা এটাকে এরূপ একটি কর্মসূচী হিসেবে উপস্থাপিত করে তারা হয়

কোন প্রবঞ্চনার শিকার। নতুবা কোন অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে অন্যাকে ধোঁকা দেয়ার জন্যে সচেষ্ট। প্রকৃত ঘটনা এই যে, সমাজতন্ত্র স্বীয় প্রত্যয় ও আচরণ উভয় ক্ষেত্রেই ইসলামের বিপরীত। সুতরাং এ দু'টোর তুলনা একেবারেই অপরিহার্য।

প্রত্যয় ও চিন্তাধারার পার্থক্য

প্রত্যয় ও চিন্তাধারার দিক থেকে ইসলাম ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে যে বহুবিধ পার্থক্য বর্তমান তার উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো নিম্নরূপ ঃ

জড়বাদী ধারণা

প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় যে, সমাজতন্ত্র একটি জড়বাদী ধারণা মাত্র। উহার দৃষ্টিতে একমাত্র সত্য তাই যা আমরা পঞ্চইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অবগত হতে পারি। যে সকল সত্য আমাদের ইন্দ্রিয় শক্তির আওতার বাইরে তার সবকিছুই হলো অলীক কল্পনা ও ভিত্তিহীন। এবং ভিত্তিহীন বলে সেগুলো সম্পর্কে মানুষের চিন্তা করার বা ইতস্তত করার কোন যুক্তিই নেই। এ পর্যায়ে এঞ্জেলস এর বক্তব্য হলো ঃ "জড় বস্তুই হলো একমাত্র সত্য।" তার অনুসারী জড়বাদীদের মতে ঃ "মানুষের মেধাও হচ্ছে এক প্রকার জড় পদার্থের অভিব্যক্তি এবং বাহ্যিক পারিপার্শিকতারই প্রতিফলন মাত্র।" তাদের ধারণায় "মানুষের আত্মা (রূহ)-ও হচ্ছে বস্তুগত পরিবেশের একটি একটি ফসল।" অতএব দেখা যাচ্ছে যে, সমাজতন্ত্র নিছক একটি জড়বাদী মতাদর্শ। এতে মানব জীবনের যাবতীয় আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ডকে হাস্যকর মনে করা হয় এবং একে যাবতীয় অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সমষ্টি বলে আখ্যায়িত করা হয়।

মানবতার নিকৃষ্টতম চিন্তাধারা

মানবীয় জীবন ও চেষ্টা-সাধনার এই ধারণা অত্যন্ত নিম্ন ও নিকৃষ্টমানের, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ইসলাম এই ধারণার সাথে কখনো একমত নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের মর্যদা অনেক বড়। যদিও দেহ তার জড়, চলতে হয় তাকে মাটির উপর। কিন্তু তার আত্মা ও চিন্তাশক্তির বিচরণস্থল অনন্ত ও অসীম। তার মৌলিক মানবীয় প্রয়োজনসমূহও কেবল অন্ন, বাসস্থান ও যৌন তৃপ্তি সাধন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়।

একটি ভুল ধারণা

কোন কোন পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন যে, আমরা যদি কেবল সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করি এবং আল্লাহ ও রাসূল সম্পর্কে আমাদের মৌলিক বিশ্বাস ও চিন্তাধারা অব্যাহত রাখি এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের অন্যান্য কাজ বজায় রাখি, তাহলে সমাজতন্ত্রের এই জড়বাদী চিন্তাধারা আমাদের

জীবনে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে কি ? কেননা সমাজতন্ত্র তো নিছক একটি অর্থনৈতিক সংস্কারমূলক কর্মসূচী। এ কর্মসূচীর পক্ষে আমাদের জীবনের অন্যান্য দিকের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার কোন সাধ্যই নেই। কিন্তু এরূপ ধারণা সম্পূর্ণরূপেই ভুল। এ বিষয়ে কারুর সন্দেহ থাকা উচিত নয় যে, সমাজতন্ত্রের নিজস্ব দৃষ্টিতেই কোন জাতির অর্থব্যবস্থা এবং তাদের মৌল বিশ্বাস ও জীবনাদর্শ দু'টি পৃথক পৃথক জিনিসের নাম নয় ; বরং তাদের উভয়ের মধ্যেই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বর্তমান। একটিকে আরেকটি থেকে পৃথক করার কোন উপায় নেই। কেননা উভয়ের ভিত্তিই হচ্ছে একই অর্থব্যবস্থা। নির্ভেজাল জড়বাদী মতাদর্শ থেকেই উভয়ের জন্ম। সমাজতন্ত্রী লেখকরা এই সত্যটিকে নানাভাবে উপস্থাপিত করেছে। কার্লমার্কস এবং এঞ্জেলস এর পুস্তকেও এ সত্যটির প্রতি যথেষ্ট আলোকপাত করা হয়েছে।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের ধারণা

সমাজতন্ত্রীরা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ (Dialectical Materialism)-কে চরম সত্য বলে বিশ্বাস করে। তাদের মতে দুই বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব বিত্তবান পুঁজিপতি এবং বিত্তহীন শ্রমিকদের শ্রেণীগত দ্বন্দ্বই এমন একটি কারণ যা মানুষের সকল প্রকার অর্থনৈতিক ও বস্তুগত প্রগতির মূল। এ পর্যন্ত মানুষ যে উন্নতি করেছে তা এই শ্রেণী সংগ্রামের একমাত্র ফল। আজ পর্যন্ত এই উন্নতির সময়ে মানুষকে যে দাসপ্রথা, সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করতে হয়েছে তাও এই দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতি এবং এরই মাধ্যমে উহা নিজস্ব মঞ্জিলে অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সমাপ্তি পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম হবে। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের এই আলোকেই সমাজতন্ত্রীরা তাদের ভূমিকাকে নির্ভুল বলে প্রমাণ করতে চায়। আর এই মতাদর্শের বুনিয়াদের প্রেক্ষিতেই তারা একথা নিশ্চিত বলে ধরে নেয় যে, বর্তমান মতাদর্শের সংগ্রামে পরিশেষে একমাত্র সমাজতন্ত্রই জয়লাভ করবে। তারা এও দাবী করে যে, সমাজতন্ত্র এবং এই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের চিন্তাধারার মধ্যে এমন একটি (বৈজ্ঞানিক) সম্পর্ক বিরাজমান যাতে আল্লাহ, রাসূল কিংবা ধর্মের আদৌ কোন অবকাশ নেই। কেননা তাদের ধারণায় এই সকল জিনিস নিছক অর্থনৈতিক কারণের ফলশ্রুতি মাত্র। অর্থনৈতিক পটভূমি থেকে পৃথক করলে এগুলোর কোন অস্তিত্ব বা গুরুত্বই অবশিষ্ট থাকে না। এ কারণে মানব জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য নির্ধারণ কিংবা উহার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেও দেখা যাবে যে, ঐগুলো একেবারেই বেকার। জীবনে যা সত্যিই মূল্যবান তাহলো অর্থনৈতিক উৎপাদনের উপায়-উপাদান। এগুলোর পরিবর্তনের সাথে সাথেই মানব জীবন প্রভাবিত হয় এবং বিপ্লবের সৃষ্টি হয়। কিন্তু সমাজতন্ত্রের এই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ যে কত অসার ও অন্তসারশূন্য তা প্রমাণ করার জন্য এই ইতিহাসই যথেষ্ট যে, আরব দেশে ইসলাম যে সর্বাত্মক, অভূতপূর্ব ও প্রচণ্ড বিপ্লব আনয়ন করে তার

পূর্বে সেখানে কোন অর্থনৈতিক বিপ্লবের সন্ধান পাওয়া যায় না এবং আরবদের অর্থনৈতিক উপায়-উপাদানেও কোন পরিবর্তন হয়েছিল বলে প্রমাণ করা যায় না। এমনটি হলে বলা যেত যে, তার ফলেই হযরত বিশ্বনবী (সা)-এর বিপ্লব এবং ইসলামের সার্বিক সাফল্য সম্ভবপর হয়েছে।

আল্লাহহীন মতাদর্শ

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম ও সমাজতন্ত্র সম্পূর্ণরূপেই পরস্পর বিরোধী। ও দু'টোকে কখনো এক বলে স্বীকার করা যায় না। ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহর অপরিসীম দয়া ও স্নেহ বিশ্ব সৃষ্টির সবকিছুকেই ঘিরে আছে। আল্লাহই তার বান্দাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্যে তার মনোনীত নবী-রাসূল প্রেরণ করেন যাতে করে তারা গোটা মানবজাতিকে ইসলামের সরল ও সঠিক পথে—যা অর্থনৈতিক অবস্থা ও পরিবেশের চেয়ে শত সহস্রগুণ উন্নত এক মহান সত্য পরিচালিত করতে সক্ষম হয়। পক্ষান্তরে সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিতে মানুষের উন্নতির স্তরসমূহ পরস্পর বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের একমাত্র ফলশ্রুতি। এতে আল্লাহর ইচ্ছা কিংবা অন্য কোন চালিকা শক্তির আদৌ কোন স্থান নেই। স্থান আছে শুধু এমন এক মানবীয় প্রয়োজনের যার মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক জীবনের নানাবিধ সমস্যা। একজন মুসলমান মুসলমান থাকা অবস্থায় এবং একমাত্র ইসলামকেই সত্যিকার জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করার পর সমাজতন্ত্রীদের মতাদর্শকে কেমন করে মেনে নিতে পারে? কেমন করেই বা সে উহার একনিষ্ঠ সেবক হতে পারে?

সমাজতন্ত্রের মানুষ সংক্রান্ত চিন্তাধারা

ইসলাম ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে দ্বিতীয় পার্থক্য হলো এই যে, সমাজতন্ত্র মানুষ সম্পর্কে একটি নেতিবাচক ধারণা পোষণ করে। সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিতে মানুষ বস্তুগত ও অর্থনৈতিক পরিবেশ ও পরিস্থিতির সামনে একটি অসহায় খেলনা মাত্র। কার্লমার্কসের বক্তব্য হলো :

"মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিভিত্তিক জীবন তাদের অর্থনৈতিক পরিবেশ পরিস্থিতির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। মানুষের বুদ্ধি-বিবেক সামাজিক পরিস্থিতি ও কর্মকাণ্ড রচনা করতে পারে না ; বরং সামাজিক কর্মকাণ্ডই মানুষের বুদ্ধি-বিবেককে সৃষ্টি করে।"

মানুষ সম্পর্কে ইসলামের চিন্তাধারা

ইসলামের মানুষ সংক্রান্ত চিন্তাধারা সম্পূর্ণরূপেই ইতিবাচক। এটা সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার বিপরীত। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ এক স্বাধীন

চিন্তাধারা ও ক্ষমতার মালিক এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া অন্য কোন কিছুর সামনেই সে মাথা নত করে না। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَٰوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ط

"এবং সমস্ত আসমান ও জমিনে যত জিনিস রয়েছে তার সবই তিনি (আল্লাহ) নিজ পক্ষ থেকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন।"

–(সূরা আল জাসিয়া ঃ ১৩)

ইসলাম মানুষের নিকট এই সত্যই তুলে ধরে যে, শক্তি ও ক্ষমতার দিক থেকে এই বিশ্ব সৃষ্টিতে মানুষের স্থানই সকলের উপরে এবং অন্যান্য সবকিছুই মানুষের সেবক মাত্র। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা মানুষকেই পেশ করতে পারি। মানুষের উন্নতি তথাকথিত 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের' কোন নিয়ম-নীতিরই অধীনতা স্বীকার করেনি। প্রথম যুগের মুসলমানগণ কখনো এক মুহূর্তের জন্যেও একথা চিন্তা করেনি যে, মানুষের ভাগ্যলিপি বা ইতিহাস রচনায় অর্থনীতির অপরিহার্য গুরুত্ব বর্তমান। দ্বিতীয়ত, কোন অর্থনীতির সামনে তাদের মার্কসের কথিত মতে—অসহায়ের মত মাথাও নত করতে হয়নি। তারা নিজেদের ইচ্ছায় এবং সজ্ঞানেই তাদের অর্থব্যবস্থাকে আল্লাহর বিধান ও হযরত বিশ্বনবী (সা)-এর দিক নির্দেশনা অনুযায়ী প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছেন। সমাজের অন্যান্য দিক ও বিভাগের ক্ষেত্রেও তারা একই পথ অনুসরণ করেছেন। বস্তুত যখন তারা দাসদেরকে মুক্তি দিয়েছেন তখন কোন অর্থনৈতিক বা বস্তুগত মুনাফা তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেনি। বরং সেটা ছিল ইসলামী শিক্ষার অনিবার্য সুফল। আর সে কারণেই ইসলামী দুনিয়ায় সামন্তবাদী ব্যবস্থা কখনো গজাতে পারেনি; অথচ সে ঘৃণ্য ব্যবস্থা শতাব্দীর পর শতাব্দীকাল ধরে ইউরোপ এবং অন্যান্য ভূখণ্ডে প্রচলিত ছিল।

সমাজের প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ

ইসলাম ও সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তৃতীয় যে কথাটি স্মরণ রাখা প্রয়োজন তাহলো ঃ কোন অর্থব্যবস্থাকেই উহার সামাজিক দর্শন ও চিন্তাধারা থেকে পৃথক করা যায় না। এ কারণে সমাজতন্ত্রকে একটি অর্থব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করার পর আমরা সমাজতান্ত্রিক জীবন দর্শন থেকে যে জীবন দর্শন মানুষকে অর্থব্যবস্থার একটি অসহায় খেলনা বলে মনে করে এবং কেবল অর্থনৈতিক কারণই সমস্ত সমাজ বিপ্লবের একমাত্র কার্যকরী শক্তি হিসেবে মেনে নেয় —কোন ক্রমেই আত্মরক্ষা করতে পারি না। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার অনিবার্য ফলশ্রুতি হলো সমাজতান্ত্রিক জীবন দর্শন। এই জীবন দর্শনের দৃষ্টিতে মানুষের জীবনে সবচেয়ে অধিক ও সিদ্ধান্তমূলক গুরুত্ব হচ্ছে একমাত্র সমাজের ঃ

সমাজের মানুষ উহার অসহায় খাদেম মাত্র। অন্য কথায় সমাজতন্ত্রে সমষ্টিই হচ্ছে সবকিছু, ব্যষ্টি বা শত সহস্র ব্যক্তি মানুষ উহার নিরুপায় সেবকের চেয়ে অধিক কিছুই নয়।

ইসলামে ব্যক্তির গুরুত্ব

ব্যক্তি সম্পর্কে সমাজতন্ত্রের এই ধারণা সম্পূর্ণরূপেই ইসলাম বিরোধী। ইসলামের দৃষ্টিতে আসল গুরুত্ব কেবল ব্যক্তি মানুষের। সমাজের সেই গুরুত্ব নেই এবং কখনো হতেও পারে না। (কেননা মানুষের জন্যেই সমাজ, সমাজের জন্যে মানুষ নয়।) এ কারণেই ইসলাম তার মহান লক্ষ্য অর্জনের জন্যে সমাজের বিপক্ষে ব্যক্তির উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে। ইসলাম মানুষের অন্তরকে এমন সমুজ্জ্বল ও পরিশীলিত করে তুলতে চায় যে, সে স্বেচ্ছায় যাবতীয় সামাজিক দায়িত্বই আঞ্জাম দিতে অগ্রসর হবে।—অন্য কথায় উহা ব্যক্তিকে সমাজের একটি সচেতন সদস্যের সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত দেখতে চায়—যাতে করে সে নিজের স্বাধীন মর্জি অনুযায়ী সামাজিক কর্তব্য পালন করতে এবং নিজের পেশাকে বাছাই করে নিতে সক্ষম হয়। কেননা একদিকে যেমন সে কোন নির্দিষ্ট পেশাকে গ্রহণ করতে বাধ্য নয়, তেমনি কোন পেশাকে বর্জন করার দায়িত্বও তার নেই। প্রশাসন যদি কোন সময়ে আল্লাহর নির্ধারিত সীমালংঘন করে বসে তখন ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই অধিকার প্রদান করে যে, সে প্রশাসনের হুকুমকে অমান্য করতে পারবে। ইসলাম তো এমনিই তার আওতাধীন সকল ব্যক্তিকে সমাজের নৈতিক বিধানসমূহের পৃষ্ঠপোষক হওয়ার দায়িত্ব প্রদান করে এবং যে কোন সামাজিক দুর্নীতিকে বন্ধ করার জন্যে শক্তি প্রয়োগ করতে বাধ্য করে। ইসলামের এই মহান লক্ষ্য এমন কোন সমাজে অর্জিত হতে পারে না যেখানে ব্যক্তিকে কোন মূল্য দেয়া হয় না এবং কোন স্বৈরাচারী ক্ষমতাসম্পন্ন সরকারের সামনে যে সরকার যাবতীয় অর্থনৈতিক উপায় ও উৎপাদনকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করে তাকে নিরুপায় করে রেখে দেয়া হয়।

সামাজিক সম্পর্কসমূহের সমাজতান্ত্রিক ভিত্তি

এই শেষ কথাটিও আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, সমাজতান্ত্রিক দর্শনে সামাজিক সম্পর্কসমূহের পারস্পরিক বিন্যাস ও শৃংখলাবিধানের মধ্যে সবচেয়ে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে অর্থনৈতিক কারণের উপর। মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে ইসলাম উহাকে যেমন অস্বীকার করে না। তেমনি উহাকে হ্রাস করার কথাও বলে না। কোন জাতির জীবনে যে একটি সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিরাজমান থাকে ইসলাম তাকে উপেক্ষা করে না এবং নৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে

উহার যে প্রভাব পতিত হয় তাকেও অস্বীকার করে না। কিন্তু উহা এরূপ কষ্ট কল্পনাকে কখনো প্রশ্রয় দেয় না যে, আমাদের জীবন অর্থব্যবস্থা ছাড়া কিছুই নয়। এবং সমাজতন্ত্রের মত এরূপ বিশ্বাস করতেও সম্মত নয় যে, মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হয়ে গেলেই অবশিষ্ট সকল সমস্যারই আপনা আপনিই সমাধান হতে বাধ্য। নিম্ন দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে কোন সন্দেহ নেই।

অর্থনৈতিক সমস্যা মানুষের দুঃখ-কষ্টের কোন সমাধান নয়

একই রূপ অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পন্ন দু'জন যুবকের দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হোক। তাদের মধ্যে একজন তো তার অন্ধ প্রবৃত্তির দাসানুদাস এবং ভোগ-বিলাসের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। আর দ্বিতীয়জন ভোগ-বিলাসে নিমজ্জিত থাকার পরিবর্তে লেখা-পড়ার মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ এবং আত্মিক চেতনা বৃদ্ধির কাজে মশগুল থাকে। প্রশ্ন এই যে, এই যুবক দু'জন কি একই রূপ ব্যবহার পাওয়ার উপযোগী? উভয়ের অবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই কি? উভয়ের জীবনকে একই রূপ কল্যাণ, সততা ও সাফল্যের অধিকারী বলে গণ্য করা যাবে কি?

ঠিক এরূপে আরেক ব্যক্তির দৃষ্টান্ত নিন। এ ব্যক্তি বড় কঠিন ব্যক্তিত্বের অধিকারী। মানুষ তার কথা শোনে এবং তাকে খুব শ্রদ্ধা করে। এই ব্যক্তিকে কি এমন এক ব্যক্তির সমান বলে গণ্য করা যায় যে সকল দিক থেকেই অথর্ব, যার না আছে কোন ব্যক্তিত্ব, না আছে কোন সামাজিক মূল্য। বরং সে একজন উপহাসের পাত্র বলেই সর্বত্র বিবেচিত হয়। নিছক অর্থনৈতিক সমস্যাই কি এই অকেজো ব্যক্তির একমাত্র সমস্যা যে, এটির সমাধান হয়ে গেলেই তার অবশিষ্ট সমস্যাগুলোর আপনা আপনিই সমাধান হয়ে যাবে? এভাবে তার জীবন কি সেরূপ সুন্দর ও সুষ্ঠু হয়ে উঠতে পারবে, যেরূপ হতে পারে প্রথমোক্ত সম্মানীয় ব্যক্তির জীবন?

অনুরূপভাবে একজন রূপবতী ও সম্মানীয়া মহিলা কি একজন কুৎসিত সাধারণ শ্রেণীর মহিলার সমান হতে পারে? দ্বিতীয় মহিলার অর্থনৈতিক সমস্যাদি দূরীভূত হওয়ার পর তার অবশিষ্ট সমস্যাগুলোর সমাধান কি আপনা আপনিই হয়ে যাবে যাতে করে সে প্রথমোক্ত মহিলার সমকক্ষ হয়ে উঠবে?

নৈতিক মূল্যবোধই সর্বাধিক গুরুত্বের অধিকারী

মানুষের মধ্যে এরূপ নৈতিক পার্থক্যের প্রেক্ষিতেই ইসলাম মানুষের অর্থনৈতিক মূল্যবোধের স্থলে নৈতিক মূল্যবোধকেই সবচেয়ে অধিক গুরুত্ব

আরোপ করেছে। কেননা উহার দৃষ্টিতে মানবীয় জীবনের ভিত্তি অর্থনৈতিক মূল্যমানের উপর নয়, বরং অর্থনীতির সাথে সম্পর্কহীন এমন কিছু মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত যা বাস্তবায়িত করার জন্যে ঠিক ততখানি সাধনা করতে হয় যতখানি করতে হয় অর্থনৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে। এ জন্যেই ইসলাম আল্লাহ ও মানুষ—অর্থাৎ প্রভু ও গোলামের মধ্যে স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে। কেননা আল্লাহ ও মানুষের এই আধ্যাত্মিক সম্পর্কই মানুষের বাস্তব জীবনে নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারে। এটাই মানুষকে বস্তুগত জীবনের সর্বনিম্ন স্তর থেকে–যে স্তরে সে বস্তুগত জীবনের অধীন এবং ধ্বংসাত্মক টানা-হেচড়া, ঘৃণা, ঈর্ষা, বিদ্বেষ ইত্যাদির নিষ্ঠুর শিকারে পরিণত হয়—তুলে নিয়ে মানবতার এমন এক সুউচ্চ ও মহিমান্বিত স্তরে পৌঁছিয়ে দেয় যেখানে সে শুধু প্রবৃত্তির লালসার হাত থেকে মুক্তিলাভ করতেই সক্ষম হয় না। বরং সে এমন এক জগতের অধিকারী হয়ে যায় যেখানে নেকী, কল্যাণ ও ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই বর্তমান থাকে না।

আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের শ্রেষ্ঠত্বের একটি দিক

ইসলামী আদর্শে জীবনযাপনের ক্ষেত্রে আরো একটি দিক থেকে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের মৌলিক গুরুত্ব বর্তমান। ইহলোকে এই আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ মানবজাতির এক অমূল্য সম্পদ। মানব জীবনে এর প্রভাব যে কত গভীর ও দূরপ্রসারী তা ভাষায় প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। এর প্রতি যথার্থ মনোযোগ দিয়ে উহার সুষ্ঠু বিন্যাস সাধন করা হলে মানব জীবনে উহা ততদূরই প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম যতদূর সক্ষম কোন অর্থনৈতিক কিংবা অন্যবিধ ব্যবস্থাপনা। বরং সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিকতার প্রভাব অন্যান্য যে কোন ব্যবস্থার প্রভাব অপেক্ষা অত্যধিক প্রশস্ত ও কার্যকরী।

ইতিহাসের দর্পণ

মুসলমানদের নিজস্ব ইতিহাসই এ সত্যের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। ধর্মত্যাগীদের প্রচণ্ড বিদ্রোহ যখন ইসলামী শক্তিকে গ্রাস করতে উদ্যত হয় তখন মুসলিম জাহানের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা) একাই একে কঠোর হাতে দমন করার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। অথচ হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা)-এর ন্যায় বিশিষ্ট সাহাবীগণও এই যুদ্ধে খলীফার সাথে একমত হতে পারেননি। কিন্তু এ সত্ত্বেও হযরত আবু বকর (রা) অবিচল থেকে সুদৃঢ় প্রত্যয় ও অভাবনীয় বীরত্বের সাথে পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছেন। প্রশ্ন জাগে, এই প্রত্যয় ও দৃঢ়তার মূলে কী ছিল ? সেটি কি কোন বস্তুগত লাভের চিন্তা ? না কোন পার্থিব লোভ-লালসা ? কোন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আশা ? নিশ্চয়ই এই কঠিনতম

মহাবিপদের সময়ে কোন বস্তুগত মুনাফা কিংবা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের নেশা তাকে অনুপ্রাণিত করেনি। যদি তাই হতো, তাহলে তিনি এতবড় যুদ্ধে কিছুতেই জয়যুক্ত হতে পারতেন না এবং ইসলামী ইতিহাসের এই সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপদসংকুল সংগ্রামে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে তার দায়িত্বও পালন করতে পারতেন না। তার এই অভাবনীয় দৃঢ়তা এবং যাবতীয় প্রতিকূল অবস্থার উপর সকল নিয়ন্ত্রণ তার আধ্যাত্মিক প্রেরণারই এক অলৌকিক ঘটনা (বা Miracle) মাত্র। এটা মানবেতিহাসেরও এক অবিস্মরণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, আধ্যাত্মিক শক্তির মধ্যে এতবড় অর্থনৈতিক এবং বস্তুশক্তিও বর্তমান যার কোন নযীর খুঁজে পাওয়া যাবে না। (ইসলামের পঞ্চম খলীফা) হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ (রা)-এর মধ্যেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত বর্তমান। তিনি তার অভাবনীয় আধ্যাত্মিক শক্তির বলে পূর্ববর্তী উমাইয়া খলীফাদের যাবতীয় জুলুম ও নির্যাতনের মূলোৎপাটন করে নতুন করে সামাজিক ও রাজনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করেন, অতীতের যাবতীয় অবিচার ও নির্যাতনের ক্ষতিপূরণ দান করেন এবং ইসলামের সামাজিক বিধি-নির্দেশ ও নিয়ম-নীতিকে পুন প্রবর্তিত করেন। আর এর অনিবার্য ফল স্বরূপ এমন এক বিস্ময়কর ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক মু'জিযা সংঘটিত হলো যে, এরপর গোটা ইসলামী সমাজে দান বা যাকাতের অর্থ পেতে পারে এমন কোন দরিদ্র লোকের অস্তিত্বই থাকলো না।

আধ্যাত্মিক দিকের গুরুত্বের মূল কারণ

উপরোক্ত সর্বাত্মক কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য করেই ইসলাম এই আধ্যাত্মিক দিকের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে। কেননা উহা মানুষকে এই বিস্ময়কর ও সর্বাত্মক কল্যাণ থেকে কখনো বঞ্চিত করতে চায় না। আবার উহা আধ্যাত্মিক কল্যাণের নামে পার্থিব উন্নতির বস্তুগত উপায় অবলম্বন করার পথেও কোন বাধার সৃষ্টি করে না। ইসলাম মু'জিযাকে অস্বীকার করে না। কিন্তু উহার অপেক্ষায় হাত-পা বন্ধ করে বসে থাকারও নির্দেশ দেয় না। বরং এর সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে উহার সর্বোচ্চ মূলনীতি হলো ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يَزَعُ بِالسُّلْطَانِ مَالَا يَزَعُ بِالْقُرْآنِ۔

"নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তি প্রয়োগ করে সেই সকল জিনিস বন্ধ করে দেন যেগুলো কুরআন দ্বারা বন্ধ হয় না।"[-তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা)-এর উক্তি]

সমাজতন্ত্রের মানবিক দিক

সমাজতন্ত্রের নির্ধারিত পন্থায় যে ব্যক্তি নিজের বস্তুগত ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটাবার জন্যে চেষ্টা করতে থাকে তার জন্যে নিজের নৈতিক ও

আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি মনোযোগী হওয়া কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়। কেননা সমাজতন্ত্রের সমস্ত গুরুত্বই জীবনের শুধু একটি মাত্র বিভাগ অর্থাৎ অর্থব্যবস্থার উপর আরোপ করা হয়। এটাকে মেনে নিলে মানব জীবনের অন্যান্য দিকের উন্নতির প্রতি লক্ষ্য দেয়ার কোন অবকাশই থাকে না। বাস্তবে কেবল ঐ একটি দিকের প্রতিই মনোযোগ দেয়া সম্ভবপর হয়। এর উদাহরণ স্বরূপ মানবদেহের একটি অংগ—হৃদপিন্ডের কাজ ধরা যেতে পারে। এই অংগটি যদি বেড়ে যায় তাহলে সে অবস্থাটি দেহের অন্যান্য অংগ-প্রত্যংগের উন্নতিকে অবশ্য অবশ্যই রুদ্ধ করে দিবে। এমতাবস্থায় সমাজতন্ত্রীদের জীবনে অর্থব্যবস্থার উপর উক্ত রূপ অসাধারণ গুরুত্ব জীবনের অবশিষ্ট দিক ও বিভাগের উন্নতিকে সার্বিক-ভাবেই ব্যহত করে দেয়।

কেউ কেউ হয়ত ইসলাম এবং সমাজতন্ত্রের এরূপ দার্শনিক তুলনাকে আদৌ পছন্দ করে না। কেননা তাদের দৃষ্টিতে এ ধরনের দার্শনিক আলোচনা কখনো গভীর হতে পারে না এবং এতে কোন উপকারও হয় না। তাদের মতে, জীবনের বাস্তব সমস্যাগুলোই একমাত্র গুরুত্বের অধিকারী। সুতরাং দার্শনিক আলোচনার চেয়ে এর গুরুত্বই অধিক। এ কারণে কোন ব্যবস্থাপনাকে গ্রহণ বা বর্জন করার সময়ে এ-ধরনের অপ্রয়োজনীয় আলোচনায় বিভ্রান্ত হওয়ার কোন যুক্তিই থাকতে পারে না। বরং এর প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে, আলোচ্য ব্যবস্থাপনা আমাদের বাস্তব জীবনে কতদূর কল্যাণকর হতে পারে। এ জন্যেই উপরোক্ত অনুসারীরা যখন দার্শনিক আলোচনার সম্মুখিন হতে বাধ্য হয় তখন তারা অস্থির ও দিগ্‌বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়ে এবং তারা বুঝতেই পারে না যে, বাস্তব জীবনে শেষ পর্যন্ত ইসলাম ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে সংঘর্ষ হয় কি কারণে। তাই তারা অন্ধের মত এ দু'টির সংঘর্ষকেই অস্বীকার করতে থাকে।

ইসলাম ও সমাজতন্ত্রের পার্থক্যের বাস্তব দিক

সমাজতন্ত্রীদের উপরোক্ত চিন্তাধারা মোটেইসঠিক নয়। কেননা কোন বিষয়ের বাস্তব ও দার্শনিক—এ দু'টি দিককে কখনো পৃথক করা যায় না। সমাজতন্ত্র ও ইসলামের মধ্যে যে পার্থক্য বর্তমান তা শুধু দর্শন বা চিন্তাধারার দিক থেকেই নয়। বরং বাস্তবেও বহু তারতম্য বিরাজমান। নিম্নে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করা গেল ঃ

পরিবারের ধ্বংস সাধন

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী জীবনের আসল কর্তব্য হচ্ছে মানবীয় প্রজন্মের বৃদ্ধি ও লালন-পালন। এ জন্যেই ইসলাম নারীর গৃহ ত্যাগ করাকে আদৌ পসন্দ করে না। এবং অসাধারণ ও জরুরী পরিস্থিতি ছাড়া অন্য কোন সময়ে নারীকে এই অনুমতি দেয় না যে, কারখানা বা ক্ষেত-খামারে মজদুরী করে

ফিরুক। হাঁ, যদি এমন কোন পুরুষ অর্থাৎ তার স্বামী, পিতা, ভাই কিংবা অন্য কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় পরিবারে না থাকে যে তার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে তাহলে নিরুপায় হয়ে অবশ্যই সে মজদুরী করার জন্যে গৃহ ত্যাগ করতে পারে। অথচ এর সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে সমাজতন্ত্র পুরুষদের ন্যায় নারীদেরকেও কল-কারখানা ও ক্ষেত-খামারে মজদুরী করাকে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। সমাজতন্ত্রের জীবন দর্শন নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন মৌলিক মনস্তাত্ত্বিক পার্থক্যকে আদৌ স্বীকার করে না এবং করে না বলেই নারী-পুরুষের স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্রেও কোনরূপ তারতম্য মেনে নিতে সম্মত নয়। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার স্বাভাবিক ভিত্তিই হলো উৎপাদনের সকল উপায়-উপাদানকে যথাসাধ্য বৃদ্ধি করা। অতএব একথা সুস্পষ্ট যে, এই লক্ষ্য কেবল তখনই অর্জিত হতে পারে যখন রাষ্ট্রের সকল নাগরীক—পুরুষ হোক বা নারী হোক —গৃহ ত্যাগ করে বাইরে আসবে এবং নিজেদের সকল যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতাকে একই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে প্রয়োগ করতে সমর্থ হবে, আর সকল পরীক্ষাগার ও ক্ষেত-খামারকে নিজেদের কর্মক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে। এই সর্বাত্মক কাজে নারীদেরকেও সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমান তালে একই প্রকার কাজ করে এগুতে হবে। এ ক্ষেত্রে নারীরা বিশেষ কোন সুবিধালাভের হকদার হতে পারবে না। এমনকি সন্তান প্রসবকালীন সময় ছাড়া কখনো তারা কাজে অনুপস্থিত থাকতে পারবে না। এ পরিবেশের অনিবার্য ফল হবে এই যে, শিশুরা মায়ের স্নেহ-মমতা, আদর-যত্ন এবং লালন-পালন থেকে বঞ্চিত হবে এবং সময়ান্তরে এই শিশুরাই[১] ব্যবসায়ের পণ্যের মত কারখানার উপযোগী শ্রমিকে পরিণত হবে।

মোটকথা, সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা মেনে নিলে আমাদের নারীদেরকে গৃহের চার দেয়ালকে পরিত্যাগ করে অবশ্য অবশ্যই কারখানা বা ক্ষেত-খামারে বাধ্যতামূলকভাবে মেহনত করতে হবে। আর এর ফলে পারিবারিক ব্যবস্থাপনা একেবারেই ধ্বংস হয়ে যাবে। অথচ পরিবারই হলো ইসলামের নৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একমাত্র ভিত্তি।[২] এবং ইসলামী জীবনব্যবস্থায় এটা এক মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর উত্তরে যদি কেউ বলে যে, সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা গ্রহণ করার পরও কল-কারখানা ও ক্ষেত-খামারে

---

১. সন্তানদের প্রশিক্ষণ পর্যায়ে 'ইসলাম ও নারী' অধ্যায়ে বিস্তৃত রূপে আলোচনা করা হয়েছে।

২. এতে করে পরিবারভুক্ত নারী ও পুরুষের পারস্পরিক অসহযোগিতা কখনো প্রমাণিত হয় না। সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন কাজ করলেও তাদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সুসম্পর্ক যেমন অব্যাহত থাকে ঠিক তেমনি পরিবারস্থ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কেও কোন ভাটা পড়ে না। তাদের কর্মক্ষেত্র বিভিন্ন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও যৌথকর্মসূচীতে কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয় না।

কাজ করা নারীদের জন্যে বাধ্যতামূলক নয়। তাহলে তার স্মরণ রাখা উচিত যে, এটা তার ঘরোয়া বা মনগড়া দর্শন হতে পারে ; সমাজতান্ত্রিক দর্শনের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই এবং কোন সমাজতন্ত্রী এর সাথে সংশ্লিষ্টও হতে পারে না। এ ব্যাপারে কমিউনিষ্টরা কখনো ধোঁকাবাজির আশ্রয় নেয় না। অর্থনৈতিক উপায়-উপাদান বৃদ্ধি করাকে মানব জীবনের জন্যে অপরিহার্য বলে আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু এ উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাকে মেনে নেয়ার কোন আবশ্যকতা আমরা স্বীকার করি না। কেননা স্বয়ং সমাজতন্ত্রীরা যে অর্থনৈতিক উন্নতি হাসিল করেছে তার কৃতিত্ব তাদের নিজেদের নয়। বরং ঐ সকল অর্থনৈতিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যা তারা ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে ধার করে এনেছে।[১] প্রশ্ন এই যে, একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র যদি অন্যান্য দেশের উন্নত শ্রেণীর উৎপাদন প্রক্রিয়া অনুসরণ করে উন্নতি লাভ করতে পারে তাহলে উক্ত একই পথ অনুসরণ করে একটি ইসলামী রাষ্ট্র উন্নতি লাভ করতে পারবে না কেন ? বিশেষ করে ইসলামী রাষ্ট্র ইহলৌকিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে নীতিগতভাবেই যখন কৃষি ও কারিগরীর সর্বাধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ করতে বাধার সৃষ্টি না করে তখন উন্নতি লাভ না করার কোন কারণই থাকতে পারে না।

প্রলেটারী একনায়কতন্ত্র

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সৌধ প্রলেটারী শ্রেণীর একনায়কতন্ত্রের ভিত্তির উপরই গড়ে উঠে। অন্য কথায়, এই ব্যবস্থাপনায় কেবল সরকারই সর্বময় ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিক। সরকারই সকল নাগরিকদের ব্যাপারে এরূপ সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকারী যে, তাদের মধ্যে কে কোন্ কাজ কি রূপে করবে ? —চাই সে কাজের জন্যে তার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাক বা না থাক, তার দৈহিক ও মানসিক অবস্থার সাথে সে কাজের সংগতি থাকুক বা না থাকুক। আর গোটা রাষ্ট্রে এই পরিকল্পনা ও বাস্তব কাজের উপর সরকারের পক্ষ থেকে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। সরকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে না কেউ কিছু চিন্তা করতে পারে। না কেউ কিছু স্বাধীনভাবে বলতে বা লিখতে পারে। সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর রূপ কাঠামোগুলোকেও সরকারই তৈরী করে এবং ইচ্ছা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করে। উহার লক্ষ্য ও কর্মসূচীও সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হয়। সমাজতন্ত্রীদের এই প্রলেটারী শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র একটি ব্যক্তির একনায়ক-তন্ত্রের চেয়ে সহস্রগুণ নিকৃষ্ট ও মারাত্মক। এ দু'টির পার্থক্যও পাঠকদের স্মরণ রাখা উচিত। একটি ব্যক্তির একনায়কতন্ত্র যেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানে সে

---

১. সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করার প্রথম দিকে রাশিয়ার অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। অতপর সেখানে ইউরোপ থেকে ধার করা পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার সাহায্যে উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয় এবং উন্নত দেশ বলে পরিগণিত হয়।

ব্যক্তিটি যদি ভদ্র ও ভারসাম্যপূর্ণ মানসিকতার অধিকারী হয় এবং দেশ ও দশের কল্যাণ সাধনই যদি তার লক্ষ্য হয় তাহলে কোন সময়ে এরূপ আশা করা যায় যে, কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা আইন-কানুন রচনার ক্ষেত্রে জনগণের সঠিক বা ভুল প্রতিনিধিদের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারে এবং তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে পারে। কিন্তু প্রলেটারী একনায়কতন্ত্রের নিকট এমন কিছুর আশা করা বাতুলতা মাত্র। কেননা তাদের সর্বপ্রথম ও একমাত্র লক্ষ্য হলো অর্থনৈতিক উন্নতি এবং এরূপ একনায়কতন্ত্র কেবল সেই সকল কাজেই উৎসাহ দেখাতে পারে যা এই লৌহ শৃংখলকে আরো শক্তিশালী করে তুলতে পারে। 'প্রলেটারী একনায়কতন্ত্রে'র পরিভাষাটিই এই সত্যের প্রতি অংগুলি নির্দেশ করছে।

সমাজতন্ত্রের দার্শনিক পরাজয়

সমাজতন্ত্রের যে ত্রুটিগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে তাছাড়াও এর একটি বড় ধরনের ত্রুটি রয়েছে। সেটি হলো ঃ এর কোন নিখুঁত ও সুষ্ঠু দার্শনিক ভিত্তি নেই। এ কারণেই সমাজতন্ত্র চিন্তাধারা ও বাস্তব কর্মতৎপরতায় অন্য কোন ব্যবস্থাপনার সাথে কোন সমঝোতায় উপনীত না হয়ে পারে না। দেখা যায়, প্রথম পর্যায়ে উহা ব্যক্তিগত মালিকানাকে পুরোপুরি খতম করার শ্লোগন তুলেছে এবং একে একে সমস্ত কর্মচারীদের পারিশ্রমিকের হার সমান করে দিয়েছে কিন্তু কিছুকাল যেতে না যেতেই এই উভয় ব্যাপারেই সমঝোতা করতে হয়েছে। কেননা পরবর্তী পর্যায়ে বাস্তব অভিজ্ঞতাই একথা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, ব্যক্তিগত মালিকানা না থাকলে আন্তরিকতার সাথে কাজ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় এবং মেহনতের ভিত্তিতে পারিশ্রমিকে বেশ কম করা অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও কল্যাণকর। কেননা এতে করে কাজের সাথে শ্রমিকদের মনের সম্পর্ক বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে উৎপাদনের পরিমাণও বেড়ে যায়। ব্যক্তি মালিকানা এবং পারিশ্রমিকের তারতম্য স্বীকার করে সমাজতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা কার্লমার্কসের দর্শনের দু'টি প্রধান স্তম্ভকে বর্জন করেছে এবং এমন এক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে যা ইসলামী দৃষ্টিভংগির অনেকটা কাছাকাছি। প্রশ্ন এই যে, মানবতা যখন অন্যান্য মতাদর্শ সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে এরূপে বারবার ইসলামের দিকে এগিয়ে আসছে তখন আমরা মুসলমানরা কেন আমাদের একমাত্র ও নির্ভুল জীবনব্যবস্থাকে পরিত্যাগ করে সমাজতন্ত্রের ক্রোড়ে আশ্রয় নিচ্ছি?

ইসলাম ও আদর্শবাদিতা[১]

সমাজতন্ত্রীদের প্রোপাগাণ্ডা

প্রায়ই আমাদের নিকট প্রশ্ন করা হয় ঃ তোমরা মুসলমানরা যে ইসলামের কথা আলোচনা করছ তা কোথায় ? উহার সত্যিকার রূপ তোমাদের কর্মজীবনে কোনদিন দেখা গেছে কি ? তোমরা দাবী করছ যে, এটা একটি আদর্শ জীবনব্যবস্থা ; কিন্তু বাস্তবজীবনে উহা কোন সময়ে অসিত্বলাভ করেছে কি ? এর উত্তরে তোমরা রাসূলে আকরাম (সা) ও খোলাফায়ে রাশেদীন —বরং তাদের প্রথম দু'জনের শাসনকালের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে বলো। কেননা তোমরা ইতিহাসে আর কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাও না। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা)-কে তোমরা আদর্শ শাসক বলে গণ্য করো এবং তাকেই তোমরা মূর্তিমান ইসলামী ভাবধারা বলে মনে করো। কিন্তু তার শাসনামলেও সামন্তবাদ, অর্থনৈতিক বৈষম্য, অসাম্য, জুলুম, স্বৈরাচার, মূর্খতা ও মূঢ়তা ছাড়া অন্য কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না। তোমরা বলছ যে, ইসলাম মুসলমানদের এই অধিকার দিয়েছে যে, যদি তাদের শাসকরা তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় তাহলে তারা তাদের নিকট কৈফিয়ত তলব করতে পারে। কিন্তু এটাতো অনেক দূরের কথা, খেলাফাতে রাশেদার পরবর্তী সময়ে এই বেচারাদেরকে তাদের শাসকরা কখনো তাদের রাষ্ট্রপ্রধান বা শাসক নির্বাচনের সুযোগ দিয়েছে কি ?

---

১. আদর্শবাদ (Idealism) শব্দটি প্রাচ্যের লোকেরা ভালো অর্থে ব্যবহার করে থাকে। কোন ব্যবস্থাপনার সমগ্র গুণাবলীকে বুঝানোর জন্যেই এ শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু আলোচ্য অধ্যায়ে শব্দটিকে এ অর্থে ব্যবহার করা হয়নি। কেননা অত্র পুস্তকে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচারিত অপবাদ নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। এখানে এই শব্দটিকে প্রতীচ্যে (অর্থাৎ ইউরোপ-আমেরিকায়) যে অর্থে ব্যবহার করা হয় সেই অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতীচ্যের লোকদের মতে 'আদর্শবাদ' চিন্তা ও কল্পনার রাজ্যে মগ্ন থাকা এবং জীবনের বাস্তব সমস্যা যেমন দারিদ্র, ক্ষুধা, দুঃখ, যন্ত্রণা, জুলুম ও নির্যাতন মুখ-চোখ বুজে সহ্য করার নামান্তর।—যখন দরিদ্র জনসাধারণকে জিজ্ঞেস করার কেউ থাকে না, বিপদ-আপদ ও দুঃখ-নির্যাতনের প্রতিকার করার কোন পন্থা থাকে না, তখন তারা অত্যাচারের ষ্টীমরোলারের নিচে পিষ্ট হতে থাকে এবং পরিস্থিতির অনুকম্পার উপরই আত্মসমর্পণ করে প্রহর গুণতে থাকে। এ জন্যে সংগত কারণেই ইউরোপের লোকেরা এই শব্দটিকে বড় ঘৃণার চোখে দেখে। কেননা এটা একদিকে মানুষকে সামন্তবাদী জুলুম ও অবমাননার শিকার হতে বাধ্য করে এবং অন্যদিকে তাদেরকে দার্শনিক কুহেলিকার আবর্তে নিক্ষেপ করে বিভ্রান্ত করে ফেলে। অথচ বাস্তব জীবন ও উহার বিভিন্ন সমস্যার সাথে এই ধরনের দর্শনের কোন সম্পর্কই নেই। বস্তুত এই ধরনের দার্শনিক তত্ত্বের জবাব মানুষ উহার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করেই দিতে পারে। আর এ কারণেই ইউরোপের লোকেরা আদর্শবাদের সকল দিক ও বিভাগ নিয়েই ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে থাকে। এই পরিস্থিতি দেখে সমাজতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা ইসলামকেও এই শ্রেণীর একটি নিষ্ফল আদর্শবাদ ও অন্তসারশূন্য মতাদর্শ বলে সাব্যস্ত করছে। কিন্তু এতে করে যে তাদের মূর্খতা ও মানসিক পীড়া ছাড়া আর কিছুই প্রকাশ পায় না তা তারা বুঝতেই পারে না।

তোমরা এও দাবী করে থাক যে, ইসলাম এমন একটি ন্যায়ভিত্তিক অর্থ-ব্যবস্থা উপহার দেয় যা সম্পদের সুষম বন্টনের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু খেলাফাতে রাশেদার আদর্শ যুগেও অর্থনৈতিক বৈষম্য কখনো বিদূরিত হয়েছে কি ? তোমরা আরো বল যে, জনসাধারণের রোজগারের ব্যবস্থা করা ইসলামী রাষ্ট্রের একটি মৌলিক দায়িত্ব। কিন্তু সেই সকল লাখো-কোটি বেকার লোকদের সম্বন্ধে তোমরা কি বলতে চাও যারা দারিদ্র ও অনাহারের আবর্ত থেকে বের হওয়ার জন্যে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিতে বাধ্য হয়েছে কিংবা সারা জীবন ধরে বঞ্চনা ও দারিদ্রের শিকার হয়ে ধুকে ধুকে মরছে ? তোমরা গর্ব করে বল যে, ইসলাম নারীদেরকে সর্বপ্রকার অধিকারই প্রদান করেছে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে নারীরা সে অধিকার কোনদিন ভোগ করতে পেরেছে কি ? এটা কি সত্য নয় যে, প্রতিকূল অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ তাদেরকে সে অধিকার ভোগ করার কোন সুযোগই দেয়নি ? তোমরা মানুষের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সম্পর্কে বড় বড় বুলি আওড়াও এবং উহাকে আল্লাহভীতির সুফল বলে প্রচার করো। তোমাদের ধারণায় এই আল্লাহভীতির কারণেই শাসক ও শাসিত এবং জাতির বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সুবিচার ও নেকীর উপর ভিত্তি করে যাবতীয় সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। কিন্তু তুলনামূলকভাবে একটি সংক্ষিপ্ত সময় বাদ দিলে এই আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ও উন্নতির ঝলকানি কোথাও দেখা যায় কি ? এই আধ্যাত্মিক উন্নতি শাসকগোষ্ঠীকে অসহায় নাগরিকদের অধিকার কেড়ে নেয়া থেকে বিরত রাখতে পেরেছে কি ? এই শাসক মণ্ডলী তাদের আযাদীকে কেমন করে ছিনিয়ে নিয়েছিল ? তাই তোমরা যে দুনিয়ার কথাবার্তা বলছো তা এক খেয়ালী বা স্বপ্নের দুনিয়া ছাড়া অন্য কিছুই নয়। খেলাফাতে রাশেদার যে স্বল্পকালীন শাসন নিয়ে তোমরা খুব গর্ববোধ করছ তা থেকে শুধু এতটা প্রমাণিত হয় যে, তখন অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন কিছু সংখ্যক এমন ব্যক্তিত্ব বর্তমান ছিলেন যারা ইতিহাসের বিস্ময়কর কাজ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু এই সকল লোকও তাদের কীর্তিকলাপ ছিল এক ব্যতিক্রমধর্মী ব্যাপার। এবং ব্যতিক্রমধর্মী ছিলেন বলেই তাদের তিরোধানের পর এমন ব্যক্তির আর আবির্ভাব হয়নি এবং তাদের কীর্তিকলাপও আর কখনো দেখা যায়নি। এবং ভবিষ্যতেও আর কোন দিন দেখা যাবে না।"

এই সকল প্রশ্নই সমাজতন্ত্রী ও তাদের সমর্থকরা ইসলামের বিরুদ্ধে উত্থাপন করে থাকে। দুর্ভাগ্যক্রমে মুসলমানদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক এরূপ বিভ্রান্তিকর প্রোপাগাণ্ডার শিকার হয়ে বসে। এর কারণ হলো, ইসলামী ইতিহাস সম্পর্কে তারা একেবারেই অজ্ঞ এবং সামান্য যা কিছু জানে তা তাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের শেখানো বুলি মাত্র।

আদর্শবাদের দু'টি বিভাগ

মূল আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে কিছু বলার পূর্বে আদর্শবাদের দু'টি মূল বিভাগের পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। আদর্শবাদ বা আদর্শ ব্যবস্থার একটি বিভাগ তো হলো এই যে, উহা কেবল খেয়ালী দুনিয়া পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে। বাস্তব জীবনে উহার কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না। আর ইতিহাসেও এমন কোন সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, উহা দ্বারা বাস্তব সমস্যার কোন সমাধান হয়েছে কিংবা উহা অনুসরণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। এ ছাড়া আদর্শবাদের অন্য যে বিভাগটি রয়েছে তা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এটা শুধু খেয়ালী দুনিয়া পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয় ; বরং এটা যে সম্পূর্ণরূপেই বাস্তব এবং অনুসরণযোগ্য তার অকাট্য সাক্ষ্য মানবেতিহাসে বর্তমান এবং মানুষের বাস্তব জীবনেই উহার গভীর ছাপ বিদ্যমান।

মৌলিক প্রশ্ন

আদর্শবাদের এই বিভাগ দু'টিকে সামনে রেখে বিষয়টি সম্পর্কে চিন্তা করলে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, আলোচ্য বিষয়ের মূল প্রশ্ন হলো ঃ নিজস্ব প্রকৃতির দিক থেকে ইসলাম কি নিছক একটি অন্তসারশূন্য আদর্শ যার কোন অস্তিত্ব বাস্তব দুনিয়ায় খুঁজে পাওয়া যায় না ?—উহা কি এজন্যেই অনুসরণযোগ্য নয় যে, উহার ভেতর-বাইর সবটুকুই আকাশ কুসুম কল্পনা মাত্র ? কিংবা বিষয়টি এরূপ যে, ইসলাম তো অবশ্যই একটি অনুসরণযোগ্য ব্যবস্থা, কিন্তু প্রতি যুগেই যে এটা ফলপ্রসূ হবে এমন দাবী করার যৌক্তিকতা আছে কি ?

আদর্শবাদের এই বিভাগ দু'টির মধ্যে যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বর্তমান তা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। ইসলাম যদি একটি নিছক আদর্শ বা কল্পন। হয়ে থাকে তাহলে তো এটা কখনো সম্ভবপর নয় যে, কেউ উহার বাস্তব অনুসরণ করবে—চাই বাহ্যিকভাবে সমাজের বিভিন্ন পরিবেশে ভবিষ্যতে উহাতে যতই পরিবর্তন আসুক। কিন্তু যদি এটা একটি অনুসরণযোগ্য জীবনব্যবস্থাই হয়ে থাকে এবং নিছক কয়েকটি বাহ্যিক কারণ উহার প্রবর্তনের পথে বাধার সৃষ্টি করে তাহলে বিষয়টির প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপেই পাল্টে যায়। এমতাবস্থায় প্রতিকূল অবস্থা যদি পরিবর্তিত হয়ে যায়, কিংবা ইসলামের অনুকূলে এসে যায় তাহলে বাস্তব ক্ষেত্রেই উহা অনুসরণ করার আশা করা যায়।

ইসলাম একটি বাস্তব জীবনব্যবস্থা

ইসলাম 'আদর্শবাদের' কোন্ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ? এ প্রশ্নের উত্তর খুব সহজ। কেননা এটা এতদূর স্পষ্ট যে, এ সম্পর্কে দ্বিমতের কোন অবকাশই নেই। ইতিহাসে ইসলাম তার নিজস্ব মহিমায় বাস্তবভাবেই একান্ত ভাস্বর। এতে করে অকাট্যরূপেই প্রমাণিত হয় যে, এটা একটি বাস্তব ও অনুসরণযোগ্য

জীবন পদ্ধতি। মানুষ আজও এটা অনুসরণ করে চলতে পারে। এটা কোন অবাস্তব খেয়াল বা কল্পনা নয়। অন্যদিকে মানুষ আজও সেই মানুষ যারা অতীতে ছিল। তাদের প্রকৃতিও তা-ই এবং তাতে কোন পরিবর্তন আসেনি। সুতরাং যে মানুষ একবার প্রথমে ইসলামকে সাফল্যের সাথে অনুসরণ করেছে, এমন কোন কারণ নেই যে, তারা আজ তাকে তাদের বাস্তব জীবনে স্থান দিতে পারবে না এবং উহার অনুসরণ করে সফলকাম হতে পারবে না।

দ্বীনের পুনর্জাগরণের আন্দোলন

আধুনিক যুগের কিছু সংখ্যক উন্নতিকামীর মতে বর্তমান যুগে ইসলামের পুনর্জাগরণ কখনো সম্ভবপর নয়। তাদের ধারণায় দ্বীনের পুনর্জাগরণ প্রচেষ্টা একেবারেই বেকার। কেননা উহার সাফল্যের কোন আশাই নেই। কিন্তু আমরা উন্নতিকামী বন্ধুদের নিকট জিজ্ঞেস করতে চাই, তাদের কথার অর্থ কি এই যে, ইসলামের কারণে প্রথম যুগে মুসলমানগণ নৈতিকতার যে শীর্ষ শিখরে আরোহণ করেছিল সে পর্যন্ত উন্নীত হওয়া আধুনিক যুগের মুসলমানদের পক্ষে কি অসম্ভব? যদি এটাই ঠিক হয় তাহলে প্রশ্ন জাগে : তাদের সেই ক্রমোন্নতির শ্লোগানসমূহ কোথায়? আর তাদের সেই দাবীই বা কোথায়? তাদের তো দাবী ছিল, মানুষ অব্যাহত ধারায় উন্নতি করছে এবং নৈতিক ও মানসিক অবস্থার দিক থেকে মানুষ এখন বহুগুণ উচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

খেলাফাতে রাশেদার স্বল্প স্থায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন

বলা হয় যে, খেলাফাতে রাশেদার আদর্শ যুগ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। এরপর মুসলমানদের ইতিহাসে উহার নমুনা একান্তই বিরল। (যেমন হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজের যুগ।) এতে করে কি প্রমাণিত হয় না যে, জীবন পদ্ধতি হিসেবে ইসলাম সত্যিই অনুসরণযোগ্য নয়? এই প্রশ্নের উত্তর অবগত হওয়ার জন্যে বিষয়টি সম্পর্কে গভীরভাবে পর্যালোচনা করা দরকার। কেননা উহার উত্তর ইতিহাসের পাতায় কোথাও রয়েছে মুসলিম দুনিয়ার নিজস্ব ইতি-বৃত্তে আবার কোথাও রয়েছে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা ও সার্বজনীন সত্যের বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহে।

স্মরণীয় দু'টি কথা—প্রথম কথা

বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে আমাদের দু'টি কথা স্মরণ রাখা একান্ত প্রয়োজন। প্রথম কথা হলো : খেলাফাতে রাশেদার সময়ে ইসলামের প্রভাবে মানুষ যে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছে এবং ইসলাম যেভাবে মানুষকে অতীতের সকল গ্লানি ও অধপতন থেকে উদ্ধার করে সভ্যতা ও নৈতিকতার শীর্ষে উপনীত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে তা এমন একটি

অভূতপূর্ব ঘটনা যে, তাকে জীবজগতের সাধারণ নিয়ম দ্বারা ব্যাখ্যা করা আদৌ সম্ভব নয়। ইসলাম এই দুনিয়ার বুকে যে সকল অলৌকিক পরিবর্তন আনয়ন করেছে এটাও তার একটা। কিন্তু এই অলৌকিক ঘটনা হঠাৎ করে হয়নি। বরং এর পেছনে ছিল মুসলমানদের নৈতিক বিপ্লব ও পুনর্গঠনের দীর্ঘ ইতিবৃত্ত। এর ফলেই এমন এমন লোক মুসলমানদের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছেন যারা ছিলেন এই অলৌকিক ঘটনার বাস্তব উদাহরণ এবং যাদের জীবনধারা ছিল এর বাস্তব বিশ্লেষণ।—ইসলাম যে তড়িৎ গতিতে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে মানবেতিহাসে তার কোন নযীর খুঁজে পাওয়া যায় না। ইতিহাসের বস্তুগত কিংবা অর্থনৈতিক ভাষায় ইসলামের এই বিস্ময়কর উন্নতির কোন বিশ্লেষণ করা একেবারেই অসম্ভব। যাই হোক, ইসলামের এই অভাবনীয় ব্যাপক বিস্তৃতির একটি ফল হয়েছে এই যে, দ্রুতগতিতে এমন এমন জাতিও ইসলাম গ্রহণ করেছে যারা এখনও পর্যন্ত ইসলামের সঠিক মর্ম ও মূল ভাবধারার সাথে পরিচিত হতে পারেনি এবং ইসলামের সমাজনীতি, অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার সঠিক গুরুত্ব ও মূল্যও অনুধাবন করতে সমর্থ হয়নি। অন্য কথায় এই নবাগতদের ইসলাম সংক্রান্ত জ্ঞান এত অল্প ছিল যে প্রকৃতপক্ষে উহা না জানারই সামিল ছিল। আর মরার উপর খাড়ার ঘা ছিল এই যে, ইসলামের প্রথম যুগে নওমুসলিমদের তালিমের জন্যে সরকারের পক্ষ থেকে যেরূপ ব্যবস্থা করা হতো সেইরূপ কোন কার্যকরী ব্যবস্থা এই সকল নবাগতদের জন্যে করা হতো না।

দেখতে দেখতে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা ক্রমেই বেড়ে যেতে থাকে। গণনার দিক থেকে মুসলমানদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু নওমুসলিমদের অধিকাংশই ইসলামের নিয়ম-নীতি ও তালিম থেকে বঞ্চিতই রয়ে যেতে থাকে। ফলে ধীরে ধীরে এক সময়ে মুসলমান শাসকগণ ইসলামের হুকুম-আহকামের বিরোধিতা করতে সাহসী হয়ে উঠে। কেননা ঐ সময়ে ইস-লামী সমাজে কোন সতর্ক ও প্রশিক্ষিত জনমত ইসলামের স্বপক্ষে একটি প্রতিবাদী শক্তি হিসেবে গড়ে উঠতে পারেনি। ফলে তাদের ভুল পদক্ষেপ প্রতিহত করার কোন আন্দোলন বা সংগ্রামও সূচিত হওয়ার অবকাশ হয়নি। এই পরিবেশে শাসকরা তাদের অধিকার হরণ করে নেয় এবং তাদের উপর নানাবিধ অত্যাচার ও অবিচার নির্দ্বিধায় চালাতে থাকে। বনু উমাইয়া, বনু আব্বাস, তুর্কী ও মামলুক রাজা-বাদশাহদের ইতিহাস এরূপ জুলুম ও নির্যাতনের কলংকে কলঙ্কিত। ইতিহাসের এই সুদীর্ঘ অধ্যায়েই মুসলমান শাসকরা ইসলামকে তাদের সস্তা খেলনায় পরিণত করেছিল এবং মুসলমান জনসাধারণের যাবতীয় অধিকার নৃশংসভাবে পদদলিত করেছিল।

দ্বিতীয় কথা

দ্বিতীয় স্মরণীয় কথাটি হলো ঃ ইসলামের কারণে মানবতার যে অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়েছিল তা কোন জড়বাদী বা নিছক কুদরতী অবস্থার অনিবার্য ফল ছিল না। ইসলাম যে রূপে গোটা মানবতাকে একটি মাত্র প্রজন্মের মধ্যেই দাসপ্রথা ও সামন্তবাদী ব্যবস্থার লাঞ্ছনা ও অবমাননার তলদেশ থেকে উদ্ধার করে সামাজিক সুবিচারের সমুন্নত শীর্ষ দেশে পৌঁছিয়ে দিয়েছে তার কোন তুলনা মানবেতিহাসে মিলে না। মানবতাকে অন্ধ ভোগ-বিলাস ও যৌন ব্যভিচার ও প্রবৃত্তির লালসার দাসত্বের হাত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং নৈতিক উন্নতি ও সচ্চরিত্রের শীর্ষ শিখরে আরোহণ করার সৌভাগ্য দান করা হয়েছে।

প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের এই বিস্ময়কর নৈতিক উন্নতি ইসলামেরই একটি অলৌকিক কীর্তি। কেননা হযরত বিশ্বনবী (সা) এবং তাঁর সম্মানীয় সহচরবৃন্দ সর্বোচ্চ নৈতিক শক্তির প্রতিনিধি ছিলেন। এই আধ্যাত্মিক শক্তির কারণেই তারা এমন এমন কাজ করতে সমর্থ হয়েছেন যাকে আজ অলৌকিক ব্যাপার বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু যখন তাদের শক্তির এই উৎস শুষ্ক হতে শুরু করে তখনই তারা অবনতির শিকার হতে শুরু করে। তবুও তাদের অন্তকরণে ইলহামী হেদায়াতের এই নূরের কিছু না কিছু পরিমাণ প্রতি যুগেই বর্তমান থাকে। বর্তমান আলোচ্য বিষয়ে আমাদের ইসলামী ইতিহাসের এই ভাস্বর অধ্যায়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আমরা আকর্ষণ করতে চাই।

আধুনিক যুগে ইসলামের প্রতিষ্ঠা অধিকতর সহজ

বর্তমান যুগে ইসলামী জীবন পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা অধিকতর সহজ। কিন্তু একথার অর্থ এই নয় যে, এ যুগে আমাদের বাস্তব জীবনে ইসলামের প্রাথমিক যুগের ন্যায় কোন আধ্যাত্মিক বিপ্লব সংঘটিত করাই সম্ভবপর নয় ; কেননা এখন হযরত বিশ্বনবী (সা)-ও আমাদের মধ্যে বর্তমান নেই এবং তাঁর সম্মানীয় সাহাবায়ে কেরামও বেঁচে নেই। কিন্তু এ ধারণা সঠিক নয়। কেননা বিগত তের শত বছরে মুসলিম উম্মত এবং সমগ্র মানবতা যে ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও উন্নতি হাসিল করেছে সে কারণে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের জগতে যে সকল বিষয়কে এক সময়ে আলৌকিক বলে মনে করা হতো সেগুলো আর অলৌকিক থাকেনি এবং সেগুলো হাসিল করাও আর অসম্ভব হয়ে রয়নি। ঐগুলো করার জন্যে যে সকল গুণ ও উপযুক্ততার প্রয়োজন ছিল, আজকের লোকেরা সেদিক থেকে পুরোপুরি যোগ্যতা সম্পন্ন। এ কারণে প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের ভাস্বর উদাহরণকে সামনে রেখে বর্তমান যুগে ইসলামী ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করা কোন কঠিন কাজ নয়। কেননা আজকের দুনিয়া প্রথম যুগের

তুলনায় ইসলামের অধিকতর নিকটবর্তী হয়ে এসেছে। এ কারণে তুলনামূলক-ভাবে কিছুটা চেষ্টা করলেই আমরা লক্ষ্য অর্জন করতে পারি।

রাষ্ট্র পরিচালকের গণতান্ত্রিক নির্বাচন ও ইসলাম

দৃষ্টান্ত স্বরূপ আধুনিক যুগে বেশীর ভাগ দেশেই রাষ্ট্র পরিচালকগণকে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত করা হয়। এবং জনগণের এরূপ অধিকার থাকে যে, তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তাদের নির্ধারিত ও অর্পিত দায়িত্ব পালনে যদি ব্যর্থ হয় তাহলে তাদেরকে বরখাস্ত কিংবা দায়িত্বমুক্ত করতে পারবে। কিন্তু মূলত এই নির্বাচন ইসলামেরই একটি বৈশিষ্ট্যের আধুনিক প্রয়োগ। এই বৈশিষ্ট্য ইসলাম বিশ্ববাসীর নিকট উপস্থাপিত করেছিল আজ থেকে তেরশ' বছর পূর্বে। নিসন্দেহে হযরত আবু বকর (রা) এবং হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা)-এর যুগে এই মূলনীতির বাস্তবায়নে ছিল একটি অলৌকিক ব্যাপার। কিন্তু আজ আর এটা কোন অলৌকিক ব্যাপার নয়। বরং একটি স্বাভাবিক ঘটনা মাত্র। এবং আজ এটা আমরা অতি সহজেই লাভ করতে পারি—কেবল এই শর্তে যে, পূর্ণ এখলাস—আন্তরিকতা ও সততা এবং পূর্ণাংগ দ্বীনদারীর সাথে আমরা যদি আমাদের জীবন গড়ে তুলতে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে পারি। এই মূলনীতিকে যদি আমরা ইংল্যাণ্ড বা আমেরিকা থেকে আমদানী করতে পারি তাহেল ইসলামের নামে উহাকে গ্রহণ করতে পারবো না কেন?—বিশেষ করে যখন এটা কোন নতুন জিনিস নয়, বরং ইসলামে এটা প্রথম থেকেই বিদ্যমান?

মৌলিক প্রয়োজনের সমস্যা

অনুরূপ আরেকটি সমস্যা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর সমস্যা। এ সম্পর্কে হযরত বিশ্বনবী (সা)-এর যে সুস্পষ্ট বিধান বর্তমান তাতে দেখা যায়, কর্মচারীদের যাবতীয় মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের উপর অর্পিত।

ইসলাম এই মূলনীতিটিকে বাস্তবায়িত করার জন্যে বর্তমান বিংশ শতাব্দীতে সমাজতন্ত্রকে প্রলেটারী একনায়কতন্ত্রের আশ্রয় নিতে হয়েছে। অথচ ইসলাম শত সহস্র বছর পূর্বেই একনায়কতন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই পরিপূর্ণ সাফল্যের সাথেই একে বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছে। সুতরাং যদি আজ আমরা রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে চাই তাহলে সমাজতন্ত্রের প্রতি তাকাবার আদৌ কোন প্রয়োজন নেই।—ইসলামের দিক নির্দেশনা ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্তই এ জন্যে যথেষ্ট।

আলোচনার মূল বিন্দু

আমাদের আলোচনার মূল বিন্দু ছিল, বিশেষ করে কেবল সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক ব্যবস্থা অনুসরণযোগ্য হতে পারে কি? এই

মাপকাঠি দ্বারা যাচাই করেই কোন ব্যবস্থা অনুসরণযোগ্য কিনা তা সুষ্ঠুভাবে নির্ণয় করা হয়। একমাত্র ইসলামই এই মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম। কেননা প্রকৃতপক্ষে এটাই একটি বাস্তবভিত্তিক কার্যকরী জীবন বিধান। বিশ্বের বুকে একমাত্র এটাই ছিল এমন একটি জীবন বিধান পরিপূর্ণ সাফল্যের সাথে কার্যকরী হয়েছিল এবং কোটি কোটি মানুষ একে আপন করে নিয়েছিল।

ইসলাম কি নিছক আবেগ ও আকাংখার ফসল ?

সমাজতন্ত্রী লেখক গোষ্ঠি ও তাদের সহযোগীরা দাবী করে যে, আধুনিক সভ্যতার প্রাসাদ কেবল বৈজ্ঞানিক সত্যের উপরই গড়ে উঠেছে–অথচ ইসলাম শুধু আবেগ ও আকাংখার আশ্রয়ে অস্তিত্ব লাভ করেছে। তাদের এই দাবীর পেছনে সত্যতার লেশমাত্রও নেই। ইসলামী আইনের প্রতি একবার দৃষ্টি দেয়াই সমাজতন্ত্রীদের এই দাবীর অসারতা হৃদয়ঙ্গম করার জন্যে যথেষ্ট। ইসলাম যে আইন ব্যবস্থা দিয়েছে উহা নিছক আবেগ বা আকাংখার ভিত্তিতে গড়ে উঠেনি , বরং নির্ভেজাল সাক্ষ্য ও ঘটনার উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। অনুরূপভাবে খুলাফায়ে রাশেদীনের দৃষ্টান্তও আমাদের সামনে বর্তমান। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, তারা পরামর্শ পরিষদের সাথে পরামর্শ করার সময়ে কিংবা ইসলামী আইনের কোন ধারা-উপধারার বিশ্লেষণ অথবা উহার সাথে সামঞ্জস্য বিধানের সময়ে নিছক আবেগ, আকাংখা, রুচি বা সুধারণার উপর ভিত্তি করে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি।

কিন্তু বাস্তব ঘটনা এই যে, জীবনের জন্যে একটি আইন ব্যবস্থা দেয়া সত্ত্বেও ইসলাম কেবল আইনের উপরই ভরসা করেনি। বরং উহা সর্বপ্রথম মানুষের আভ্যন্তরীণ সভ্যতার প্রতি লক্ষ্য দেয় এবং তাদের মধ্যে নৈতিক চেতনাকে এতদূর জাগ্রত করে দেয় যে, তারা নিজেরাই স্বতস্ফূর্তভাবে আইনের আনুগত্য করতে শুরু করে। আর এ জন্যে তাদেরকে ভয় বা লালসা দেয়ার কোন প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকে না। রাজনীতির ক্ষেত্রে এটা হলো মানুষের সবচেয়ে বড় সাফল্য। ইসলামী সমাজে আইন ঠিক তখনই প্রয়োগ করা হয় যখন সমাজের সামষ্টিক কল্যাণ এর প্রয়োজনীয়তাবোধ করবে এবং চরিত্র সংশোধনের যাবতীয় মাধ্যমেই বেকার বলে পরিগণিত হবে। ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান গনী (রা)-এর বহুল প্রচারিত বাণীঃ

يَزَعُ اللّٰهُ بِالسُّلْطَانِ مَالَا يَزَعُ بِالْقُرْاٰنِ ○

"আল্লাহ সেই সকল কাজ শক্তি দ্বারা বন্ধ করে দেন যা কুরআন দ্বারা বন্ধ করা যায় না।"

ইসলামী আইনের এই বৈশিষ্ট্যকেই পরিস্ফুট করে তোলে।

ইসলামের পুনর্জ্জাগরণ এখনো সম্ভব—কয়েকটি দৃষ্টান্ত

যারা ইসলামের পুনর্জাগরণের অসম্ভব বলে মনে করে তাদেরকে প্রায়ই বলতে শোনা যায় ঃ হযরত উমর (রা)-এর ন্যায় মহান ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ইতিহাসে রোজ রোজ ঘটে না। কিন্তু এ ধরনের উক্তি দ্বারা প্রকৃতপক্ষে তাদের মানসিক দৈন্যই প্রকাশিত হয়। কেননা ইসলামী জীবনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামী আইনের বাস্তব প্রবর্তনের জন্যে আজ আমাদের হযরত উমর (রা)-এর ন্যায় আদর্শ লোকদের নয়। বরং তাদের ছেড়ে যাওয়া আইন ও উহার বিভিন্ন নযীরের একান্ত প্রয়োজন। কোন কারণ নেই যে, আমরা যদি মুখলিস ও সত্যনিষ্ঠ হই তাহলে তাদের অনুসরণ করতে পারব না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে ঃ হযরত উমর (রা) তার খেলাফতে যুগে এরূপ ফরমান জারী করে দিলেন যে, যদি কেউ অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার কারণে চুরি করে বসে তাহলে তার হাত কাটার শাস্তি দেয়া যাবে না। এই আইন সংক্রান্ত নযীরের প্রয়োগের জন্যে ব্যক্তিগতভাবেই হযরত উমরের বর্তমান থাকার বাস্তব প্রয়োজনীয়তা আছে কি ? কিছুতেই নেই। কেননা তাঁর এই আদেশ প্রকৃতপক্ষে তাঁর ইজতিহাদ ছাড়া অন্য কিছুই ছিল না। আর ইসলামী আইনের এই মৌলনীতির উৎস ছিল ঃ

ادرؤا الحدود بالشبهات

"সন্দেহ হলে হদ প্রবর্তন করো না।"

হযরত উমর (রা) তাঁর শাসনামলে এই আইনও প্রবর্তন করেছিলেন যে, মুসলমান শাসকরা ধনীদের অতিরিক্ত সম্পদ তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করে দরিদ্র লোকদের মধ্যে বন্টণ করে দিতে পারবে। আধুনিক ইংল্যাণ্ডে আজ ঠিক আইনই অনুসৃত হচ্ছে। কিন্তু অনস্বীকার্য যে, ইংল্যাণ্ডকে এই আইন রচনা করতে কিংবা উহার প্রবর্তনের জন্যে কোন উমরের প্রয়োজন হয়নি। বস্তুত এটা প্রকৃতপক্ষে বর্তমান যুগে ইসলামী আইন অনুসরণযোগ্য হওয়ার বড় একটি অকাট্য প্রমাণ। কেননা এই আইনও হযরত উমর (রা)-এর নিজের রচিত ছিল না ; বরং পবিত্র কুরআনের যে আইনের উপর ভিত্তি করে এটা রচিত হয়েছিল সেটি ছিল ঃ

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ط

"যাতে করে তোমাদের সম্পদ কেবল ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত হতে না থাকে।"-(সূরা আল হাশর ঃ ৭)

হযরত উমর (রা) খলীফা হিসেবে এই মতও প্রকাশ করেছেন যে, হুকুমাতের সকল কর্মচারী ও পদস্থ কর্মকর্তাদের সম্পদ এবং আয়ের উৎসগুলোর

ব্যাপক অনুসন্ধান চালানোও হুকুমাতের এখতিয়ার ভুক্ত ব্যাপার। যাতে করে এটা জানা যায় যে, তারা কি এই সম্পদ বৈধ পন্থায় অর্জন করেছে, না অবৈধ পন্থায় আয় করেছে। বর্তমান বিশ্বে সকল রাষ্ট্রেই এই আইন সমর্থন করছে এবং এ আইন অনুযায়ী আমলও করা হচ্ছে। অথচ এখন আমাদের মধ্যে কোন উমর বর্তমান নেই।

হযরত উমর (রা) এই আইনও প্রণয়ন করেছিলেন যে, অবৈধ শিশুদের (যাদের পিতা-মাতার কোন সন্ধান পাওয়া যাবে না) লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। তাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রশিক্ষণের যাবতীয় খরচও সরকারই বহন করবে। যাতে করে পিতা-মাতার পাপের মাশুল নিষ্পাপ সন্তানকে দিতে না হয় সে জন্যেই এই আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। বিশ শতকের ইউরোপ-আমেরিকাও এরূপ আইন প্রণয়ন করতে বাধ্য হয়েছে। এতে করে আরেকবার এ সত্য প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলামী আইন-কানুন প্রবর্তনের জন্যে হযরত উমরের ন্যায় মহান ব্যক্তিদের বর্তমান থাকার কোন আবশ্যকতা নেই। বস্তুত হযরত উমর (রা)-এর এই সীমাহীন গুরুত্বের মূলে যে কারণটি বর্তমান আমরা তারই মুখাপেক্ষী। ব্যক্তি উমরের মুখাপেক্ষী নই। সে কারণটি হলো ঃ হযরত উমর (রা) প্রাথমিক যুগের শ্রেষ্ঠ আইনবিদ বা ফকীহ ছিলেন, ছিলেন ইসলামের প্রকৃত রূহের সাথে পরিচিত। তার ইসলামের আইন ও মূলনীতিরও ছিল গভীর জ্ঞান। তার ব্যক্তিগত জীবনের আদর্শের আলোকে আমরা আমাদের জীবনকে সুন্দর ও সুখময় করে তুলতে পারি। তার ব্যক্তিত্ব সকল স্থান ও কালের সকল মুসলমানের জন্যে একটি পবিত্র ও উন্নতমানের আদর্শ। কিন্তু ধরুন, আমরা যদি তার ব্যক্তি জীবনের গুণাবলী নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করতে না পারি তাহলেও আমাদের সামষ্টিক ও বাস্তব জীবনের সামগ্রিক কল্যাণের জন্যে তার পরিত্যক্ত ইসলামী আইনের তথা ফিকহার অনুসরণ আমাদের জন্যে যথেষ্ট হতে পারে। কেননা এরূপে আমরা কমপক্ষে অন্যদের দ্বারস্থ হয়ে তাদের আইন ও শাসনতন্ত্র ভিক্ষা করার অপমান থেকে তো বাঁচতে পারি।

ইসলাম খেলাফাতে রাশেদার সাথে নিঃশেষ হয়ে যায়নি

ইসলামী জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে আরো একটি ভুল ধারণা দেখা যায়। বলা হয় ঃ খেলাফাতে রাশেদা এবং হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ (রা)-এর সংক্ষিপ্ত সময় বাদ দিলে ইসলামী জীবনব্যবস্থা কখনো পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কিন্তু যারা একথা বলে তারা একথা বেমালুম ভুলে যায় যে, খেলাফাতে রাশেদা অথবা হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজের পরে ইসলাম একটি ধর্ম

এবং জীবন পদ্ধতির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য কোন সময়েই হারায়নি ; বরং পূর্বে যেমন ছিল তখনও তেমনি ছিল। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায়, খেলাফাতে রাশেদার পরে সরকারী ব্যবস্থাপনায় পুরোপুরি কিংবা আংশিকভাবে এক প্রকার দুর্বলতার পরিবর্তন সূচিত হয়। নতুবা রূহ বা মূল ভাবধারার দিক থেকে সমাজব্যবস্থা যেমনটি ছিল তেমনিটই ছিল। তখনও সেই সমাজব্যবস্থা 'বিত্তশালী' ও 'গরীব' কিংবা 'প্রভু ও 'গোলাম'-এর ন্যায় কোন শ্রেণী প্রথাকে বরদাশত করেনি। কেননা সেই ইসলামী সমাজব্যবস্থায় সমস্ত নাগরিকই ভ্রাতৃত্বের একই সূত্রে গ্রথিত ছিল ; মেহনত ও শ্রমের এবং সুফল ও বরকতের সবাই ছিল সমান অংশীদার।

ইসলামের নিয়ন্ত্রণ পরবর্তী যুগে

এভাবে ইসলামী দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় একমাত্র ইসলামের আইনই দেশের নিয়ন্ত্রণী শক্তি হিসেবে কার্যকরী ছিল। সেই শক্তিই ইউরোপের ন্যায় সাধারণ মানুষকে সামন্তবাদীদের দয়া ও অনুকম্পার উপর ছেড়ে দেয়নি। ইসলামী ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি দ্বারা মুসলমানদের ইতিহাসের প্রতিটি যুগই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এবং মুসলমানরা যে বিভিন্ন সময়ে তাদের দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে তার অনেক স্থানেই ইসলামী ঐতিহ্যের এই ঝলকানি আমরা দেখতে পাই। এই প্রসংগে গাজী সালাউদ্দীন আইয়ুবীর ক্রুসেডের (Crusade) যুদ্ধে সমগ্র খৃষ্টান রাজা-বাদশাহদের পরাজিত করার কাহিনী মানবেতিহাসের এক অবিস্মরণীয় ব্যাপার। অনুরূপভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চুক্তি পালনের ব্যাপারে মুসলমানদের ইতিহাস এক গৌরবময় অধ্যায়। অতপর জ্ঞানের অন্বেষণ ও অনুশীলন এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তারা এতদূর অগ্রসর ছিলেন যে, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প কলায় তারাই ছিলেন বিশ্বের পথিকৃৎ। ইসলামের এই প্রজ্জলিত মশালের আলোকেই অবশেষে গোটা ইউরোপ একদিন আলোকিত হয়ে উঠে এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও উৎকর্ষের পথে তারা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হতে থাকে।

মোটকথা পাশ্চাত্যের লোকেরা বাস্তবতার সাথে সম্পর্কহীন যে আকাশ কুসুম কল্পনা সর্বস্ব আদর্শবাদকে ঘৃণার চোখে দেখে সেইরূপ আদর্শবাদের সাথে ইসলামের আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। বরং এটা একটি পূর্ণাংগ ও অনুসরণযোগ্য বাস্তব জীবনব্যবস্থা। একবার পরিপূর্ণ সাফল্যের সাথে এই ব্যবস্থা অনুসৃত হয়েছে এবং আজও উহাকে অপেক্ষাকৃত সহজভাবে অনুসরণ করা যেতে পারে। কেননা তেরশ' বছরের মধ্যে মানুষ যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে তা তাদেরকে ইসলামের কাছাকাছি এনে দিয়েছে। এ যুগে যদি সত্যিকারভাবে কোন জীবনব্যবস্থাকে অন্তসারশূন্য অবাস্তব ও অকার্যকর আদর্শবাদিতা

বলে গণ্য করা যায় তাহলে সেটি হবে সমাজতন্ত্র। কেননা উহাকে আজ পর্যন্ত বিশ্বের কোথাও সাফল্যের সাথে অনুসরণ করা হয়নি। স্বয়ং সমাজতন্ত্রীরাই স্বীকার করে যে, আসল সমাজতন্ত্রের মঞ্জিল এখনো অনেক দূরে। বিশ্ব ধীরে ধীরে উহার দিকে অগ্রসর হচ্ছে মাত্র। যখন সমস্ত বিশ্ব একটি মাত্র বিশ্ব সমাজ তান্ত্রিক সরকারের অধীনে পরিচালিত হবে এবং দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ সকল মানুষের মধ্যে সমানভাবে বন্টণ করে দেয়া হবে ঠিক তখনই সত্যিকার সমাজ তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। তখন 'গরীব' ও 'ধনী'র শ্রেণী সংগ্রামও চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে, কেননা শ্রেণী সংগ্রামের মূল কারণ—অর্থনৈতিক বৈষম্যের কোন নাম-নিশানাও দুনিয়ায় খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সমাজতন্ত্রের কাল্পনিক স্বর্গ

সমাজতন্ত্রের উপরোক্ত কাল্পনিক স্বর্গরাজ্যের সাথে বাস্তবতার কোন সম্পর্কই নেই। এটা 'আত্মপ্রবঞ্চনা' এবং দুনিয়াকে ধোঁকা দেয়া ছাড়া অন্য কিছুই নয়। যে সকল অলীক কল্পনার উপর ইহার সৌধ নির্মাণ করা হয়েছে উহার সবটুকুই বাতিল এবং ভিত্তিহীন। কেননা না মানুষের মধ্যে কৃত্রিম উপায়-উপাদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সাম্য স্থাপন করা যেতে পারে। না নিছক সম্পদের সমবন্টনের মাধ্যমে মানুষের সকল সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। আর না একথা সত্য যে, মানুষের উন্নতির রহস্য কেবল শ্রেণী সংগ্রামের মধ্যেই নিহিত। সমাজতন্ত্র এমন একটি আদর্শবাদিতার ধ্বজাধারী যার পেছনে কেবল সেই সকল লোকই ছুটতে পারে যারা বিচার-বিবেচনার সকল যোগ্যতাই হারিয়ে ফেলেছে। এই মতাদর্শ জড়বাদের বীজ থেকেই জন্মলাভ করে। কিন্তু বলিহারি ! ধূর্তামি আর কাকে বলে যে, এত সত্ত্বেও দাবী করা হচ্ছে যে, এটাই চূড়ান্ত পর্যায়ের বৈজ্ঞানিক এবং বাস্তব জীবনের সকল প্রকার ঘটনার সাথে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যশীল।

আমাদের কর্মসূচী

ইসলাম আমাদের জন্যে যে লক্ষ ও উদ্দেশ্য নির্ধারিত করে দিয়েছে উহা অর্জন করার পন্থা কি ? স্বীকার করি যে, ইসলামই সর্বশ্রেষ্ট জীবন পদ্ধতি এবং আমাদের ঐতিহাসিক ভৌগলিক এবং আন্তর্জাতিক অবস্থানের প্রতি লক্ষ্য করে ইসলামই আমাদের মুসলমানদের সম্মান, নেতৃত্ব এবং সামাজিক সুবিচার লাভের একমাত্র মাধ্যম। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, যখন সমগ্র দুনিয়াই এত ঘোর বিরোধী এবং খোদ মুসলিম দেশসমূহের উপর এমন স্বৈরাচারী শাসকবৃন্দ চেয়ে বসেছিল যারা অন্যদের চেয়েও অধিকতর শক্তি প্রয়োগ করে একে দমন করার চেষ্টা করছেন তখন কেমন করে আমরা এর অনুসরণ করতে পারি ?

ঈমান ও ইয়াকিনের পথ

উপরোক্ত পরিস্থিতিতে আমাদের কর্মপন্থা কি হওয়া উচিত। আমাদের কতর্ব্য কি ? এর একমাত্র উত্তর হলো ঃ ইসলামী লক্ষ্য অর্জনের পথ একমাত্র উহাই যা মানবেতিহাসের প্রতি আন্দোলনকেই অপরিহার্য রূপে গ্রহণ করতে হয়েছে। আর এই পথটি হলো ঈমান ও ইয়াকিনের পথ।

মহান ঐতিহাসিক অলৌকিক ঘটনা

এই ঈমানই ছিল ইসলামের প্রথম যুগের মুসলমানদের শক্তির একমাত্র উৎস। এ যুগের মুসলমানদের মুক্তির রহস্যও এর মধ্যে নিহিত। মুসলমান হিসেবে আমরা আজ যে সকল সমস্যার সম্মুখীন উহা প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের সমস্যা থেকে মোটেই ভিন্নতর নয়। তারা ছিলেন মুষ্টিমেয় লোক। কিন্তু তৎকালীন দুই বৃহৎ শক্তি—রোম ও ইরানের বিরুদ্ধে তারা লাভ করেছিল অভাবনীয় বিজয়। অথচ এই শক্তিদ্বয় কি জনবল, কি ধন বল, কি সাজ-সরঞ্জাম, কি রণ কৌশল, কি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা—সকল দিক থেকে ছিল মুসলমানদের চেয়ে বহুগুণে অগ্রসর। কিন্তু তা সত্ত্বেও মাত্র ৫০ বছরের মধ্যেই তারা কায়সার ও কিসরা (সিজার ও খসরু) উভয়ের অহংকারকেই ধূলায় মিশিয়ে দেয়। এবং লোহিত সাগর থেকে শুরু করে রোম সাগর পর্যন্ত সমস্ত এলাকাই অধিকার করে নেয়। তাদের এই সাফল্য ছিল ইতিহাসের এক মহা অলৌকিক ঘটনা।

ইতিহাসের কোন বস্তুগত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দ্বারা ইতিহাসের এই মহান অলৌকিক ঘটনার পর্যালোচনা করা সম্ভবপর নয়। একমাত্র ঈমান ও ইয়াকীনের হাতেই এই দায়িত্ব অর্পণ করা চলে। এই ঈমানী প্রেরণার কারণেই মুসলিম মুজাহিদ বাহিনী যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রু বাহিনীর সম্মুখীন হয়ে উচ্চৈস্বরে বলে উঠতো ঃ

أَلَيْسَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ اِلاَّ أَنْ أَقْتُلَ هٰذَا الرَّجُلَ أَوْ يَقْتُلَنِىْ

"আমার এবং জান্নাতের মধ্যে শুধু এতটুকু ব্যবধান যে, আমি এই ব্যক্তিকে (কাফিরকে) হত্যা করব অথবা সে আমাকে হত্যা করবে।"

এরপর কোন বর যেমন বাসর ঘরে অভাবনীয় আনন্দের সাথে প্রবেশ করে ঠিক তেমনিভাবে তারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে ঝাপিয়ে পড়ত। এই ঈমানী শক্তির কারণেই তারা শত্রু বাহিনী দেখা মাত্র অজ্ঞাতসারেই বলে উঠতো ঃ

هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَا اِلاَّ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ (النصر ، او الشهادة)

"তোমরা আমাদের ব্যাপারে দু'টি উত্তম জিনিসের মধ্যে যে কোন একটির জন্যেই কি অপেক্ষমান ? (অর্থাৎ বিজয় কিংবা শাহাদাত।)"

বস্তুত এই পথ অলম্বন করেই আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারি। এই পথ বর্জন করলে কোন আহ্বানই সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে না।

অস্ত্র-শস্ত্রের প্রয়োজন আছে কি ?

যুদ্ধের অস্ত্র-শস্ত্র সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হয় এবং বলা হয় যে, এখন আমাদের কাছে না আছে অস্ত্র-শস্ত্র, না আছে অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম। এছাড়া ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার যুদ্ধে জয়লাভ করা কেমন করে সম্ভবপর ? যারা এ ধরনের কথা বলেন তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক রয়েছে মুখলেস ও আন্তরিক এবং কিছু সংখ্যক রয়েছে হীনমন্যতা বা পরাভূত মানসিকতার শিকার। অস্ত্র-শস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জামের অবশ্যই প্রয়োজন, এতে কারুর সন্দেহ নেই। আর এ কথাও সত্য যে, বর্তমানে আমাদের কাছে উহার কিছুই নেই। তবে আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, আমাদের সর্বপ্রথম যা প্রয়োজন তা অস্ত্র-শস্ত্র নয় ; শুধু অস্ত্রের জোরে আজ পর্যন্ত কোন জাতিই কোন অলৌকিক ঘটনা দেখাতে পারেনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইটালীর সেনাবাহিনীর অস্ত্র-শস্ত্রই ছিল সর্বাধুনিক ; কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা যুদ্ধে কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি। দেখা গেছে তাদের সৈন্যরা ছিল যারপরনাই ভীরু, অনেক সৈন্যই পালিয়ে গেছে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে এবং আত্মসমর্পণের সময়ে সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্রই তারা ফেলে গেছে শত্রুদের জন্যে। তাদের অস্ত্র-শস্ত্রের অভাব ছিল না, বরং অভাব ছিল বিশ্বাস ও সাহসিকতার।

অস্ত্র-শস্ত্র ও ঈমান

উপরোক্ত অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা আমরা দেখতে পাই যখন ঈমানী চেতনায় বলীয়ান ক্ষুদ্র একদল লোক[১] যাদের সংখ্যা একশ'র অধিক কিছুতেই

১. লেখত সম্ভববতঃ তারাবলসের যুদ্ধে যোগদানকারী মুজাহিদ বাহিনীর কথা বলেছেন।

ছিল না—সেই 'বৃহৎ' কিন্তু অন্তসারশূন্য ইটালীর শাসকদেরকে অতি অল্পকালের মধ্যেই এতদূর ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলেছিল যে, তারা দেশটি ছেড়ে গিয়েই প্রাণে বাঁচার কথা ভাবতে বাধ্য হয়েছিল। ঈমানদারদের এই দলটির কাছে মারাত্মক কোন অস্ত্র-শস্ত্র ছিল না। না তাদের কাছে তোপখানা ছিল। না ছিল কোন জেট ফাইটার। না ছিল ভারী কোন হাতিয়ার। বাহ্যত তারা কেবল মামুলী পিস্তল ও রাইফেল দ্বারাই লড়াই করেছিল। এবং জয়লাভ করতেও সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই যে, তাদের নিকট প্রকৃত পক্ষে যে অস্ত্র ছিল তা ছিল দুষমনদের হাতিয়ারের চেয়ে শত সহস্রগুণ ভীতিকর ও মারাত্মক। এই হাতিয়ার ছিল তাদের ঈমানী চেতনা। প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের ন্যায় আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার সময়ে তারা তাদের ঈমানী চেতনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল এবং এরূপ দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিল যে, হয় তারা আল্লাহর দুষমনদের হত্যা করবে, নতুবা তাদের হাতে শাহাদাত লাভ করবে। চরম বিপদ ও প্রতিকূল পরিবেশে তাদের সাফল্যের একমাত্র চাবিকাঠি ছিল তাদের এই ঈমানী শক্তি এবং অপরাজেয় সংকল্প।

সত্যের পথ—শাহাদাতের আকাংখা

আমরা ভালোরূপেই অবগত আছি যে, আমরা যে পথ অবলম্বন করেছি উহা কুসমাস্তির্ণ নয়। বরং শক্তিপ্রয়োগে, রক্ত ও অশ্রুর ভেতর দিয়েই সে পথ অতিক্রম করতে হয়। এর জন্যে কুরবানীর আত্মত্যাগ ছাড়া উপায় নেই। আমাদের মহান ও পবিত্র লক্ষ্য—অর্থাৎ আমাদের ইজ্জত সম্ভ্রম, শ্রদ্ধা, মর্যাদা এবং সামাজিক সুবিচার এই পথেই অর্জন করতে পারি। আর একথা সুস্পষ্ট যে, এ সওদা কখনো সস্তা নয়।

ত্যাগ ও কুরবানী অপরিহার্য

এটা একান্তই বাস্তব যে, ঘৃণা, লাঞ্ছনা, দারিদ্রতা, দুর্বলতা, নৈরাজ্য ও বৈষ্যমের কারণে আমরা যে দুঃখ-দুর্দশার ভেতর দিয়ে কালাতিপাত করছি উহা ইসলাম অনুসরণ করার জন্যে যে দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হতে হয় তার চেয়ে বহুগুণ অধিক। বিগত মহাযুদ্ধে আরব জাহানের লক্ষ লক্ষ লোক নিহত হয়েছে। হাজার হাজার লোক বোমার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। অসংখ্য মানুষ বিত্ত-সম্পদ হারিয়ে পথে বসেছে। অগণিত লোক ধরা পড়ে বন্দী হয়েছে এবং বিপুল সংখ্যক নিরপরাধ ও নিষ্পাপ মানুষকে রিজক ও জীবিকা অর্জনের উপায়-অবলম্বন থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও আমরা মিঃ চার্চিলকে সন্তুষ্ট করতে পারিনি। তিনি যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার সংগে সংগেই আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ "আমরা তোমাদেরকে রক্ষা করেছি, এখন উহার মূল্য দেয়ার জন্যে তোমরা প্রস্তুত হয়ে যাও।"

পাশ্চাত্য শক্তিসমূহের স্বভাব

এখন সকলের বক্তব্য হলো ঃ যখন পাশ্চাত্যের শক্তিগুলো আরব জাহানের লোকদেরকে এ যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তির অধীনে একত্র করার জন্যে তৎপর হয়ে উঠে তখন তাদের দাবী ছিল ঃ এরূপে কমপক্ষে পঞ্চাশ লাখ আরবকে তাদের সশস্ত্র সেনাবাহিনীতে ভর্তি করে তাদের উপরই তাদের মারণাস্ত্রসমূহের পরীক্ষা চালাবে যাতে করে শ্বেতাংগ আমেরিকাবাসী ও ইংরেজরা ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে যায়। কিন্তু যখন দেখা গেল যে, আরবরা খুব সহজে এই চুক্তিতে সাড়া দিচ্ছে না তখন তারা গায়ের জোরে আরব জাহানের সমস্ত উপায়-উপাদানের উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করে। আরব জনসাধারণের উপর লাঞ্ছনা ও অত্যাচারের ষ্টীম রোলার চালিয়ে তাদেরকে পর্যুদস্ত করে দিল। এরপরেও যখন তাদেরকে কাবু করতে পারলো না তখন তাদের সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করতে বাধ্য হলো। মৃত্যু একটি আমোঘ সত্য ; কোন প্রাণীই এর হাত থেকে বেঁচে থাকতে পারে না। সুতরাং বিপদ-আপদ ও দুঃখ-যন্ত্রণায় অস্থির হওয়া সম্পূর্ণরূপেই অর্থহীন। বহু লোকই এমন ছিল যারা অপমান ও লাঞ্ছনার সাথে মৃত্যুবরণ করেছে। অনুমান করা হয় যে, মহাযুদ্ধে মিত্র শক্তির কমপক্ষে পাঁচ লাখ লোক নিহত হয়েছে। তাহলে ইসলামের উদ্দেশ্যে—শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন ও সত্য নিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জীবন দিতে আমরা কুণ্ঠিত হবো কেন ? আজ যদি ইসলামের উদ্দেশ্যে বাঁচা-মরার জন্যে পাঁচ লাখ লেখক প্রস্তুত থাকে তাহলে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার সাথেই বলা যায় যে, বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা সম্পূর্ণরূপেই পরিবর্তিত হয়ে যাবে। তখন না থাকবে কোন ক্ষমতা দখলকারী স্বৈরাচারী শাসকের দাপট, আর না থাকবে কোন খৃস্টান বা অখৃস্টান সাম্রাজ্যবাদের কোন অস্তিত্ব। এখনো কি বলা প্রয়োজন যে, ইসলামী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করার পন্থা কি ?

সমাজতন্ত্রের উন্নতি ও ইসলাম

কিছু সংখ্যক লোক এমন রয়েছে যারা বর্তমান যুগে সমাজতন্ত্রের উন্নতি দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। অথচ তাতে করে অস্থির হওয়ার কোন যুক্তিসংগত কারণই নেই। কেননা সমাজতন্ত্রের আবির্ভাবের পর সারা বিশ্বে ইসলামের বিন্দুমাত্র ক্ষয়-ক্ষতি সাধিত হয়নি। বর্তমান সময়ে যে দেশগুলো সমাজতন্ত্রের আওতাভুক্ত ঐগুলো যখন বৃহত্তর খৃস্টান জগতের অংশ ছিল তখন উক্ত এলাকা এখনকার মতই ইসলামের বিরুদ্ধে একইরূপ শত্রুতা পোষণ করতো। বস্তুত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বহু পূর্বেও রুশ সরকার মুসলমান দেশসমূহে ফিতনা ও বিপর্যয় সৃষ্টির জন্যে তাদের এজেন্ট নিয়োগ করতো। তারা তখনও মুসলমানদের কল্যাণ কামনা করতো না এবং এখনো করে না।

ইউরোপের অবস্থাও একই রূপ। ইউরোপ এক সময়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডের যুদ্ধ পরিচালনা করতো এবং এখনো পর্যন্ত সেই ধরনের 'পবিত্র' যুদ্ধে তারা অংশগ্রহণ করছে। মোটকথা, ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সারা দুনিয়ায় দুষমনদের যে ভূমিকা অতীতে চালু ছিল বর্তমানকালেও সেই অবস্থার আদৌ কোন পরিবর্তন হয়নি।

আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি ?

সারা বিশ্বের এই প্রেক্ষাপটে মুসলমান হিসেবে আমরা আজ ঠিক সেই স্থানেই দাঁড়িয়ে আছি যেখানে দাঁড়নো ছিলেন আমাদের প্রাথমিক যুগের মুসলমান। তারা তখন ডানে-বামে উভয় দিকেই দু'টি বৃহত্তর বিরোধী শক্তির—ইরান ও রোম রাজ্যের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। আমাদের অবস্থাও আজ সেই রূপ। তবে যে সকল জালেম ও স্বৈরচারী শাসকবৃন্দ ইসলামী দেশগুলোর উপর চেপে আছে তাদের ব্যাপারে আমাদের কি করা উচিত ? তাদের সম্বন্ধে আমাদের এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, তাদের পতন খুব দূরে নয়। কেননা ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এই ধরনের জালেম, স্বৈরাচারী ও অন্তসারশূন্য সরকার কখনো দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না।

ইসলামী চেতনার দাবী

বর্তমানে যে ভাস্বর ইসলামী চেতনা মুসলিম বিশ্বে ক্রমবিকাশ লাভ করছে তা ইসলামের নিয়ম-নীতির আলোকে সামাজিক ইনসাফ ও ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আর এ উদ্দেশ্যে উহা প্রাচ্যের সমালোচনা বা অহেতুক তর্ক-বিতর্কের যেমন পরোয়া করে না। তেমনি পাশ্চাত্যের মোড়লিপনা বা ছিদ্রান্বেষণের কোন গুরুত্বও স্বীকার করে না।

সৃষ্টি হচ্ছে নতুন জগত

বড়ই আনন্দের বিষয় এই যে, কঠিনতম ও ঘোর প্রতিকূল পরিবেশ সত্ত্বেও বিশ্বের সর্বত্রই ইসলামী আন্দোলন ক্রমেই জোরদার হয়ে উঠছে। উহার শক্তি দিন দিন বেড়ে চলেছে এবং উহার গুরুত্বও প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান অবস্থা দেখে পরিষ্কার বুঝা যায়, ইসলামের পুনর্জাগরণ অনিবার্য এবং একথা দিবালোকের মত স্পষ্ট যে পুনরায় একবার সেই গৌরবময় ও ভাস্বর ইতিহাস আমাদের সামনে আসছে যার ঝলকানি একবার সমগ্র বিশ্ব দেখতে পেয়েছিল আজ থেকে সাড়ে তেরশ' বছর পূর্বে।

বর্তমান বিশ্বের মুক্তির পথ

আজকের বিশ্ব একদিকে জড়বাদের দাসত্ব এবং অন্যদিকে অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের দ্বিমুখী অভিশাপে ভীষণভাবে জর্জরিত। ইসলাম গোটা বিশ্বকে এ দু'টির

হাত থেকে মুক্তি দেয় এবং তাকে এমন একটি জীবনব্যবস্থা প্রদান করে যাতে জড় এবং রূহ উভয়টিই বর্তমান এবং উভয়ের দাবীকেই একই সময়ে পূরণ করে। জড়বাদের (Materialism) অভিশাপ মানষের রূহ এবং কলব উভয়ের শান্তি ও নিশ্চিন্ততাকে কেড়ে নিয়েছে এবং তাদের দুনিয়াকে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের এক আখড়ায় পরিণত করেছে। আধুনিক বিশ্বের এই সকল ব্যধির চিকিৎসা একমাত্র ইসলামের মাধ্যমেই সম্ভবপর। কেননা উহা বস্তুকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে রূহকে কখনো জবাই করে না এবং রূহকে মূল্য দিতে গিয়ে এতদূর বাড়াবাড়িও করে না যাতে করে বস্তুকে পুরোপুরিই উপেক্ষা করা হয়। উহা এই দু'টির মাঝামাঝি একটি ভারসাম্যপূর্ণ পথকেই অনুসরণ করে এবং উহাদের চাহিদাসমূহের মধ্যেও একটি সুষ্ঠু সামঞ্জস্য স্থাপন করে। আমরা আশা করি শীঘ্রই হোক অথবা বিলম্বে হোক, সমগ্র বিশ্ববাসীই একদিন ইসলামের প্রকৃত মূল্য হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবে। নিজেদেরই দ্বীন হিসেবে গ্রহণ না করলেও তারা যে উহার উপস্থাপিত জীবন দর্শনকে কোন না কোন রূপে অধিককাল পর্যন্ত উপেক্ষা করে চলতে পারবে না তাতে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য উহাকে কবুল করার ভেতরেই তাদের সার্বিক কল্যাণ ও মুক্তি নিহিত।

ইসলামী আন্দোলনের আমরা কর্মীরা অবশ্যই অবগত আছি যে, আমরা যে পথ অবলম্বন করেছি তা কোন শান্তিপূর্ণ পথ নয়। প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের মতই আমাদেরও (ঈমানের) পরীক্ষা, ত্যাগ, সহানুভূতি ও অন্যকে অধিকতর অগ্রাধিকার দেয়ার কঠিন ও প্রাণান্তকর মঞ্জিলসমূহ অতিক্রম করতে হবে। তাহলেই আমরা বিশ্ববাসীকে ইসলামের সত্যনিষ্ঠ এবং সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত করতে সমর্থ হবো। কেননা এই পথে যে কোন প্রচেষ্টা ও ত্যাগ দেখানো হোক না কেন উহা কখনো নিষ্ফল হয় না। আসমান ও জমিন উভয়ই এর সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়ঃ

وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِىٌّ عَزِيْزٌ-

"যে আল্লাহর সাহায্য করে আল্লাহও অবশ্যই তার সাহায্য করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহান শক্তিধর ও মহা পরাক্রমশালী।"

আর এটা সুনিশ্চিত যে, মহান আল্লাহর এই প্রতিশ্রুতি সত্য।

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই